সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

সুমথনাথ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুমথনাথ ঘোষ চল্লিশের দশকের লেখক, কল্লোল যুগের পরবর্তী পর্বের গল্পকার। ছোটগল্প-উপন্যাস দুই ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দচারণা। মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখদুঃখ, আশানৈরাশ্য, ক্ষুধাতৃষ্ণা, লোভক্ষোভ, ব্যর্থতা-আত্মগ্লানি, ফাঁপা অহংকার ও চাপা অভিমান সবই তাঁর কলমের সূচীমুখে উঠে এসেছে। এদিক থেকে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দলভুক্ত, অথচ তাঁদের স্কুলের অন্তর্গত নন; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পূর্বসূরী, অথচ তাঁর সমস্ত বিশিষ্টতা তিনি আত্মসাৎ করেননি। সুমথনাথের গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত কম নয়, যদিও তথোচিত মর্যাদা তিনি তাঁর জীবৎকালে লাভ করেননি। অবশ্য সর্বকালের সর্বশ্রেণীর লেখকদের যে পরমপ্রার্থনীয় পাঠকদের অনুরাগ, সুমথনাথ অনেকাংশে তা পেয়েছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণের পর তাঁর লেখনীর গতি স্তব্ধ হয়েছে, কিন্তু সামান্য কালব্যবধানেও তাঁর সমগ্র রচনার দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাওয়া গেছে। একালে, বাংলা কথাসাহিত্যের সমগ্র ঐশ্বর্য ও বৈভবের দিকে তাকিয়ে সখেদে বলা যেতে পারে, সুমথনাথকে আমরা যথেষ্ট সম্মান দিই নি, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর চেয়ে স্বল্পবিত্ত লেখককেও হয়তো কখনও তাঁর তুলনায় অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়ে গেছে। কারণ সুমথনাথ ছিলেন ভারি কুণ্ঠিত স্বভাবের, স্বভাবনিস্পৃহ প্রচারবিমুখ মানুষ।

বাঁকাস্রোত সুমথনাথের প্রথম যৌবনের জনপ্রিয় উপন্যাস। শরৎচন্দ্রীয় রীতিতে ও সাধুভাষায় লেখা এই মাঝারি মাপের উপন্যাসটিতে সুমথনাথের পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য, জীবনের খুঁটিনাটির দিকে সতর্ক মনোযোগ, বয়ঃসন্ধিলগ্নের কিশোর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর কৌতূহল, কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ার এক গ্রামজীবনের সংকীর্ণ সংস্কারজীর্ণ নিরানন্দ-পরিবেশসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, বর্ণনার আকর্ষণ শক্তিতে এবং স্বাদু ভাষায় আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন অভ্যস্ত কর্মচক্রে আবর্তিত। শিক্ষাদীক্ষা, উপার্জন, বিবাহ, সংসার, পুত্রকন্যা, চাকরি, সাচ্ছল্য ও প্রতিষ্ঠার কমবেশি আয়োজনে সংহত সে জীবন। কিন্তু এই উপন্যাসের নায়ক এক উৎকেন্দ্রিক জীবনের অভিশপ্ত পথচারী। উত্তম পুরুষে কথিত এই উপন্যাসের নায়ক তার অকৃতার্থ নিষ্ফল অপদার্থ একটি জীবন নিয়ে কেবলই ব্যর্থতার এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছে। অতিশৈশবে মাতৃহীন ও পিতার সযত্ন নিশ্ছিদ্র স্নেহাশ্রয়ে প্রতিপালিত কলকাতার এক অভিজাত পরিবেশে লালিত বালকটি অকস্মাৎ পিতাকে হারিয়ে গ্রামের এঁদো পুকুরের ধারে সহানুভূতিহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, কুশিক্ষার রুদ্ধ পরিবেশে, জ্যাঠামশায়ের সংসারে স্থানান্তরিত হয়। তারপর নানা ধরনের মানুষ ও অভিজ্ঞতার বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে চলতে চলতে তার ঊর্ধ্বারোহী চরণ স্খলিত হয়েছে। মাতৃস্নেহবঞ্চিত বালকের

ব্যাকুল স্নেহক্ষুধা তাকে তাড়িত করেছে মাতৃকল্প নারীদের কাছে। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না-কোনো প্রত্যাশাভঙ্গের আঘাতে তার স্নেহবুভুক্ষু অপরিণত চিত্ত জটিল মনোবিকারের বাঁকাস্রোতে পর্যুদস্ত হয়েছে। কিশোর প্রেমের এক মৃদু স্নিগ্ধ সুবাস ক্ষণকালের জন্যে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। অবশেষে বয়ঃসন্ধিকালে এক মাতৃসমা মহিলার স্নিগ্ধ বাৎসল্যের আশ্রয়ে তার আবাল্য-অপরিতৃপ্ত স্নেহকাতরতার সাময়িক পর্যবসান ঘটেছে। কিন্তু একই সঙ্গে আর এক পরিণতবয়স্কা রূপবতী মহিলার সংস্পর্শে এক গোপননিষিদ্ধ রহস্যময় সম্পর্ক তার জীবনে অনাস্বাদিত নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। পুনরায় তার কৈশোর-প্রেমবেদীর অন্তর্হিত প্রতিমা শান্তির পুনরাবির্ভাবে সে বিচলিত হয়ে উঠেছে ও আবার অনির্দেশ্য ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়েছে। বাঁকাস্রোত উদ্‌ভ্রান্ত বয়ঃসন্ধির একটি উচ্চাঙ্গ গদ্যনাট্য।

মহানদী অন্য ধরনের উপন্যাস। এই উপন্যাসে নির্যাতিত দেশকর্মী শঙ্কর স্বাধীনতাঅর্জনের অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজের হাজতবাস থেকে মুক্তি পেয়ে পুরনো অঞ্চলে এসে দেখতে পেল স্বাদেশিকতার আদর্শ ভূলুণ্ঠিত। তারই প্রাক্তন সহকর্মী তিনকড়ি যাবতীয় অসামাজিক দুষ্কর্মের নায়ক, কর্মীরা ছন্নছাড়া লক্ষ্যভ্রষ্ট। আদর্শহীন শিক্ষাহীন হঠাৎধনী শিবনাথ তার বিপুল বিত্তের দ্বারা খয়রাতি ও সেবা কর্মের প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্মানিত হওয়ার সুযোগ অর্জন করে নিয়েছে। তিনকড়ি হয়েছে তার একান্ত সহায়ক। শঙ্কর নতুন করে দেশগড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে, তার মন্ত্রশিষ্যা লাবণ্যও তার পিছনে নিঃস্বার্থভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। এসবের অপরিহার্য পরিণামে শুরু হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। লাবণ্যের জীবনে নেমে এসেছে দুর্বিপাকের আঘাত। অবস্থার পরিণামে লাবণ্যকে এক দুশ্চরিত্র জমিদারের গলায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালা দিতে হয়েছে এবং গোপনে দেশসেবার অপরাধে স্বামীগৃহে পেয়েছে অপমান ও নির্যাতন। ঘটনার তীব্র প্রবাহে শঙ্করের করুণ মৃত্যু। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন। লাবণ্যের অসুখী দাম্পত্য-জীবনের টানাপোড়েন, শিবনাথের জীবনের বিপরীতমুখী প্রবাহ ও বিস্ময়কর পরিবর্তন—এইসব নিয়ে, ছোট ছোট বহু কাহিনী উপকাহিনীর মিলনে মহানদী একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের মহানদীতে পরিণত হয়েছে। সীমাবদ্ধ অর্থে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকার খণ্ডচিত্রণের সদৃশতায়, তারাশঙ্করের পঞ্চগ্রাম-গণদেবতার সঙ্গে এই উপন্যাসটির তুলনা চলে। নানা মত বিশ্বাস আদর্শ ও অভিপ্রায়ের প্রতিনিধিত্বে ঘটনাবর্ত-জটিল উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত আগ্রহ টানটান করে রাখে। একালের পাঠকদের কাছে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের স্বদেশ-ইতিহাসের কয়েকটি রাজনৈতিক পৃষ্ঠা গভীর কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

পদধ্বনি যেন আর এক সুমথনাথের রচনা। কলকাতার তথাকথিত রকবাজ সংস্কৃতিবর্জিত শিক্ষাহীন ইভটিজার তরুণদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। এই শ্রেণীটিকে নিয়ে গত দুই দশকে অনেক গল্পউপন্যাস চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু সুমথনাথ যখন তাদের গল্প বলেছেন তখন সমকালীন কথাসাহিত্যে তার কোনো নজির ছিল কিনা সন্দেহ। এই ছেলেদের পাড়ার ফাংশান, বারোয়ারি কার্তিক পুজোর জন্যে চাঁদার অত্যাচার, বোমাবাজি, মদ্যপান, গৃহস্থ পরিবারে ঢুকে নানা ধরনের জোরজুলুম ও অত্যাচার করা, আধুনিক গান ও ওরিয়েন্টাল ড্যান্স-প্রীতি, রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তাদের ব্যবহার এইসব উপাদান এই উপন্যাসে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তাদের দুর্বৃত্ততার মধ্যে কোনো মানবিক আচরণেরও ইঙ্গিত দিয়ে লেখক তাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। আরো অনেক চেনাজানা লঘুগুরু প্রসঙ্গও উপন্যাসে এসে গেছে। এমন-কি বাংলায় এম. এ. পাশ করে রবীন্দ্রসাহিত্যে পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গ বিষয়ে গবেষণা করে ডি-ফিল করা নিয়েও কৌতুক করেছেন তিনি। জনবহুল রাস্তায় মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই, মিথ্যে আত্মপরিচয়ে ভদ্র ঘরের মেয়েকে প্রতারিত করা, সমাজবিরোধীর মৃত্যুকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়—সমকালীন নাগরিক জীবনের এমনতরো টুকরো ছবি অসংখ্য। উপন্যাসটি বর্ণনামূলক উপন্যাসরীতিতে লেখা হয়। চলচ্চিত্রের মতো দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দ্রুত পটপরিবর্তনরীতিতে রচিত। আদ্যন্ত নিটোল কাহিনীর তুলনায় ছোট ছোট টুকরো টুকরো ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্রের আদলে ছোটগল্পের আভাস। এই ধরনের কোলাজধর্মী উপন্যাস বাংলায় বিশেষ চোখে পড়েনি। এদিক থেকে পদধ্বনি পাঠের আলাদা একটা স্বাদ পাঠকরা অনুভব করবেন।

সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্পে মোটামুটি কলকাতা শহরের আধাসামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনীর উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রায় চার দশকের পরিধিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটা সাধারণ চেহারা তাঁর গল্পগুলি খুঁজলে চিনে নিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরের অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, চোরাকারবার, কালোবাজারি, ভদ্রঘরের স্ত্রীকন্যাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করানো, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে বনিবনার অভাব, শিক্ষাসংকট ও তৎসংক্রান্ত আরো বহু সমস্যা—এইগুলি থেকে শুরু করে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশের আরো শত সমস্যার জালে বিভ্রান্ত মধ্যবিত্তের তীব্র অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের রূপকার তিনি। তাঁর ছোট গল্পগুলি মূলত দর্পণজাতীয়, কোনো টীকাভাষ্য মন্তব্য-উদ্দেশ্যবাদে তিনি গল্পকে বিড়ম্বিত করেন না, কোনো সূক্ষ্ম বিদ্রূপে বা নীতির তর্জনীর দ্বারা গল্পকে চমকিত করেন না। সেই দিক থেকে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কথিত পয়েন্টিং ফিঙ্গার দিয়ে তিনি গল্প শেষ করেন না, কোনো তির্যক মন্তব্যে তিনি পাঠকদের বুদ্ধি বা মনকে উত্তেজিত করেন না। ভাষ্যের চেয়ে উন্মোচনে, টিপ্পনীর চেয়ে চিত্রণেই তাঁর প্রবণতা। সহানুভূতি দরদ অনুকম্পা সমানুভূতি এইগুলি লেখক হিসাবে তাঁর মহৎ গুণ। আর এই দিক থেকে তিনি বোধহয় শরৎচন্দ্রেরই উত্তরসূরী।

সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অনতিদীর্ঘ পরিসরেও বিশেষভাবে নজরে আসে। তাঁর প্রথম জীবনের ছোটগল্প-গুলির মধ্যে গল্পরসের প্রতি তাঁর দুর্বলতার পরিচয় আছে। কৌতূহল সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের উৎকণ্ঠা জাগানোর যে চলতি রীতি, তার প্রতি তাঁর আধুনিক অনাস্থা প্রকাশ পায়নি। বস্তুত আখ্যানধর্মিতা, ঘটনাবর্ত-রচনা, কৌতূহল-সৃজন, জটিলতা আকর্ষণ—এ সব রীতিই পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোট গল্পের একাংশকে অধিকার করে ছিল। সুমথনাথ ঘোষের কলমেও তার প্রভাব আছে।

জটিলতা সুমথনাথ ঘোষের সেই প্রথম পর্বের গল্পগ্রন্থ, পঞ্চাশের দশকের পূর্বের রচনা। তখনও শহর কলকাতা বিজলি বাতিতে ঝলমল করে ওঠে নি। শহরের গলিখুঁজিতে শ্যাকরার দোকানে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলত। অনেক আপিস-বাবু কিছু কিছু অনির্বাচ্য কারণে প্রথম পত্নী জীবিত থাকতেও দ্বিতীয়বার পত্নী আমদানি করতে ভয় পেতেন না। সন্ধেবেলায় ফিটন চেপে বাবুরা লেকে বেড়াতে যেতেন, কেউ ট্যাকসিতে। এই গল্প-সংকলনটির প্রথম গল্প জটিলতায় লেখক সুমথনাথ পুরুষের দুর্জ্ঞেয় জটিল মনের একটি দিককে ছোটগল্পের অপরিসর আয়োজনে আভাসিত করেছেন। এ গল্পে এক প্রৌঢ় স্বর্ণকার কোনো ধনী খদ্দেরবাড়ীর পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যার জন্যে একটি জড়োয়া হার তৈরির অর্ডার পায়। সেই অপূর্ব রূপবতী কন্যাকণ্ঠে হারটি বেমানান হয়নি—তবু কিছু মণিমুক্তার ঈষৎ পরিবর্তনের দাবিতে হারটি সেদিন স্বর্ণকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেই রূপসীর কম্বকণ্ঠে, দোলানো হারটি যে ঐ লাবণ্যবতীর অনিন্দ্য অঙ্গ-স্পর্শে ধন্য হয়েছিল, তারই ফলে হারটি সম্পর্কে ঐ প্রৌঢ় স্বর্ণকারের বুকে আশ্চর্য একটি মোহ জাগে। সেদিন তার সঙ্গে হারটি নিয়ে যে কিশোর গৃহ-ভৃত্যটি গিয়েছিল তার অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর চিত্তেও সেই রূপ দর্শনের ফলে আলোড়নের ঢেউ ওঠে, আর হারটি পুনরায় স্পর্শ করার জন্যে সেও অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু উক্ত প্রৌঢ় শ্যাকরার চিত্তবিক্ষোভই হয় গুরুতর। এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর অপরূপ যৌবনলালিত্য, এমন নিটোলনিলাজ উচ্ছল কম্বকান্তি যেন সে জীবনে দেখেনি। তার নিজের পরিবারের রূপহীন কুদর্শন নারীদের তুলনায় এই রূপ-ঐশ্বর্য তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়, তার বুদ্ধিকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে। অঙ্গস্পর্শ-

ধন্য হারটিকে সে তৎপরতার সঙ্গে গোপন করে নির্দোষ ভৃত্যসঙ্গীকে চুরির দায়ে জেল খাটায়। রূপসী রমণীর কণ্ঠস্পর্শধন্য হারটিকে গোপনে সংরক্ষিত করার এই অতি সূক্ষ্ম অথচ রহস্য-জটিল মনোবিকার অবলম্বনেই জটিলতা গল্পটি নিপুণভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই জাতীয় গল্প পৃথিবীর যে কোনো ছোট গল্পের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করতে পারে।

সহধর্মিণী গল্পে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত সুপ্রভা স্বামী ও পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল একজন পরিচারিকার অনুগ্রহে শয্যাশ্রয় করে ক্ষীণভাবে বেঁচে আছে। উদ্‌গত অভিমান, অশ্রুসিক্ত স্মৃতি ও অবহেলিত হীনতাবোধই তার নিত্য সঙ্গী। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগিণীর সংস্রব এড়িয়ে চলার পিছনে স্বামীর ঔদাসীন্য এবং প্রতিবেশিনী কোনো নারীর প্রতি স্বামীর জায়মান দুর্বলতা অনুমান করে সুপ্রভা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অবশেষে দুর্মর ঈর্ষা নিয়ে দুর্বল অশক্ত শরীরে কোনো মতে স্বামীর কক্ষে উপস্থিত হয়ে স্বামীর জন্যে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসে মুখ ঠেকিয়ে সুপ্রভা সেই জলকে জীবাণুদুষ্ট করা হল মনে করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। কিন্তু স্বামী ঘরে ফিরে সেই জল খেতে গেলে আবার সুপ্রভা সেখানে এসে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই গ্লাস ফেলে দেয়। পরদিন স্বামীর অসুস্থতা ও রক্তবমনের সংবাদে সুপ্রভা বিহ্বল হয়ে পড়ে। অনুতাপের বজ্রানল প্রতিহিংসাপরায়ণা সহধর্মিণীর রোগজর্জর বুককে বিদীর্ণ করে দিতে থাকে।

প্রতিঘাতও দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প। কমলা ও অরুণের বিবাহিত জীবনের মধ্যে তিক্ততা ও বিস্বাদ দুজনের দূরত্বকে প্রায় অমীমাংসিত বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে চলেছে। এবং অন্যতম কারণ তৃতীয় এক নারী ইন্দ্রাণী, অরুণের প্রাক্তন বান্ধবী, বর্তমানে বন্ধুপত্নী। পূর্বতন প্রীতি সম্বন্ধে অরুণ এখনও ইন্দ্রাণীর সংসারে প্রবেশাধিকার পায়, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণের সৌভাগ্য দাবি করে। কিন্তু অচিরেই প্রমাণ পায় ইন্দ্রাণী ও তার স্বামীর দাম্পত্য জীবনে তার কোনো আমন্ত্রণই নেই, সে নিতান্তই অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় পক্ষ মাত্র। সেই মুহূর্তেই সে আপন পত্নী কমলার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে এবং ইন্দ্রাণীর উপেক্ষার প্রতিদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নব-উপজাত পত্নীপ্রেমের প্রতি ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে সে যখন ইন্দ্রাণীকে আঘাত দেওয়ার সুযোগ সন্ধান করছে, তখন অকস্মাৎ পত্নীর প্রতি অরুণের এই হঠাৎ দুর্বলতাকে কমলা ইন্দ্রাণীর প্রতি গোপন আকর্ষণের উদাহরণ মনে করে স্বামীবিমুখ হয়ে ওঠে। তার বঞ্চিত জীবনে সদ্য-সঞ্চারিত পুলক মুহূর্তে কঠোর বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়।

প্রথম প্রেম ও ছবি গল্প দুটি ভিন্ন স্বাদের। ছবি গল্পে অসীম নামে এক

সৌন্দর্য-সন্ধানী রূপপূজারী বিত্তবান চিত্রশিল্পী এক দেহোপজীবিনীর রূপে মুগ্ধবিহ্বল হয়ে বহু প্রতিকূলতার পর তাকে মডেল হতে রাজি করায় এবং পরে বিবাহ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও দেয়। হেমাঙ্গিনীকে মডেল করে আঁকা তার ছবিগুলি বহু চড়া দামে বিক্রি হয়, তার শিল্প উচ্চপ্রশংসা লাভ করতে থাকে। হেমাঙ্গিনীকে দেখে আঁকা এমনি একটি ছবি শ্রীরাধার মানভঞ্জন একদা সেই হেমাঙ্গিনীর জীবনেই গভীর পরিবর্তন ঘটায়। বারাণসীর এক বৈষ্ণব আখড়ায় সেই ছবিটিকে ঘিরে বৈষ্ণবদের প্রণত ভক্তি দেখে হেমাঙ্গিনী অন্তরে তার পূর্বতম জীবনের জন্য গ্লানি ও অপরাধ বোধ করে এবং অসীমের গৃহ ত্যাগ করে নিরুদ্দিষ্টা হয়। বিস্মিত অসীম একদিন তাকে বৃন্দাবনের এক মঠে আবিষ্কার করে। হেমাঙ্গিনী তখন সত্যিই যোগিনী মাতৃমূর্তিতে ধ্যানাসীনা। বারাঙ্গনার এই উদ্‌বর্তন যেন বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির আধুনিক সংস্করণ। এটিকে ঠিক প্রচলিত মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটগল্প বলা যায় না।

প্রথম প্রেম ঐতিহাসিক রোমান্স—যেধারার গল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পর রমেশচন্দ্র দত্ত স্বর্ণকুমারী দেবী তাকে আরো গতি ও আয়ু দিয়েছিলেন। একালেও ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নতুন করে আবার গল্প-উপন্যাস লেখার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সুমথনাথের গল্পটি তার আগের যুগের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র-স্বর্ণকুমারীর উত্তরাধিকার পর্বের চিহ্ন। বহু-নারী-ভোগী উদ্ধত দাম্ভিক আরংজেবের জীবনে কেমন করে এক ক্রীতদাসী-কন্যা হীরা-বাই-য়ের অসাধারণ দৃষ্টিবিভ্রমকারী যৌবন জাগিয়েছিল উদ্দাম প্রেমের হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতা, যার জন্যে নিষ্ঠাবান মুসলমান আরংজেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সুরাপাত্রে কণ্ঠ ঠেকাতে উদ্যত হয়েছিলেন, ইতিহাসের সেই বিবরণটাকেই এখানে রোমান্সের রঙেরসে সরস করে নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়েছে।

এ ধরনের ঐতিহাসিক রোমান্সের যুগ শেষ হয়ে গেছিল বলেই সুমথনাথ সে পথে আর অগ্রসর হননি। কিন্তু ইচ্ছা করলে সে ধরনের রচনাতেও তিনি যে দক্ষতা দেখাতে পারতেন, এই গল্পটি তারই সাক্ষ্য হয়ে থাকে।

বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৫০

অরুণকুমার বসু

বাঁকাস্রোত

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

১

জীবনের হাটে সবাই লাভের অংকটা লইয়া মাথা ঘামায়। সকলের নজরে প্রথমেই পড়ে কাহার ব্যবসায় কিরূপ জোর চলিতেছে, কে কতখানি ধনী হইয়াছে, কে একটি পয়সা মূলধন না লইয়া কলিকাতায় কতগুলি বাড়ি ও গাড়ি করিয়াছে। সকলে যখন এই সব লইয়া চিন্তা করে, আমার তখন মনে পড়ে সেই হতভাগ্যের কথা—যে একই ব্যবসায়ে নামিল অথচ সবচেয়ে বেশি লোকসান খাইয়া সকলের পিছনে পড়িয়া রহিল অখ্যাত ও অবজ্ঞাত। মাঝে মাঝে মনে ভাবি—কেন আমার এমন হয়? কেন আমি অন্য সকলের মত লাভটাকে আগে দেখিতে পাই না? উঁচু জিনিসের প্রতি কেন আমার নজর আগে পড়ে না? ধনীর উচ্চশির অট্টালিকার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে আমি তাকাইতে পারি না। শত শত গৃহ-হারার ক্রন্দন মনে হয় যেন জমাট হইয়া আছে তাহার ভিত্তির অন্ধগহ্বরতলে, সুকঠিন দেওয়ালের পঞ্জরে পঞ্জরে। স্বর্ণরথের উড্ডীয়মান ধ্বজের দিকে চাহিয়া সবাই যখন জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে, আমি তখন চাহিয়া দেখি—কেহ তাহার চক্রতলে পিষ্ট হইল কিনা। অগ্রহায়ণ মাসে যখন মাঠে মাঠে ধান কাটা চলিতে থাকে—ভারে ভারে ফসল লইয়া চাষীরা হাসিমুখে ঘরের দিকে ছুটিয়া যায়, তখন সহসা আমার মনে পড়ে সেই জমির কথা—যাহাতে চাষ হইল না, ফসল ফলিল না। কাহার দোষে কি হইল তাহা ভাবিতে পারি না—গভীর আলস্য, জমির অনুর্বরতা, ক্রুদ্ধ প্রকৃতির নৃশংস পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্য কিছু—যাহা হয়ত মানুষ চোখে দেখিতে পায় না, যাহা হয়ত তাহার চিন্তার বাহিরে। মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। একেবারে যে সে রকম কোন কারণ থাকিতে পারে না তাহাও মন স্বীকার করিতে চাহে না। চুপ করিয়া ভাবি, ইহা কি আমারই মনের দোষ! মনটাকে চিরিয়া চিরিয়া দেখি। হঠাৎ উহার একটা জবাবও তখন যেন পাই।

মনে পড়ে কিছুদিন পূর্বে এক আত্মীয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, তুই যে এমন হ'বি একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তিরিশ বছর বয়স হলো, কিন্তু তিরিশটা পয়সা কোনদিন রোজগার করতে পারলি না। অথচ যারা তোর সঙ্গে পড়তো, তারা কেউ উকিল, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ডাক্তার হ'য়ে বিয়ে থা ক'রে কেমন সংসারী হয়েছে।

আত্মীয়ার কণ্ঠে সহানুভূতির সুর ছিল বলিয়া কিনা জানি না, সেদিন ভাল করিয়া তাহার কথার উত্তর দিতে পারি নাই। কে যেন ভিতর হইতে বারবার গলাটা টিপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে হইল সত্যই বলিয়াছেন তিনি। আমার সহপাঠীরা সবাই পাইয়াছে জীবনে প্রতিষ্ঠা, শুধু আমিই কিছু করিতে পারিলাম

না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত আমি কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিলাম—না পাইলাম অর্থ, না পাইলাম যশ, না জীবনের কোন অবলম্বন ; অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপব্যয়িত হইয়া গেল।

সারা রাত ধরিয়া ঘর পুড়িয়া যাইবার পর প্রভাতে গৃহস্বামী যেমন তাহার ভস্মের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ অতীতের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। যাহা হয়ত বলিবার ছিল তাহাও তাঁহাকে বলিতে প্রবৃত্তি হইল না এইজন্য যে, তিনি তাহার বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারিবেন ত না-ই, হয়ত বা উল্টা অর্থ করিয়া আমারই জীবনকে আরো দুঃসহ করিয়া তুলিবেন। তাই এক কথায় তাঁহার সেই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য শুধু সেদিন তাঁহাকে নিঃশব্দে কপালটা দেখাইয়া বলিয়াছিলাম, সবই বরাত।

তিনি সে কথা হইতে কি বুঝিয়াছিলেন জানি না। বহুক্ষণ মাথা ঘামাইয়া যেন দর্শনের অতি জটিল তত্ত্বের মর্মোদ্ধার করিতে পারিয়াছেন এই ভাবে সশব্দে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, যা বলেছিস বাবা, ভাগ্য ছাড়া পথ নেই।

সেদিন মুখের এই একটি ছোট কথায় যে বিষয়টির নিষ্পত্তি একমুহূর্তে এমনি করিয়া হইয়া গিয়াছিল, সেটি কিন্তু আসলে তত ছোট নহে। ছোট একটি ফল দেখিতে নেহাৎ তুচ্ছ হইলেও তাহার পিছনে যেমন থাকে দীর্ঘকালের ইতিহাস—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ, আবার তাহা হইতে ডাল পাতা ফুল ও ফল—সেইরূপ এই ছোট কথাটির পিছনেও ছিল একটি বিরাট ইতিহাস!

তাই, যে কথাটি সেদিন খুলিয়া বলিতে পারি নাই, মন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম—লোককে আমার এই ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শুনাইয়া লাভ কি—যাহা শুধু আমার তাহা আমারই থাকুক, সেই কথাটিই কিন্তু আরো দশ বৎসর ধরিয়া নিঃশব্দে বহন করিবার পর আজ হঠাৎ মনে হইতেছে—যাহাকে আমি এতদিন ভাঙাচোরা জীবনের বিকৃত ইতিহাস বলিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলাম, উহা ত মিথ্যা নহে, উহারও ত একটা পরিচয় আছে। সুস্থ, সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের কাহিনীর মত তাহাও স্বাভাবিক, তাহাও সত্য। অন্ধকারের পাশে যেমন আলো, অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গের কাছে যেমন স্বাস্থ্যবান্ ও পূর্ণাকৃতি মানুষ, তেমনি ব্যর্থতার কাছেই সার্থকতা উঠে উজ্জ্বল হইয়া—পরাজয়ের কাছে জয়। এক জন আছে বলিয়াই ত আর একজনের এত কদর, এত দাম। এই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণই ত মানুষের ইতিবৃত্ত!

সেইজন্য আজ কেবলই মনে হইতেছে—আমি যে কাহিনীকে বিকৃত ও ব্যর্থ বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি উহাতে আমার কুণ্ঠাবোধ করিবার কিছু নাই। উহা তো আমার একার নহে, আরো বহু সাফল্যমণ্ডিত ও গৌরবোজ্জ্বল জীবনের কাহিনী আমারই অন্ধকারময় জীবনের পটভূমিকায়

আলোকদীপ্ত হইয়া উঠিয়া বরং পাঠকের চক্ষুকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। আমি শুধু প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করিবার কাষ্ঠদণ্ডের মত মাঝে মাঝে সলিতাটিকে ঠেলিয়া দিয়া নীরবে পশ্চাতে অবস্থান করিব। যাহারা আলোর শিখা দেখিবে তাহারা হয়ত আমাকে দেখিতেই পাইবে না।

যাহা হউক—ভূমিকা দীর্ঘতর করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজন না হইয়া এইবার আসল কথাটা শুরু করি।

আমি যে একদিন বড় হইব—বিদ্যায় বুদ্ধিতে যশে অর্থে দশজনের একজন হইয়া সমাজের উপরতলায় যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের উপরে না হউক অন্তত একসঙ্গেও থাকিতে পারিব, একথা কেমন করিয়া জানি না, আমি ছাড়া অন্য সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সমবয়সী আত্মীয়স্বজন ত বটেই, এমন কি অনাত্মীয় অশিক্ষিত গ্রামবাসী বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের মনেই সেইরূপ ধারণা হইয়াছিল।

বাল্যকালে আমি যখন কলিকাতা হইতে বাবার সঙ্গে মাত্র দুই একদিনের জন্য দেশে বেড়াইতে যাইতাম তখন এইসব বিস্মিত ও কৌতূহলী দর্শকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে গর্ব অনুভব করি নাই একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া, জুতা-মোজার সঙ্গে গার্টার আঁটিয়া, সাহেবী ধরণের উন্মুক্ত-বক্ষ কোটের মাঝে 'নেক্‌টাই' ঝুলাইয়া দশ বছর বয়সে আমি যখন শেক্সপীয়ার, বায়রন, মিল্‌টন হইতে অর্থ-না-বুঝিয়া অনর্গল ইংরেজি আবৃত্তি করিয়া যাইতাম তখন আমার পিতার কাছে গাঁয়ের বহু প্রবীণ লোককে বলিতে শুনিয়াছি, 'ধন্য তোমার ছেলে, আমাদের দেশের নাম রাখবে—এতটুকু ছেলের কি ইংরেজি বুলি রে বাবা, একেবারে সাহেবকেও হকচকিয়ে দেয়! কই, আমাদের গাঁয়ের আর একটা ছেলেও ত এ রকম পারে না—ইংরেজি ত দূরের কথা, বাঙলাই তাদের জিবে জড়িয়ে যায়।'

স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধ—সকল বয়সের নরনারী আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেন যাত্রা থিয়েটার শুনিতেছে, এইভাবে অস্ফুট ও স্ফুটতর কন্ঠে আমার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সেদিন যে-সব উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছিল সেকথা মনে হইলে আজ হাসি পায়।

আবার দুই একটি বালককে চুপিচুপি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, আলোকের মত আমরাও কলকাতায় থাকলে ওর চেয়ে ভাল ইংরেজি বলতে পারতুম। ওঃ ভারি ত শক্ত, কত যে ভুল বলছে, আমাদের হেডমাস্টার থাকলে এখুনি ধরে দিতে পারতেন, এখানকার সবাই ত কত পণ্ডিত!

পিছন দিক হইতে এইসব শুনিয়া যখন আমার মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিত, আমার বাবার উৎসাহ তখন কিন্তু আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি আমাকে বলিতেন, আলোক, সেই গানটা এদের একবার শুনিয়ে দাও ত!

আমি গান গাহিতাম। আমার কণ্ঠস্বর নাকি সুমিষ্ট ছিল। আবার যখন

সবাই বাহবা দিত তখন তিনি বলিতেন, আলোক, তোমার ব্যাগ থেকে ছবিগুলো এনে একবার এদের দেখাও ত !

আমি ছবিও আঁকিতাম। পিতার আদেশ ছিল আমার কাছে শিরোধার্য। আমার জন্মের পরই মা মারা যান। তখন হইতে তিনি আমায় বুকে করিয়া ছিলেন, মায়ের অভাব কোনদিন জানিতে দেন নাই। আমাকে সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন এবং সর্বদা বড় আদর্শ আমার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতেন।

আমরা কলিকাতায় সাহেবী পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতাম। আমি সাহেবী স্কুলে পড়িতাম, মেম নার্স আমায় মানুষ করিত। বাবা চাকুরি করিয়া যাহা কিছু রোজগার করিতেন সমস্তই খরচ করিতেন আমাকে সত্যকারের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য। সেইসব দিনের কথা আজ শুধু স্বপ্নের মত মনে হয়।

দেশে আসিয়া যখন আবার চলিয়া যাইতাম তখন জ্যাঠাইমাকে চোখ মুছিতে মুছিতে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, ঠাকুরপো, ওকে দিনকতকের জন্যে এখানে রেখে যাও। এখন ত গরমের ছুটি, আম কাঁঠাল দুটো খাক্ বাছা।

তাহার উত্তরে বাবা কি বলিতেন স্মরণ নাই। তবে একদিনের ঘটনা আজও মনে পড়ে; জ্যাঠাইমা এইরূপ অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এখানে থাকলে সব বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশে দুদিনে উচ্ছন্ন যাবে বৌদি—তুমি কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে, ওকে হয়ত চোখে-চোখে রাখতে পারবে না—তাহলে আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জ্যাঠাইমার ছেলেমেয়ে অনেকগুলি ছিল। পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট ছেলে-মেয়ে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ—পেটগুলি বড়, মাথা ডাগর ডাগর, হলুদবর্ণ কোটরগত চক্ষু ও স্তিমিত দৃষ্টি, মসীকৃষ্ণ রঙ, গায়ের চামড়া ফাটা-ফাটা—খড়ি উঠিতেছে। ধুলাকাদা মাখিয়া, পানাপুকুরে মাতামাতি করিয়া, গাছে চড়িয়া, বনজঙ্গল ছিঁড়িয়া লুটিয়া-পুটিয়া কি সব বুনো ফল আনিয়া তাহারা সর্বদা তাহাদের একমাত্র ইন্দ্রিয় সর্বভুক রসনার তৃপ্তিসাধন করিত। আমার ভাই-বোন হইলেও তাহাদের দেখিয়া আমার মনটা কেমন ঘিন-ঘিন করিত।

বাবার মুখ হইতে সেই কথা শুনিয়া জ্যাঠাইমার হয়ত-বা মনে হইল তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে মিশিলে পাছে আমি খারাপ হইয়া যাই, তিনি বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন এইভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটু মিষ্ট প্রলেপ দিয়া। তাই তিনি বলিলেন, আমার ছেলেদের সঙ্গে মিশলে যদি তোমার ছেলে খারাপ হয়ে যায় মনে করো, তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু ছোট বৌ মরবার সময় আলোককে আমার হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিল, 'দিদি, আমার আলোককে আজ থেকে তোমার ছেলে মনে কোরো।' এই বলিয়া চোখে কাপড় দিয়া, কণ্ঠে একপ্রকার অদ্ভুত সুর টানিয়া আনিয়া তিনি কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

জ্যাঠাইমার এই কান্না দেখিয়া কিংবা মায়ের শেষ-অনুরোধের কথা স্মরণ

করিয়া বলিতে পারি না—বাবার দুই চক্ষু মুহূর্তে করুণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া আমাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, বৌদি, চুপ করো, কেঁদো না, এই নাও তোমার আলোককে, আমি আবার আসছে শনিবারে এসে নিয়ে যাবো। এই বলিয়া জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আমার ব্যাগটি নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার নিজেরটা হাতে লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পাল্কী প্রস্তুত হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। স্টেশন সেখান হইতে নয় মাইল দূরে। একখানি ট্রেন ফেল করিলে আর একখানি সেই গভীর রাত্রে। সমস্ত দিনে মাত্র দুইখানি গাড়ি যায় ও দুইখানি আসে। কাজেই কিছু বেশি সময় হাতে লইয়াই বাহির হইতে হয়। তাহার উপর মানুষের যান, একসঙ্গে আর কতক্ষণ বহিতে পারিবে! মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবার জন্যও কিছু সময় দরকার। তাই পাল্কীর-বেহারাও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইতিমধ্যে বার-দুই তাগাদা করিয়া গিয়াছিল।

এদিকে বাবা প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যাঠাইমার কান্না থামিয়া গেল। চোখ হইতে কাপড় নামাইয়া এক হাতে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তখন বাবাকে আগাইয়া দিবার জন্য পাল্কীর কাছ পর্যন্ত আসিলেন। বাবা আমার কপালে একটি চুমা খাইয়া পাল্কীতে গিয়া বসিলেন এবং দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, আসি বৌদি।

এসো ভাই। বলিয়াই জ্যাঠাইমা আমাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, আলোক যাও,—বাবাকে নমস্কার করে এসো।

আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া বাবার দুই পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেই তিনি একেবারে আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আমি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলাম, আমি এখানে থাকবো না বাবা, আমায় নিয়ে চলো।

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি যাইয়া আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইতেই আমি উচ্চৈঃস্বরে কান্না ধরিলাম, কিছুতেই সেখানে থাকিব না বলিয়া। তাঁহারা দুইজনে তখন যত আমায় বুঝাইতে লাগিলেন সেখানে থাকিবার জন্য, তত আমার কান্না বাড়িতে লাগিল। সে কি দৃশ্য! মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো কত যে সেখানে জড় হইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে আবার টিপ্পনী কাটিতে লাগিল। ছেলেমেয়েগুলি আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতে লাগিল এবং মেয়েদের ভিতর হইতে কেহ কেহ বলিল, বুড়ো খোকা! লজ্জা করে না কাঁদতে? জ্যাঠাই কি তোর পর? তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি?

খাইয়া ফেলিবেন কি না বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে দেখিলে আমার বিষম ভয় করিত। কি বীভৎস চেহারা! যেমন কালো, তেমনি মোটা, চোখগুলি ভাঁটার মত গোল গোল, নাকে এক বিরাট নথ। নারীজাতির সৌন্দর্যের বহু বর্ণনা কবিরা করিয়াছেন, তাহাদের দেহকান্তির স্তবগান করিতে গিয়া তাঁহাদের

লেখনী মুখর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যদিচ আমি কবি নই তবুও এটুকু নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সৌন্দর্য ত দূরের কথা, এত কুশ্রী রূপ যে কোন রমণীর থাকিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে আমি হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। বোধহয় ভয় নহে, তাঁহার এই সৌন্দর্যহীনতার জন্যই আমার মন এইভাবে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার প্রতি।

বাবা আমার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, থাক্ তবে বৌদি, ও এবার আমার সঙ্গে যাক্—পরে বড় ছুটি পেলে ওকে আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এখানে থাকবো।

জ্যাঠাইমা বাবার এই কথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু রুক্ষ কণ্ঠে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ভুতো মুখপোড়া—কান দুটো কি তোর কালা হয়েছে, শুনতে পাচ্ছিস না—যা না ছুটে, ওর ব্যাগটা ঘর থেকে এনে দে না?

ভুতো এতক্ষণ তাঁহারই কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মাতৃআজ্ঞা পালন করিল। বেহারারা পাল্কীটি কাঁধে তুলিয়া লইলে বাবা আর-একবার বলিলেন, বৌদি, তবে আসি, কিছু মনে কোরো না।

জ্যাঠাইমা হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। তবে পাল্কী ছাড়িয়া দিতেই আমাদের কানে আসিল এই কথাটি—আলোক না হয় ছেলেমানুষ, সে ত কাঁদবেই—তুমি বাপ, তোমার কি তা' বলে সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, কি বলো দিদি?

দিদিদের মধ্য হইতে সঙ্গে সঙ্গে কে একজন খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওগো ওরা যে শহুরে লোক, আমাদের মত জংলীদের সঙ্গে থাকলে যে মান যাবে—তা বোঝ না?

জ্যাঠাইমার গলা, আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরও, আমরা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন, বুঝি না আবার, আমায় কি কচি খুকী পেলি টেঁপির মা—সব বুঝি, তবে কিনা ঠাকুরপোর আক্কেলটা শুধু দেখছিলুম।

ইহা শুনিয়া বাবা একবার নীরবে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, আমিও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। কিন্তু কেহ কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলাম না। পাল্কী চলিতে লাগিল। আমরা দুজনেই দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

২

ইহার পর আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল। দেশে যাইবার নাম আমি কোনদিন মুখে আনি নাই, এমনকি বাবাকেও বলিতে শুনি নাই। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত কোথা হইতে এক কালব্যাধি আসিয়া বাবাকে আক্রমণ করিল। তিনি

টাইফয়েড রোগে একুশ দিন ভুগিয়া শেষে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। আর আমি তখন আমার একমাত্র এবং শেষ আশ্রয় সেই জ্যাঠাইমার কাছেই যাইতে বাধ্য হইলাম। ভগবানের মনে বোধকরি এইরূপ ইচ্ছাই ছিল—আমি কি করিব!

বাবার চিকিৎসায় নাকি বহু টাকা ঋণ হইয়া গিয়াছিল। তাই জ্যাঠামশায় আমাদের ঘরের আসবাবপত্র—খাট, বিছানা, গালিচা, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়া আমাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় যেদিন আমায় সঙ্গে লইয়া দেশের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেদিনের কথা মনে হইলে আজও আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে।

হাওড়া জেলার এক অতি নিভৃত অঞ্চলে এই স্থানটি। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাপিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে আমরা একটি স্টেশনে আসিয়া নামিলাম। স্টেশন উহাকে বলা চলে না—শুধু মাটির উপর ঈষৎ উঁচু খানিকটা জমি, তাহাতে ছোট্ট একটি টিনের ঘর ও গোটাকতক আলোর খুঁটি পোঁতা, তাহাদের একটিতে মাত্র আলো আছে। একটি বাবু এবং একটি কুলি গাড়ি আসিবার সময় স্টেশনে উপস্থিত হয়, তারপর গাড়ি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাবুটি কোথায় অন্তর্ধান হন, কুলিটি তখন সেখানকার যাবতীয় কাজ চালায়। স্টেশনের ঠিক পিছনে তাহার একটি চালাঘর, ঘরের সম্মুখে বাঁশের খুঁটিতে একটি ছাগল বাঁধা ছিল। মেহেদি গাছের বেড়ার মধ্যে ঈষৎ ফাঁক, তাহারই ভিতর দিয়া তাহার যাতায়াতের পথ।

কেবল আমরা দুইটি মাত্র প্রাণী স্টেশনে নামিলাম, আর কোন যাত্রী সেদিন ছিল না। জ্যাঠামশাইকে দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার প্রশ্ন করিলেন, এই যে ডাক্তার-বাবু, কতদূর গিয়েছিলেন? এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমার জ্যাঠামশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। পাশ-করা নহেন—ঘরে বই পড়িয়া শিখিয়াছিলেন। বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, রোগ যত না ভাল হউক, নামডাক হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশি। যাহা হউক—স্টেশন-মাস্টারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যখন বলিলেন—কলিকাতায়,—তখন আবার প্রশ্ন হইল—কেন, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায় এইবার বাবার অসুখ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী ত বলিলেনই, উপরন্তু আমার জন্ম, মায়ের মৃত্যু হইতে শুরু করিয়া সেইদিন পর্যন্ত আমাদের পারিবারিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎক্ষণাৎ দিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না। শেষে মাস্টার মহাশয় যখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি টাকাকড়ি বাবা রাখিয়া গিয়াছেন—তখন তিনি এই কথাটি বলিতে ভুলিলেন না যে,, আমার বাবা টাকাকড়ি ত কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, উপরন্তু আমাকে অসহায় অবস্থায় তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি এই বলিয়া পরিশিষ্ট টানিলেন, সে আমায়

দেখতো না বলে আমি ত আর সত্যি সত্যিই ভাইপোটাকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারবো না? আমার কর্তব্য আমি করে যাবো তাতে লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক, কি বলো ভায়া?

স্টেশন-মাস্টার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নিশ্চয়ই—সে কথা আবার বলতে!

জ্যাঠামশায় তখন টিকিট দু'খানি তাঁহার হাতে দিয়া লাইন ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ডানদিকে বাঁকিলেন। দেখিলাম, অদূরে চালাঘরে একটি দোকান দেখা যাইতেছে। তাহাতে দড়ি দিয়া ঝোলানো একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সামনে বাঁশের তৈয়ারী একটি বেঞ্চি, তাহাতে দুইটি লোক বসিয়া বেঁটে ও মোটা কাচের গ্লাসে করিয়া চা খাইতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম—উহা বোধ হয় চায়ের দোকান, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম উহার একধারে রহিয়াছে মুড়ি মুড়কি ও বাতাসা, তাহার সহিত একটা কাঠের ছোট বারকোশে সকালের ভাজা গোটাকয়েক বেগুনি ও আলুর চপ। পিছনে একটা ছোট আলমারী, তাহার কোনটার কাচ ভাঙা, কোনটার বা কাচ আছে, কোনটার আবার কাগজ দিয়া জোড়া। ইহার ভিতর থালায় করিয়া সাজানো রহিয়াছে গজা, জিলিপি ও ছানাবড়া প্রভৃতি ঘিয়ে ভাজা খাবার। আবার দোকানী যেখানে বসিয়া আছে তাহার ঠিক পিছনে একটা কাচ দেওয়া টিনের কৌটার মধ্যে কতকগুলা বিড়ির বাণ্ডিল ও আর একটা কৌটায় কতকগুলা হাঁসের ডিম। সামনে একটা থালায় সাজা পান রহিয়াছে, তাহার উপর একটা খয়ের-এর দাগ লাগা ভিজা ন্যাকড়া ঢাকা দেওয়া এবং সেই থালার এক কোণে একটা সিগারেটের কৌটা।

জ্যাঠামশায় সেখানে যাইয়া বলিলেন, দেখি মধুসূদন, এক পয়সার বিড়ি দাও ত!

মধুসূদন বিড়ি দিবার আগেই প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু?

জ্যাঠামশায় আবার একে একে বাবার অসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া আমার আসিবার কারণ পর্যন্ত সমস্ত তাহার নিকট বিবৃত করিলেন। তিনি বোধ করি অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহার হাত হইতে শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিস্তার পাওয়া যাইবে না, সে একে একে সমস্ত কথা না শুনিয়া ছাড়িবে না—তাই পূর্বেই সতর্ক হইলেন। তারপর একটা বিড়ি জ্বলন্ত নারিকেল দড়ির আগুন হইতে ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, টাকাকড়ি ত এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি, উল্টে আমার ঘাড়ে এই ভাইপোটাকে চাপিয়ে গেছে। ভাই আমায় দেখতো না, তা-বলে আমি ত আর এই দুধের শিশুকে ভাসিয়ে দিতে পারি না? আমার ত একটা কর্তব্য আছে, তাতে লোকে যা ইচ্ছে বলুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। এইবার আর একটু থামিয়া বিড়িতে একটা টান দিয়া বলিলেন, তুমি কি বলো মধুসূদন?

আজ্ঞে সে কথা একশো বার। লোকে কত কি বলে! তা ধরতে গেলে কখনো

চলে ! এই বলিয়া সে আবার পানে চুণ লাগাইতে মনোযোগ দিল।

সেই দোকানের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যে মেটে পথটি গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটা চালাঘরের সামনে গিয়া তিনি ডাকিলেন—শিবু বাড়ি আছ ?

আজ্ঞে আছি—বলিতে বলিতে হুঁকা হাতে করিয়া একটি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল, তারপর জ্যাঠামশায়কে দেখিয়া বিনয়াবনত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু যে—এ সময় কোথা থেকে আসছেন ?

তিনি বললেন, কলকাতা থেকে।

ব্যস্, আর নিস্তার নাই, আবার শুরু হইল একই রকমের প্রশ্ন, ঠিক পূর্বের মত কেন, কি বৃত্তান্ত, কবে গিয়াছিলেন, কি রোগ হইয়াছিল, এখন আমার অবস্থা কি হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অসম্ভব কৌতূহল পল্লীগ্রামের প্রত্যেকটি লোকের—একটা দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ থামে না। জ্যাঠামশায়ও সকল প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিয়া, শেষে ইহা উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না যে, আমার বাবা একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, আমাকে একেবারে জলে ভাসাইয়া গিয়াছেন। আমার সামনে আমার সম্বন্ধে বার বার ওই কথাটি বাহিরের লোককে বলিতে শুনিয়া আমার মনটা কেমন হইয়া গেল।

জ্যাঠামশায়ের মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন শিবু বলিল, আজ্ঞে গাড়ি চাই কি ?

শিবু গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান—তাহার দুই পুরুষের এই ব্যবসা। জ্যাঠামশায় বলিলেন, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে শিবু, সন্ধ্যে হয়ে গেল—ছেলেমানুষ, সমস্ত দিন না খেয়ে আছে।

তত্ক্ষণ একটু তামাক ইচ্ছে করুন, বলিয়া শিবু হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শিবু গলায় ঘণ্টা বাঁধা এক জোড়া বলদ লইয়া আসিয়া বাহিরের বাতাবী লেবু গাছের তলায় যে গাড়িটা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে জুড়িয়া দিল, তারপর কালিপড়া এক প্রকার কেরোসিন তেলের ল্যাম্প গাড়ির নীচে ঝুলাইয়া আমাদের লইয়া মাঠের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। গোরুর গলার ঘণ্টার ধ্বনি সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির বক্ষ ধ্বনিত করিয়া চলিতে লাগিল। আমি কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে চলিলাম। বাহিরে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু অন্ধকার—মাঠ গাছপালা জঙ্গল খানা ডোবা পুষ্করিণী সব যেন মসীলিপ্ত একাকার বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দশটা হইবে, আমরা গিয়া বাড়ীতে পেঁৗছিলাম।

জ্যাঠাইমা আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিও তারস্বরে ইহাতে যোগদান করিল। তারপর আমি যত কাঁদিলাম, তাহার সহস্রগুণ বেশি কাঁদিলেন তিনি। আমার বাবার নাম করিয়া

কাঁদিলেন, আমার মায়ের নাম করিয়া কাঁদিলেন, আমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, এমন কি তিনি এই বংশে বধূরূপে প্রবেশ করিবার পরে ও আগে যাঁহারা যাঁহারা পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে কাঁদিলেন। আমার শোক দেখিয়া বোধ করি তাঁহাদের সকলের জন্য একই সঙ্গে জ্যাঠাইমার শোক উথ্‌লাইয়া উঠিল।

ইহা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোক বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত আসিয়া সেই রাত্রে আমাদের বাড়িতে ভিড় জমাইয়া তুলিল। উঠানে, রান্না-ঘরের দাওয়ায়, ঘরে বাইরে, লোকে লোকারণ্য! জ্যাঠাইমা উঠানে বসিয়া মর্মভেদী চীৎকার করিতেছেন আর তাহারা সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার সেই শোকাভিভূত অবস্থা ও করুণ অঙ্গভঙ্গী দেখিবার জন্য কিংবা তিনি উহাদের দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন বলিয়া তাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহা তাহারাই জানে।

জ্যাঠামশায়ের তখন নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাব। ভাবালস ডাগর দুইটি চোখে দার্শনিকের দৃষ্টি—তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। যেন এই সংসার, ইহার মায়া মমতা, স্নেহ বন্ধন, সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার কাছে বৃথা—তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। শুধু এক হাতে তিনি আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন, আর আমি কাঁদিতেছিলাম তাঁহার বক্ষের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া। তিনি সাধারণ ব্যক্তির মত কোন সান্ত্বনা কোন উপদেশ আমাকে দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া বরং চুপ করিয়া থাকাই তখন তাঁহার কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন—কেন তাহা জানি না।

শুধু মনে পড়ে জ্যাঠাইমা যখন বহুক্ষণ পরে একবার কাঁদিয়া উঠিলেন 'তোমার আলোককে কোথায় রেখে গেলে গো' বলিয়া, তখন কে একজন আসিয়া আমায় লইয়া গিয়া তাঁহার কোলের মধ্যে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ত তোমার আলো, তোমার ছেলে—এই নাও বড় বৌ।

জ্যাঠাইমা তখন আমায় বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া উচ্চতম গ্রামে আর একবার কাঁদিয়া উঠিয়াই চুপ করিলেন। জ্যাঠাইমার বুকে স্থান পাইয়া কি না বলিতে পারি না—আমি তখন কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম।

তিনি আমার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, ভয় কি বাবা, আমি যে তোমার মা।

এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া জ্যাঠাইমার নিকট সিন্দুকের চাবি চাহিল। জ্যাঠাইমা কাপড়ে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে, তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না—শুধু একবার জ্যাঠামশায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

তারপর জ্যাঠাইমা সেই চাবিটি কোমরে-বাঁধা একটি কালো সুতা হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। ছেলেটি ক্ষিপ্রগতিতে উহা লইয়া গিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিল। তিনি চাবিটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ

পরে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উদাস মুখে বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, দুই-একজন যেন তাঁহার কাছে গিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, আহা ছোট ভাই তো নয়, যেন লক্ষ্মণ! কি করবে বলো বাবা, সংসারের এই নিয়ম! এ-শোক যে তোমার বুকে সবচেয়ে বেশি লাগবে, তা কি আর বলে দিতে হবে।

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর সহসা একটু নামাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তা টাকাকড়ি ত কিছু রেখে গেছে তোমার ভাই কালীচরণ?

জ্যাঠামশায় তেমনি উদাস কণ্ঠে বলিলেন, রাখা দূরে থাক্, আমার পর্যন্ত ধার হয়ে গেছে।

আহা-হা তা তো হবেই—তুমি কি তার তেমন ভাই—আমরা কি জানি না সেকথা। বলিতে বলিতে একে একে সবাই প্রস্থান করিল।

৩

আমার যে কি অবস্থা হইল, তাহা বোধ করি না-বলিলেও কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। ছিলাম শহরে, শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে, পিতৃস্নেহে গুঞ্জরিত সুন্দর এক আবেষ্টনীর মধ্যে। সেখানে দেখিতাম, সুন্দর মানুষ, শুনিতাম তাহাদের মুখের সুন্দর কথা, সাহেবী স্কুলে পড়িতাম, সুসজ্জিত সাহেবী পাড়ায় বাস করিতাম; সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া আমার দিন কাটিত। এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া আমার শৈশব ও বাল্যের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তাহার মধ্যে থাকিয়া রস আহরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, অঙ্কুর হইতে যেমন বৃক্ষোদ্‌গম হয়, তেমনি ভাবে। এমন সময় বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপের মত কোথা হইতে আসিল আমার জীবনের কালরাত্রি; চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—এ আমি কোথায়? চমকিয়া উঠিলাম যেন এক দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া।

ঘোর পল্লীগ্রাম। চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল—বাঁশ, তেঁতুল ও শ্যাওড়া গাছই বেশি। বড়-ছোট অসংখ্য পুস্করিণী · কচুরীপানা ও সরকলমীর দলে ভর্তি! কোথাও ভাঙা শানের ঘাট, কোথাও-বা পুকুরে জল নাই, কোথাও-বা পানা পচিয়া পুকুরের জল সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাঙাচোরা পথ খানিকটা মাঠের উপর দিয়া, খানিকটা বা বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকজন অধিকাংশই দরিদ্র ও ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট—তাহাদের কথা বলিবার ভঙ্গী অত্যন্ত বিশ্রী, জামাকাপড় যেমন ময়লা তেমনি রুচিহীন, ঘর-দোরের কোন শ্রী নাই, আসবাবপত্রও ছন্দহীন। মোট কথা, আমার কাছে সেই আবহাওয়াটা অত্যন্ত কুৎসিত ও অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

জ্যাঠামশায়ের বাড়িটা আরও বিশ্রী—দিনরাত সে আমার চোখকে পীড়া ত

দিতই উপরন্তু আমার মনকে সর্বদা ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত।

বহুদিনের প্রাচীন একতলা বাড়ি। বাহিরের দেয়ালগুলা নোনা লাগিয়া অর্ধেক ক্ষইয়া গিয়াছে, তাহারি মধ্যে স্থানে স্থানে কাঁচা গোবর চাপাইয়া ঘুঁটে দেওয়া — ঘরের ভিতরে বালিকাম, চুনকাম বোধ হয় করা হইয়াছিল স্মরণাতীত যুগে— দেওয়াল হইতে বালি উঠিয়া গিয়া এখন ইঁট দেখা যাইতেছে, কোথাও-বা মরুভূমির মাঝে ওয়েসিসের মত একটু একটু বালির চাপড়া জাগিয়া আছে, তাহারি উপর শিবদুর্গা ও কালীর ছবি টাঙ্গানো। ছাদ হইতে কয়েকটা টালি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বহুদিনের পুরাতন আলকাৎরা-মাখানো কাঠের কড়ি-বরগায় উই লাগিয়া পুরাতন ঘায়ের মত দেখাইতেছে। ঘরে মেঝেয় যে এককালে সিমেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য দুই-একটি জায়গায় এখনো রহিয়াছে, বাকি সমস্ত মেঝেটা উঁচু-নীচু ও অসমতল। ছোট ছোট গবাক্ষ—ঘরের ভিতর ভালো করিয়া আলো-বাতাস খেলে না। বহুদিনের পুরাতন তক্তপোষ ঘরে ঘরে পাতা, তাহার উপর ততোধিক পুরাতন শয্যা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাঁথা, ছেঁড়া শততালি দেওয়া লেপ ও তৈলাক্ত বালিশ, সেগুলির আবার অধিকাংশের ওয়াড় নাই, যেটি আছে সেটিকেও চেনা শক্ত।

এই রকম একটি ঘরে আমি শুইতাম—ভুতো, কেলো, ঘণ্টা ও পচার সঙ্গে একত্রে। ইহারা সকলেই জ্যাঠামশায়ের ছেলে। ভুতো আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়, কিন্তু পড়িত আমার সঙ্গে একই ক্লাসে। ছেলে ও মেয়ে জ্যাঠামশায়ের দশটি। তাহাদের বয়সের তফাৎ ছিল খুব কম। শুনিয়াছিলাম, আরো দুই-তিনটি ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়াছে। চারিটি ছেলে ও ছয়টি মেয়ে তখনো সুস্থশরীরে বর্তমান। মেয়েগুলির নাম খেঁদি, নেড়ি, বুঁচী, আন্নাকালী প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, মেয়েগুলি তাহাদের মায়ের মত আকৃতি-প্রকৃতি পাইয়াছিল। ইহারা সকল সময় আমায় ঘিরিয়া থাকিত, কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না। তাহাদের কথাবার্তা, তাহাদের ভাবভঙ্গী, তাহাদের আচার-ব্যবহার আমার আদৌ ভাল লাগিত না। আমাকে তাহারা তাহাদের অন্যান্য ভায়েদের মত করিয়া পাইতেছে না বলিয়া জ্যাঠাইমার নিকট নানারূপ প্রশ্ন করিত। জ্যাঠাইমা অমায়িকভাবে তাহাদের সে প্রশ্নের জবাব দিতেন বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকিত তাহা আমায় অহরহ দগ্ধ করিত, আমি বড়লোকের ছেলে বলিয়া তাহাদের মনে মনে ঘৃণা করি—ইহাই তাঁহার কথার মূল তাৎপর্য ছিল। হয়ত সকালে উঠিয়া সকলের সঙ্গে আমিও পান্তাভাত খাইতে বসিতাম, কিন্তু তাহাদের মত অত খাইতে পারিতাম না বলিয়া জ্যাঠাইমা বলিতেন, ও বড়-মানুষের ছেলে, এসব কি ওর মুখে রোচে—ওর বাবা ওকে কত সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াত!

লজ্জায় আমার ঘাড় হেঁট হইয়া যাইত এবং ছেলেমেয়েগুলি সবাই তখন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে করিতে

প্রাণপণে পান্তাভাত আরো ঠাসিয়া গিলিতাম।

রাত্রে শুইবার সময় কোন কোনদিন মেয়েগুলি বায়না ধরিত আমার কাছে শুইবার জন্য, জ্যাঠাইমা তখন তাহাদের বলিতেন, ওর যে সুন্দর চেহারা, তাই তোদের মত কুচ্ছিৎ বোনদের নিয়ে শুতে ঘেন্না করে।

ইহা শুনিয়া দুঃখ ও অভিমানে আমার বুক ফাটিয়া যাইত, কিন্তু তবুও মুখে কোন প্রতিবাদ না করিয়া সব হজম করিতাম। ইহা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায়ও আমার আর ছিল না। তাই মনে মনে ঈশ্বরের নিকট শুধু সহ্য করিবার শক্তি প্রার্থনা করিতাম।

তাহার পরের অবস্থা না বলাই ভাল। ছোট ছোট ভাই-বোনদের লইয়া সেই মলিন বিছানায় ছারপোকার কামড় সহ্য করিয়া শুইয়া থাকিতাম। রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসিত না, তাহার পরিবর্তে আসিত অশ্রু। ভগবানের নিকট তখন মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, হে ঈশ্বর, এর চেয়ে আমার মৃত্যু হলো না কেন?

মানুষকে আমি ঘৃণা করিতাম না, তবে তাহাদের কদর্যতা, কুশ্রীতা প্রভৃতি আমি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না।

৪

জ্যাঠামশায় আমাকে যে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমার মন আরো খারাপ হইয়া গেল। এ কি ইস্কুল! হাই ইস্কুলের এ কি দুর্দশা!

দেড় শত বৎসরেরও বেশি পুরাতন একতলা একটি বাড়ি। তাহার বাহির ও ভিতরে নোনায় ক্ষইয়া গিয়াছে, জানলার কবাট নাই, দরজাও ভগ্নপ্রায়। কোন রকমে জুড়িয়া আঁটিয়া গোরু-ছাগলের হাত হইতে ঘরগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ইহার মধ্যে ঢুকিতে পারে, গায়ের জোরও বোধ করি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া দুই পাশে আরো দুইটি চালাঘর, তাহাদের দরজা-জানালার বালাই নাই—খড়ের চাল ও দরমার বেড়া দেওয়া। ইহার মধ্যে মাদুর বিছাইয়া কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে পড়িতেছে, শিক্ষক মহাশয় মাঝখানে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। ছেলে কম বলিয়া এক একটি ক্লাস দরমার বেড়া দিয়া পার্টিশান করা—পাকাঘরেরও এইরূপ বন্দোবস্ত।

বিদ্যালয়ের দিকে চাহিয়াই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ইহার পাশে কলিকাতার সেই প্রাসাদোপম শিক্ষানিকেতনটির কথা মনে পড়িল।

পথে আসিবার সময় জ্যাঠামশায় এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বহু গুণকীর্তন করিতে করিতে আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। আশি বৎসরের পুরাতন সেই বিদ্যালয়টি, ইহা হইতে পাশ করিয়া কত লোক দেশপূজ্য হইয়াছেন, এমন কি

তিনি, আমার পিতা ও পিতামহ পর্যন্ত এই স্কুলে একদিন পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি আরও বহু কাহিনী সেই প্রাচীন বিদ্যালয়টির সম্বন্ধে আমার কাছে সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই সব শুনিতে শুনিতে আমার মনে প্রথমটা খুব একটা বিস্ময় জাগিয়াছিল ; মনে হইয়াছিল, না জানি ইস্কুলটি কিরূপ হইবে। তাই বাড়ি হইতে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া যখন ইহাকে চোখে দেখিলাম তখন আমার সমস্ত উৎসাহ ও আগ্রহ নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

ইহার উপর আবার শিক্ষক মহাশয়দের দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলাম। কে বলিবে ইহাদের শিক্ষক! জরাজীর্ণ, ক্ষয়াঘষা সব চেহারা, বুঝি ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের আক্রমণে বিপর্যস্ত—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, পয়সার অভাবে বহুদিন কামানো হয় নাই ; জামা কাপড়ের অবস্থাও সেইরূপ, মলিন ও বহু সেলাইয়ের চিহ্ন সমন্বিত ; কাহারো পায়ে চটিজুতা, কাহারো বা তাহাও নাই। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক—চেহারা সকলেরই সমান, দেখিলে মনে দয়ার উদ্রেক হয়। এই সব শিক্ষকের পাশে কলিকাতার স্কুলের শিক্ষকদের সুন্দর ও মার্জিত চেহারার কথা মনে করিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইলাম।

প্রথমেই অফিসঘরে ঢুকিতেই দেখিলাম সম্মুখে একজন বৃদ্ধ, চোখে দড়িবাঁধা পুরু লেনস-এর চশমা লাগাইয়া চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতেছেন।

জ্যাঠামশায় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, ইনি হেডমাস্টার, নমস্কার করো। আমি এঁর কাছে পড়েছিলুম।

আমাদের দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় চশমাটা তাড়াতাড়ি কপালের উপর তুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুইজনে তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলাম। এমন সময় গাড়ু হাতে করিয়া ও পৈতা কানে জড়াইয়া আর একটি বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন—ইনি হেডপণ্ডিত। তাঁহাকেও আমরা উভয়ে প্রণাম করিলাম। তিনি অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—এ ছেলেটি কে হে কালীচরণ?

জ্যাঠামশায় বলিলেন, আমার ভাইপো, এখানে ভর্তি করে দেবো।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় এইবার আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন। তিনি আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে শুনিলেন। জ্যাঠামশায়ও আবার, বাবা যে কিছু না রাখিয়া আমাকে একেবারে তাঁহার ঘাড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় চাপাইয়া গিয়াছেন, সে কথা বলিতে ভুলিলেন না।

হেডমাস্টারমশায় তখন আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি বাবা?

বলিলাম, শ্রীআলোক রায়।

বেশ, বেশ নাম। বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোন্ স্কুলে পড়তে?

সেণ্ট পল্‌স্‌।

কলিকাতার এই সাহেবদের স্কুলের নাম শুনিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে—তিনি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—বেশ বেশ—দেশের ছেলে দেশের স্কুলে পড়বে বৈকি—তোমার বাপ পিতামহ যেখানে পড়েছেন সে তো তোমার কাছে তীর্থস্থান তুল্য! ও সব সাহেবসুবোদের স্কুলে কি আমাদের মত ঘরের ছেলেদের পোষায়—কি বলো কালীচরণ?

বলিয়া তিনি হুঁকায় ঘন ঘন আরো দুই-চারিটি টান মারিয়া হেডপণ্ডিত-মশায়ের নিকট সেই বেঁটে ও কড়িবাঁধা ধূম্রপাত্রটি হস্তান্তর করিলেন।

ইহার পর হেডমাস্টার মহাশয় নিজে আমাকে পরীক্ষা করিয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া লইলেন।

জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে ভুতো যদিও আমার চেয়ে চারি বৎসরের বড় তথাপি সেও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। আমাকে সহপাঠী হিসাবে পাইয়া তাহার স্ফুর্তি খুব বাড়িয়া গেল। সে ভাবিল, তবে আমি আর তাহার চেয়ে বেশি কি লেখাপড়া শিখিয়াছি? কলিকাতায় থাকিয়া সাহেবদের স্কুলে পড়িয়া আমি যাহা শিখিয়াছি, গ্রামের স্কুলে পড়িয়া সেও তাহাই শিখিয়াছে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে তাহার পিতামাতা কিন্তু খুশি হইলেন না। জ্যাঠাইমা যখন তাঁহার স্বামীর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার ছেলে যে ক্লাসে পড়ে আমিও সে ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি তখন তিনি জ্যাঠামশাইকে একবার নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা, এতটুকু ছেলে আলো, ও কি ভুতোর সঙ্গে পড়তে পারবে—মুখপোড়া মাস্টাররা কি চোখের মাথা খেয়েছে? বলি, আমরা মেয়ে-মানুষ, আমাদের যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাদের কি তাও নেই? ছোট বড় দেখলে বুঝতে পারে না?

জ্যাঠামশায়, গৃহিণীর আসল ব্যথাটা কোথায়, বোধ করি বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, তাই গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, লেখাপড়াটা কি বয়স দিয়ে মাপা যায়, ওর জন্যে মাথায় কিছু থাকা চাই। তোমার ছেলের মাথায় যে কেবল ষাঁড়ের গোবর পোরা, তাই বয়স বেড়েছে কিন্তু জ্ঞান বাড়েনি!

জ্যাঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিলেন, বালাই, ষাট্‌,—আমার ছেলের মাথায় গোবর পোরা হবে কেন, শত্রুর হোক! তোমার অভিসম্পাত লেগে লেগেই ত ভুতো আমার লেখাপড়ায় দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বলি, আমার ছেলের মাথায় না হয় গোবর আছে, কিন্তু কার মাথায় যে সোনা আছে তা কোন্‌ চোখে মাস্টাররা দেখতে পেলে শুনি?

এই বলিয়া একটা মুড়ো খ্যাংরা লইয়া তিনি খর খর করিতে করিতে উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। বস্তুত এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে ভর্তি হইতে হইলে যে ছাড়পত্র লাগে এবং তাহাতে যে লেখা থাকে ছাত্র

কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে সে খবর তিনি জানিতেন না। জ্যাঠামশায়ও সেকথা প্রথমে তাঁহাকে বলেন নাই। শেষে যখন জ্যাঠাইমা খুবই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, সেই সময় তিনি বলিলেন, এখানকার মাস্টারদের কি দোষ, তাদের তুমি মিছিমিছি গাল পাড়ছো কেন? ওখানে আলোক যে ক্লাসে পড়তো, এখানে এসে সেই ক্লাসেই ভর্তি হয়েছে।

নথ নাড়িয়া তিনি স্বামীর মুখের উপর জবাব দিলেন, বলি, ভর্তি ত ও নিজে হয়নি; তা মাস্টাররা একবার পরীক্ষা করে দেখলে না পর্যন্ত যে সত্যি সত্যি সে এখানকার স্কুলে পারবে কি না?

জ্যাঠামশায় ইহা শুনিয়া তাঁহার মুখের কাছে আরো সরিয়া গিয়া বলিলেন, তাহলে আরো এক ক্লাস উঁচুতে ভর্তি হতো!

বলিয়া কি একটা কাজে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু খিড়কীর দরজা পার হইতে না হইতেই বোধ করি এই কথাটা তাঁহার কানে তীরের মত গিয়া বিঁধিল—ভূতো যে কারুর চেয়ে বড় হবে তা তুমি বাপ হয়ে যখন সহ্য করতে পারো না, তখন অন্য লোক পারবে কেন? সবই আমার অদৃষ্ট, তা না হলে আমার ভূতো আজ দুটো পাশ দিতে পারতো।

৫

পরদিন হইতে আমি ভূতোর সঙ্গে একত্রে রোজ স্কুলে যাইতাম। একই বই দুইজনে পড়িতাম। আমার জন্য পয়সা খরচ করিয়া বই কিনিতে হইল না বলিয়া জ্যাঠামশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

প্রথম হইতেই সহপাঠীদের ব্যবহারে আমার মন তাহাদের উপর বিরূপ হইয়া ছিল, তাহার উপর যখন কয়েক দিনের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, লেখাপড়ায় তাহাদের সকলের চেয়ে আমি ভাল, তখন পুরাতন ছেলেগুলির গাত্রদাহ আরো বাড়িয়া গেল, তাহারা ভিতরে ভিতরে দল পাকাইয়া আমাকে অপমান করিবার জন্য ছলছুতা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহারা কোনদিনই আমাকে জব্দ করিতে পারে নাই। সেইদিন হইতে প্রতি সাপ্তাহিক পরীক্ষাতে আমি ফার্স্ট ত হইতামই, উপরন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় সেই বছর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সপ্তম শ্রেণীতে উঠিলাম।

ভাগ্যক্রমে প্রথম হইতেই আমি শিক্ষক মহাশয়দের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিতেন—শুধু লেখাপড়ায় নহে, সর্ববিষয়েই নাকি আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা অন্য ছেলেদের অপেক্ষা বেশি ছিল তাই তাঁহাদের নিকট হইতে আমি নানা রকম সাহায্য পাইতাম। তাঁহারা আমাকে লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই লইয়া পড়িতে দিতেন। হেডমাস্টার একখানি খবরের কাগজ লইতেন, পড়া হইয়া গেলে পরের দিন সেটিও তিনি আমায় দান করিতেন। ভাল ভাল খবরগুলিতে

দাগ দেওয়া থাকিত, সেগুলি আমায় পড়িতে হইত।

আমি সহপাঠীদের সঙ্গে মিশিতাম না, তাহাদের খেলাধুলা হাসিতামাশা কিছুতেই যোগ দিতাম না। সকলের মধ্যে থাকিয়াও আমি যেন ছিলাম একা। ইহার আরো কারণ ছিল। সহপাঠীদের ভাবভঙ্গী আমার আদৌ ভাল লাগিত না। তাহাদের কথার মধ্যে যেমন কোন শ্রী নাই, ছন্দ নাই—তেমনি তাহাদের গ্রাম্য রসিকতা ও চাষাড়েপনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইতাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মন সুরুচিসম্পন্ন। সেইজন্য এই সব সমপাঠী সহাধ্যায়ীদের কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। যতক্ষণ আমি স্কুলে থাকিতাম—নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম, অবসর সময়টুকুও কাটাইতাম লাইব্রেরীর বই পড়িয়া।

স্কুলে যেমন আমার কোন বন্ধু ছিল না, বাড়ীতেও তেমনি আমি ছিলাম একা—সকলের মধ্যে থাকিয়াও পর। ঘরে ও বাহিরে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল বই—আমার সুখদুঃখ হাসিকান্নার সাথী! লাইব্রেরী হইতে কখনো বা শিক্ষক মহাশয়দের নিকট হইতে বইগুলি চাহিয়া আনিয়া আমি পড়িতাম। নূতন নূতন বই আমার চোখের সামনে নূতন নূতন কল্পনার রাজত্ব খুলিয়া ধরিত। আমার মন তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইত—কখনও তেপান্তরের মাঠে, কখনো সাতসাগরের পারে, কখনো বা কত অজানা রাজ্যে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া। সেখানে কত রাজা-উজীর, কত মন্ত্রি-সেনাপতি, কত পরী-বনদেবী, কত ফুলকুমারী, পশুপক্ষী, কত দেশবিদেশ, কত আকাশ-পাতাল স্বর্গমর্ত্য, কত লোকলস্কর, সেপাই পাহারা! তখন আমার মনে হইত আমি ত একা নহি, এ সংসারে আমার যে-সব সঙ্গী আছে, অন্য কাহারও তাহা নাই!

আমার সহপাঠীরা যখন দল বাঁধিয়া খেলাধুলা করিত আমি তখন চুপ করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতাম। আমার মন হয়ত এ পৃথিবী ছাড়াইয়া কোন্ এক স্বপ্নলোকে চলিয়া যাইত! সেদিন এ সৌভাগ্যের জন্য আমি মনে মনে ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিতাম।

কিন্তু এ সৌভাগ্য আমার বেশিদিন রহিল না। যেদিন আমি প্রথম হইয়া নূতন ক্লাসে উঠিলাম সেইদিন হইতে জ্যাঠাইমার মেজাজও যেন বিরূপ হইয়া উঠিল আমার প্রতি। আমি মনে মনে জ্যাঠাইমাকে ভয় করিতাম। তিনি যে কেবল আমার প্রতি কার্যে আঘাত দিয়া কথা বলিতেন, বয়স অল্প হইলেও তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু এখন তাহার বেদনা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এতদিন যাহা শুধু ফল্গু নদীর মত ছিল অন্তঃসলিলা, এইবার তাহা যেন রুদ্র-মূর্তিতে প্রকট হইয়া পড়িল সর্বসমক্ষে। তাহার সে তীব্রতা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

যেদিন বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বাহির হইল সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। জ্যাঠাইমা অপরাহ্ণে উঠান ঝাঁট দিতেছিলেন। আমি ঘরে

বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলাম। ভুতো তখন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে কাহার বাগান হইতে না বলিয়া কি পাড়িয়া খাইলে নতুন ক্লাসে উঠিবার স্ফূর্তি উপভোগ করিতে পারা যায় সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। এমন সময় এক প্রতিবেশিনী ছোট ছেলে কোলে করিয়া জ্যাঠাইমার নিকট আসিয়া শুধাইলেন,—হ্যাঁলা খেঁদীর মা, তোর দেওরপো নাকি ফার্স্ট হয়েছে, আমার ছেলের মুখে শুনলুম!

জ্যাঠাইমা যেন প্রথমটা সেকথা শুনিতেই পান নাই এইরূপ ভাব দেখাইলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনী যখন আবার বলিলেন, খোকা বলছিল ও নাকি একটা মেডেল পাবে!

কথাটা শুনিয়া সহসা বোধ করি জ্যাঠাইমার কর্ণকুহর জ্বালা করিয়া উঠিল। তিনি ঝাঁট দিতে দিতে বলিলেন, দিনরাত অমন বই মুখে ক'রে পড়ে থাকলে আমার ভুতোও পারতো। তা কি বলবো ভাই, বই যেন মুখপোড়ার যম—পড়ার নাম শুনলেই ওর গায়ে জ্বর আসে। আর দেখ না, সেই ছেলে এখনো ঘরে বই মুখে দিয়ে বসে আছে—দিনরাত্তির কি পড়াই পড়তে পারে ভাই!

ঠিক সেই সময় কতকগুলি কাঁচা পেয়ারা কোঁচড়ে লইয়া এবং একটি চিবাইতে চিবাইতে ভুতো বাড়ীর উঠানে আসিয়া পা দিল এবং জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া বলিল, বড্ড খিদে পেয়েছে মা, মুড়ি দে খেতে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভুতোর চুলের মুঠি ধরিয়া ঘা কতক চড় কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, খিদে পেয়েছে! মুড়ি দেবো না মুড়ো খ্যাঙরা দেবো! মুখপোড়া, পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিনরাত কেবল খেলা আর খেলা—আর কেবল গিলতে দাও। কাল থেকে যদি বেরুবি বাড়ি থেকে ত তোর ভাত বন্ধ—দেখি তুই পড়িস কিনা!

ভুতো খুব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার মায়ের এই ব্যবহারে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল আজ নতুন ক্লাসে উঠিয়াছি, হয়ত মায়ের কাছে আবদার করিলে কিছু ভাল-মন্দ খাদ্য মিলিবে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা মিলিল তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে শুধু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মাস্টার মশায়রা ত বিকেলবেলা খেলতে বলেছেন—তাঁরা বলেন ব্যায়াম আগে তারপর লেখাপড়া—শরীর ভাল না থাকলে পড়াশুনা ভাল হয় না?

জ্যাঠাইমা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, শরীর! শরীর নিয়ে ধুয়ে খাবি? মুখপোড়া, আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে?

ভুতো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চলো না মাস্টারদের জিজ্ঞেস করবে, তারা বলেছেন কিনা!

আরও ঘা-দুই পিঠে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, বলেছেন? সে কি শুধু তোকে একলা বলেছেন?

ভুতো বলিল, আমালে একলা কেন—সকলকেই ত বলেছেন।

—সকলকে বলেছেন! মুখপোড়া মাস্টাররা কি চোখে দেখতে পায় না যে

একজন দিনরাত ঘরে বই মুখে দিয়ে বসে আছে ?

বলিয়া তিনি আবার প্রতিবেশিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দেখলে ত দিদি ছেলের রকমখানা ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশিনী বলিলেন, কাকে বলছিস ভাই—আমার খোকাও অমনি, কার সাধ্যি যে তাকে বই দিয়ে বসাবে ?

তারপর মিনিট কয়েক থামিয়া আবার বলিলেন, যাই ভাই খেঁদীর মা, বেলা পড়ে এলো—ছেলেটার আবার কদিন ধরে সর্দ্দিকাসি হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগবে।

বলিতে বলিতে তিনি খিড়কীর দরজা দিয়া প্রস্থান করিলেন। জ্যাঠাইমাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে চলিয়া গেলেন।

ভূতো তখন পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোঁচড় হইতে দুইটা কাঁচা পেয়ারা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, তোর জন্যে শুধু শুধু আমি মার খেয়ে মলুম।

আমি সবই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, তবু কথাটা চাপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার জন্য কেন ?

সে বলিল, তুই দিনরাত যে লাইব্রেরীর বই পড়িস মা ত আর তা জানে না—মনে করে বুঝি পড়ার বই পড়ছিস—তাই আমি ফাঁকি দিচ্ছি মনে করে মা মারলে। যদি পড়তেই হয় ত কাল থেকে তুই ভাই মাঠে গিয়ে পড়িস—তা না হ'লে মা আমাকে আর বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না।

বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে।

ভূতোর সঙ্গে আমার খুব আন্তরিকতা না থাকলেও অন্তত অসদ্ভাব ছিল না। তাই পরের দিন হইতে আমি বইখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতাম।

জ্যাঠামশায় নিজের ক্ষেতখামার, চাষ-আবাদ লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতেন। উহা তদারক করিতে করিতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। আর যেটুকু সময় অবসর পাইতেন বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি করিতেন। ইহাতে পয়সা না পাইলেও কলাটা মুলোটা, পুকুরের মাছটা রোগীদের নিকট হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে যাহা পাইতেন তাহাতেও সংসারের অনেকটা সাশ্রয় হইত। তাঁহার জমিজমার যাহা আয় ছিল তাহার সঙ্গে ইহা মিলাইয়া মিশাইয়া কোন রকমে খাইয়া পরিয়া সচ্ছলে পল্লীগ্রামে চলিয়া যাইত, অন্যের কাছে তাঁহাকে কোনদিন হাত পাতিতে হইত না। তাই যাহারা গ্রামে সুদের কারবার করিত তাহারা ভাবিত কালীচরণ বেশ দুপয়সা জমাইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য জানি না, তবে আমি কোনদিন জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে ইহার কোন পরিচয় পাই নাই।

বেশভূষায় তাঁহার কোন পারিপাট্য ছিল না—এমন কি তাহা অতি সাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ? স্বল্পভাষী, সংসার সম্বন্ধে যেন চিরউদাসীন। তাঁহাকে দেখিলে গীতায়-উক্ত আদর্শ পুরুষকে মনে পড়ে। তিনি সংসারধর্ম সবই করেন

অথচ মনে হয় যেন কোথাও কোন আসক্তি নাই। এক একদিন এমনও হইয়াছে, জ্যাঠাইমা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁহাকে আনিতে বলিয়া হয়ত বসিয়া আছেন, তিনি কিন্তু ফিরিলেন একেবারে শূন্য হাতে। ইহা দেখিয়া জ্যাঠাইমা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলি কোন্ চুলোয় তোমার কান ছিল, আমি যে এত বকে বকে মলুম তা কি শুনতে পাওনি? না, আমি বাড়ীর একটা দাসীবাঁদী ব'লে আমার কথা গেরাহ্যি হয় না?

জ্যাঠামশায় অপ্রস্তুত হইয়া বলেন, ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছি, না পাছে আমার জন্যে পয়সা খরচ হয় তাই মনে থাকে না?

জ্যাঠামশায় তখন শপথ করিয়া পকেট হইতে তাড়াতাড়ি পয়সা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলে তবে তিনি শান্ত হন বটে, কিন্তু চুপ করেন না। বলেন, কার ধ্যানে দিনরাত থাকো—যদি সংসার করতে চাও ত সংসার করো আর যদি ধ্যান করতে চাও ত তারও জায়গা আছে সেখানে চলে যাও। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না।

এই রকম ঝগড়া তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই হইত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্যাঠাইমা জয়ী হইতেন শুধু মুখের জোরে। জ্যাঠামশায় তাঁহার চেয়ে তাঁহার মুখকে সহস্রগুণ বেশি ভয় করিতেন। তাই তাঁহার মুখকে বন্ধ রাখিবার জন্য নিজের মুখ একেবারে খুলিতেন না। শুধু খুব বেশি রাগ হইলে একটি কথা প্রায়ই বলিতেন, হ্যাঁগা, তুমি যখন জন্মেছিলে তোমাদের দেশে কি তখন মধু পাওয়া যেত না?

—কেন, জানলে কি তুমি কিছু কিনে পাঠিয়ে দিতে? জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিতেন।

—ঠিক ধরেছো ত। বলিয়া জ্যাঠামশায় হয়ত একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠাইমা ঝাঁজিয়া বলিতেন, ধরবো না? তোমার মত মুখে মিষ্টি আর অন্তরে বিষ ভরে রাখতে ত আমার বাপ মা শেখায়নি। আমাদের ভেতর বাইরে সব সমান।

বলিয়া তিনি রাগে গরগর করিতে করিতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিতেন।

রাগটা জ্যাঠাইমার বরাবরই ছিল, তবে ইদানীং দেখিতাম কিছু বাড়িয়াছিল, বিশেষ করিয়া যেন আমার উপর। তাঁহার মনে কেমন করিয়া জানি না এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ভুতো যদি আমার মত বেশি পড়িত তাহা হইলে আমার মত সেও ফার্স্ট হইতে পারিত। বস্তুতো ভুতো পাঠ্য পুস্তক আমার চেয়েও অনেক বেশি পড়িত—দুলিয়া দুলিয়া চক্ষু বুজিয়া প্রতিটি লাইন পাঁচবার দশবার করিয়া যে মুখস্থ করিত, তাহা তিনি জানিতেন না। তাই সকল বিষয়ে পাশ করিবার মত নম্বর সে পাইত না কেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেন না। তবে তাহার মাথাটা যে একটু মোটা ছিল সেকথা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের, এমন কি জ্যাঠামশায়কে

পর্যন্ত, বহুবার উল্লেখ করিতে শুনিয়াছিলাম। জ্যাঠাইমার কানেও যে কথা আসে নাই তাহা নহে। তবে তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না, একই বই দুইজনে পড়ি অথচ আমি বেশি নম্বর পাই আর ভূতো কম পায় কি করিয়া! হয়ত বেশিক্ষন বইগুলি আটকাইয়া রাখিয়া ভূতোকে পড়িতে দিই না, এই মনে করিয়া এক একদিন তিনি চুপি চুপি আমাদের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

আমরা দুইজনেই চেঁচাইয়া পড়িতাম। প্রথম যেদিন জ্যাঠাইমা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেকথা এখনও মনে আছে। ভূতো মাকে দেখিয়া আরও বেশি মনোযোগী হইয়া উঠিল এবং আরো জোরে দুলিতে দুলিতে পড়িতে লাগিল—'এঁ্যা পচা পুকুরে স্নান করিলে ম্যালেরিয়া হয়', 'এ্যা পচা পুকুরে স্নান করিলে ম্যালেরিয়া হয়'—

সে লাইনটি সে অন্য দিন হয়ত পাঁচবার পড়িত সেদিন সে লাইনটি পনেরোবার কুড়িবার পড়িল, বোধহয় মাকে খুশি করবার জন্য।

আমি তখন ইংরেজি কবিতা পড়িতেছিলাম, গলা কাঁপাইয়া, সুর করিয়া, থামিয়া থামিয়া ছন্দ, মাত্রা, বজায় রাখিয়া—

Oh, call my brother back to me,
I cannot play alone,
The summer comes with flower and bee,
Where's my brother gone.

জ্যাঠাইমা দুজনের পড়াই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিলেন। তারপর বলিলেন, হাঁরে ভূতো, তোর বুঝি ও-বই পড়া নেই? এই বলিয়া আমার বইখানির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইলেন।

ভূতো সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ওর আগে পড়া হয়ে যাক্ মা, তারপর আমি পড়বো।

জ্যাঠাইমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, কেন, তুই আগে পড়ে পরে ওকে দিতে পারিস না? পচা পুকুরে নাইলে যে ম্যালেরিয়া হয় এ ত সকলেই জানে, এ মুখস্থ করে কি উনুনের পাঁশ হবে শুনি? মুখপোড়া মাস্টাররা কি তোকে পড়া দেবার আর কিছু খুঁজে পায় না?

ভূতো বিস্মিত নেত্রে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বা রে, আমি যে স্বাস্থ্যরক্ষা পড়ছি!

—মুয়ে আগুন তোর স্বাস্থ্যরক্ষার—এ পড়ে কি হবে শুনি?

ভূতো ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে আবার বলিল, জানো না মা, হেডমাস্টারমশায় বলেন, আগে স্বাস্থ্য তবে অন্য কিছু। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে মানুষের বেঁচে থেকে লাভ কি?

জ্যাঠাইমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—ঝাঁটা মারি এই স্বাস্থ্যরক্ষার মুখে—

যদি মুখ্যুই হয়ে রইলি তবে স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রে কি হবে ? দেখ্ দেখি ও ছেলে কেমন চালাক, বাজে বই না পড়ে কেমন কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

বলিয়া তিনি গম্ভীরকণ্ঠে আমায় কহিলেন, এই আলো, তোর বইটা এখন ভূতোকে দে, আর তুই ওর বইটা পড়্।

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম। আমার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপিতেছিল।

আর একদিন কখন তিনি এইভাবে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন আমরা দুইজনে কেহই বুঝিতে পারি নাই। আমি তখন বাঙলা বই পড়িতেছিলাম—

আপনার ভাই নেই ব'লে

ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?

আর কারো জননী আসিয়া

ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?...

ভূতো তখন পড়িতেছিল ভূগোল—'এ্যা মতিহারী, তামাকের জন্য বিখ্যাত', 'এ্যা রামপাল, কলার জনা বিখ্যাত'—

—ভূতো ! পিছন দিক হইতে যেন সিংহগর্জন হইল। আমাদের দুইজনের অন্তরাত্মা একসঙ্গে চমকাইয়া উঠিল। ভূতো পিছন দিকে না চাহিয়া বলিল, কি মা ?

—বলি ওটা কি পড়া হচ্ছে ?

—ভূগোল, মা।

—ভূগোল না আমার পিণ্ড ! বলি তামাক আর কলার কথা জেনে তোর কি হবে শুনি ?

ভূতো বলিল, সেকেণ্ড মাস্টার বলেছেন ভূগোলটা খুব ভাল করে মুখস্থ করতে। পৃথিবীর সম্বন্ধে জ্ঞান না হলে পড়াশুনো শিখে লাভ নেই।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ খুব লাভ ? তামাক আর কলা—ওই দুটোই শিগ্গির খেতে শিখবে সেকেণ্ড মাস্টারের মতো।

তারপর ধমক দিয়া বলিলেন, বন্ধ কর্ বই। দে ওটা ওকে পড়তে তুই, ওর বইটা পড়্। এই বলিয়া তিনি অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে শুধু চাহিলেন।

আমি কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বাঙলা বইটি ভূতোর হাতে তুলিয়া দিতেই তিনি প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর হইতে এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল ভাল বইগুলি আমি নিজে পড়ি আর খারাপগুলি ভূতোকে পড়িতে দিই। অথচ এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনদিন কোন চিন্তার উদয় হয় নাই। যখন যে বইটা পাইতাম আমরা দুজনে ভাগাভাগি করিয়া পড়িতাম। কিন্তু জ্যাঠাইমাই প্রথম আমাদের সেই দিকে সচেতন করিয়া দিলেন। ফলে সেই দিন হইতে আমি

ভুতোর মত না লইয়া আর কোন বই পড়িতাম না।

এত করা সত্ত্বেও যখন আমি অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম তখন আর এক কাণ্ড ঘটিল। একদিন হঠাৎ পড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম বইপত্র কিছুই নাই, ভুতো সবগুলি লইয়া আলাদা একটি ঘরে বসিয়া একাকী পড়িতেছে।

আমি ইহার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, হ্যাঁরে ভুতো, এখানে একলা পড়ছিস্ কেন ভাই—ও ঘরে যাবি না?

সে যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই এইভাবে আপন মনে পড়িয়া চলিল। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগিল। গলাটা একটু খাটো করিয়া তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ ভাই ভুতো, বল্ না কেন এ ঘরে পড়ছিস?

এইবার ভুতো হঠাৎ পড়াটা থামাইয়া বলিল, জানি না। তারপর পড়ায় বেশি করিয়া মনোযোগ দিল।

আমি তখন বলিলাম, তাহলে আমার বইগুলো দে ভাই, আমি চলে যাই।

সে আর একবার পড়া থামাইয়া শুধু উত্তর করিল, না।

রাগ হইয়া গেল। বলিলাম, তুই আমায় পড়তে দিবি না?

ভুতো আবার বলিল, না। এইবার তাহার কণ্ঠস্বর যেন দৃঢ়তর বলিয়া মনে হইল।

—আচ্ছা আমি এখুনি জ্যাঠাইমাকে বলে দিয়ে আসছি। এই বলিয়া সবে ঘর হইতে বাহিরে পা দিয়াছি এমন সময় দেখিলাম তিনি দাঁড়াইয়া আছেন ঠিক আমার পিছনে। হঠাৎ সামনে বাঘ দেখিলে লোকের মনের অবস্থা যেরূপ হয় আমার অনেকটা সেই রকম হইয়াছিল। তবু মনে একটু বল সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, দ্যাখো না জ্যাঠাইমা, ভুতো আমায় একটাও বই পড়তে দিচ্ছে না।

তাঁহার মুখে যেন পূর্ব হইতেই ইহার উত্তর যোগাইয়া ছিল। তাই বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কহিলেন, তা আমি কি করবো—তুই যদি ওর বই নিয়ে আট্‌কে রাখিস্ তাহলে ও পড়ে কখন বল্ তো—একেই ত ওর পড়ায় মন নেই।

তাঁহার কথার উপর কথা বলিবার সাহস আমার ছিল না, তাই অবনত মস্তকে নিজের পড়ার ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিলাম জানি না, তবে এক সময় হঠাৎ জ্যাঠামশায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, হ্যাঁরে আলোক, তোর আজ বুঝি পড়াশুনো নেই—চুপ করে বসে আছিস কেন?

ইহার উত্তরে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বাহির হইল না। শুধু দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল গালের উপর। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় একটা হাত রাখিয়া বলিলেন, কি হয়েছে বাবা বল তো?

তাঁহার মুখ হইতে এই আদরের ডাক শুনিয়া কিনা জানি না আমি আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, একেবারে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম।

জ্যাঠামশায় তখন আমার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে মৃদু ও সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, কি হয়েছে বল্ তো আলোক—লক্ষ্মী বাপ আমার !

আমি তখন অস্ফুটস্বরে বলিলাম, ভূতো আমায় বই দিচ্ছে না পড়তে !

তিনি সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ ভূতোর নিকট ছুটিয়া গেলেন, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, কেন তুই আলোককে বই দিসনি—শিগ্‌গির দে বলছি হতভাগা !

ভূতো পিতার নিকট সত্য গোপন করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিল, মা যে তাহলে বকবে !

জ্যাঠাইমা বারণ করিয়াছেন শুনিয়া মুহূর্তে তাঁহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিন্তু বোধ হয় এরূপ অন্যায়কে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি একেবারে রান্নাঘরে গিয়া হাজির হইলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—হ্যাঁগো, তুমি নাকি আলোককে বই দিতে বারণ করেছ ?

—কে বলেছে, সেই ছোঁড়া বুঝি ? এই বলিয়া তিনি রাঁধিতে রাঁধিতে একেবারে তরকারীর খুন্তিটা হাতে করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর আমার মুখের সামনে হাতমুখ নাড়িয়া অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, বলি জ্যাঠা বাড়িতে পা না দিতে-দিতেই লাগানো হয়েছে ? ওঃ তবে ত আমি একেবারে মরে গেলুম ভয়ে—তিনি আমায় এখুনি বচুগাছে ফাঁসী দেবেন ! বেশ করেছি—একশোবার বারণ করবো—দেখি কে আমার কি করতে পারে ? এই বলিয়া তিনি যেমন বেগে প্রবেশ করিয়াছিলেন তেমনি বেগে আবার প্রস্থান করিলেন।

আমি ত হতভম্ব ! যেন ইহার জন্য দায়ী আমি একা এবং সমস্ত অপরাধ আমার। এদিকে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার অবস্থাও আমারই মত।

ভূতো ও তাহার অন্যান্য ছোট ছোট ভাইবোনগুলি যে-যেখানে ছিল, সবাই তখন আমার পড়ার ঘরে। চাহিয়া দেখিলাম, তাহাদের মুখে হাসি নাই, সবাই বিস্মিত ও স্তব্ধ।

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর জ্যাঠামশায়ের যেন হুঁস হইল, তিনি ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাহিয়া এক ধমক দিলেন, তোরা এখানে কি করছিস রে ? যা শিগ্‌গির এখান থেকে !

তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল।

তখন ধীরে ধীরে তিনি আমার কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, চুপ কর্ বাবা, আমি তোকে আলাদা বই কিনে দেবো।

জ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলেটির নাম পচা। সে বোধ হয় দরজার পাশেই কোথাও লুকাইয়া ছিল। তাহার কানে এই কথাটি যাইবামাত্র সে একেবারে ছুটিতে ছুটিতে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, মা জানো, বাবা আলোকদাকে আলাদা বই কিনে দেবে বলছে !

যেন অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ হইল। জ্যাঠাইমা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, তা ত বলবেই! নিজের ছেলে যখন বইয়ের অভাবে পড়তে পাচ্ছিল না, তখন কি চোখে নুড়ো গোঁজা ছিল যে দেখতে পায়নি! এখন একদিন ভাইপো পড়ার বই পায়নি, তাই কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলো! দর্পহারী মধুসূদন কি নেই, তিনি কি এর বিচার করবেন না? এই বলিয়া জোরে জোরে তিনি কড়াইয়ের খুন্তি নাড়িতে লাগিলেন।

রান্নাঘর হইতে সব কথাই আমাদের কানে আসিয়া পেঁছিল। কিন্তু জ্যাঠা-মশায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

৬

মোট কথা, এমনি ভাবে একরকম করিয়াই আবার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারও বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছি শুনিয়া জ্যাঠাইমার মূর্তি যেন আবার বদলাইয়া গেল। আমার প্রতি তিনি তখন হইতে এইরূপ ব্যবহার শুরু করিলেন যে, তাহা বলিতে আজও লজ্জা করে।

অবশ্য ভূতোও ক্লাসে উঠিয়াছিল, তবে দুইটি বিষয়ে ফেল করিয়া। তাই জ্যাঠাইমা তাহার জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখিবার কথা জ্যাঠামশায়কে বলিলেন।

তিনি প্রথমে কথাটা উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, ওটা গাধা, ওর কিছু হবে না—তাছাড়া মাস্টার রাখতে গেলে যে একগাদা টাকা লাগবে, তা পাবো কোথায়? ওই একটার পেছনে যথাসর্বস্ব খরচ করে ত আমি পথে বসতে পারবো না—আর পাঁচটাকে মানুষ করতে হবে।

পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি শুনিলে কোন্ মায়ের প্রাণে ভাল লাগে, তাহার উপর স্বামীর মুখ হইতে ইহা শুনিয়া জ্যাঠাইমা একেবারে রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কোন রকমে ক্রোধ সংবরণ করিতে করিতে অভিমানক্ষুব্ধ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, কোন্ ছেলেটাকে তুমি মানুষ করেছ শুনি? বাছাদের আমার পড়া বলে দেবার একটা লোক পর্যন্ত নেই—তুমি বাপ, তুমি কি কোনদিন গিয়ে একবার ছেলেদের পড়ার কাছে বসো? লেখাপড়াটা কি ওরা আপনি আপনি শিখবে?

জ্যাঠামহাশয় বলিলেন, হাঁ যার হয়, তার আপনিই হয়—তার প্রমাণ ত তোমার বাড়ীতেই রয়েছে। আলোককে কে পড়া বলে দেয়?

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তাছাড়া, এই ত গ্রামে আরো দশটা ছেলে রয়েছে, তাদের কি সকলের মাস্টার আছে?

জ্যাঠাইমা হাতমুখ নাড়িয়া অভিনয় করিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, হ্যাগো হ্যাঁ, তোমার ভাইপোর মত ছেলে গাঁয়ে কেন, ভু-ভারতে আর নেই জানি—তা ব'লে কি

নিজের ছেলেদের ভাসিয়ে দিয়ে তার পুজো করতে হবে, না চন্নামেত্য খেতে হবে !

জ্যাঠামহাশয় কহিলেন; আমি কি তাই বলছি ?

এর চেয়ে আবার কি করে বলবে শুনি ! তা না হ'লে নিজের বড়ছেলে, তার কিসে ভাল হয়, তুমি তা না ভেবে কিনা বলছো, ওর লেখাপড়া হবে না। বেশ, তুমি যদি মাস্টারের মাইনে দিতে না পারো স্পষ্ট করে বলো, আমার বাবার দেওয়া গহনা এখনও ত দু'একখানা আছে, তাই দিয়ে আমি যেমন করে হোক মাইনে যোগাবো—তবু চোখের সামনে ছেলেটা মুখ্যু হয়ে যাবে, শুধু পড়া বলে দেবার একটা লোকের অভাবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

এই বলিয়া দম লইবার জন্য একটু থামিয়া তিনি আবার অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন, ভুতো বলছিল ওদের স্কুলে কে একজন সেকেণ্ড মাস্টার আছে, সে নাকি খুব ভাল পড়ায়, আমি তাঁকেই ঠিক করেছি—পাঁচ টাকা মাইনে দু'বেলা বাড়ীতে এসে ভুতোকে দু'ঘন্টা পড়িয়ে যাবে।

যদি ঠিক করেই ফেলেছো, তবে আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছো কেন ?

ঘাট হয়েছে ! তোমাদের চোদ্দপুরুষের পায়ে দণ্ডবৎ। এই বলিয়া জ্যাঠাইমা দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

জ্যাঠামশায়ও কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘর হইতে জ্যাঠাইমার গলা শোনা গেল। বলি ওগো বড়মানুষের জামাই, শুনতে পাচ্ছো, বাজার-হাট কি আজ হবে না—বই মুখে দিয়ে বসে থাকলেই চলবে—পিণ্ডি উঠবে কি করে মুখে শুনি ?

এই সাদর সম্ভাষণটি যে তিনি আমারই উদ্দেশে করিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, আপন মনেই পড়িতেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আমার কথা কি কানে ঢুকলো না, না জ্যাঠা-মশায়কে দিয়ে বলাতে হবে ? বলি এতটুকু কি আক্কেল নেই তোর, বাজার-হাট-গুলো করবে কে শুনি—দেখছিস ভুতো পড়ছে, আর উনিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অপরাধীর মত আমি তাড়াতাড়ি বই মুড়িয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর পয়সা লইয়া বাজারের দিকে চলিলাম। এই কাজটি জ্যাঠামশায় করিতেন। যেদিন তিনি পারিতেন না, ভুতোই করিত। কাজেই আজ যে সহসা আমাকে ইহার জন্য ডাক পড়িবে, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, তবু এই ভাবে জ্যাঠাইমার কাজে লাগিতে পারিয়াছি ভাবিয়া সেদিন মনে মনে খুব খুশি হইয়া উঠিলাম।

পরের দিন আবার আমি পড়িতেছি, এমন সময় জ্যাঠাইমা খেঁদীকে দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সে নাকি ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহার রন্ধনকার্যে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। আমি বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু যতই তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করি,

ততই সে আরো জোরে কাঁদিয়া উঠে। ছোট ছেলেমেয়ে ইতিপূর্বে কখনও আমি রাখি নাই, তাই ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া তাহাকে থামাইব, এমন সময় জ্যাঠাইমা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, বলি চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, দেখতে পাচ্ছিস না মেয়েটা একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আমি তখনি বারণ করেছিলাম খেঁদীকে যে, দিস্‌নি ওর কাছে—ও গোরার বাচ্ছা, এই কালো কুচ্ছিত বোনকে ছুঁলে যে ওর রং কালো হয়ে যাবে !

কথাটা শুনিয়া আমি আরও বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এমন সময় গোয়ালঘর হইতে সরলা ঝি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু ওকে নিয়ে একটু ফাঁকায় যাও না।

আমি খুকিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে হাওয়া খাওয়াইতে চলিয়া গেলাম। হাওয়া খাইয়া কিনা বলিতে পারি না, মেয়েটা কিছুক্ষণ পরেই চুপ করিল, কিন্তু যেমন আবার ভিতরে লইয়া আসিলাম, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলাম। এইভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেই সেদিন সকালটা কাটিয়া গেল, আমার আর পড়াশুনা হইল না।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি সকাল সকাল বই লইয়া বসিলাম। সকালে যে পড়া করিতে পারি নাই, আগে তাহা করিয়া লইব, এই সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক ! খেঁদী আসিয়া খবর দিল, আলো-দা, গয়লা এসেছে, মা তোমাকে গোয়ালে যেতে বললে।

দুধ দুইবার সময় একজনকে সেখানে যাইতে হইত, বাছুরটা ধরিবার জন্য। এ পর্যন্ত আমি এ কার্য কোনদিন করি নাই। কে যে করিত তাহাও ঠিক জানিতাম না, তাই জ্যাঠাইমার সে হুকুম শিরোধার্য করিয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরের দিকে যাত্রা করিলাম।

তিনটি গোরু দুহিতে যে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিত, তাহা আমি জানিতাম না। আমার মন তখন স্কুলের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল। তাই যত দেরি হইতে লাগিল, ততই আমি গোয়ালাকে তাগাদা দিতে লাগিলাম তাড়াতাড়ি করিবার জন্য। গোয়ালার বয়স হইয়াছিল অনেক, তাহার উপর সে একটু গল্প করিতে ভালবাসে। দুধ দুহিতে দুহিতে সে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করিতেছিল। পাছে আমার কথায় মন দিলে তাহার হাত চলিতে বিলম্ব হয়, তাই শুধু একটা 'হু' হাঁ' দিয়া তাহার দীর্ঘ প্রশ্নের জবাব দিতেছিলাম। কিন্তু গোয়ালার কৌতূহল ইহাতে মেটে না। সে কেবল প্রশ্ন করে।

একবার সে বলিল, আচ্ছা দাদাবাবু, তুমি ত বললে, ইংরেজি, বাঙলা, ইতিহাস, আরও কত কি বই পড়ো—কিন্তু কি করে সবগুলো একসঙ্গে মনে রাখো ? আমি ত আজ পর্যন্ত দুধের হিসেবটা ঠিকমত রাখতে পারলুম না। একজনের হিসেবের সঙ্গে আর-একজনের গোলমাল হয়ে যাবেই। আর তার জন্যে ফি-মাসেই কত বকুনি খেতে হয়। যে আজ একসের দুধ নিলে, আমি হয়ত তার ঘাড়ে দেড়

সের চাপিয়ে দিলুম—আর যে দেড় সের নিলে তার নামে একসের লিখে রাখলুম !

আমি বলিলাম, বুড়ো হয়েছো, তাই সব কথা মনে থাকে না।

সে তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহলে ত বাঁচতুম—ছেলেবেলা থেকেই আমার এই রকম ধাত দাদাবাবু ! গয়লানীর মুখনাড়া না খেয়ে আমার একটা দিনও কাটে না। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, আচ্ছা, দাদাবাবু, তোমার এমনধারা হয় না ? বাঙলা পড়া বলতে গিয়ে ইংরেজি বলে ফেলো না, কি আঁক কষতে গিয়ে ইতিহাস লিখে দাও না ?

তাহার কথা শুনিয়া আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল, এইজন্যই বোধ হয় লোকে বলে—আশি বৎসর না হইলে গয়লার বুদ্ধি হয় না।

আমাকে হাসিতে দেখিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, হাসছো যে, আমার কথাটা কি বুঝতে পারলে না দাদাবাবু ?

বলিলাম, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই ত লেখাপড়াটা সকলের মাথায় ঢোকে না।

আমার মুখ হইতে ইহা শুনিয়া গোয়ালা একেবারে লাফাইয়া উঠিল। ঠিক বলেছো দাদাবাবু, এই জন্যেই আমার লেখাপড়া হয়নি। মিথ্যে কথা বলবো না, আমার বাবা আমায় সারদা গুরুর পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল, লেখাপড়া শেখাবার জন্যে চেষ্টাও করেছিল ঢের, কিন্তু বললে তুমি পেত্যয় না যাবে, তিন বছর ধরে তিনের ঘরের নামতা আর কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না, কেবলই সাতের ঘরের সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায়। তাই একদিন রাগ করে বাবা পাঠশালা থেকে নাম কাটিয়ে দিলে।

তারপর একটা হাই তুলিয়া বলিল, বুঝলে দাদাবাবু, আমি কিন্তু আর ও-ভুল করিনি, ছেলে দুটোকে একেবারে জাত-ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়েছি। গয়লানী অনেক কান্নাকাটি করেছিল ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে ব'লে। আমি বললুম, যার বাপ তিন বছর ধরে তিনের কোটা নামতা মুখস্ত করতে পারে না, তার ছেলে আবার কি লেখাপড়া শিখবে ?

ইহা শুনিয়া আমি একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

দুধের বালতি লইয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই জ্যাঠাইমা বলিয়া উঠিলেন, গোয়ালঘর যে আজ হাসিতে ফেটে যাচ্ছিল, বলি গোরুগুলো কি তোমার সঙ্গে কথা বলে নাকি গয়লাবুড়ো ?

তাহলে ত বাঁচতুম মা ঠাকরুণ, বলিয়া বুড়া ঈষৎ হাসিল।

জ্যাঠাইমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কেন—মানুষের কথা বুঝি আর ভাল লাগে না ?

রা-মো ! মানুষের নাম কোরো না মা—যেমন মুখ তেমনি ব্যবহার ! দেখ না, যত অশান্তি এই মানুষকে নিয়ে ! ঝগড়া-বিবাদ, পরের নিন্দে, পরের কেচ্ছা,

ছি ছি ছি—কি বলবো মা ঠাকরুণ, আমি ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করি এবার যেন আর মানুষ হয়ে না জন্মাই !

জ্যাঠাইমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তবে কি গোরু হয়ে জন্মাতে চাও ?

মানুষের চেয়ে সে ঢের ভাল—ওরা তবু মানুষের ব্যথা বোঝে। তুমি কি বলো দাদাবাবু ? এই বলিয়া গোয়ালা বুড়ো আমার দিকে চাহিল। আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পড়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুড়া বলিয়া উঠিল, তোমার এই ছেলেটি কালে একটা মানুষের মত মানুষ হবে দেখে নিয়ো মা ঠাকরুণ, আমি বলে রাখলুম। ওঃ, অতগুলো বই একসঙ্গে পড়ে কি করে মনে রাখে !

সহসা জ্যাঠাইমার মুখটা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে আবার মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, সেই আশীর্বাদ করো বুড়ো—পরের ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে যেন মুখ থাকে।

রাত্রের পড়াতে এতটা ব্যাঘাত হওয়ায় আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তাই পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া পড়িতে বসিলাম ইহার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য। কিন্তু আবার আজ খেঁদী আসিয়া তাহার ছোট বোনটিকে আমার কোলে দিয়া গেল। বলিল, বড্ড জ্বালাতন করছে মাকে, তুমি ওকে নিয়ে একটু ফাঁকে যাও।

মেয়েটি আমার কাছে আসিয়া পূর্বদিনের মতই কান্না শুরু করিয়া দিয়াছিল, আর আমি কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছিলাম না। শিশুদের কান্না কেমন করিয়া থামাইতে হয় আমি জানিতাম না। তাই আমার এই অপটুত্ব দেখিয়া সরলা ঝি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার কোল হইতে খুকিকে তুলিয়া লইল এবং তাহাকে শান্ত করিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

আমি যেন বাঁচিলাম। মনে মনে সরলাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে পড়ার ঘরে গিয়া বই লইয়া বসিলাম। কিন্তু কয়েক-মিনিট পরেই জ্যাঠাইমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ঝিকে বলিতেছেন, কেন তুই খুকিকে নিয়ে এলি ?

ঝি উত্তর করিল, দাদাবাবুর এখন লেখাপড়া করার সময়, তাই আমি তার কোল থেকে নিয়ে এলুম।

জ্যাঠাইমা গলায় একপ্রকার সুর টানিয়া কহিলেন, ওলো আমার দরদিনী—বলি এতদিন কোথায় ছিলি লো ?—বলে 'মার চেয়ে ব্যথী বড় তারে বলি ডান'।

এই বলিয়া একটু দম লইয়া আবার শুরু করিলেন, লেখাপড়ার তুই কি বুঝিস্ লা যে, বলতে এসেছিস আমার কাছে ? ওর পড়ার ক্ষতি হচ্ছে কিনা, তা কি তুই আমার চেয়ে বেশি বুঝিস্ ?

সরলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কিছু বুঝি না মা, তবে পাড়ার লোকেরা বলে দাদাবাবু নাকি খুব ভাল ছেলে লেখাপড়ায়—

থাম্ তুই। বলিয়া একটা ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, বাড়ির কোন কাজ না করে দিনরাত বই মুখে করে পড়ে থাকলে সবাই অমন ভাল ছেলে হতে পারে!

সরলা ইহার কোন উত্তর দিয়াছিল কিনা আমি শুনিতে পাই নাই। তবে মুহূর্ত কয়েক পরে সে খুকিকে আনিয়া ধপাস্ করিয়া আমার কাছে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমিও তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলাম না, সেও আমায় আর কোন কথা বলিল না।

এতক্ষণে জ্যাঠাইমার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি যে ভুতোকে কোন কাজ করিতে না দিয়া কেন আমায় বলিতেন—তাহা বুঝিলাম। ইহার জন্য আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিলেও মুখ বুজিয়া সহ্য করা ছাড়া তখন আর অন্য কোন উপায় ছিল না। তাই জ্যাঠাইমা যখন যাহা হুকুম করিতেন, আমি অবনত মস্তকে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিতাম। এইভাবে সকালে তাঁহার মেয়েকে লইয়া বেড়াইয়া আনা এবং সন্ধ্যার পর গোয়ালাকে সাহায্য করা আমার নিত্যকর্ম হইয়া উঠিল ত বটেই উপরন্তু অন্যান্য খুচরো কাজ যখন যাহা সংসারে প্রয়োজন হইত, তাহাও আমাকে করিতে হইত।

খেঁদী কোনদিন হয়ত একটা পয়সা আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিত, আলো-দা, মা বললে শিগ্গির এক পয়সার হিঙ কিনে আনতে, ডাল সেদ্ধ করে মা বসে আছে সাঁতলাতে পারছে না, যেন দেরি না হয়।

বাড়ি হইতে দোকান প্রায় আধ মাইল দূরে। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটিতাম হিঙ কিনিতে। হিঙ আনিয়া দিয়া হয়ত পড়িতে বসিয়াছি, আবার কিছুক্ষণ পরে খেঁদী আসিয়া বলিত, আলো-দা, মা বললে, তোমাকে তখন বলতে ভুলে গিয়ে-ছিল, খুকির জন্যে দু'পয়সার বার্লি আনতে হবে—খুকির আজ সকাল থেকে পেটের অসুখ করেছে—বার্লি না আনলে মা ওকে খেতে দিতে পারছে না।

বলা বাহুল্য, আবার ছুটিতে হইত। এইভাবে প্রায় প্রতিদিনই দুইবার না হউক, একবার অন্তত দোকানে যাইতেই হইত। কাহারো জন্য বিস্কুট, কাহারো জন্য লজেন্‌স্, কাহারো জন্য বাতাসা, কাহারো জন্য মুড়ি-মুড়কি; ইহা ছাড়া তেল, নুন, পাঁচফোড়ন, সরিষা প্রভৃতির আকস্মিক প্রয়োজন ত ছিল-ই।

৭

বাড়িতে এইভাবে দিন কাটিলেও স্কুলে কিন্তু এতদিন আমার পড়াশুনার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। লেখাপড়ার আগ্রহ আমার বরাবরই ছিল প্রবল। শুধু তাহাই নহে, ইহার ভিতরেই আমার মন তখন একমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত। বাহির হইতে যত কষ্ট, দুঃখ আসুক না কেন, আমার অধ্যয়নানুরাগী মনকে তাহা কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই প্রতি পরীক্ষাতেই আমি প্রথম স্থান

অধিকার করিয়া আসিতেছিলাম। আমার এই কৃতিত্ব দেখিয়া জ্যাঠামশায় হেড-মাস্টারকে ধরিলেন আমায় ফ্রি করিয়া দিবার জন্য। হেডমাস্টার মশায়ও কর্তৃ-পক্ষকে দিয়া তাহা অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

ইহার জন্য সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখিলেও আমি কিন্তু ফ্রি পড়িবার জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করিতাম। ভাবিতাম, এতদিনে যেন আমি লেখাপড়ার জন্য একটা উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছি।

ইতিমধ্যে সহপাঠীদের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কাহারও সহিত সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় নাই। কথাবার্তা সকলের সঙ্গেই হইত। কেহ বা কোন কঠিন অঙ্ক লইয়া আসিত আমার কাছে বুঝিবার জন্য, কেহ বা পরীক্ষার পূর্বে কোন্ প্রশ্নগুলি আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহা আমার নিকট হইতে জানিয়া লইত। আমি যাহা জানিতাম, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বলিয়া দিতাম। কিন্তু যদি পরীক্ষায় তাহার ভিতর হইতে কিছু না আসিত ত তাহারা আমায় টিটকারী দিতে ছাড়িত না। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিত যে, আমি তাহাদের ভুল বলিয়া দিয়াছি নিজের সুবিধার জন্য, তাহারা 'ফেল' করিলে আমি শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে বাহবা লইব বলিয়া।

আমি কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহা সহ্য করিতাম। আবার যখন আমার অনুমান সত্যে পরিণত হইত, তখন সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া বলিত, মাইরি, ভাগ্যিস্ তুই বলে দিয়েছিলি, আমি একেবারে ছাঁকা বই থেকে মুখস্থ মেরে দিয়েছি।

ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হয়ত তাহারা কেহ এক পয়সার বিস্কুট কিংবা এক পয়সার 'অবাক জলপান' কিনিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিত, আমি সাদরে তাহাও গ্রহণ করিতাম। এমনি যখন ক্লাসে আমার অবস্থা, তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একদিন হেডপণ্ডিত মশায় চেয়ারে বসিয়া পড়াইতে পড়াইতে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখা গেল তাঁহার দীর্ঘ শিখাটি চেয়ারের মাথার সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি যত টানেন, শিখাটিও তত চেয়ারের সঙ্গে জড়াইয়া যায়। কাঁচা বেলের আঠা কে চেয়ারে লাগাইয়া রাখিয়াছিল, তাই কিছুক্ষণ টানাটানি করিবার পর তাহা খুলিয়া গেল। পণ্ডিতমশায় ইহাতে কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ হেডমাস্টার মশায়কে ডাকিয়া আনিলেন।

হেডমাস্টার মশায় একটা বেত হাতে করিয়া ক্লাসে আসিলেন এবং কে ইহা করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকটি ছাত্রই বলিল, বেলের আঠা কেমন করিয়া সেখানে আসিল তাহারা কেহ জানে না।

অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম ঘণ্টায় সংস্কৃত পড়ানো হইত। দুই একটি ছেলে ইহাও বলিতে ছাড়িল না যে, হয়ত আগের দিন বাহির হইতে কেহ আসিয়া সেখানে

উহা লাগাইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদের পক্ষে ইহা জানা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

শেষে হেডমাস্টারমশায় আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, আলোক, তুমি সচ্চরিত্র ও স্কুলের আদর্শ ছেলে—সমস্ত স্কুল তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে—তোমার উপর সকলের অগাধ বিশ্বাস। আমি জানি, তুমি অন্তত আমার আছে মিথ্যে কথা বলবে না। কার কাজ এটা বল তো বাবা?

আমি জানিতাম, কিন্তু হেডমাস্টার মশায়ের এইরূপ আবেদনের পরও কি করিয়া তাহা গোপন করিব ভাবিয়া না পাইয়া বলিলাম, স্যার, সহপাঠীদের মধ্যে যদি কেউ করেই থাকে ত আমার কি বলা উচিত তার নাম? আপনিও ত একদিন ছাত্র ছিলেন?

হেডমাস্টার মশায়ও যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন। তাই বার দুই মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কিন্তু কাজটা যে কতদূর গর্হিত, তা ত তুমি বুঝতেই পারছো। কাজেই ভবিষ্যতে এই ব্যাপার যাতে আর না হয়, তাও ত তোমার দেখা কর্তব্য। যে ছাত্রেরা শিক্ষকদের অপমান করে, তাদের সমর্থন করা তোমার মত আদর্শচরিত্র ছেলের পক্ষে কখনও উচিত নয়।

ইহার পর আমি আর নামটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হেডমাস্টার মশায় তাহাকে পঁচিশ ঘা বেত মারিলেন স্কুলের সমস্ত ছেলের সামনে।

বলা বাহুল্য, ক্লাসের ছেলেদের কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক, শয়তান—এই নামে অভিহিত হইলাম। কিন্তু কি করিব, তাহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইল। সহপাঠীদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে ঠিক কিরূপ ছিল, তাহা এক কথায় বলা বড় শক্ত। মোট কথা, প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু মেলামেশা করা দরকার, ঠিক ততটুকু ক্লাসের ছেলেরা আমার সঙ্গে মিশিত—তাহার চেয়ে বেশি উভয়পক্ষের কাহারও প্রয়োজন হইত না। ইহার সব চেয়ে বড় কারণ বোধ হয় আমার তরফ হইতে যথেষ্ট আগ্রহের অভাব। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাদের খেলাধূলা, ইয়ারকি, ঠাট্টা, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার সমস্তই আমার নিকট অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত। তবুও তাহারা বহুবার আমায় তাহাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। আমার মন তাহাদের মধ্যে যেন হাঁপাইয়া উঠিত।

আমি একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতাম মাঠে ঘাটে পথে, কখনো বা কোন নির্জন স্থানে বসিয়া বই পড়িতাম। ইহাতেই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাইতাম।

একদিন একলা একটি মাঠের ধারে বসিয়াছিলাম। আমার হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু মনটা ছিল আকাশের গায়ে উড়িয়া-যাওয়া বলাকাশ্রেণীর দিকে। এমন সময় পিছন দিক হইতে ছুটিতে ছুটিতে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে আসিয়া আমায় বলিল, এই আলোক, শিগ্‌গির পালা এখান থেকে, তোকে আজ ক্লাসের ছেলেরা মারবে বলে ঠিক করেছে।

ছেলেটির নাম কমল। ভীরু ও শীর্ণ চেহারা। গায়ের রঙ ফরসা, দেহের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চোখ দুইটি—উজ্জ্বল ও ভাবময়।

আমি বলিলাম, কেন মারবে কমল ?

সে বলিল, তুই হেবোর নাম কেন বলে দিতে গেলি হেডমাস্টারের কাছে ? তাই ত ওর দলের ছেলেরা রেগে গেছে।

বলিলাম, মাস্টারদের অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। শিক্ষকরা গুরু, তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা না করলে যে লেখাপড়া হয় না। তার জন্যে যদি মার খেতে হয় তাতেও রাজী !

কমল বলিল, আরে মারবে কে ? এখন ত পালা, তারপর কাল হেডমাস্টারকে বলে দিলেই সব জব্দ হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া আমায় টানিতে টানিতে ভিন্ন পথ দিয়া বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু দরজার কাছে পা দিতেই আমার নজরে পড়িল দূরে দুইটি ছেলে আমাদের দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। উহারা যে হেবোর দলের তাহাও চিনিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, এই কমল, তোকে যদি ওরা মারে !

সে বলিল, আমি বনের ভেতর দিয়ে লম্বা এক ছুট দেবো। আমার সঙ্গে ওদের কেউ ছুটতে পারবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়া শুনিলাম কমলকে হেবোর দলের ছেলেরা খুব প্রহার করিয়াছে। আমি মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলাম। আহা, আমার জন্য বেচারী মার খাইল। কমলকে চুপি চুপি ডাকিয়া কহিলাম, ভাই আমার জন্যে মিছিমিছি তুই মার খেলি—আমায় মাপ কর।

সে হাসিয়া বলিল, দূর বোকা—তুই কি ভেবেছিস আমার লেগেছে ? আমিও এমন কামড়ে দিয়েছি ফণীর হাতে যে সে বাপ বাপ বলে ছুট দিয়েছে। আর এই দ্যাখ তার নতুন কপিং পেন্সিলটা পড়ে গিয়েছিল দেখতে পায় নি। যেমন মেরেছে, আমি কিছুতেই এটা ফিরিয়ে দেবো না।

সেই দিন টিফিনের সময় হেডমাস্টার মহাশয়কে গিয়া আমরা দুইজনে সব কথা বলিয়া দিলাম। তিনি হেবোকে ডাকিয়া কি বলিয়াছিলেন জানি না, তবে আমাদের পিছনে আর তাহারা কখনো লাগে নাই।

এই ঝগড়াকে উপলক্ষ্য করিয়া কমলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হইল। কমল যাহাদের সঙ্গে খেলাধুলা করিত তাহাদের অধিকাংশই হেবোর দলভুক্ত। তাই স্কুল হইতে ফিরিয়া বিকালটা সে আমারই সঙ্গে কাটাইত। আমরা দুইজনে একসঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তখন এই একদিন দামোদরের বাঁধ পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম। দামোদর নদ সেখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। কোন কোন দিন দুইজনে মাঠে বসিয়া গল্প করিতাম। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য বই কমল একেবারে পড়ে নাই। আমার মুখ হইতে নানা দেশ বিদেশের গল্প শুনিয়া সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইত। তাহার শিখিবার আগ্রহ ছিল। আমি যখন গল্প

বলিতাম সে হাঁ করিয়া আমার মুখের কথা যেন গিলিত। গল্প শেষ হইলে কিছুক্ষণ সে আর কথা কহিতে পারিত না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। বোধ হয় ভাবিত তাহার চেয়ে কত বেশি আমি জানি। তাই কখন যে তাহার মনের কোণে আমার জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা হইয়া গিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুধু গল্প শুনিতে শুনিতে এক একদিন বিস্ফারিত নেত্রে সে আমায় জিজ্ঞাসা করিত, আলোক, তুই এত শিখলি কি করে ভাই?

আমি যখন বলিতাম, শুধু লাইব্রেরীর বই পড়িয়া, সে আরো বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা আমি যদি পড়ি তাহলে আমিও কি শিখতে পারবো?

নিশ্চয়ই।

কি বই পড়বো ভাই?

আমি তাহাকে বইয়ের নাম বলিয়া দিতাম। সে স্কুলের লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়িত। এইভাবে তাহার মনের মধ্যে বাহিরের বই পড়িবার আগ্রহ যত বাড়িতে লাগিল তত সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিত লাগিল। আমিও মন খুলিয়া গল্প করিবার একজন সঙ্গী পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম।

কিন্তু এটুকু সুখও আমার অদৃষ্টে বেশি দিন সহ্য হইল না। একদিন সকালে একখানি বই কমলকে দিতে গিয়া এক বিপর্যয় ঘটিল। বইখানি গল্পের—আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাহাকে পড়াইতে না পারা পর্যন্ত যেন মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছিল না। আমরা দুইজনে যখন কোন গল্প লইয়া আলোচনা করিতাম তখন আমার মনে এত আনন্দ হইত যে কি বলিব। তাই বইখানি লইয়া আমি তৎক্ষণাৎ কমলদের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং বাহির হইতে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ইতিপূর্বে আমি কোনদিন তাহাদের বাড়ি যাই নাই। কঞ্চি ও গাছের ডালপালার বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল কমলদের বাড়ি। কিন্তু প্রথমবার ডাকেতে আমি তাহার সাড়া পাইলাম না। দ্বিতীয়বার আবার যেমন ডাকিয়াছি অমনি ভিতর হইতে তাহার মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কে রে দুষ্টু ছেলে, লেখাপড়ার নাম নেই, সকালবেলা কমলকে ডাকতে এসেছে?

ইহা শুনিয়া আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পাছে কেহ আমায় দেখিতে পায় এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি সামনের আমবাগানটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম তারপর চুপি চুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আমার নিজের বই লইয়া বসিলাম। তখন ভূতো ও তাহার অন্যান্য ভাই-বোনেরা সবাই পড়িতেছিল। আমার মনে হইল, সত্যই ত, আমি কমলকে ডাকিয়া অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু বই খুলিয়া যতবার পড়িবার চেষ্টা করি কিছুতেই মন পড়ায় যায় না। কেবলই সেই কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আমি কি সত্যই দুষ্টু ছেলে, কমলের মা কি আমার কথা তাঁহার ছেলের মুখে শোনেন নাই। আমি কোনদিন কাহারো ত কোন অনিষ্ট করি নাই—তাই কেহ আমাকে কটু কথা বলিলে মনে বড় ব্যাথা পাইতাম।

সেই দিনই মনে কি হইল, কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনো কমলকে ডাকিতে তাহার বাড়ি যাইব না।

এদিকে কমলকে ডাকিতে যাইয়া যে তাহার মায়ের নিকট ভৎর্সিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি সেকথাও আমি তাহাকে জানিতে দিই নাই। কমল আমাকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখিত—পাছে ইহাতে আমার সম্মানের হানি হয় তাই চাপিয়া গিয়াছিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে আবার এক ঘটনা ঘটিল। শুনিলাম পাশের গ্রামের হাই স্কুলে প্রাইজ, এবং সেই উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে একজন নাম-করা সাহিত্যিক আসিবেন সভাপতিত্ব করিতে। এই সাহিত্যিকটির নাম আমার এবং কমলের দুজনেরই জানা ছিল। আমরা তাঁহার রচিত অনেক বই পড়িয়াছিলাম। তাই যাঁহার রচনা পড়িয়া আমরা কত কাঁদিয়াছি, কল্পনার কত নব নব লোকে নিত্য বিচরণ করিয়াছি তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের উভয়ের মনে কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাহাকে কিরূপ দেখিতে—তিনিও আমাদেরই মত মানুষ কিনা, এই রকম আরও সব কত সম্ভব অসম্ভব কথা চিন্তা করিয়া কতদিন রাত্রে আমরা ঘুমাইতে পারি নাই।

তাই প্রাইজের দিন আমরা দুইজনে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সেই পরম বিস্ময়কর বস্তু সাহিত্যিককে দেখিবার জন্য বেলাবেলি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেদিন ছিল রবিবার, স্কুল বন্ধ। কিন্তু দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যখন আবার আমরা গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গাছে ও বনেজঙ্গলে অন্ধকার দেখিয়া কমল বলিল, ভাই আলোক, আমার বড় ভয় করছে, আমাকে একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?

অগত্যা আমি রাজী হইলাম। কিন্তু যেমন কমল বাড়ির মধ্যে পা দিয়াছে, অমনি তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল। মুখপোড়া, রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা দিতে শিখেছ—কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি? এই বলিয়া কিল চড় দুমদাম করিয়া তাহার মাথার পিঠে বসাইয়া দিলেন।

কমল চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—ও মা মরে গেলুম গো—আর আমি কখনো যাবো না—আমায় আর মেরো না গো—

কার সঙ্গে গিয়েছিলি শিগ্‌গির বল্! যত সব বদমাইস ছেলেদের সঙ্গে আজকাল মিশতে সুরু করেছো—আসুক সে শনিবার বাড়ি—তারপর তোমার হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করবো। এই বলিতে বলিতে তিনি তাহাকে আরও প্রহার করিতে লাগিলেন। কমলের বাবা কলিকাতায় মেসে থাকিয়া চাকরি করিতেন। মাসে দুইবার করিয়া বাড়ী আসিতেন।

কমল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি আলোকের সঙ্গে গিয়েছিলুম—

কেন তুই এইসব বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশিস্—তোকে না কতদিন বারণ করেছি কারুর সঙ্গে মিশবি না—বল্ আর কারুর সঙ্গে মিশবি?

না মা, আর কারুর সঙ্গে কখনো মিশবো না! এই বলিয়া কমল তখন তাহার মায়ের প্রহার হইতে নিস্তার পাইল।

পথ চলিতে চলিতে আমার কানে এই কথাগুলি সবই আসিল, আমি বদমায়েস, আমি দুষ্টু আমি কমলকে খারাপ করিয়া দিতেছি! আর কমলও তাহার কোন প্রতিবাদ করিল না। ইহা ভাবিয়া মনে একটু দুঃখ হইল। কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী কষ্ট হইল কমলের জন্য। বাস্তবিক কমলের মা কি ভীষণ রাগী! বেচারী কমল আমারই জন্য কত মার খাইল! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কমলের সঙ্গে মিশিব না।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে ঢুকিতেছি এমন সময় শুনিলাম, জ্যাঠাইমা ভূতোর চুলের মুঠি ধরিয়া কিল চড় মারিতেছেন, আর চেঁচাইয়া বলিতেছেন, আর যাবি ম্যাচ খেলতে? এত রাত পর্যন্ত বাইরে কাটানো—মুখপোড়া, পড়াশুনা শিখে কি আমার মাথা কিনবি—আমি আর ক'দিন—মরবি যে নিজে—আমি ত আর দেখতে আসবো না।

অন্য দিন এমন সময় ভূতো পড়াশুনা শুরু করিয়া দেয়—আজ সে ম্যাচ খেলিতে গিয়াছিল পাশের গ্রামে, তাই এই প্রহার!

চুপি চুপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কি জানি আমারও দেরি হইয়াছে, এক্ষুনি হয়ত জ্যাঠাইমা আমাকেও দু'চার ঘা বসাইয়া দিবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ এই রকম আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করিবার পর যখন সব চুপ-চাপ হইয়া গেল এবং রান্নাঘর হইতে জ্যাঠাইমার খুন্তি নাড়িবার শব্দ আমার কানে আসিয়া পেঁাছিল, তখন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার মা বাঁচিয়া নাই বলিয়া।

সব মায়েরাই শুধু ছেলেকে প্রহার করেন ও গঞ্জনা দেন—আমার মনে এইরূপ ধারণা সেই দিন কেন জানি না বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমি চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া এইসব ভাবিতেছিলাম। এমন সময় সরলা ঝি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আমার ঘরে আলো দিতে আসিল। অন্ধকারে আমাকে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস লইয়া বলিল, এমনি করে চুপ করে বসে আছো কেন দাদাবাবু—তোমার কি পড়াশুনা নেই?

বলিলাম, আছে।

আছে ত বসে আছ কেন?

আমি আরো একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, হ্যাঁ সরলা, তোর ছেলে আছে? এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন আমার মুখ হইতে সরলা যেন আশা করে নাই, তাই সে সহসা ইহার কোন উত্তরই দিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, তুই তাকে খুব মারিস, না? হ্যাঁরে সরলা, সব মা কি তার ছেলেদের শুধু মারে?

সরলা আলোটা রাখিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। আমি ইহার কারণ উপলব্ধি করিবার পূর্বেই সে বলিল, মারবো দাদাবাবু! কোনদিন তার গায়ে হাত পর্যন্ত ছোঁয়াইনি, তবু কেন ভগবান কেড়ে নিল তাকে আমার কোল থেকে? এই বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরে শুনিয়াছিলাম সরলা একটি ছেলে লইয়া বিধবা হয় এবং সেই ছেলেটি পাঁচ বৎসর বয়সে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়।

পরের দিন স্কুলে যাইতেই কমল আসিয়া আমার পাশে বসিল। ইদানীং সে আমারই সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকিত। সেদিনও সে প্রতিদিনের অভ্যাস মত নানা রকমের কথা সোৎসাহে আমার নিকট বলিয়া যাইতে লাগিল। আমিও হুঁ-হাঁ দিয়া কোনরকমে তাহার সায় দিয়া চলিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে সহসা চুপ করিল। বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার কথা শুনিবার আর আমার আগ্রহ নাই।

ক্লাসের মধ্যে তখন আমাকে কমল সে সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না। শুধু টিফিন হইলে স্কুলের পিছনে যে বাগান ছিল তাহার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সে বলিল, আলো, তোর কি হয়েছে সত্যি করে বল্ না ভাই!

আমি প্রথমে বলিলাম, কিছুই হয় নাই। কিন্তু কমল সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া যখন বার বার আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, আমি বদমায়েস, আমার সঙ্গে মিশতে তোর মা বারণ করেছেন, আর তুইও ত তাঁকে বলেছিস্, আর মিশবি না—তাই আমি আগে থেকে নিজেই সাবধান হচ্ছি!

অভিমানে তখন আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কমলের কাছে ইহার কারণ আর গোপন রহিল না। সে বুঝিল যে কাল সন্ধ্যার ব্যাপার সমস্তই আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কোনরকম লুকোচুরি না করিয়া সে বলিল, দূর, তুই ভারি বোকা, এটা বুঝতে পারলি না যে, তখন ওই কথা না বললে মা আমায় ছাড়তো না, আরো মারতো, তাই মিছিমিছি বলেছি।

আমি বলিলাম, তা বলে তুই মিথ্যে কথা বলবি মা'র কাছে!

আরে, ওকে মিথ্যে কথা বলে নাকি? বরং মা'রই ভুল হয়েছে, অন্যে মিথ্যে করে তাঁকে যা লাগিয়েছে, মা তাই বিশ্বাস করেছেন। তুই ত সব কথা জানিস না, আমি তোকে বলিনি—পাছে তুই মনে কষ্ট পাস্ তাই।

বলিলাম, ভালই হয়েছে না জেনে।

সে বলিল, না, যখন তোর মনে এই রকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তখন শুনতেই হবে। এই বলিয়া কমল যাহা বলিল তাহার সারাংশ হইল এইরূপ: কমল কিছুদিন লাইব্রেরীর বই লইয়া এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠ্য পুস্তক সে আদৌ পড়িত না, ফলে সাপ্তাহিক পরীক্ষায় সে দুই-তিনটি বিষয়ে নম্বর

পায় কম। ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতা হোবার দলের দুইচারিটি ছেলেকে গোপনে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলে, আলোকের সঙ্গে মিশিয়া কমলের এইরূপ হইয়াছে। তাই তাহার পিতামাতার মনে আলোকের সম্বন্ধে ওইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কমল আমার সেই নীরবতা লক্ষ্য করিয়া, কেন জানি না, কয়েক মিনিট পরে নিজেই বলিয়া উঠিল, আমি তাদের মন থেকে এ ভুল ধারণা দূর করবো !

আমি বলিলাম, কি দরকার ভাই, মিছিমিছি আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে তুই আরো মার খেয়ে মরবি মায়ের কাছে। তুই কি জানিস না, তোকে কেউ মারলে আমার মনে বড় কষ্ট হয় !

কমল বলিল, যতই মা মারুক, তবু আমায় কেউ তোর কাছ থেকে সরাতে পারবে না। এই বলিয়া একটু থামিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় মৃদুস্বরে বলিল, শুধু তুই যেন আমায় ত্যাগ করিস নি ভাই !

শেষের কথাগুলি বলিবার সময় তাহার ডাগর চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিল। আমি ইহার উত্তরে কি বলিব বুঝিতে না পারিয়া শুধু তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলাম, আচ্ছা।

সেদিন এই-দুইটি কিশোরের এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া বোধ করি অন্তরীক্ষ হইতে ভগবান হাসিয়াছিলেন। তাই ইহার কয়েকদিন পরেই একটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের দুইজনের মনে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর কোনদিন জোড়া লাগে নাই। ঘটনাটি হয়ত অন্যের কাছে তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে তাহা বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

কমল সেইবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিল, আর আমি প্রথম। কমলের আনন্দ ধরে না। শুধু এই সম্মান পাইয়াছে বলিয়া নহে—ইহার দ্বারা যে, সে সকলের ভুল ভাঙাইয়া দিয়াছে তাহার জন্য। ইহার পূর্বে কোনদিন সে পরীক্ষায় কোন স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সাধারণ ছেলেদের মত বছর বছর শুধু ক্লাসে উঠিত। অবশ্য এবারে তাহার এই কৃতকার্যতার জন্য আমার কিছু হাত ছিল। আমি তাহাকে প্রয়োজনীয় অঙ্ক, শক্ত শক্ত পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়া দিতাম। আমারও মনে একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, তাহাকে পড়া-শুনায় ভাল করিয়া তুলিবই। লোকে দেখিবে, বিশেষ করিয়া কমলের বাপ-মা—যে, আমার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের ছেলে বদমায়েস হয় নাই, লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে। তাই তাহার এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমারও আনন্দ কম হয় নাই। কমলের ত ইহার জন্য আমায় কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা ছিল না।

প্রাইজের দিন আনন্দ আরও বাড়িল—যেমন আমার, তেমনি কমলের। কমল এইবার প্রথম প্রাইজ পাইবে, তাহার আনন্দ অবশ্য খুবই হইয়াছিল, কিন্তু আমার

আনন্দ ছিল তাহার চেয়েও বেশি। প্রথমত, সে আমার সাথী, দ্বিতীয়ত, তাহার এই পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে আমারই কৃতিত্ব বেশি। সকাল হইতে আমরা দুই-জনে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দেবদারু পাতা কাটিয়া আনিয়া স্কুলবাড়িকে সাজাইয়া, লাল নীল সবুজ রঙের কাগজ কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া চেন, নিশান, ফুল প্রভৃতি কত রকম কি তৈয়ারী করিয়া, স্কুলের বেঞ্চিগুলিকে হেড-মাস্টার মহাশয়ের উপদেশ মত সারিবন্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। চারটায় প্রাইজ। হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের সকাল সকাল যাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কমলের সঙ্গে কথা হইল, তিনটের সময় আমি তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব। আমি কমলের বাড়ী যাইতাম না তাহার মায়ের ভয়ে। তাহাদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটি আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া মুখে একপ্রকার 'হুইসিল' বাজাইতাম, তাহা শুনিয়া কমল চলিয়া আসিত। এইভাবে আমরা প্রত্যহ মিলিত হইয়া একত্রে স্কুলে যাইতাম।

সেদিন আর কোন কাজে মন বসিতেছিল না। বার বার কেবল জ্যাঠাইমার ঘরে ঘড়ি দেখিতে যাইতেছিলাম—কখন তিনটা বাজিবে! আমার অতি-ব্যস্ততা দেখিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন, বলি—তুই ত একলা প্রাইজ পাবি না, আরও অনেক ছেলে পাবে, তবে এত ব্যস্ত কিসের? এখন একটু ঘুমুগে যা, দেরি আছে অনেক, ভূতোও ত যাবে স্কুলে।

আমার চোখে যে তখন ঘুম আসিতেছিল না তাহা আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইব ভাবিয়া পাইলাম না। প্রাইজের দিনে এমন একটা আনন্দ হয় মনে যে, তাহা চাপিয়া রাখা শক্ত। তাই অতি কষ্টে সেই দুই ঘণ্টা সময় কাটাইয়া ফরসা জামা-কাপড় পরিয়া আমি জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি ঘুমাইতে-ছিলেন, বারতিনেক ডাকিবার পর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার দুই পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেই তিনি 'রাজা হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তারপর আবার বিছানায় দেহ এলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, হ্যাঁরে, প্রাইজ কি পালিয়ে যাচ্ছে যে, এই দুপুর থেকে সেখানে গিয়ে হত্যে দিতে হবে?

আমি বলিলাম, দুপুর কি, তিনটেই ত বেজেছে। আর এক ঘণ্টা সময় মোটে আছে।

তিনি বলিলেন, তা এক ঘণ্টা সময়টা কি কম নাকি?

বলিলাম, হেডমাস্টার মশাই যে তিনটের সময় যেতে বলে দিয়েছেন!

হেডমাস্টারের আর কি, খেয়ে দেয়ে দিব্যি ঘুম মারছেন, আর এই কচি ছেলে-গুলোকে দিয়ে যত খাটিয়ে নিচ্ছেন। তা যাও, আবার দেরি হলে হয়ত তাঁর রাগ হবে!

জ্যাঠাইমার অনুমতি পাইয়া যেন বাঁচিলাম। তারপর সেখান হইতে

জ্যাঠামশায়ের ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সোজা কমলের বাড়ীর দিকে চলিলাম।

কিন্তু কমল কই? তাহার ত দেখা নাই! গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বার বার মুখে সেই সংকেতধ্বনি করা সত্ত্বেও আমি তাহার কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না। তবে কি সে আমি আসিবার পূর্বেই চলিয়া গেল স্কুলে? এই মনে করিয়া তখনই ধীরে ধীরে তাহার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম, সে আছে কিনা দেখিবার জন্য।

কঞ্চির বেড়া দেওয়া ছিল তাহাদের বাড়ির চারিদিকে। তাহারই ভিতর দিয়া চুপি চুপি একবার কমলের সন্ধান লইয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, কমল বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া আছে আর তাহার মা তাহাকে সাজাইয়া দিতেছেন। তিনি প্রথমে তাহাকে জামা-কাপড় পরাইয়া দিলেন, তারপর তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিলেন, তারপর জুতোজোড়া আনিয়া তাহার পায়ে পরাইয়া দিলেন। শেষে একটা এসেন্সের শিশি খুলিয়া তাহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

কমলের মন তখন স্কুলে যাইবার জন্য বোধ হয় ছটফট করিতেছিল। তাই সে বলিল, হয়েছে মা, আর নয়।

তিনি বলিলেন, আর একটু দাঁড়া বাবা। এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া কমলের মুখটা একবার মুছাইয়া দিলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম এখানে ওখানে লাগিয়াছিল। তারপর আর একবার চিরুনি দিয়া তাহার চুলটা আঁচড়াইতে লাগিলেন। ছেলেকে সাজাইয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছিল না।

আর নয় মা, হয়েছে। এই বলিয়া কমল মায়ের হাতটা মাথার উপর হইতে সরাইয়া দিয়া যেমন তাঁহাকে প্রণাম করিল, অমনি তিনি ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার দুই গালে দুইটি চুম্বন করিলেন।

আমি এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখিতেছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। সহসা মনে হইল যেন পৃথিবীটা একটা প্রবল ভূমিকম্পে দুলিয়া উঠিল। আমার চারিদিকের গাছপালা, আকাশ, বাতাস, মাটি সব যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমি টলিতে টলিতে তখন সম্মুখে যে বিরাট বাগান ছিল, তাহারই মধ্যে ঢুকিয়া একটি গাছের তলায় বসিয়া পড়িলাম। কমলকে ডাকিবার কথা মনে রহিল না, প্রাইজের কথাও মনে পড়িল না। শুধু কি যেন নাই, কিসের একটা হাহাকার আমার সমস্ত অন্তরকে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া দিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত বেদনায় আমায় মূর্ছিত করিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ যে এইভাবে ছিলাম মনে নাই। তবে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যখন স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন স্কুলের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য! প্রাইজ দেওয়া শুরু হইয়া গিয়াছে। আমি জনতার পিছনে গিয়া এক জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। এমন সময় কোথা হইতে কমল ছুটিয়া আসিয়া বলিল, এই যে আলো, কোথায় ছিলি ভাই এতক্ষণ? আমি তোর বাড়িতে

গিয়ে খুঁজে এলুম—ভুতো বললে, অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে ! তারপর স্কুলে এসে এতক্ষণ ধরে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু কোথাও তোকে দেখতে পেলুম না। কোথায় গিয়েছিলি ভাই ?

বুঝিলাম, আমি যে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম, তাহা সে শুনিতে পায় নাই। কোথায় ছিলাম, কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিলাম, একটু দেরি হয়ে গেল !

আনন্দে কমল তখন ঝলমল করিতেছিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে যেন একটু মুষড়াইয়া গেল, তারপর বলিল, চল্—তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, তোকে যে পণ্ডিতমশায় খুঁজছেন ! এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া একরকম, টানিতে টানিতে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, এই যে স্যার, আলো এসেছে !

হেডপণ্ডিতমশায় বলিলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি—এক্ষুনি যে তোদের নাম ডাকা হবে, সব এক জায়গায় এসে দাঁড়া।

আমি দাঁড়াইলাম তাঁহার নির্দেশমত স্থানে।

একে একে তিনবার আমার নাম ডাকা হইল। তিনখানি প্রাইজ আমি একসঙ্গে পাইলাম—লেখাপড়ার জন্য সৎচরিত্রের জন্য এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির জন্য। যন্ত্রচালিতের মত আমি সেই প্রাইজগুলি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার নিজের জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তারপর কত বক্তৃতা, কত গানবাজনা হইল —কিছুই আমার আর ভাল লাগিল না। আমার মন তখন কোথায়, কি যেন ভাবিতেছিল, কে জানে ! তাই প্রাইজ শেষ হইবার পূর্বেই আমি এক সময় সেখান হইতে চুপি চুপি বাড়িতে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, তবে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল পশ্চিমের আকাশে ও গাছপালার মাথায়। আমি চুপ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কি একটা হাতে করিয়া ভুতো ঘরে ঢুকিল। তারপর কণ্ঠস্বর নিম্নতর করিয়া কহিল, এই আলো, তুই বড্ড বোকা, খাবার না খেয়েই চলে এলি কেন ?

ইহার উত্তরে তাহাকে কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিলাম, ভুলে গেছি ভাই।

ভুতো বলিল, তুই ভুলে গেলি বলে আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছিস—এই দ্যাখ্ আমি তোর খাবারটা চেয়ে এনেছি—এই নে, খা—

বলিলাম, তুই খা ভাই, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

ভুতো আবার বলিল, অন্তত একটা খা ভাই। জিলিপীটা ভারি সুন্দর করেছে—

বলিলাম, না।

তখন সে আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সেই খাবারগুলি উদরসাৎ করিয়া বলিল, জানিস আলো, এইটে নিয়ে আমার চারবার খাওয়া হলো ? ইস্কুলে আমি

তিনবার নিয়েছি—কেউ ধরতে পারেনি।

এই বলিয়া আমার প্রাইজ তিনটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল, ওঃ এবার অনেকগুলো বই পেয়েছিস ত! দে মাকে দেখিয়ে আনি।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে ভিতরে গিয়া জ্যাঠাইমাকে বলিল, মা, এই দ্যাখো, আলো তিনটে প্রইজ পেয়েছে!

ইহার উত্তর তখনই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল, মুখপোড়া, তোর লজ্জা করে না এগুলো হাতে ক'রে আনতে? ও ত তিনটে পেয়েছে, তুই কি পেলি?

ভুতো তাড়াতাড়ি বইগুলি আনিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে আর কিছু না বলিয়া তেমনি ভাবে চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাঠামশায়ের কণ্ঠস্বর পাইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তিনি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, দেখি কি বই পেয়েছিস্!

আমি বইগুলি তাঁহার হাতে দিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, এখনো ফিতে খুলিসনি কেন?

এই 'কেন'র জবাব দিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না, আর কেন-ই বা ছিল না তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর বোধ করি কেহ জানিত না। তাই কিছু না বলিয়া তেমনি ভাবেই চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার পূর্বেও আরো দুইবার প্রাইজ পাইয়াছিলাম কিন্তু এরূপ কখনো হয় নাই। জ্যাঠামশায়ও আমায় নীরব থাকিতে দেখিয়া আর কিছু প্রশ্ন করিলেন না। বইগুলি হাতে করিয়া তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

৮

দুই দিন ছুটির পর স্কুল খুলিল। প্রাইজ উপলক্ষে এই ছুটি। কমল আসিয়া যথারীতি আবার আমার পাশে বসিল। তারপর আমি কি কি বই পাইয়াছি, সেগুলি পড়িয়াছি কিনা এবং তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি সব চেয়ে ভাল ইত্যাদি বহু প্রশ্ন একসঙ্গে মুখস্থ বলিবার মতো না থামিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। আমি বইগুলির শুধু নাম বলিলাম। কিন্তু সেগুলির একখানিও এখনও পড়া হয় নাই শুনিয়া কমল বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এই দুদিন তবে কি করলি?

আমি কিছুই করি নাই এবং কেন যে করিতে পারি নাই সে কথা তাহাকে বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

কমল কিন্তু সোৎসাহে বলিয়া চলিল, আমি এর মধ্যে দু'খানা বই শেষ করে ফেলেছি, কি সুন্দর বই ভাই! তোকে কালকে পড়তে দেবো'খন। আজকে মা পড়ছেন কিনা!

মা পড়ছেন! কথাটা কানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের সেই দৃশ্যটি আবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল কমলের প্রাইজ পাওয়া সত্যই সার্থক

হইয়াছে। আমার প্রাইজ দেখিয়া জ্যাঠাইমা যাহা বলিয়াছিলেন ভূতোকে, সেই কথাটিও সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আমি আর চিন্তা করিতে পারিলাম না।

কমল নিজের কথা শেষ করিবার পরও আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কি রে, আমার বই পড়বি না?

আমার যেন চমক ভাঙিল। বলিলাম, নিশ্চয়ই। তুই দিলেই পড়বো।

ইহা শুনিয়া কমল যেন অধিকতর উল্লাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এই স্ফূর্তি দেখিয়া আমার বুকের মাঝে কোথায় যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। মনে হইল তাহার এই আনন্দ উৎসবে যেন আমার প্রবেশাধিকার নাই। আমার ও কমলের মাঝে যেন কিসের একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, যাহা বাহির হইতে দেখা যায় না কিন্তু অন্তরের দিকে চাহিলে ধরা পড়ে।

পরের দিনে কমল তাহার বই দুখানি আমাকে দিয়া বলিল, তোর বইগুলো পড়া হলে আমায় দিস্ কিন্তু!

বলিলাম, কালই তোকে এনে দেবো—তোর পড়া হয়ে গেলে তারপর আমি পড়বো।

দিনচারেক পরে কমল স্কুলে আসিয়া বলিল, জানিস আলো, মার খুব ভাল লেগেছে তোর বইগুলো! মা বল্লেন, আমার চেয়েও তুই ভাল বই পেয়েছিল!

ইহা শুনিয়া আমার বুকের ভিতরে নিমেষে যেন একটা কিসের আলোড়ন উপস্থিত হইল। কমলের মা তাহা হইলে আমার বই পড়িয়াছেন! তখন সাগ্রহে কমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যি?

কমল বলিল, মাইরি বলছি। কাল রাত্তির দেড়টা পর্যন্ত জেগে মা পড়েছেন তোর বই!

ইহা শুনিয়া আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। বলিলাম, আর কিছু বলেন নি?

সে বলিল, বলেছেন তোকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে—আজ যাবি ভাই?

বাড়ি যাইবার কথা শুনিয়া প্রথমে মন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণে কি মনে করিয়া আবার দমিয়া গেল। কমল আমার মুখ দেখিয়াই হয়ত তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। তাই মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া আবার বলিল, যাবি না ভাই আলো? মা তোকে একবার দেখতে চান।

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাবো।

সেই দিন ছুটির পর বাড়িতে বই রাখিয়া আমি কমলের সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। বাড়ির ভিতরে পা দিবার পূর্বেই কমল চীৎকার করিয়া উঠিল, এই দ্যাখো মা, আলোক এসেছে!

তিনি বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে

দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সেদিন কমলকে সাজাইয়া দিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার শরীরের মধ্যে কেমন একটা পুলকানুভূতি হইল। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া শুধু 'বেঁচে থাকো', 'রাজা হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহা শুনিয়া সহসা আমার সমস্ত আগ্রহ যেন নিভিয়া গেল। আমার মন যেন গোপনে তাঁহার কাছে আরো কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাই তাহার বিফলতায় তৎক্ষণাৎ মুষড়াইয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন, তোমায় দেখে ভারি আনন্দ হলো বাবা আজ—আমার কমল ত তোমার নাম করতেই অজ্ঞান! আমি জানি তোমার জন্যেই ও এবারে ভাল হয়ে ক্লাসে উঠেছে, প্রাইজ পেয়েছে।

এই কথাগুলি তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আমি খুশি হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু কি সেই কথাগুলি শুনিয়া খুশি হইবার জন্য আমি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম? তাঁহার কি আর কিছু আমায় বলিবার ছিল না? বিদায় লইবার পূর্বে হঠাৎ যেন তিনি সে সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। তাই ছেলের কথা বলিতে বলিতে এক ফাঁকে আমার কে আছে, কি বৃত্তান্ত, জ্যাঠাইমা কিরূপ ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন। তারপর আমি যখন বলিলাম, জ্যাঠাইমা খুব ভাল ব্যবহার করেন, তখন তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আহা মা নেই যার কেউ নেই তার! এই বলিয়া আমার দুর্ভাগ্যের জন্য মুখে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেদিনের মতো বিদায় লইলাম। শুধু আসিবার সময় তিনি বলিলেন, আবার এসো বাবা, তোমাকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়—তুমি বড় ভাল ছেলে!

অবশ্য ইহার পর হইতে আমি মধ্যে মধ্যে কমলের বাড়ি যাইতাম। কিন্তু যতবার গিয়েছি ততবার সেই এক কথা তাহার মায়ের মুখে শুনিতাম—আমি ভাল ছেলে, আমায় দেখিলে তাঁহার খুব আনন্দ হয়, তাঁহার ছেলে আমায় খুব ভালবাসে, আমি যেন কমলের লেখাপড়ার দিকে একটু নজর রাখি এবং আমার মা নেই বলিয়া পৃথিবীতে আমি সব চেয়ে দুঃখী! এক একদিন আমার দুঃখ কল্পনা করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর করুণ হইতে করুণতর হইয়া উঠিত। এমন কি তিনি জোর করিয়া দুই এক ফোঁটা জলও আমার সামনে চোখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেন। আমার ইহা একেবারে ভাল লাগিত না। মুখে না বলিয়া কার্যত যদি তিনি আমার দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত সেদিন আমার মন বেশি সান্ত্বনা লাভ করিত!

এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার কাছে এইরকম কিছু হয়ত আমি তখন প্রত্যাশা করিতাম। তাই তাঁহার নিকট হইতে তাহা না পাইয়া তীব্র হতাশা লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। নিজের ছেলের চিন্তায় তিনি দিনরাত এইরূপ বিভোর

হইয়া থাকিতেন যে পরের ছেলের কথা মনে করিবার মত অবসর তাঁহার মিলিত না। এইভাবে কমলের প্রতি তাঁহার স্নেহ যত বেশি করিয়া আমার চোখে ধরা পড়িতে লাগিল ততই যেন আমার মন হইতে কমল দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ইহা বুঝিতে বোধ করি কমলের বেশি বিলম্ব হয় নাই।

ইহার পর একদিন মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলাম। কমলও আমার পাশে বসিয়া ছিল। দুজনেই নীরব, কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না, যেন আমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ ব্যবধান অপরিচয়ের! কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর হঠাৎ এক সময় কমল বলিয়া উঠিল, আলোক, একটা কথা আজ সত্যি করে বলবি ভাই?

বলিলাম, কি কথা—বল্?

সে বলিল, আজকাল তুই দিনরাত যেন কি ভাবিস—বিশেষ করে আমি যতক্ষণ তোর কাছে থাকি। তাছাড়া আগেকার মত তুই বইও পড়িস না, আর আমাকে বই পড়তেও দিস্ না। কি হয়েছে তোর, বল না ভাই।

আমি শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কমল আবার অনুনয় করিল, বল্ না ভাই?

আমি আকাশের দিকে তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিলাম, জানি না।

ইহার পরে আবার একদিন কমলের মা আমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা আলোক, কমলের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া হয়েছে?

বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া কেমন করিয়া মানুষে করে তাহা আমি আজও ভাবিয়া পাই না। তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, ঝগড়া? কৈ, না!

তবে কমল অমন করে থাকে কেন দিনরাত? তোর কথা জিজ্ঞেস করলে ভাল করে উত্তর দেয় না, অথচ তোরা একসঙ্গে পড়িস, একসঙ্গে বেড়াস—কি হয়েছে, আমার কাছে লুকোসনি বাবা—আমি তোর মা হই, বল্?

মা হই! কথাটি কানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। সহসা চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জল সামলাইয়া লইয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম। মনে হইল বলি, ইহার জন্য তুমিই ত দায়ী! যদি সত্য সত্যই তুমি আমার মা হইতে পারিতে তাহা হইলে হয়ত আমি কমলের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারিতাম না। কিন্তু মুখ দিয়া কিছুতেই কথাটা উচ্চারণ হইল না, শুধু বারকয়েক ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, বল্ বাবা, আমার কাছে লুকোসনি!

আমি আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শুধু বলিলাম, জানি না।

ইহা হইতে তিনি কি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, তবে তিনি আর আমাকে ডাকেন নাই, আমিও আর তাঁহার নিকট যাই নাই।

আর কমল? তাহার কথা না বলাই ভালো! মন যে দিতে জানে, সে সহজেই বুঝিতে পারে অন্যের মনে তাহার স্থান কোথায়। তাই সেও ধীরে ধীরে আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

আমার অবস্থা তখন হইল সকলের চেয়ে খারাপ। সকলের মধ্যে থাকিয়াও যেন আমি একা—যেমন বাড়িতে তেমনি স্কুলে। পৃথিবীর সঙ্গী মেলে অনেক কিন্তু বহু সাধনার ফলে একটি বন্ধু পাওয়া যায়। অন্তরে অন্তরে যে মিলন তাহা কদাচিৎ সম্ভব হয়, সেইজন্য বুঝি সত্যিকারের বন্ধু জগতে এত দুর্লভ।

যাহা হউক এমনিভাবে যখন আমার দিন কাটিতেছিল তখন একদিন হঠাৎ জ্যাঠামশায় আসিয়া বলিলেন, আলোক, আমার এক বন্ধু তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—খুব বড়লোক আর লেখাপড়াও জানে খুব—আমাদের গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান সে। তার ছেলে মধু নাকি তোদের সঙ্গে পড়ে—এবার সেকেণ্ড হয়েছে—চিনিস তাকে?

বলিলাম, হ্যাঁ।

আমরা সকলে তখন রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছিলাম। জ্যাঠামশায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিতেছিলেন। জ্যাঠাইমা ভুতোকে ডাল দিতে দিতে একবার শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুধু কি ওকে যেতে বলেছে?

হ্যাঁ বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় ঘর ভরিয়া গেল। প্রশ্ন এবং জবাব দুই-ই নিতান্ত সামান্য; কিন্তু মনে হইল ইহারই ভিতর দিয়া যেন জ্যাঠাইমার অন্তরে এক নিদারুন আঘাত লাগিল। তাই জ্যাঠাইমার ছেলে-মেয়েগুলি হঠাৎ ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার নীরবে তাকাইল এবং একসঙ্গে আবার সকলে আমার মুখের দিকে চাহিল। যেন ইহার জন্য সমস্ত অপরাধ আমার।

জ্যাঠামশায় আর কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্যাঠাইমাও গম্ভীর মুখে আমাদের সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে ভোজনপর্ব শেষ করিয়া আমি যখন ঘাটে আঁচাইতে গেলাম তখন ভুতো আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, ওরা খুব বড়লোক—তোকে খুব খাওয়াবে দেখিস্। আমার জন্যে ভাই পকেটে ক'রে কিছু নিয়ে আসিস্!

আমি কোন কথা না বলিয়া নীরবে একবার তার মুখের দিকে তাকাইলাম। আমার চাহনি দেখিয়া ভুতোর মনে কি হইল বলিতে পারি না, সে আমায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, রাগ করলি?

৯

ভাবিয়াছিলাম একদিন সময় করিয়া মধুদের বাড়ি যাইব, কিন্তু বাজার হইতে ফিরিবার পথে পরদিন সকালে হঠাৎ মধুর বাবার সঙ্গে আমার দেখা হইয়া গেল। তিনি সাহেবী পোশাক পরিয়া ছড়ি হাতে করিয়া "মর্নিং ওয়াক" করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার মুখে একটি লম্বা চুরুট জ্বলিতেছিল। সহসা তিনি আমায় ডাকিয়া বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোন!

আমি কাছে যাইয়া দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন, তুমি ফার্স্ট হয়েছ? আমার ছেলে মধুর সঙ্গে তুমি পড়ো?

বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

'ভেরি গুড্"—খাসা ছেলে তুমি। এই বলিয়া মুখে আমার প্রশংসা করিয়া এবং রবিবার তাঁহার সঙ্গে একবার বাড়িতে দেখা করিতে বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কাহারো বাড়িতে যাওয়া আমি পছন্দ করিতাম না। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের আদেশ ও তাহার উপর তাঁহার বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিবার মত সাহস আমার ছিল না বলিয়া পরের দিন স্কুলে গিয়া মধুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের বাড়িতে কে কে আছে।

মধু আমার মুখ হইতে এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় আমি অনুরোধ করিতে সে বলিল, তাহার মা, বাবা, চারিটি ছোট ছোট ভাই বোন এবং একজন মামা থাকেন—তিনি এবার বি. এ পরীক্ষা দিবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার আমি মধুকে প্রশ্ন করিলাম, হ্যাঁ-রে মধু, তোর মা তোকে খুব মারেন?

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, ধ্যেৎ, মারবে কেন?

আমি বলিলাম, তবে?

ঈষৎ সলজ্জ কণ্ঠে সে বলিল, খুব ভালবাসে।

ভালবাসে! আমার বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কমলের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তখনি একবার মনে মনে স্থির করিলাম, না, কিছুতেই তাহাদের বাড়ি যাইব না। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার আমার মনের অতি নিভৃত কোণে ছোট্ট একটি বাসনা কোথা হইতে সহসা উঁকি মারিয়াই লুকাইয়া পড়িল। মনে হইল, আচ্ছা মধুকে তাহার মা কিরূপ ভালবাসেন একবার দেখিলে কেমন হয়!

অবশেষে সেই ইচ্ছারই জয় হইল। আমি রবিবার সকালে মধুদের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম।

আমাকে দেখিয়া মধুর বাবা একেবারে চেঁচাইয়া উঠিলেন, ওগো শুনচো এইদিকে এসো, আলোক এসেছে।

মধুর মা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আমি ঘাড় হেঁট করিলাম।

ইহার পর তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে আমায় মুখে খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর লেখাপড়ার বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে হঠাৎ মধুর বাবা একটা খাতা বাহির করিলেন। তাহাতে একটা অঙ্ক লেখা ছিল, তিনি সেইটা আমাকে কষিতে দিয়া বলিলেন, আমি আর মধুর মামা, দু'জনেই অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই উত্তরমালার সঙ্গে মিলছে না। তুমি একবার দেখ তো বাবা? আমার মনে হয় উত্তরমালাতেই ভুল আছে।

আমি সবিনয়ে বলিলাম, তাই হবে—তা না হ'লে আপনারা দু'জনে যখন এতবার ক'রে কষাতেও অঙ্কটা মিললো না, তখন আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তবে আমাকে কষতে বলে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

বলা বাহুল্য আমার এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই খুব খুশি হইলেন, তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিলেন।

অঙ্কটি খুবই সোজা—তবে একটু ঘুরাইয়া বলা ছিল—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি উহা করিয়া ফেলিলাম। তাঁহারা তখন বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, উত্তরমালার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। আর যায় কোথায়! আমাকে যেন তাঁহারা মাথায় করিয়া নাচিতে লাগিলেন। মধুর মা জল-খাবার না খাওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না।

ইহাই হইল আমাদের আলাপের সূত্রপাত। ইহার পর হইতে আমি মধ্যে মধ্যে মধুদের বাড়ি যাইতাম। মধুও তখন হইতে ক্লাসে আমার পাশে আসিয়া বসিত এবং তাহার সঙ্গে লেখাপড়া লইয়া নানা আলোচনা হইত। তাহার মামা ও বাবার নিকট যাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না, আমার কাছে পরের দিন আসিয়া সে বুঝিয়া লইত। এমনি ভাবে অল্পদিনের মধ্যে মধুর সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য বাড়িয়া উঠিল। তাহার মাকেও আমার বেশ লাগিত। তিনি খুব সস্নেহ ব্যবহার করিতেন আমার সঙ্গে।

ইহার পর একসময় অকস্মাৎ চার-পাঁচদিন মধু ক্লাসে আসিল না। তাহার অভাবটা ইদানীং আমি ক্লাসে বেশ অনুভব করিতাম। কেন আসিতেছে না একবার খোঁজ লওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া আমি একদিন বৈকালে তাহাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাহিরে তাহার ছোট ভাইবোনেরা খেলা করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, মধুর খুব জ্বর হইয়াছে।

জ্বর শুনিয়া আমি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম এবং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম,

খুব বেশি জ্বর ?

তাহারা ছেলেমানুষ, বেশী কম কাহাকে বলে বোধ হয় ঠিক জানিত না। তাই তাহাদের মধ্যের বড় মেয়েটি বলিল, চলো আলোক-দা, তোমায় দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া আমাকে লইয়া সে একেবারে তাহাদের শুইবার ঘরে গিয়া হাজির হইল। দরজায় পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে আসিল মধুর কাতরোক্তি—মা-গো, গা জ্বলে গেল !

ইহা শুনিয়া তখন তাহার মা তাহাকে আরো নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ঠাকুর তোমার গায়ের সব তাপ আমার গায়ে দিয়ে দেবেন—তুমি আজই ভাল হয়ে যাবে বাবা !

মধু একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ—তোমার গালটা কি ঠাণ্ডা মা, আমার কপালে আর একবার দাও না !

আমি আর শুনিতে পারিলাম না। আমার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুনের শিখা বাহির হইতে লাগিল। মনে হইল এখনি ছুটিয়া কোথাও পালাই, কিন্তু যতবার চেষ্টা করিলাম কিছুতেই পা উঠাইতে পারিলাম না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ আমি সেখানে পড়িয়া গেলাম।

আমার এই পড়িয়া যাওয়ার শব্দ পাইয়া মধুর মা সচকিত হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে ?

তিনি ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া ছিলেন। তাই এদিকে তাকাইতেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, মা আলো-দা এখানে পড়ে গেল।

আহা-হা ! তোল্ শিগ্‌গির ওকে হাত ধরে !

ঘরের জানালাগুলি বন্ধ ছিল, পাছে মধুর গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। তিনি বলিলেন, তোর জন্যেই এই কান্ড হলো—অন্ধকারে ঘরের মধ্যে যদি নিয়ে এলি ত আগে জানলা খুলে দিলি না কেন ?

মেয়েটি আমার হাত ধরিয়া তুলিবার আগেই অবশ্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আমার শরীর তখনো ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। মধুর মা আমাকে খাটের উপর বসিতে বলিয়া সহানুভূতিকণ্ঠে বলিলেন, কোথাও লাগেনি ত বাবা ?

আমি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

তারপর মধুর সঙ্গে তাহার রোগের বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। সেই ঘর যেন তখন চারিদিক হইতে আমার নিশ্বাস রোধ করিয়া ধরিতেছিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না সেই আবহাওয়া।

তখনো সন্ধ্যা হয় নাই—সবে দূরের গাছপালাগুলি আব্‌ছা হইতে শুরু করিয়াছে। আমি একাকী মাঠের আকাবাঁকা পথ ধরিয়া লক্ষ্যহীনের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তারপর অন্ধকারে যখন চারিদিক একাকার হইয়া গেল তখন চুপি চুপি আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলাম।

আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই খুলিয়া আমি তাহার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। যতবার পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করি, ততবার দেখি মন চলিয়া যায় সেইখানে, যেখানে মধুকে তাহার মা বক্ষে জড়াইয়া লইয়া শুইয়া আছেন। পতঙ্গ যেমন দীপশিখার চতুর্দিকে ঘুরিয়া মরে, ঠিক তেমনিভাবে আমার মনও সেই একটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বার বার জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

এমন সময়ে খেঁদী আসিয়া বলিল, আলো-দা, গয়লা এসেছে।

আমি তখন আমার দৈনন্দিন কর্ম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। অন্যদিন পড়া ছাড়িয়া উঠিবার সময় বিরক্ত লাগিত কিন্তু সেদিন মনে হইল, যেন বাঁচিলাম।

গোয়ালার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হঠাৎ সেদিন তাহাকে আমি প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—আচ্ছা গয়লাবুড়ো, তোমার মা আছে?

একটা হাই তুলিয়া সে বলিল, আজ দশ বছর হলো মা দেহ রেখেছে।

আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমায় মারতো তোমার মা?

বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বুড়ো বলিল, মারবে কেন গো? কি ভালই বাসতো, যখন যা আবদার করেছি কখনো না বলেনি। এমন মা আর হয় না।

আমি বলিলাম, আচ্ছা তুমি আমাদের বাড়ি কতদিন এই কাজ করছো?

দুধ দোওয়া বন্ধ করিয়া সে বলিল. তখন আমার কুড়ি বছর বয়েস, আর আজ একষট্টি হলো। ওঃ, সে কত যুগের কথা! এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে আবার বলিল, তোমার বাবা তখন সবে পাঠশালা যেতে শুরু করেছে।

আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, তা'হলে তুমি আমার মাকেও দেখেছো, কি বলো?

দেখিনি আবার! এই এতটুকু মেয়ের সঙ্গে তোমার বাবার বিয়ে হয়েছিল। তারপর কত বড় হলো—আহা যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটি! আর কি সুন্দর যে দেখতে ছিল তা কি বলবো দাদাবাবু। আমাকে ঠিক ছেলের মত ভালবাসতো। আজো মনে পড়ে, তোমার ভাতের দিন তাঁর নিজের পরবার একখানা ভাল কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বৌকে দিয়ো। বুড়ির সেই কাপড়টা এত পছন্দ হয়েছিল যে, এখনো সে বাক্সয় তুলে রেখে দিয়েছে—প্রাণ ধরে পরেনি। বলে, প'রে এমন জিনিসটা নষ্ট করবো?

তাহার এই কথা শুনিতে শুনিতে মায়ের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, আমায় খুব ভালবাসতো, না গয়লাবুড়ো?

বুড়ো আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ভালবাসার আর সময় পেলে কৈ? তোমার কপাল দাদাবাবু, তা না হ'লে ছ'টা মাসও গেল না, মা আমার স্বর্গে চলে গেল। এ পাপের সংসারে দেবতার ঠাঁই হবে কেন।

মানুষকে এত যত্ন, এত দয়া করলে কি কেউ পৃথিবীতে ট্যাঁকে—আমি আগেই জানতুম !

অকস্মাৎ আমার সমস্ত আগ্রহ নিভিয়া গেল। গয়লাবুড়ো চুপ করিল, আমিও আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। গোয়ালঘর একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিল। শুধু বালতির মধ্য হইতে দুধ দোয়ার একটা মৃদু আওয়াজ এবং তাহারই সঙ্গে বাছুরের লেজ চাটিবার একপ্রকার কর্কশ শব্দ গোরুর জিভ হইতে বাহির হইয়া সেই নীরবতাকে যেন করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিতেছিল। আমি বাছুরের দড়ি ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেই শব্দ শুনিতেছিলাম।

হঠাৎ গোয়ালবুড়ো ডাকিল, দাদাবাবু ?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে বলিল, কি ভাবছো ? মা'র কথা ?

'হাঁ' বলিতে পারিলে আমি সবচেয়ে সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা না পারিবার বেদনায় আমার কণ্ঠ তখন অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল, আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। যাঁহাকে কখনো চোখে দেখি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা পর্যন্ত নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভাবিব ? তাই, সেই নিষ্ঠুর দেবতা, যাঁহার হাতে মানুষের জীবন-মৃত্যু, তাঁহার কাছে মনে মনে এই বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিলাম, হে ভগবান, যদি ছায়ার মত আমার মায়ের মুখখানি আজ মনে থাকিত তবে কল্পনায় তাঁহাকে দেখিয়াও কত সুখ পাইতাম, তাহাও তুমি কাড়িয়া লইলে কেন ? কি অপরাধ আমি করিয়াছিলাম তোমার কাছে !

বুড়ো আমাকে আবার চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, যার মা নেই সংসারে তার সত্যিই কেউ নেই।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিলাম, কেন, সংসারে আর যে এত লোকজন রয়েছে তারা কি কেউ নয় ?

বুড়ো একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, হুঁ। মায়ের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না দাদাবাবু—আর একটু বড় হ'লে বুঝতে পারবে। এ যে নাড়ীর টান—তোমার মনের কথা আপনা থেকেই তাই মা বুঝতে পারে, মুখে বলতে হয় না।

আমি আবার চুপ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। পিছনে কখন জ্যাঠাইমা যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা আমাদের দুইজনের কেহই বুঝিতে পারি নাই। আমি চুপ করিতেই তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন· হ্যাঁগা গয়লাবুড়ো, বলি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছো এখনো তোমার আক্কেল হলো না, ওই ছেলেটাকে একলা পেয়ে তার মাথা খাচ্ছো ! কে তোমায় ওর কানে গুরুমন্তর দিতে বলেছে যে, আমরা পর—এ সংসারে কেউ কারুর নয় ? বুড়ো হয়েছো, কোথায় ঠাকুর-দেবতার কথা চিন্তা করবে, না লোকের ঘর ভাঙাবার মতলব করছো—ছিঃ ! আমি বলি, রোজ এত কি গল্প করে একবার শুনে আসি। ওমা—এসে দেখি এই কাণ্ড ! তাই ত ভাবি, এ ছোঁড়া এমন দিন দিন পরের মত হয়ে যাচ্ছে কেন ? ভগবান জানেন আমি যদি ওকে এতটুকু পর ভেবে থাকি। এই বলিয়া তিনি

গোয়াল-ঘরের চালের দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বোধ করি চাল ভেদ করিয়া ভগবান তাঁহাকে দেখিতেছেন কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য।

গয়লাবুড়োর তখন দুধ দোয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে দুধের বাল্‌তিটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি ওর কানে মন্তর দেবো কেন মা, আমি যে তোমাদেরই খেয়ে প'রে মানুষ। তবে দাদাবাবু তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছিল, তাই—

থাক্ আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। এই বলিয়া জ্যাঠাইমা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইলেন।

তুমি দাদাবাবুকে জিজ্ঞেস করো মা আমার সামনে!

জিজ্ঞেস করতুম, যদি আমি নিজের কানে না শুনতুম! এই বলিয়া অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি হন্ হন্ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আমরা দুইজনেই হতভম্ব! কে কাহাকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

বুড়োর নিকট হইতে আমি সেকালের কত গল্প শুনিতাম। আমাদের বংশের, আমাদের দেশের কত কাহিনী সে আমাকে বলিত। তাই একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া চট্ করিয়া বুড়ো আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, তোমার জ্যাঠাইমা কিন্তু মানুষ সুবিধের নয়!

আমি তাহাকে কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় শুনিতে পাইলাম রান্নাঘর হইতে তিনি চেঁচাইয়া সরলা ঝিকে বলিতেছেন, কাল থেকে তুই দুধ দোয়াতে যাবি।

ইহা শুনিয়া আমার আনন্দ হইবার কথা, পড়িবার জন্য এতটা সময় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু সেদিন আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়াই হইল না। কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া গোয়ালারে সেই কথাটি আমার কানে গুঞ্জরিত হইতে লাগিল, ও যে নাড়ীর টান, মনের কথা মা আপনি বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মধু-র মার কথা মনে পড়িল, কমলের মাতৃস্নেহের সে দৃশ্যও চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। আবার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে সরলা আসিয়া বলিল, হ্যাঁগো দাদাবাবু, তুমি পড়ছো না, এমন সময় শুয়ে আছো যে? শরীর খারাপ করেনি ত?

বলিলাম, শরীর খারাপ? না—হাঁ—তা শরীর খারাপ বলতে পারিস।

ওমা এ আবার কেমনধারা কথা, বলতে পারিস! তোমার শরীর খারাপ কি না, তা তুমি জানো না?

তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমি খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, হাঁ, আজকে বড় জোর একটা আছাড় খেয়েছি।

আছাড় খেয়েছ? কোথায়? লাগেনি ত? দেখি কোথায় ব্যথা! এই বলিয়া সে ব্যস্তভাবে আমার বিছানার আরো কাছে সরিয়া আসিল।

আমি বলিলাম, থাক্ সে ব্যথা তুই দেখতে পাবি না সরলা।

আচ্ছা দেখতে চাই না, তোমার ব্যথা তোমার থাক্। বলি কলিতে কারো ভাল করতে নেই। এই বলিয়া সে রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

আমি একা ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। প্রথমেই আমার মায়ের কথা মনে পড়িল। তারপর আমার চোখের সামনে আবার সেই সব দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। মধুর মা মধুকে বুকের মধ্যে লইয়া শুইয়া আছেন—কমলের মা কমলকে সাজাইয়া দিতেছেন—কমল মায়ের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিল—তারপর—তারপরের দৃশ্য আর আমার চক্ষু সহ্য করিতে পারিল না। ধড়মড় করিয়া আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, দুই হাতে দুই চোখ চাপিয়া ধরিয়া। তাহাতেও নিস্তার নাই। আবার সেই দৃশ্য অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিল। তখন তাড়াতাড়ি একটা বই লইয়া পড়িতে বসিলাম। কিন্তু বই খুলিয়া পড়িতে গিয়া দেখি আমার চোখ বইয়ের পাতায় আছে—মন কখন চলিয়া গিয়াছে কমল ও মধুর মায়ের কাছে। আবার বই বন্ধ করিয়া রাখিলাম। কি করিয়া এইসব চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইব ভাবিতেছি এমন সময় সরলা আসিয়া বলিল,, দাদাবাবু, তোমার ভাত দিয়েছে, খাবে এসো।

তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করিয়া ছুটিলাম রান্নাঘরের দিকে। যাইতে যাইতে শুনিলাম, জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা চীৎকার শুরু করিয়াছে কাহার মাছ বড়, কাহার মাছ ছোট ইহা লইয়া—আর জ্যাঠাইমা তাহাদের ধমক লাগাইতেছেন। মনটা যেন হাল্কা হইয়া গেল। মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম। খাইতে বসিয়া প্রতিদিন ছোট ছোট ভাইবোনেরা যখন এই রকম ভাবে ঝগড়া করিত কোন-না-কোন খাদ্য লইয়া, আমার তখন ভারি ভালো লাগিত। মনে পড়ে, কাহারো পাতে হয়ত এক টুকরো আলু বেশি পড়িয়াছে, কাহারো পটোল ভাজাটা আকৃতিতে বড়, কাহারো মাছের পেটে ডিম নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি সহস্র রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য জ্যাঠাইমাকে জবাবদিহি করিতে হইত এই সময়। তিনি সহসা যেমন বিব্রত হইয়া পড়িতেন তেমনি আবার সহজেই সকলকে সন্তুষ্ট করিতে জানিতেন।

এইসব দৃশ্য কল্পনা করিতে করিতে আমি যেমন রান্নাঘরে ঢুকিলাম অমনি আর এক দৃশ্য আমার চোখে পড়িল। জ্যাঠাইমা ভুতোকে ভাত খাওয়াইয়া দিতেছেন, তাহার আঙুলে ন্যাকড়া বাঁধা, বোধ হয় কিসে কাটিয়া গিয়াছে।

ইহা দেখিয়া আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। আমার যে মা নাই সেই কথা মনে পড়িয়া সেদিন আর আমার ভাত গলা দিয়া নীচে নামিতে চাহিল না, কেবলই আটকাইয়া যাইতে লাগিল। আমি অর্ধেক ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

জ্যাঠাইমা আমার পাতে ভাত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, ভাত ফেললি যে, কে তোর পাতের এঁটো খেতে যাবে?

আমি কিছু বলিবার আগেই সরলা বলিল, মা ও-পাতের ভাতগুলো আমি খাবো'খন—দাদাবাবুর শরীরটা আজ ভাল নেই কিনা।

ভাল নেই ত খাবার আগে কি বাক্‌রোধ হয়েছিল যে বলতে পারেনি? আমি না হয় পর, কিন্তু তোর কাছে বললেও ত পারতো? এই বলিয়া তিনি সরলার উপর ঝাঁঝিয়া উঠিলেন।

জ্যাঠাইমা তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে সুধা ঝরিতেছে—তাঁহার দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন স্নেহ দিয়া গড়া। আমার চোখের সামনে তিনি যেন অকস্মাৎ নবকলেবর ধারণ করিলেন। যে-হাতে করিয়া তিনি ভূতোকে খাওয়াইয়া দিতেছিলেন, সেই হাতের স্পর্শ শুধু একটিবার আমার মুখে তেমনিভাবে পাইবার জন্য তখন আমার সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল।

ভূতোর সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া সেদিন রাত্রে কিছুতেই আমার চোখে ঘুম আসিল না। তবে কি সেও মধু ও কমলের মত বরাত লইয়া সংসারে আসিয়াছে? তাহাদের মতো সেও কি তবে সুখী? ভূতোর প্রতি ঈর্ষায় আমার মন ভরিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল, তবে কি জ্যাঠাইমা কমল ও মধু-র মায়েরই মতো? সব মা-ই কি তবে সমান! যাহাদের মা আছে তাহারা সকলেই কি তবে এদের মতো সুখী ও ভাগ্যবান?

আর চিন্তা করিতে পারিলাম না। মাথা গরম হইয়া উঠিল। আমার যে মা নাই এবং জীবনে আর কখনো তাঁহাকে পাইব না, বারংবার সেই কথা মনে করিয়া আমার দুই চোখে আমার জল ভরিয়া উঠিল।

১০

পরের দিন সকালে দেখিলাম ভূতোর হাত ভাল হইয়া গিয়াছে, সে নিজেই ভাত খাইতেছে। কিন্তু সেদিন রাত্রে খাইতে যাইবার আগে হঠাৎ আমার মনে পূর্ব রাত্রের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল কেন তাহা জানি না। জ্যাঠাইমার হাতে খাইবার জন্য আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। ওঃ সে কি যন্ত্রণা! আমি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিব না। যাঁহাদের মা নাই তাঁহারা কেবল বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কি করিব, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে ভাবিতে ভাবিতে সহসা একটা বুদ্ধি আমার মাথায় খেলিয়া গেল। ছেলেমানুষি হইলেও তাহার মধ্যে যে প্রাণের কতখানি ব্যাকুলতা ছিল তাহা ভাবিয়া এখন বিস্মিত হই।

পেন্সিল কাটিবার জন্য একটি ছুরি ছিল আমার কাছে। আমি পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সেই ছুরিটা বাহির করিয়া ডান হাতের একটা আঙুল খানিকটা চিরিয়া ফেলিলাম। ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ব্যথাও লাগিল, জ্বালাও করিল, কিন্তু যে জ্বালায় আমার মন তখন জ্বলিতেছিল তাহার কাছে ইহা তুচ্ছ।

তাই একটু ন্যাকড়া বাহির করিয়া সেই আঙুলটায় তখন বেশ করিয়া জড়াইয়া বসিয়া ছিলাম। এদিকে হাতের ন্যাকড়া যে রক্তে কখন ভিজিয়া উঠিয়াছে সেদিকে একেবারেই দৃষ্টি ছিল না। কখন সেই কাটা আঙুল লইয়া জ্যাঠাইমার সম্মুখে হাজির হইব আর তিনি আমাকে ভূতোর মতো নিজে হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন বোধ করি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম।

এমন সময় খেঁদী আসিয়া বলিল, আলো দা, ভাত খাবে এসো।

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমার হাতের দিকে খেঁদীর নজর পড়িতে সে শিহরিয়া উঠিয়া মুখে একপ্রকার আওয়াজ করিয়া বলিল, মাগো, ও কি করেছ—হাত কাটলে কি করে?

দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া বলিলাম, পেন্সিল কাটতে গিয়ে কেটে গেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া রান্নাঘরে গেল আগে জ্যাঠাইমাকে সেই সংবাদটি দিবার জন্য। আমি ইহাতে মনে মনে খুশিই হইলাম, কেননা তাহা হইলে জ্যাঠাইমা হয়ত আমাকে খাওয়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া যেন একটা কল্পনাতীত আনন্দে আমার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি তখন ধীরে ধীরে সেই ন্যাকড়া-বাঁধা আঙুলটিকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম।

জ্যাঠাইমা আমাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন! বলিলেন, বুড়ো ছেলে—একটা পেন্সিল পর্যন্ত কাটতে জানে না—বাপ একেবারে আদর দিয়ে দিয়ে জন্তু তৈরী করেছে। নাও বোসো, এখন গিলে আমার সাতগুষ্টিকে উদ্ধার করে। এই বলিয়া একটা বড় চামচ আনিয়া ঠক্ করিয়া আমার পাতের কাছে ফেলিয়া দিলেন।

খেঁদী বলিল, মা, চামচে দিয়ে আলো দা খেতে পারবে?

না পারে ত তুই খাইয়ে দে! এই বলিয়া তিনি সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

খেঁদী আমার পাতের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আলো-দা, তোমায় খাইয়ে দেবো?

বলিলাম, না—চামচে দিয়েই আমি খেতে পারবো।

খেঁদী ফিরিয়া গেল।

আমি চোখের জল সামলাইতে সামলাইতে সেই চামচ দিয়া কোন রকমে ভাত গিলিতে লাগিলাম। এইভাবে আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিমেষে যেন তাসের ঘর-বাড়ির মত ভাঙিয়া পড়িল। আমি নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া আবার নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মাতৃস্নেহ আস্বাদ করিবার জন্য সেদিন অন্তরে যে দুর্জয় তৃষ্ণা জাগিয়াছিল তাহা এমনি করিয়া ব্যর্থ হইল বলিয়া সারা রাত আমি ঘুমাইতে পারিলাম না, বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

ভোর হইতেই আমি শয্যাত্যাগ করিলাম। বিছানায় শুইয়া থাকিতে আর

ভাল লাগিল না, মনে করিলাম, একটু বেড়াইয়া আসি। কিন্তু দরজা খুলিয়া বাহিরে পা দিয়াই আবার শিহরিয়া উঠিলাম। দেখিলাম উঠানে মাদুর পাতিয়া জ্যাঠাইমা শুইয়া আছেন তাঁহার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। আর ভুতো একপাশ হইতে মাকে জড়াইয়া কচি ছেলের মত তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতেছে। আমি অপলকনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, এমন স্বর্গীয় দৃশ্য আর কখনো দেখি নাই। জ্যাঠাইমার সেই কুশ্রী চেহারার কথা তখন ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল স্বর্গের সমস্ত সুধা যেন তিনি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার বক্ষের ভাণ্ডারে শুধু ভুতোকে পান করাইবার জন্য। পথের ভিখারী যেমন করিয়া ধনীর অট্টালিকার দিকে চাহিয়া থাকে তেমনি ভাবে আমি চাহিয়া রহিলাম ভুতোর দিকে। আমার মনে হইতে লাগিল—যদি আমার মা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমিও আজ এইভাবে—। আর চিন্তা করিতে পারিলাম না, আমার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি আমি সেখান হইতে বাহিরে পলাইয়া গেলাম আমার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্য।

কিন্তু বাহিরে গিয়াও নিস্তার পাইলাম না। সেই চিন্তা আমাকে যেন আরও বেশি করিয়া পাইয়া বসিল। আমি অল্পক্ষণ পরেই আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম এবং একটা বই লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। সেই সব দৃশ্য —মাতৃস্নেহের সেই সব অদ্ভুত ছবি বইয়ের পাতার ভিতর হইতে আমার চোখের সামনে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিলাম—তাহাতেও কিছু হইল না। তখন আবার মাঠের দিকে ছুটিলাম। কিন্তু সেখানেও তাহারা ভূতের মত আমার পিছনে পিছনে তাড়া করিল। অবশেষে এমন হইল যে, আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সকল সময় তাহারা অশরীরী ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

এক এক সময় ভাবিতাম—আমি কি পাগল হইয়া গিয়াছি নাকি? আমি জোর করিয়া সেই সব চিন্তা দূরে সরাইয়া দিতাম। কিন্তু ঘরের বাহিরে, চারিদিকে যে-সব মা ও ছেলে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আবার দেখিলে বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আমার মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল তখন একদিন আমি মরীয়া হইয়া উঠিলাম। মনে হইল, চুরি ডাকাতি—যেমন করিয়া হউক, মাতৃস্নেহ আমার চাই! ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বাঁচিতে পারিব না—কিছুতেই না।

তাই হঠাৎ সেদিন চোরের মত চুপি চুপি জ্যাঠাইমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। জোড়াতক্তপোষের উপর যে লম্বা বিছানা পাতা পড়িয়াছিল সহসা তাহার দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল ইহার উপরে জ্যাঠাইমা শুইয়া থাকেন—মাতৃস্নেহের কত বন্যা বহিয়া গিয়াছে ইহার উপর

দিয়া ! তাই সেই শয্যাটিতে হাত ঠেকিবামাত্র আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই শয্যার একপাশে শয়ন করিবার জন্য মনে মনে কতদিন ভগবানের পায়ে কত মাথা খুঁড়িয়াছি, কিন্তু হায় সে সাধ আমার একদিনও মেটে নাই। শুধু জ্যাঠাইমার কাছে শুইয়া থাকিব, শুধু তাঁহার গায়ে হাত দিয়া শুইয়া থাকিব, আর যদি তাহাও সম্ভব না হয় ত অন্ত সেই শয্যার একপাশে পড়িয়া রহিব—যেখানে তাঁহার স্পর্শ, তাঁহার গায়ের গন্ধ, তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মিলিয়া মিশিয়া আছে !

আজ এই প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করিয়া সেদিনের কথা মনে হইলে হাসি পায়। কিন্তু তবুও একদিন যে-ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার চক্ষে কত অশ্রু ঝরিয়াছে তাহার কথা না বলিলে বোধ করি জীবনের কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অপরের নিকট ইহার মূল্য কিছু থাক বা না থাক, ইহা যে আমার জীবনের গতিকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তাই নিঃসঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

জ্যাঠাইমার কাছে শয়ন করিবার জন্য এক-একদিন রাত্রে গল্প বলিতে বলিতে তাঁহার শয্যায় জ্যাঠতুতো ভাইবোনের সঙ্গে আমি ছল করিয়া ঘুমাইয়া থাকিতাম—যদি জ্যাঠাইমা কিছু না বলিয়া আমারি কাছে শুইয়া পড়েন এই আশায় ! কিন্তু জ্যাঠাইমা আমাকে দেখিয়াই ছেলেমেয়েদের বলিতেন, এই খেঁদী, ওকে তুলে দে শীগ্‌গির, নিজের বিছানায় গিয়ে শুক্—বুড়ো ছেলে, রোজ রোজ হুঁস থাকে না—কে ওকে ডাকতে যাবে ! সারাদিনে খাটুনির পর কোথায় এসে একটু শোব, না একে ডাক্—তাকে ডাক্—।

অগত্যা আমি উঠিয়া যাইতাম, ব্যর্থ মনোরথ লইয়া।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। অন্ধকার রাত্রে উঠিয়া বাহিরে গিয়া শুইয়া ছিলাম। জানিতাম জ্যাঠাইমা রোজ ভোরের দিকে সেইখানেই আসিয়া ঘুমাইতেন। ঠিক যে জায়গায় তিনি বালিশ লইয়া শুইতেন সেইখানে আমি শুইয়াছিলাম। মনে বহু আশা ছিল নিশ্চয়ই আজ সাধ মিটিবে, অন্তত তাঁহার পাশে একটিবার শুইতে পাইব। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম আমার নিকট হইতে তিনি বহুদূরে সরিয়া ঘুমাইতেছেন। মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। সহসা মনে একটা দুরন্ত বাসনা জাগিল—যদি চুপি চুপি এই সময় জ্যাঠাইমাকে একবার স্পর্শ করি তাহা হইলে ত কেহ দেখিতে পাইবে না ! কিন্তু ইহা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। যদি তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠেন কিংবা আমার এই কাণ্ডখানা অপর কেহ দেখিতে পায় ! কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিলাম। কিন্তু আর পারিলাম না—কে যেন দুর্দমনীয় আকর্ষণে আমায় জ্যাঠাইমার দিকে টানিতে লাগিল—মোহাবিষ্টের মত আমি ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার পাশে গিয়া বসিলাম।

তারপর আর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া আমার হাতটা তুলিয়া যেমন

তাঁহার হাতটি স্পর্শ করিতে যাইব অমনি মনে হইল পিছনে কিসের শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া দেখিলাম একটি বিড়াল সশব্দে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আবার বক্ষ-স্পন্দন একটু প্রশমিত হইলে যেমন আবার হাত তুলিয়াছি অমনি জ্যাঠামশায়ের ঘরের দরজায় শব্দ হইল। তিনি বাহিরে আমাকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, আলো, বাইরে শুয়ো না বাবা, শেষ রাত্তিরে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ে—অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, না, আর শোব না জ্যাঠাবাবু।

এমনি করিয়া সেদিনও আমার মনের বাসনা মনেই রহিয়া গেল।

কিন্তু যে বাসনা প্রবল, সে বন্যার মত আসিয়া একদিন জীবনের মূল পর্যন্ত টলাইয়া দেয়, তাহাকে কোনক্রমেই চাপিয়া রাখা যায় না, তাই একদিন দুপুরে চোরের মত জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকিয়া যে বালিশে তিনি মাথা দিয়া শয়ন করেন তাহারই উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম।

নিস্তব্ধ দুপুর, জ্যাঠাইমা ছেলেমেয়েদের লইয়া পাড়ায় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পিছনে তাঁহার গলা শুনিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, কি করছিস রে আলো আমার বিছানায় এসে?

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইলাম অপরাধীর মত, তাঁহার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তবু এক্ষেত্রে একটা কিছু না বলিতে পারিলে মান যায় দেখিয়া চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, তোমার বিছানায় ছারপোকা দেখতে পেয়ে মারছিলুম।

তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিলেন, তোর ঘর থেকে বুঝি আমার বিছানার ছারপোকা দেখা যাচ্ছিল? তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, না আমার বিছানার তলা থেকে পয়সা চুরি করা হচ্ছিল? বলি চুরি-বিদ্যেটা এর মধ্যে অভ্যেস করা হয়েছে নাকি! এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিছানার তলায় হাত দিয়া কতকগুলি টাকাপয়সা বাহির করিয়া গুণিতে লাগিলেন।

অপমানে লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ তখন ঘামিয়া উঠিয়াছে। আমি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া যেন বাঁচিলাম।

সেদিন আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার সাক্ষী রহিলেন শুধু একজন যিনি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াও সকলকে লক্ষ্য করেন।

ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়িলাম। যেমন প্রবল জ্বর তেমনি ভয়ংকর মাথাব্যথা—যন্ত্রণায় আমার সারা দেহ টন্ টন্ করিতে লাগিল। আমি নীরবে মুখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। অসুখ হইলে বরাবর আমি এইভাবেই যন্ত্রণা সহ্য করিতাম। সংসারে যাহার আপন বলিতে কেহ নাই তাহার যে অধীর হওয়া সাজে না, একথা আমি অল্পবয়সেই বুঝিয়াছিলাম,

কিন্তু এবারে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। দেহ বুঝিলেও মনকে কিছুতেই আর বুঝাইতে পারিলাম না। বার বার মধু-র কথা মনে পড়িয়া চোখে জল আসিতে লাগিল। আমার সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল মাতৃস্নেহের জন্য। মনে হইল চীৎকার করিয়া সেই নিষ্ঠুর ভগবানকে বলি, 'আমি ভাল ছেলে হতে চাই না, ধন মান যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই চাই না—শুধু আমার মাকে দাও — জগতে আমার আর কিছু কাম্য নেই।'

রোগশয্যায় শুইয়া যখন এইসব চিন্তা করিতাম তখন জ্যাঠামশায় আসিয়া থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর দেখিয়া, একফোঁটা ঔষধ খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন আমি কেমন আছি এবং আমার মাথার যন্ত্রণা কমিয়াছে কিনা।

ইহার উত্তরে কি বলিব প্রথমটা একটু ভাবিতাম, তারপর বলিতাম, ভালই আছি। আর মাথার যন্ত্রণার কথা বলিতে গিয়া হাসি পাইত। যে যন্ত্রণায় অন্তর আমার দিবানিশি জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার কাছে মাথার যন্ত্রণা কতটুকু! তাই শেষের প্রশ্নের উত্তরেও বলিতাম, কমেছে।

জ্যাঠামশায় প্রত্যহ আমার মুখ হইতে এই দুইটি কথা শুনিয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া যাইতেন। প্রতিদিন তিনি সকালে ও বিকালে দুইবার আমাকে দেখিতে আসিতেন এবং মিনিট দশ পনেরো কাছে বসিয়া থাকিয়া আবার নিজের কাজে চলিয়া যাইতেন।

আমার পথ্যাপথ্যের তদারক করিতে আসিতেন জ্যাঠাইমা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা খেঁদীকে তিনি হুকুম করিতেন কখনো সাগু খাওয়াইতে, কখনো ছানার জল দিতে, কখনো মাথায় জলপটি লাগাইতে। প্রত্যহ তিনি ঠিক খাইবার সময় বুঝিয়া বার দুই-তিন নিজে আসিতেন। রোজই আমার মনে হইত হয়ত জ্যাঠাইমা আজ নিজে হাতে করিয়া আমায় খাওয়াইয়া দিবেন। তাঁহার স্পর্শলাভ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু রোজই যখন তিনি শুধু কন্যাকে আদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেন তখন গোপনে আমার চোখে অশ্রু ঝরিত।

প্রত্যহ মার খাইতে খাইতে একবার যেমন লোকে মরীয়া হইয়া উঠে তেমনিভাবে হঠাৎ আমি একদিন দুপুরবেলা জ্যাঠাইমাকে ডাকিয়া ফেলিলাম। কিন্তু ডাকিয়াই মনে হইল, কি করিলাম! বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। জ্যাঠাইমা ভিতরে ছিলেন। আমার ডাক শুনিয়া একেবারে আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ইচ্ছা হইল বলি, আমার কাছে বসিয়া একটু মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে, কিন্তু কিছুতেই সেকথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। আমাকে তাঁহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ডাকছিলি কেন রে?

বার দুই ঢোক গিলিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, তুমি একটু জল আমার মুখে ঢেলে দেবে।

তিনি বলিলেন, আমি যে কাচা কাপড় প'রে আছি, এখনো রান্নাঘরের কাজ বাকি রয়েছে—তোর ও নোঙরা বিছানা ত আমি ছুঁতে পারবো না—খেঁদীকে ডেকে দিচ্ছি, এসে জল দেবে'খন। এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর খেঁদীকে ডাকিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—মুখপুড়ী মেয়ে, ছেলেটা অসুখে খুন হয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে একটু বসে থাকতে পারো না? দিনরাত খেলা আর খেলা? যা শীগ্‌গির আলোককে একটু জল দি'গে যা।

খেঁদী আসিয়া জল খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। আমার তৃষ্ণা পায় নাই তবু একঢোক গিলিতে হইল পাছে জ্যাঠাইমা কিছু মনে করেন এই আশঙ্কায়। দারুণ উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপিতেছিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই সরলা আসিয়া বলিল, কেমন আছো দাদাবাবু?

রোজই সে একবার-দুইবার করিয়া আমার খোঁজ লইতে আসিত। তাই প্রতিদিনের মত সেদিনও বলিলাম, ভালো আছি।

সরলা তখন আবার প্রশ্ন করিল, মাথার যন্ত্রণা একটু কমেছে কি দাদাবাবু?

তাহার কণ্ঠস্বরে সেদিন কি ছিল বলিতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হইল, সরলা ঝি এবং কৈবর্তের মেয়ে হইলেও, সে ত একদিন সন্তানের জননী হইয়াছিল। তাহার বক্ষ ত একদিন মাতৃত্বের সুধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! কিসের অজ্ঞাত পুলকে আমার সর্বশরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল। বলিলাম, সরলা, আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিবি?

সে বিছানার নিকট হইতে দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, দাদাবাবু, আমি যে ছোট জাতের মেয়ে, তোমার বিছানা ছুঁলে মা আমায় আর আস্ত রাখবে না।

বলিলাম, কিন্তু জ্যাঠাইমা কি করে জানতে পারবে, আমি মা-কালীর দিব্যি করে বলছি কাউকে বলবো না, তুই একটু আমার বুকে হাত বুলিয়ে দে।

ছি ছি! ওকথা বলো না দাদাবাবু, তাহ'লে যে আমার পাপ হবে! আমার যদি উপায় থাকত তাহলে কি তোমায় একথা বলে দিতে হত—আমার কি চোখ নেই? আচ্ছা, আমি দিদিমনিকে ডেকে দিচ্ছি।

বলিতে বলিতে সরলা ঘর হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

আমি একা রোগশয্যায় পড়িয়া আবার নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলাম।

১১

সেই বছর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া সবাই অবাক হইয়া গেল। প্রথম, দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় স্থান পর্যন্ত আমি অধিকার করিতে পারি নাই। স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র, পাড়ার লোক, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা, এমন কি ভুতো পর্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না, সেও এক বিষয়ে আমার চেয়ে কিছু বেশি নম্বর

পাইয়াছিল। জ্যাঠামশায় চিন্তাক্লিষ্টমুখে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন করিয়া পরীক্ষা এত খারাপ হইল। আমি ইহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জ্যাঠাইমা পিছনের ঘরে কোথায় ছিলেন জানি না, সেখান হইতে তিনি বোধ হয় সবই শুনিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ বাহিরে আসিয়া আমার হইয়া জবাব দিলেন, দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকলেই কি পড়া হয়—বলি মানুষের মাথা ত, কত আর ধরবে। ভূতোকে ত আমি কিছুতেই পড়তে বসাতে পারি না, তা সেও নাকি ওর চেয়ে ঢের বেশি নম্বর পেয়েছে।

এই বলিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ভূতো—ও ভূতো? মুখপোড়া বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি, শুনতে পাচ্ছিস না? তোর সেই নম্বরের কাগজটা এনে ওঁকে দেখা না?

ভূতো প্রথমেই বাবাকে তাহা দেখাইয়াছিল। তাই ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, দেখিয়েছি ত?

তখন জ্যাঠাইমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোরটা দেখিয়েছিস?

লজ্জায় আমি তখনো সেটা জ্যাঠামশায়কে দেখাইতে পারি নাই, তাই ঘাড় নাড়িয়া তাঁহাকে জানাইলাম, না।

তা দেখাতে যাবে কেন, তাতে যে তোমার মান যাবে! ওঁকে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে তোমার কাছে চাইতে হবে, তবে তুমি দয়া করে দেবে! দিনে দিনে হ'লো কি, বলে বাপের বড়-ভাই জ্যাঠা তাঁকেও আজকালকার ছেলেরা কেয়ার করে না। ধন্যি যাহোক—আরো কত যে দেখ্‌বো বাবা, তা কে জানে! এই বলিয়া জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া লইয়া তিনি আবার আমার দিকে তাকাইলেন।

ইহাতে যেন আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া জামার পকেট হইতে 'প্রগ্রেস রিপোর্ট'টি আনিয়া জ্যাঠামশায়ের হাতে দিলাম।

জ্যাঠাইমার মুখচোখ নিমেষে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আর একবার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া খেঁদীকে ডাকিতে লাগিলেন উচ্চৈঃস্বরে।

খেঁদী বাহিরের দিকে খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কি মা? তিনি ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার মাথা আর মুণ্ডু—বলি আজকাল কোন্ চুলোয় থাকো যে ডাকতে ডাকতে গলা ফেটে মরে গেলে শুনতে পাও না!

খেঁদী ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সে হাঁ করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, যা ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গি থেকে দুখানা চিনির পুলি এনে তোর আলোক-দাকে দে।

খেঁদী বলিল, কোনদিন ত আলোকদা খায় না মা?

—হারামজাদী, তোর সে খোঁজে দরকার কি—যা বলছি তাই কর্। কোনদিন

খায় না, আজ খাবে। সে হিসেব-নিকেশে তোর কি ?

খেঁদী পুলি লইয়া আসিতে আমি বলিলাম, আমার ক্ষিদে নেই, খাবো না এখন।

জ্যাঠাইমা তেমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, আবার রাগটুকু আছে ষোলআনা !

জ্যাঠামশায় তখন আমায় খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা আমি কোনদিন অমান্য করি নাই। অগত্যা উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে করিতে সেই চিনির পুলি দু'টি গলাধঃকরণ করিলাম।

পরের দিন হেডমাস্টারমশায় আমাকে চুপি চুপি তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, আলোক, তুমি আমাদের স্কুলের একমাত্র আশা-ভরসা—তোমার মুখের দিকে আমরা এমন কি আমাদের সেক্রেটারী পর্যন্ত চেয়ে আছেন—তোমার পরীক্ষার ফল এবারে এত খারাপ হলো কি করে বাবা ?

কি একটা কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, স্যার, শরীরটা এবার মোটেই ভাল ছিল না তাই একেবারে পড়তে পারিনি।

আমিও তাই হেডপণ্ডিতমশায়কে বলছিলুম, নিশ্চয় বইগুলো তুমি ভাল করে পড়তে পারোনি , তা না হ'লে তোমাকে হটাতে পারে এমন ছেলে এ অঞ্চলে নেই। আচ্ছা কাল থেকে তুমি আমার বাড়িতে কোচিং পড়তে যেয়ো—আমি তোমায় নিজে একটু দেখবো !

আমি হেডমাস্টার মশায়ের এই প্রস্তাবে সবিনয়ে সম্মতি জানাইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেমন পা বাড়াইয়াছি অমনি সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায় আমার বাঙলা পরীক্ষার খাতাটা হাতে করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমায় বলিলেন, হ্যাঁরে, তুই খাতাতে কি সব বুড়োমি করেছিস—দিন দিন দেখছি বিদ্যে বাড়ছে ! শুনুন মাস্টার মশায় কি লিখেছে ও !

এই বলিয়া তিনি আমার সামনে হেডমাস্টার মশায়কে বলিলেন, 'মাতৃহীন মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব' এর অর্থ লিখতে গিয়ে আলোক কি মন্তব্য করেছে দেখুন !

হেডমাস্টারমশায় চশমার মধ্যে দিয়া বিস্মিতদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আর তিনি আমার খাতাখানি পড়িতে লাগিলেন—'জগতের শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে এইরকম লাইন কেমন করিয়া বাহির হইল জানি না। কেননা তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা একেবারে অসম্ভব—আমার মনে হয় অন্তত আমাদের দেশে ইহা কখনো সম্ভব হয় নাই, হইতে পারে না। যাহার মা নাই সে কখনো মা পাইতে পারে না ; এদেশের কোনো মা পরের ছেলের দুঃখ বুঝিতে পারে না ; এখানে প্রত্যেক মা স্বার্থপর—প্রত্যেকে শুধু নিজের ছেলেকেই ভালবাসিতে ব্যস্ত ! তাই মনে হয় এই লাইনটি রবীন্দ্রনাথের মত কবির হাত দিয়া বাহির না হইলেই ভাল হইত। তিনি বাঙলার কবি, বাঙলা দেশের

মায়েদের মনের দিকে তিনি কি কখনো সত্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখেন নাই ?'···

হেডমাস্টার মশায় দড়িবাঁধা চশমাটা সহসা কপালের উপর তুলিয়া দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আলোক, এসব তুমি কী পাগলের মত লিখেছো !

বলিলাম, আমি যা লিখেছি স্যার সব সত্যি, এর মধ্যে এক কণাও মিথ্যে নেই।

তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও বাঙলা দেশে এমন মা নেই যে অপরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতে পারে ?

আমি বলিলাম না, নেই। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায় তখন উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, তুই কত দেখতে চাস্—হাজার হাজার এই রকম মা বাঙলার পথে ঘাটে ছড়িয়ে রয়েছে !

আমি বলিলাম, হাজার হাজার ত দূরের কথা, আপনি একটিও দেখাতে পারবেন না স্যার।

আবার তর্ক করে, দেখছেন মাস্টারমশায়—আপনি কি করে এই ছেলের ওপর এত ভরসা রাখেন জানি না—আমি ত বলি এর চেয়ে কমল ঢের ভাল ছেলে !

হেডমাস্টার মশায় অস্ফুটস্বরে শুধু একবার হুঁ বলিয়াই, নিজে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

বাহিরে আসিতে সেকেণ্ড মাস্টারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি আমায় একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, দ্যাখ্, আমাকে ত সেই ভুতোকে পড়াবার জন্যে তোদের বাড়ি যেতেই হয়, তুই না হয় আর দুটো টাকা বেশি দিস্, আমি তোকেও পড়াবো—একসঙ্গে দুই ভায়ে পড়বি সে ত ভাল-ই হবে—তোর জ্যাঠাকে বলে দ্যাখ্ না ?

সংক্ষেপে শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া আমি চলিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু তিনি আবার আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিলেন, দেখছিস ত ভুতো কী ছিল আর কী হয়েছে ? আমার কাছে ফাঁকি পাবে না—অন্য মাস্টারদের মতো একটা কিছু লিখতে দিয়ে যে নিজে বসে বসে হাওয়া খাবো তা হবে না। আমি যার ভার নেবো তাকে মানুষ ক'রে দিয়ে তবে ছাড়বো, হ্যাঁ !

আমি বলিলাম, এ বিষয়ে আমার ত কোন হাত নেই স্যার, আপনি জানেন—জ্যাঠামশায় না বললে আমি কী করবো ?

—না, তুই আর কী করবি ! তবে তোকে বলছি এই জন্যে যে তুই এই কথাগুলো তাঁকে বুঝিয়ে বলিস্। আর তুই জিজ্ঞেস করিস ভুতোকে, শুধু গাধার মতো কতকগুলো বাজে মুখস্থ করলেই পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায় না, এমন সব 'ইমপরটেণ্ট' দাগ দিয়ে দিয়েছিলুম যে হুবহু সেইগুলো একজামিনে পড়ে গিয়েছিল। এমন কি রচনা পর্যন্ত ভুতো মুখস্থ করে গিয়েছিল—জিজ্ঞেস করে দেখিস্ তাকে ! আমার কাছে ফাঁকি পাবি না।

তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে, হেডমাস্টার বুঝি তোকে

পড়াবার কথা জ্যাঠামশায়কে বলতে বল্‌ছিলেন ?

আমি বলিলাম, না, তিনি আমাকে কোচিং পড়বার জন্যে তাঁর বাড়ী যেতে বলছিলেন।

ইহা শুনিয়া সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, ওখানে গিয়ে কী হবে—একগাদা ছেলের মধ্যে কখনো লেখাপড়া হয়—হুঁঃ—হেডমাস্টারের যেমন মাথা খারাপ ! এই বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর কমল ও মধু আসিল আমাকে সান্ত্বনা দিতে। কি বলিয়া কথাটা পাড়িবে ঠিক করিতে না পারিয়া তাহারা প্রথমটা একটু ইতস্তত করিল। তারপরে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া আমাকে কিছুদূরে লইয়া গিয়া বলিল, আচ্ছা আলোক, সত্যি করে বল্‌ না ভাই, তোর কাছ থেকে আমরা কত শিখলুম অথচ তুই আমাদের চেয়ে কম নম্বর পেলি কেন ? বল্‌ না ভাই, আমাদের কাছে লুকোস্‌নি !

তাহাদের মুখ হইতে এইরূপ সহানুভূতিসূচক কথা শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন আমাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে। একবার ভাবিলাম বলি আমার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার একমাত্র কারণ তোমরা, কিন্তু মুখ দিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহাদের সম্মুখে চাপিয়া লইয়া বলিলাম, কি করে জানবো বল !

কমল বলিল, ওটা বাজে কথা—তা না হলে তোর মত ছেলে কখনো এত কম নম্বর পায় ? নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ আছে, আমাদের কাছে তুই ভাঙছিস্‌ না !

মধুও তাহাতে সায় দিয়া বলিল, আমারও তাই বিশ্বাস ভাই।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, তাহলে হয়ত তোদের কথাই ঠিক।

১২

পরের রবিবার মধুর ফার্স্ট হওয়া উপলক্ষে তাহাদের বাড়িতে এক ভোজের আয়োজন হইল। মধুর মা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যাইব না, শরীর খারাপ এই অজুহাত দেখাইব। কিন্তু পরে মনে হইল, তাহারা হয়ত ভাবিবে মধু আমার স্থান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া ঈর্ষাবশত আমি যাই নাই। অগত্যা যাইতেই হইল।

মধুর মা তাঁহার পাড়ার আরো কয়েকজন স্ত্রীলোককে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কমল তাহার মাকেও লইয়া আসিয়াছিল। বাড়ি একেবারে গুলজার ! মধুর মা যেন আহ্লাদে ফাটিয়া পড়িতেছেন। আর তাঁহার সঙ্গিনীরা সব মধুকে ঘিরিয়া কত কি প্রশ্ন করিতেছেন। মধুরও চোখে একটা গর্বের ভাব

ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলেরও যশোগান হইতেছিল সেখানে। কিন্তু আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই সব যেন মুহূর্তে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সবাই আমাকে দেখাইয়া চোখে চোখে কী যেন ইসারা করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল!

যাহা হউক, আমাকে দেখিতে পাইয়া প্রথমে মধুই ছুটিয়া আসিল এবং তাহার পড়ার ঘরে গিয়া একটা চেয়ারে আমাকে বসিতে দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। শুধু যাইবার সময় বলিল, বোস্ ভাই, একটু কাজ আছে আমি এখুনি আসছি।

ইহার মিনিট কয়েক পরেই কমল খুব ব্যস্তভাবে ঘরে আসিয়া বলিল, কি রে আলোক, কখন এলি?

বলিলাম, এই মিনিট পনেরো হ'লো।

তারপর কিছুক্ষণ খুচরা আলাপ করিয়া সেও কাজের অছিলায় ভিতরে চলিয়া গেল।

এইবার আসিলেন মধুর মা। তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাবা তুই এসেছিস বলে কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে তা কি বলবো।

এই সংবাদটি জানাইতেই যেন তিনি আসিয়াছিলেন, তাই শেষ হইবামাত্র আর একমুহূর্ত দেরি না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি চুপচাপ বসিয়া মধুর একখানা পাঠ্য-বইয়ের পাতা উলটাইতে লাগিলাম। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমার স্থান কোথায়?

এই সব চিন্তা করিতেছি এমন সময় মধুর বাবা একটা মোটা বর্মা চুরুট মুখে পুরিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কয়েকটি কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পরই শুরু করিলেন, 'নেক টু নেক ফাইট' দিতে হবে—হাঁ মধু এবার ফার্স্ট হয়েছে, তুমি আসছে বার ওকে আবার মেরে দাও—ও আবার তোমায় মারতে চেষ্টা করুক। এই রকম না হ'লে ভাল ছেলে কী! শুধু জমিদারীর মৌরসী পাট্টার মত একঘেয়েভাবে জীবন কাটানোর কোন মানে হয় না। জীবনে ওঠা-নামা চাই—যতখানি নামবে তার দু'ডবল আবার উঠবে। বেশ বেশ, তুমি এসেছো দেখে ভারি খুশি হলুম। এই বলিয়া একসঙ্গে বারকতক চুরুটে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। কমল ও মধু আমাদের দলটিকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিল। মধুর মা এক একবার রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, কমল, দেখিস বাবা সকলের যেন পেট ভরে। আমি একটু ওদিকে ব্যস্ত রয়েছি।

মধুর বাবার ইতিমধ্যে একবার আসিয়া কমলকে উপদেশ দিয়া গেলেন আমাকে যেন একটু ভাল করিয়া দেখা হয়। কমলকে মধুদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হইতে

দেখিয়া আমার মনটা অকারণেই কেমন খারাপ হইয়া গেল। মনে হল, আমি যেন পর, ইহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

এমনিভাবে যখন খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সহসা মধুর মা আমার পাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া মধুকে হুকুম করলেন আরো গোটা দুই সন্দেশ আনিয়া আমার পাতে দিতে। আমার তখন পেট ভরিয়া গিয়াছিল। আমি অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আর খেতে পারব না। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, তুমি ভাল করে না খেলে মধুর মনে আনন্দ হবে না বাবা—আজ ওর জীবনে একটা বিশেষ দিন। শেষের এই কথাটি শুনিবামাত্র আমার মনে হইল, আমারও জীবনে আজ একটা বিশেষ দিন—ইতিপূর্বে কখনো আমি ফার্স্ট ছাড়া হই নাই।

খাওয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেখানে আর এক মিনিটও আমার যেন ভাল লাগিতেছিল না। মধুর মাকে রান্নাঘরে যাইয়া নমস্কার করিতেই তিনি বলিলেন, এর মধ্যে চললি বাবা—আমি মনে করেছিলুম মধু ও কমলকে তুই পরিবেষণ করে খাওয়াবি।

এই কথাটা শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। বার কয়েক ঢোক গিলিয়া বলিলাম, আমায় এতটা পথ যেতে হবে, তার ওপর রাতও হয়েছে অনেক।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে এসো বাবা। তোর হয় ত ভাল করে খাওয়াই হলো না—আমি ত একেবারে দেখতে পারলুম না।

কমলের মা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকেও আমি নমস্কার করিলাম। তিনি সদর দরজার কাছ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পিছনের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, এবার ফার্স্ট হতে পারলি না কেন বাবা?

কেন! ইহার উত্তর কাহাকে দিব, আর কেই-বা তাহা বুঝিবে! তাই নীরবে শুধু একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম। তিনি বলিলেন, মন দিয়ে পড়্ বাবা যাতে আবার ফার্স্ট হতে পারিস।

বলিলাম, আপনাদের আশীর্বাদ পেলে হতে পারি বৈ কি।

তিনি বলিলেন, আমি আশীর্বাদ সব সময় করছি বাবা।

চিন্তাভারাক্রান্ত মনে আমি যখন বাড়িতে আসিয়া জামা খুলিতেছিলাম তখন জ্যাঠাইমার একটি মন্তব্য আমার কানে আসিল। তিনি সরলাকে বলিতেছিলেন, লজ্জাও করে না, ছ্যাঃ—খাওয়াটাই এত বড় হলো—তুই ফার্স্ট হতে পারলিনি আবার যে হলো তার বাড়িতে স্ফূর্তি করে খেতে গেলি। আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

সরলা বলিল, হ্যাঁ মা, বড়দাদাবাবুকে ওরা বলেনি? ভুতোকে সে বড়দাদা বলিত।

খ্যাংরা মারি অমন খাওয়ার মুখে—বললেই যেন আমার ভুতো যেতো। এমন

নোলা আমার ছেলের নয় !

সরলা বলিল, তারাই বা কেমন লোক বাপু !

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তারা ত ওই চায়। ওকে নেমন্তন্ন করলে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপমানও করা হলো।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া, তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। মনে হইল হয়ত জ্যাঠাইমা ঠিক বলিতেছেন। এমন সময় ভূতো আসিয়া বলিল, কি রে, কখন এলি ?

বলিলাম, এই আসছি ভাই।

খুব খাওয়ালে, না ! একে ফার্স্ট হয়েছে, তায় ওর বাবা খুব বড়লোক। কি কি খেলি ভাই বল্ না ?

একে আমার মনের তখন ওই রকম অবস্থা, তাহার উপর আবার ভূতোর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। কেবলই প্রশ্ন করে রান্না কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ আহার্য কি পরিমাণ খাইয়াছি ইত্যাদি। যখন সে শুনিল যে সন্দেশ মোটে একটা খাইয়াছি, তখন ভূতো আমার উপর রীতিমত চটিয়া উঠিল, যেন আমি ঘোরতর এক অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।

সে বলিল, তুই ভারি বোকা, নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কেবল বাজে জিনিস খেয়ে পেট ভরাস—আমি লুচি তরকারী প্রথমটা একটু একটু খেয়ে পেট খালি করে রাখি শেষকালে মিষ্টি খাবো বলে। আট দশটা সন্দেশ না খেতে পারলে আর নেমন্তন্ন গিয়ে লাভ কি ? কচুঘেঁচু ত বাড়িতে রোজই খাই !

আমি ইহার কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে মনের আনন্দে বলিয়া চলিল, হ্যাঁরে, কমল কি রকম টানলে ? ও ভারি চালাক ছেলে যাহোক, আজকাল কি রকম মধুকে জমিয়েছে দেখেছিস—দিন-রাত ওর সঙ্গে লেগে থাকে ! আর মধুটাও তেমনি বোকা—আমি হ'লে—

কমলের চরিত্রের প্রতি এইরূপ ইঙ্গিত করিতে ভূতোর উপর আমার ভীষণ রাগ হইল। বলিলাম, ভূতো চুপ্, ওর সম্বন্ধে কোন কথা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।

ভূতো আমার মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিল এবং আমার কাছে আর তাহার বসিয়া থাকিতে সাহস হইল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। শুধু যাইবার সময় ক্ষীণকণ্ঠে একটি কথা বলিয়া গেল, তুই আমার ওপর রাগ করলি বটে কিন্তু কমল যে তোকে কি চোখে দ্যাখে তা একদিন বুঝতে পারবি !

আমি কোন রকমে ক্রোধ সংবরণ করিতে করিতে বলিলাম, আচ্ছা তোর চেয়ে কমলকে আমি বেশি চিনি।

১৩

ভুতো এবং আমি একসঙ্গে একই মাস্টারের কাছে বাড়িতে পড়িব জ্যাঠাইমা ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি জ্যাঠামশায়কে বুঝাইলেন—তাহা হইলে ভুতোর পড়াশুনা একেবারেই হইবে না। জ্যাঠামশায়ও ইহাতে কি বুঝিলেন জানি না, তবে জ্যাঠাইমার প্রস্তাবেই রাজী হইলেন। অবশ্য এই সংবাদে আমি যেমন খুশি হইয়া উঠিলাম তেমনি দুঃখিত হইলেন সেকেণ্ড মাস্টারমশায়। কারণ, গরজটা আমার চেয়ে তাঁহারই ছিল বেশি। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টারের কাছে ছুটির পর কোচিং পড়াই আমার স্থির হইল। ইহাতেও আমার কোন উৎসাহ ছিল না কিন্তু তবুও যে যাইতাম তাহার একটি কারণ ছিল।

প্রথম দিন তাঁহার বাড়ি হইতে ফিরিতেছি, অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার দিকে ঢলিতে শুরু করিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি পথসংক্ষেপ করিবার জন্য রায়-বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বিরাট বাগান, নানারকম ফলফুল-গাছের জন্য একদিন বিখ্যাত ছিল; এখন যত্নের অভাবে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি হইতে দ্রুত ফিরিবার একটি পথ ছিল। আমি আপন মনে গাছপালার দিতে তাকাইতে তাকাইতে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে পিছন দিক হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, আমায় একটা লতা পেড়ে দাও না ওই গাছ থেকে।

মেয়েটিকে পূর্বে কখনো দেখি নাই। বয়স বোধ হয় বারো কি তেরো হইবে। সে তখন হাঁপাইতেছিল। তাহার কপালে, গালে, ঠোঁটের উপর, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া মুখখানিকে যেন শরৎ-প্রভাতের শিশির-ভেজা স্থলপদ্মের মত সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম—এ গ্রামে এমন মেয়ে কোথা হইতে আসিল।

বালিকাটির যেন আর বিলম্ব সহিতেছিল না। সে দ্রুতকণ্ঠে বলিল, দাও আমায় শীগ্‌গির—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।

বলিলাম, তুমি কোথায় থাকো?

সে তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই দক্ষিণ পাড়ায়।

দক্ষিণ পাড়ায়? কাদের বাড়ি? আমি ত ওদিকে কতবার গেছি—কই, তোমায় ত কখনো দেখিনি।

সে বলিল, তুমি যদি দেখতে না পাও ত আমি কি করবো। আমি তোমায় রোজ দেখি!

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, রোজ দেখ! কি করে?

মেয়েটি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, জানি না যাও! বলছি, দেরি হয়ে গেছে—

লতাটা পেড়ে দেবে ত দাও নইলে আমি চলে যাই। এই বলিতে বলিতে সে দুই এক পা অগ্রসর হইল।

তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমি সাগ্রহে বলিলাম, না না যেয়ো না, আমি এখুনি পেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই লতা দিয়ে তুমি কি করবে?

সে বলিল, বকুল ফুলের মালা গাঁথবো।

বকুল ফুল?

হ্যাঁ, ওইখানে একটা মস্ত বড় বকুল গাছ আছে, আর কত ফুল পড়ে আছে তার তলায়, দেখবে চলো না! এই বলিয়া সে বাগানের একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল। ফুলের কথা বলিতে বলিতে দেখিলাম তাহার মুখ চোখ ঝলমলে হইয়া উঠিল। আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আচ্ছা তুমি আমায় রোজ কি করে দেখো, আমি ত তোমাদের পাড়ায় রোজ যাই না?

মেয়েটি বলিল, তুমি ত আমাদের পাঠশালার কাছ দিয়েই রোজ স্কুলে যাও।

বলিলাম, তুমি পাঠশালায় পড়ো? তাহ'লে তুমি খেঁদীকে চেনো?

মেয়েটি বলল, বা রে খেঁদী ত আমাদের সঙ্গেই পড়ে!

খেঁদী তোমার সঙ্গে পড়ে? তাহ'লে তুমি নিশ্চয় আমাদের বাড়ি জানো?

হ্যাঁ। আমরা যেদিন প্রথম আসি, তার পরদিন মা'র সঙ্গে তোমাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলুম।

'প্রথম আসি' কথাটি শুনিয়া প্রশ্ন করিলাম, তোমরা কি এখানে ছিলে না?

মেয়েটি এইবার রীতিমত চটিয়া উঠিয়া জবাব দিল, জানি না যাও! এই বলিয়া আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, আচ্ছা আর কিছু জিজ্ঞেস করবো না, চলো তোমায় লতা পেড়ে দিচ্ছি? এই বলিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া বলিলাম, আচ্ছা এই জঙ্গলের মধ্যে একা ফুল কুড়োতে আসতে তোমার ভয় করে না?

সে বলিল, ভয় কিসের, আমার কত বন্ধু এসেছে এখানে—আমরা সকলে মিলে রোজ এখানে ফুল কুড়োতে আসি। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরো সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল, শীগগির দাও না লতা পেড়ে—ওদের এতক্ষণে কতখানি মালা গাঁথা হয়ে গেল!

পল্লীগ্রামে যাঁদের বাড়ি, তাঁহারা জানেন, কোন কোন বড় গাছ হইতে সুতার ন্যায় একপ্রকার সরু সরু লতা ঝুলিতে থাকে, এইগুলি লইয়া ছেলেমেয়েরা ফুলের মালা গাঁথে, আবার ইহাদেরই মোটা লতাগুলিতে দোলা বাঁধিয়া দোল খায়। মেয়েটি এইরূপ একটি গাছের কাছে আমাকে লইয়া যাইতেই আমি বলিলাম, আচ্ছা এর আগে তোমরা কোথায় ছিলে?

সে বলিল, আমরা ছিলুম মুন্সীরহাটে, আমার জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশায় মরে গেছে কিনা, তাই মামা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। আমরা

দু'মাস হলো এসেছি, এখন এখানেই থাকবো। ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যায়—আর আমাদের দেখবার কেউ নেই কিনা। এইভাবে এক নিঃশ্বাসে সে তাহাদের সংসারের সব কথা আমাকে বলিয়া ফেলিল।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা তোমার নাম কি?

সে রাগ করিয়া বলিল, যাও বলবো না—বলছি, আগে লতাটা পেড়ে দাও, বড্ড দেরি হয়ে গেল, না কেবল বাজে কথা—

বলিলাম, আগে নাম বলো, তবে লতা পেড়ে দেবো।

ইস্, নাম বলবার জন্যে আমার পা কেঁদেছে—বয়ে গেছে, চাই না চাই না তোমার লতা—। এই বলিয়া সে বনের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। আমি পিছন হইতে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম, এই যে লতা নিয়ে যাও—আমি তোমার নাম শুনতে চাই না—! কিন্তু সে যেন সেকথা শুনিতেই পাইল না, শঙ্কিতা হরিণীর মতো অকস্মাৎ চঞ্চল চরণে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়াই লক্ষ্য করিলাম, সে কোন্ দিকে গেল। তারপর গাছ হইতে একটি লতা পাড়িয়া লইয়া, সে যেদিকে গিয়াছে সেই পথে চলিলাম।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই যে দৃশ্য আমার চোখে পড়িল, তাহা আজও ভুলি নাই। বকুল ফুলের যেন সমারোহ! হাজার হাজার ফুল তারার মতো বিছাইয়া আছে তৃণাচ্ছাদিত একখণ্ড শ্যামল ভূমির উপরে, আর কয়েকটি বালিকা গাছের তলায় বসিয়া মালা গাঁথিতেছে। তাহাদের কাহারো পরনে ডুরে শাড়ি, কাহারো বা রঙীন; কেহ আঁচল হইতে ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে, কেহ-বা এক জায়গায় ফুল কুড়াইয়া স্তূপীকৃত করিতেছে। তাহাদের কাহারো বা খোঁপায় বকুল ফুলের মালা জড়ানো, কাহারো বা গলায়, কেহ-বা দুই হাতে বালার মত পরিয়াছে!

সেই মেয়েটি তখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটি একটি করিয়া ফুল কুড়াইয়া এক জায়গায় জড়ো করিতেছিল। তাহার মাথায় যে কখন টুপ টাপ করিয়া দুই-একটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে বোধ করি তাহার হুঁস ছিল না। সেই ফুল-গুলি তাহার চুলের মধ্যে আটকাইয়া যেন অন্ধকার আকাশে তারার মত জ্বল জ্বল করিতেছিল, কত ফুল সেই মেয়েগুলি পায়ের তলায় দলিয়া চলিতেছিল। তাহাদের মুখে হাসি, চোখে চঞ্চলতা। আমার মনে হইল, তাহারা যেন এ পৃথিবীর নহে, তাহারা কোন স্বর্গের পরি, যেন ফুল লইয়া এখানে খেলিতে আসিয়াছে। দূর হইতে তাই দুই চোখ ভরিয়া আমি তাহাদের দেখিতে লাগিলাম। সেইদিন প্রথম আমার সেই পল্লীগ্রামটিকে সুন্দর বলিয়া মনে হইল; তাহার গাছপালা, বন-জঙ্গল, খানা-ডোবা সব যেন আমার চোখে নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল!

কিছুক্ষণ পরে আমি সেই লতাটি লইয়া তার কাছে উপস্থিত হইলাম এবং সেটি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, তুমি পালিয়ে এলে কেন, আমি কত ডাকলুম!

সে আমার হাত হইতে লতাটি লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বলিল, চাই

না—যাও !

অপরাধীর মত আমি সেই লতাটি আবার কুড়াইয়া আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, আমার উপর রাগ করছো কেন, তুমি নিজেই ত চলে এলে ?

আমার কথা শুনিয়া অন্য মেয়েগুলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে আবার লতাটি ফেলিয়া দিয়া বলিল, দ্যাখ্ না ভাই, মিছিমিছি আমার কত দেরি করিয়ে দিলে।

আমি বলিলাম, তুমি চলে এলে কেন ?

না, চলে আসবে না, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাতগুষ্ঠীর নাম বলবে ! এই বলিয়া কতকটা অভিমানজড়িত কণ্ঠে আবার বলিল, ওরা কত মালা গেঁথেছে, আমার এখনো ফুলই কুড়নো হলো না—শুধু তোমার জন্যে।

বলিলাম, আচ্ছা আমি তোমায় ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছি।

থাক্, অত আর উপকার করতে হবে না। এই বলিয়া আরো ক্ষিপ্র হস্তে সে ফুল কুড়াইতে লাগিল। আর একটি মেয়ে তখন ছুটিয়া গিয়া সেই লতাটি তুলিয়া লইল। বলিল, এই শান্তি, তুই নিবি না ত, এটা তাহলে আমি নিই ভাই ?

আর একটা মেয়ে তাহার নিকট হইতে লতাটি ছিনাইয়া লইয়া বলিল, না, আমি নেবো, তোর ত রয়েছে একটা। এই বলিয়া তাহারা যখন সেই লতাটির অধিকার লইয়া রীতিমত একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুলিল, তখন শান্তি হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের হাত হইতে সেটি কাড়িয়া লইয়া বলিল, ইস্, নিতে এসেছে—যা, এ আমার লতা, তোদের কাউকে দেবো না, যা !

বলা বাহুল্য, যাহার উদ্দেশ্যে লতাটি আনিয়াছিলাম, সে-ই স্বেচ্ছায় উহা গ্রহণ করাতে আমি খুশি হইয়াছিলাম সবচেয়ে বেশি ; কিন্তু তবুও অপর মেয়ে দুটির মুখের দিকে চাহিয়া শান্তিকে বলিলাম, শান্তি, তুমি ত ফেলে দিয়েছিলে, এখন ওরা কুড়িয়ে এনেছে, ওটা ওদের প্রাপ্য, তুমি দিয়ে দাও ওদের।

সে বলিল, বেশ করবো, আমি একশোবার ফেলে দেবো, তাতে ওদের কি ? এই বলিয়া সে আবার ফুল কুড়াইতে মনোযোগ দিল। আমি ইতিমধ্যে এক আঁজলা ফুল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেগুলি তাহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলাম, শান্তি, এই নাও।

চাই না তোমার ফুল। এই বলিয়া আমার হাতে সে এমন এক ধাক্কা মারিল যে, সব ফুলগুলি মাটিতে ছড়াইয়া গেল। ইহাতে আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। এত কষ্ট করিয়া আমি এতগুলি ফুল কুড়াইলাম, আর সে সবগুলি ফেলিয়া দিল। আমি খপ্ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, দাও শিগ্গির আমার লতাটা ফিরিয়ে !

লতা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, সে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, উঃ—মা-গো, লাগছে—আমার হাত ভেঙে গেল—ছাড়ো, ছাড়ো—

সভয়ে আমি তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। শান্তি তৎক্ষণাৎ সেই লতাটি

লইয়া তাহার জামার বুকের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তারপর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কেমন জব্দ করেছি, লেগেছে না—ছাই !

আমার রাগ ইহাতে আরো বাড়িয়া গেল। আমি তখন দুই হাতে করিয়া অনেক ফুল কুড়াইয়া কুড়াইয়া এক জায়গায় জড়ো করিলাম এবং অপর মেয়েগুলির দিকে চাহিয়া বলিলাম, কে এই ফুলগুলো নেবে ?

সঙ্গে সঙ্গে চারটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল 'আমায় দাও', 'আমায় দাও' ! আমি আঁজলা করিয়া ফুল তুলিয়া যেমন তাহাদের হাতে দিতে যাইব, অমনি ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া শান্তি আমার হাত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইল। তারপর সঙ্গিনীদের মারিয়া-ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়া সব ফুলগুলি নিজের আঁচলে ভরিতে লাগিল। আমি তখন শান্তির আঁচলটা টানিয়া ধরিয়া বলিলাম, তুমি ত আমার ফুল ফেলে দিয়েছিলে, তবে আবার নিচ্ছো কেন ?

সে বলিল, বেশ করবো নেবো।

বলিলাম, আমি যে এগুলো ওদের জন্যে কুড়িয়েছি ?

সে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, ওদের জন্য কুড়িয়েছি ! আমার এত দেরি ক'রে দিয়ে—আবার ওদের ফুল দেওয়া হচ্ছে ! এই বলিতে বলিতে একরকম জোর করিয়া সে ফুলগুলি কাড়িয়া লইল। অন্য মেয়েগুলি ইহার জন্য তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

আমি তখন তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, তোমাদের সকলকে আমি কাল অনেক ফুল দেবো, তোমরা রাগ কোরো না ভাই।

ইহা শুনিয়া শান্তি একবার শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাহার বাড়ির পথ ধরিল।

পরদিন অপর বালিকাগুলিকে ফুল দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেইজন্য যথাসময়ে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ক্ষিপ্রহস্তে ফুল কুড়াইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় এক ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। তারপর ফুলগুলিকে পাঁচভাগ করিয়া চারভাগ অপর চারটি মেয়েকে দিয়া পঞ্চম ভাগটি যখন শান্তির কাছে লইয়া গেলাম তখন সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া সেই ফুলগুলি সব ফেলিয়া দিল এবং এতক্ষণ ধরিয়া নিজে যে মালা গাঁথিয়াছিল তাহাও টানিয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছড়াইয়া দিতে দিতে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। তাহার সঙ্গিনীরা তাহার এই ব্যবহারে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। আমি কিন্তু তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য।

কিছুদূর যাইয়া আমি তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিলাম। শান্তি ছুটিতেছিল, দাঁড়াইল। আমি তখন তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, শান্তি, তুমি সব ফেলে দিলে কেন ?

আমার খুশি ! এইকথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দীর্ঘপক্ষ্মাচ্ছাদিত বিস্ফারিত

চক্ষু দুইটিতে জল টলটল করিয়া উঠিল।

আমি আবার বলিলাম, শান্তি, তোমার কি হয়েছে, বলো লক্ষ্মীটি!

সে তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল, কিছু হয় নি। ছাড়ো বলছি আমায়!

এইবার আমি লক্ষ্য করিলাম শান্তির অভিমানস্ফুরিত অধরোষ্ঠ বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল। কতকগুলি কথা আছে যাহা চোখের জলে নীরবে যেমন ভাল করিয়া বলা যায়—মুখের ভাষার মুখরতায় তাহার দশভাগের একভাগও বোধ করি ঠিক তেমনটি করিয়া বোঝানো যায় না। তাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি আবার অনুনয় করিয়া বলিলাম, শান্তি, লক্ষ্মীটি, বলো তোমার কি হয়েছে?

জানি না—তুমি যাও না ওদের ফুল কুড়িয়ে দিতে—দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! এই কথা বলিতে বলিতে সহসা সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া আমার মনটা কেমন একরকম হইয়া গেল! আমার উপর যেন তাহার একারই সম্পূর্ণ অধিকার, তাই অপরের সঙ্গে সমানভাবে তাহাকে ফুল দেওয়াতে আমার উপর তাহার এই অভিমান। আমি যে তাহার এই অশ্রুবর্ষণের কারণ—ইহা মনে করিয়া কেন জানি না সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। তখন তাহার জলভরা চোখদুটি যেমন করুণ তেমনি সুন্দর বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। আমি কাপড়ের খুঁট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, তোমাকেও ত আমি সমান ভাগ দিয়েছি।

আমার হাত তাহার চোখ হইতে সরাইয়া দিয়া সে বলিল, সমান ভাগ আমি চাই না—

তবে তুমি সব চাও?

এইবার শান্তি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম ইহাই তাহার ইচ্ছা—বলিলাম, আচ্ছা কাল থেকে তাই হবে। আমি আর কাউকে একটা ফুলও দেবো না—সব তোমায় দেবো।

মুহূর্তে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু একটা ফুলও তুমি কাউকে দিতে পারবে না! যদি দাও ত আমি আর কোনদিন তোমার ফুল নেবো না।

তাহাকে ফুল দেওয়া যেন আমারই গরজ, আর লওয়া না লওয়া সমস্তই তাহার ইচ্ছা! আমার উপর তাহার এই জোর ও অধিকার প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কে তাহাকে দিল, কোথা হইতে সে পাইল—এইসব কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে সেদিন আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু বাড়িতে আসিয়াও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই কথাই আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যতবার লেখাপড়ায় মন বসাইতে চেষ্টা করিলাম ততবার কেবল কি একটা অননুভূতপূর্ব মধুর রসের আবেশে আমার নিভৃত হৃদয় যেন ভিতরে ভিতরে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইল।

পরের দিন যথাসময়ে হাজির হইয়া দেখিলাম তাহারা সকলে আসিয়াছে এবং ফুল কুড়াইয়া কেহ মালা গাঁথিতেছে, কেহ বা আঁচলে ভরিতেছে। আমি আসিবার সময় কতকগুলি লতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম; সেগুলি সব শান্তিকে দিলাম এবং ফুল কুড়াইয়া কুড়াইয়া তাহার আঁচলে রাখিতে লাগিলাম। এইভাবে অনেক ফুল জমা হইলে শান্তি আমায় বলিল, আলোক-দা, আমায় একটা মালা গেঁথে দাও না?

বলিলাম, আমি ত জানি না কেমন করে মালা গাঁথতে হয়।

আমার এই কথা শুনিয়া শান্তির সঙ্গিনীরা সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। তখন এই হাসির কারণটা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু যখন দেখিলাম লতার সাহায্যে বকুল ফুলের মালা গাঁথা অত্যন্ত সহজ কাজ তখন নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক ফুলের মালা যত রকমে গাঁথা যাইতে পারে তাহার মধ্যে এই বকুলের মালা গাঁথাই সব চেয়ে সহজ। ফুলগুলি যেমন ছোট, ইহার মধ্যস্থলে তেমনি বৃহৎ এক ছিদ্র থাকে। গাছের ঐ লতা সুতোর চেয়ে মোটা অথচ দৃঢ় বলিয়া তাহা একটি পাঁচ বছরের ছেলেও অনায়াসে তাহার মধ্যে ভরিতে পারে। যাহা হউক শান্তি একবার আমাকে দেখাইয়া দিবার পরই আমি গাঁথিয়া চলিলাম। একই লতার দুইটি প্রান্তে দুইজনে একত্রে ফুল ভরিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা দুইজনে এক বিরাট মালা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। ইহাতে শান্তির চোখে মুখে গৌরবের হাসি ফুটিয়া উঠিল। অন্য সকলের চেয়ে সে যে বড় মালা গাঁথিয়া লইয়াছে ইহাতেই তাহার গর্ব। তাহা ছাড়া আমি যে একমাত্র তাহাকেই এই কার্যে সাহায্য করিয়াছি, অন্য কাহাকেও একটি ফুল পর্যন্ত কুড়াইয়া দিই নাই, ইহাও বোধ করি সেদিন তাহার নিকট অধিকতর গর্বের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এইভাবে ফুল কুড়ানো ও মালা গাঁথার কাজে শান্তিকে সাহায্য করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দুইজনের ভিতর কেমন একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। পাঠশালা হইতে খেঁদীর কানে এই সংবাদটি যথাসময়ে পেঁছিতে দেরি হইল না। শান্তির প্রতি আমার এই পক্ষপাতিত্বের কথা লইয়া অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে আলোচনা চলিত। শান্তির সঙ্গিনীদের বিশ্বাস—তাহাদের সকলের চেয়ে শান্তিকে ভাল দেখিতে বলিয়া আমি তাহাকেই পছন্দ করি এবং অন্য সকলকে ঘৃণা করি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা তাহা বলিতে চাহি না, তবে আজ মনে হয় মানুষকে আপন করিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। সেই আশ্চর্য ক্ষমতা যাহার আছে, সে অসঙ্কোচেই নিজের দাবী ঘোষণা করিতে জানে, তাহাকে বঞ্চিতও হইতে হয় না।

খেঁদীর দল ছিল অন্য। সে তাহাদের সঙ্গেই খেলাধুলা করিত। কিন্তু এই সংবাদটি পাওয়া মাত্র সে তাহার পুরাতন দল ছাড়িয়া এই দলে আসিয়া যোগ

দিল এবং তখন হইতে সে-ও নিয়মিত ফুল কুড়াইতে আসিতে শুরু করিল। আমার প্রতি বরাবরই খেঁদীর বেশ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু শান্তির প্রতি আমার আচরণ চোখে দেখিবার পর হইতে তাহার মন যেন আমার প্রতি ক্রমশই বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একদিন ইহা চরমে গিয়া পেঁছিল। খেঁদী জ্যাঠাইমাকে বোধ হয় এই সম্বন্ধে জানাইয়াছিল, তাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিতে তিনি বলিলেন, হ্যাঁরে, আমি না-হয় পর, কিন্তু এই ছোট ছোট ভাইবোনগুলো, এরা কি দোষ করলে—এরা যে আলোক-দা আলোক-দা করে মরে—তা কি কোনদিন তোর চোখেও পড়ে না ?

আমি জ্যাঠাইমার এই কথার তাৎপর্যটা ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তখন বলিলেন, ছুঁড়ীকে রোজ বলি, তুই কেন ফুল কুড়োতে যাস্ ! তোদের ওপর যদি ওর এতটুকু টান থাকতো, তা হলে কি শান্তিকে ফুল কুড়িয়ে দিত তোকে না দিয়ে ?

এতক্ষণে সব বুঝিলাম। তখন তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, বলি, শান্তি তোমার কোন্ শ্বশুরের মেয়ে যে তাকে রোজ ফুল কুড়িয়ে দেওয়া হয়, মালা গেঁথে দেওয়া হয় !

এই কথা শুনিয়া লজ্জায় আমার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলাম, খেঁদী ত কোনদিন আমায় বলে নি ?

বলতে হবে কেন—তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস্ যে দেখতে পাস্ না ? এই বলিয়া তিনি নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে পড়িবার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম, সঙ্গে সঙ্গে খেঁদী লণ্ঠন জ্বালিয়া আমার ঘরে দিতে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, হ্যাঁরে খেঁদী, মিথ্যে মিথ্যে করে এসব কথা কেন জ্যাঠাইমাকে লাগিয়েছিস্ ?

সে বলিল, মিথ্যে কথা কী আমি বলেছি ? তুমি কি শান্তিকে ফুলের মালা গেঁথে দাও না ?

বলিলাম, হ্যাঁ দিই, কিন্তু তুই কি কোনদিন আমার কাছে চেয়েছিস ?

সে বলিল, কেন আমি চাইতে যাবো—শান্তি কি চায় কোনদিন ?

আমি বলিলাম, শান্তি যে আমায় আচার, পেয়ারা, লজেঞ্চুস, বিস্কুট কত কি খাওয়ায়।

ওঃ—ভারি তো জিনিস ! বাড়ি থেকে চুরি করে এনে সবাই অমন খাওয়াতে পারে।

চুরি করে আনে ! তুই কি করে জানলি খেঁদী ?

সে বলিল, ওর মা'র কাছে কি রকম মার খায় মশায়—জানো ? এই বলিয়া আবার পরম উৎসাহে সে বলিয়া চলিল, একদিন বাসি কাপড়ে আচারের হাঁড়ি

থেকে আচার বার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল—ওঃ আমাদের সামনে কী মার দিলে শান্তিকে ওর মা ! তারপর আর একদিন ছোট ভাইয়ের খাবারের শিশি থেকে লজেঞ্জুস আর বিস্কুট চুরি করে সবে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় ওর মা ঘাট থেকে জল নিয়ে সেখানে এসে পড়েন ; দেখেন ওর কাপড়ের খুঁটে কী সব বাঁধা রয়েছে ! ব্যস, আর যায় কোথায়—কী মারটাই খেলে ও আমাদের সামনে ! ও কাঁদতে কাঁদতে ওর মায়ের পায়ে ধরে বললে, আর কক্ষনো করবো না মা, কক্ষনো না !

খেঁদীর মুখে শান্তির এই আচার, বিস্কুট ও লজেঞ্জুস চুরির কথা শুনিতে শুনিতে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সত্যই শান্তি আমাকে মধ্যে মধ্যে এই সব আনিয়া দিত। তবে কি আমারই জন্য সে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিত, শুধু আমাকে খুশি করিবার জন্য ? কথাটা তখন সম্পূর্ণরূপে আমি চিন্তা করিতে পারিলাম না। ঠিক আনন্দও নহে, ঠিক দুঃখও নহে, অথচ উহাদের সংমিশ্রণে একপ্রকার অনির্বচনীয় আনন্দবেদনাময় অনুভূতি যেন আমার শিরায় উপশিরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। আমার আর শুনিতে ভাল লাগিল না। খেঁদীও বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন একখানি বই খুলিয়া পড়িতে বসিলাম। কি পড়িলাম জানি না—তবে আমার মনে হইতেছিল, যদি আমার পাখীর মত ডানা থাকিত তবে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গিয়া একবার শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতাম, খেঁদী যাহা বলিয়াছে সত্য কিনা। তাহার নিজের মুখ হইতে একবার সেই কথাটি শুনিবার জন্য তখন আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

পরের দিন আমি বোধ করি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখনও বকুলতলায় আর কেহ আসে নাই। শুধু টুপটাপ করিয়া বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ার মধ্যে কেমন যেন একটা আত্মোৎসর্গের ভাব ! তাহাদের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম। এমন সময় পিছন দিক হইতে সহসা কে আসিয়া আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—কে ?

কোন উত্তর নাই।

তখন তাহার কাচের চুড়ি ও বাহু দুটির উপর হাত বুলাইয়া অনুভব করিতে করিতে বলিলাম, কে ?

এববার শান্তি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইতিপূর্বে কোনদিন সে আমার সহিত এইরূপ আচরণ করে নাই। তাই প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিলাম কিন্তু পরে তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম সে একা। তখনো তাহার সঙ্গিনীরা কেহই আসে নাই। আমি কোন কথা বলিবার আগেই ঝপ্ করিয়া সে তাহার ডান হাতটা আমার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। আজও সে

আমের আচার আনিয়াছিল। আমি হাতটি টানিয়া লইতেই সে হাসিয়া বলিল, আচার যে!

গম্ভীরভাবে বলিলাম, জানি।

শান্তি যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবটা কাটাইয়া লইয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, খাবে না?

বলিলাম, না।

কেন?

কহিলাম, তুমি চুরি করে আনো কেন আমার জন্যে?

সে বলিল, তা না হ'লে মা যে দেয় না।

নাই বা দিলে!

শান্তি বলিল, তুমি যে খেতে ভালবাসো। এই বলিয়া সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইল।

আমি তখন তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম, শান্তি, আমার জন্যে কেন তুমি এ কাজ করতে যাও? কেন তোমার মা'র কাছে তুমি মার খাও?

এইবার সে আমার হাত হইতে তাহার হাত দুইটি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, বেশ করি আমি মার খাই—তোমার ত তাতে লাগে না!

ইহার উত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। একসঙ্গে এত কথা তখন মাথায় ভিড় করিয়া আসিল যে তাহার একটিও মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি-লাম না।

অল্পদিনের মধ্যেই শান্তির সঙ্গিনীরা কেমন সবাই জানিতে পারিল যে আমাদের দুইজনের সম্পর্কটা কোথায় যেন তাহাদের চেয়ে স্বতন্ত্র, তাহাদের চেয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ। বিশেষ করিয়া খেঁদীর চোখে ইহা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়িল।

বৈশাখ মাসে আমাদের দেশে কুমারী মেয়েরা একটা ব্রত পালন করে, তাহার নাম পুণ্যিপুকুর। উঠানে পুকুরের মত ছোট একটি গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে একটি বেলের ডাল পুঁতিয়া দেয়। তারপরে গঙ্গামাটি দিয়া একটি শিবলিঙ্গ তৈরী করিয়া ফুল বিল্বপত্র গঙ্গাজল দিয়া প্রতিদিন সকালে পূজা করে। এই ব্রত একমাস ধরিয়া চলে—বৈশাখের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া শেষ দিন পর্যন্ত। ইহা পালন করিলে নাকি শিবের মত বর হয়; তাই দলে দলে মেয়েরা এই সময় খুব ভোরবেলা উঠিয়া ফুল সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। বাগানে বাগানে ঘুরিয়া —এ বাড়ি, ও বাড়ি করিয়া—কখনো বলিয়া কখনো বা না বলিয়া যে যেমন করিয়া পারে এই ফুল তুলিয়া আনে। ইহার জন্য মেয়েদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে—কে কাহাকে টেক্কা দিয়া কত বেশি ফুল লইতে পারে! শান্তি একা এই কাজটি ভালভাবে পারিয়া উঠিত না। অন্য মেয়েদের মত অত ভোরে তাহার ঘুম ভাঙিত না। তাই সে ফুলের সাজি লইয়া আসিয়া আমায় চুপি চুপি ডাকিত। আমি উঠিয়া তাহার সঙ্গে যাইতাম। আঁকুশি দিয়া আমি গাছের ডালগুলি নীচু

করিয়া ধরিতাম আর সে ফুল তুলিত। এইভাবে আমার সহায়তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুল পাইয়া সে যেমন খুব খুশি হইত তেমনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিত! আর তাহার এই কার্যে লাগাইতে পাইয়া আমিও যেন নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।

অন্য মেয়েরা ইহার জন্য মনে মনে শান্তিকে ঈর্ষা করিত, মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইত না। সব চেয়ে বেশি হিংস্র হইয়া উঠিত খেঁদী। সে রোজ আমার সঙ্গে যাইত এবং শান্তিকে যেমন ফুল পাড়িয়া দিতাম তাহাকেও সেইরূপ দিতে বাধ্য হইতাম। কোনদিন তাহার ফুল কম পড়িলে সে আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিত, আমি মাকে বলে দেবো। জ্যাঠাইমাকে যে আমি মনে মনে ভয় করিতাম ইহা খেঁদী ভাল করিয়াই জানিত; কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারিতাম না, মুখে তাহার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্বেগ দেখাইতে হইত। তবে ইহাতে আমার একটা সুবিধা হইত এই যে, জ্যাঠাইমাকে আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইত না। তাঁহার কন্যাকে অবহেলা করিয়া অন্য বালিকাদের প্রতি স্নেহ দেখাইলে তিনি যে কিছুতেই আমায় ক্ষমা করিবেন না ইহা আমি ইতিপূর্বে কয়েকটি ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই শান্তির জন্য যাহা আমার করিতে হইত, তাহাতেই খেঁদীকে আগে সঙ্গে লইতাম। ফলে খেঁদী যত না খুশি হইত জ্যাঠাইমা হইতেন তাহার চেয়ে বেশি।

আমাদের নানা রকমের খেলা হইত। পাড়ার দশ পনেরজন মেয়ে আসিয়া মাঠে জমিত। কখনো হইত লুকোচুরি, কখনো বা চু-কপাটি, কখনো বা আরো কত কি, যাহার নাম এখন আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দুইটা করিয়া দল হইত, আর কোন্ দলে কে যাইবে ঠিক করা হইত একরকম লটারী করিয়া। সে লটারীর পদ্ধতি অবশ্য অন্য রকম। দুইজন দুইজন করিয়া গলা-ধরাধরি করিয়া আসিত। তারপর তাহারা বলিত, 'ডাক ডাক কিস্‌কো ডাক'?

দলের যে দুইজন নায়ক, তাহারা বলিত, 'মেরী ডাক' অর্থাৎ আমার ডাক। তখন যে দুইজন আসিল, তাহারা বলিত, 'কে নেবে বকুল ফুল, কে নেবে গোলাপ ফুল?' অথবা 'কে নেবে রাজা, কে নেবে রাণী?' একটি নায়ক হয়ত বলিল, আমি নেবো বকুল ফুল কিংবা রাজা, অমনি উহাদের দুইজনের মধ্যে যে ওই নাম লইয়াছিল, সে তাহার দলে চলিয়া গেল। অপর জন তখন দ্বিতীয় দলে গেল। কখনো কখনো আবার দুইজনে হাতে করিয়া দুইটি জিনিসও লইয়া আসিত। তারপর বলিত, কে নেবে ঘাস, কে নেবে পাতা? এইভাবে দুইটি দল গঠিত হইত। আমি কিন্তু গোপনে শান্তির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম —সে যে নামটি লইবে, তাহা যেন শেষে উচ্চারণ করে। আমি তাহা বুঝিয়া যতবার ডাকিতাম, ততবারই শান্তি আমার দলে চলিয়া আসিত। খেঁদী ইহাতে মনে মনে খুব চটিয়া যাইত। অন্যান্য মেয়ের মত সেও চেষ্টা করিত আমার দলে আসিতে, কিন্তু পারিত না।

এক একদিন আবার আমি 'বুড়ি' হইতাম। একটি মেয়ের চোখ টিপিয়া ধরিতাম, তারপরে সকলে লুকাইয়া যখন 'টুকো' বলিত, তখন আমি তাহার চোখ ছাড়িয়া দিতাম। তারপর সে খুঁজিয়া বেড়াইত সঙ্গীদের। আর তাহারা সেই অবসরে এখান-ওখান হইতে টুপটাপ করিয়া লুকাইয়া আসিয়া আমায় ছুঁইয়া দিত। বেশ লাগিত আমার এই সব খেলা। কখনো তাহাদের সঙ্গে খেলিতাম কখনো বা বুড়ি হইতাম। বাড়িতে, ঘরের মধ্যে, মাঠে, অথবা ফুল কুড়াইতে যাইয়া বনের মধ্যে এই সব খেলা চলিত।

মাঝে মাঝে 'কানামাছি'-খেলাও হইত। একজনের চোখ কাপড়ের আঁচল দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া রাখা হইত, তারপর বাকি সকলে একে একে তাহার মাথায় চাঁটি মারিয়া বলিত, কে মারলে? যদি চক্ষুবন্ধ অবস্থায় সে বলিতে পারে কে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে চোর হইবে। অর্থাৎ তাহাকে আবার এইভাবে চোখ বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং অন্য সকলে পূর্বের মতো তাহার মাথায় হাত স্পর্শ করিয়া বলিবে কে মারলে?

আমিও এই খেলা খেলিতাম। কিন্তু আশ্চর্য, যত মেয়ে আমার মাথায় মারিত কাহারো নাম ঠিক বলিতে পারিতাম না—হয়ত বেলা মারিল, বলিলাম রেণু মারিয়াছে, কিংবা রেণু মারিল বলিলাম খেঁদী; অথচ শান্তি যেই মারিত, অমনি বলিয়া দিতাম তাহার নাম। চোর হইতে শান্তির ঘোরতর আপত্তি, সর্বদা অন্য সকলের উপরে থাকিতে এবং সকলকে সব বিষয়ে টেক্কা দিতে পারিলেই সবচেয়ে খুশি হইত সে। তাই আমার উপর রাগিয়া গিয়া শান্তি বলিত, তুমি যেমন কেবলই আমায় চোর করো, আমিও তেমনি তোমায় করবো। এত জন আছে, কারো নাম তুমি বলতে পারো না, বেছে বেছে শুধু আমার বেলাই আর ভুল হয় না। আচ্ছা বাঁধো আমার চোখ। এই বলিয়া নিজেই আঁচল দিয়া সবলে নিজের চোখ দুটি বাঁধিয়া ফেলিত।

শান্তি আমার উপর রাগ করিত বটে, কিন্তু আমি তাহাকে কিছুতেই বুঝাইয়া পারিতাম না যে, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।

অন্য সকলের নামও আমি করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঠিক হয় না, তা আমি কি করিব? তাহার হাতের স্পর্শ আমার মন কেমন করিয়া চিনিতে পারিত, আজও তাহা বুঝিতে পারি না। আর শুধু আমিই বা কেন? শান্তির বেলাও ঠিক তাহাই হইত! সেও আমার বেলা ঠিক নাম বলিয়া দিত। অন্য কাহারো স্পর্শ সে বুঝিতে পারিত না, কিংবা কেবল আমাকে জব্দ করিবার জন্যই এইরূপ করিত, তাহা জানি না। যাহা হউক আমাদের দুইজনের এইভাবে চোর হওয়াতে অন্য সব মেয়েই খুব কৌতুক অনুভব করিত এবং হো হো করিয়া হাসিত তাহাদের চোর হইতে হইল না বলিয়া। শুধু খেঁদী সে হাসিতে যোগ দিতে পারিত না, সে নিশ্চয় মনে মনে প্রার্থনা করিত, আলোক-দা যেন তাহাকে একবার চোর করে। চোর হইবার জন্য কেবল তাহারই মন এইরূপভাবে লালায়িত হইয়া উঠিত।

আমি কোন খেলাধুলাই জানিতাম না, তাই পূর্বে কোনদিন এইভাবে সময় নষ্ট করি নাই। ছেলেবেলা হইতে শুধু বই লইয়াই কাটাইয়াছি এবং এই সময়টা যাহারা খেলা করিয়া নষ্ট করে মনে মনে তাহাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য কত ধিক্কার দিয়াছি। স্কুলের ছেলেরা কতদিন আমাকে কত সাধিয়াছে খেলা শিখাইবার জন্য, কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হই নাই। মধু ও কমলকে খেলাধুলা না করিয়া সেই সময়টা পড়িবার জন্য কত উপদেশ দিয়াছি। তাহারা আমার কথায় খেলাধুলা বন্ধও করিয়া দিয়াছে এবং হাতে হাতে তাহার ফলও পাইয়াছে। তাই আমাকে এখন এইভাবে খেলাধুলা করিতে দেখিয়া তাহারা সকলে রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। কমল ও মধু প্রায়ই আমায় বলিত, শেষকালে মেয়েদের সঙ্গে খেলছিস্—তার চেয়ে চল্ না ফুটবল খেলিগে স্কুলে।

আমি বলিতাম, না ভাই, ও-সব মারধোর, হাত-পা-ভাঙা খেলার মধ্যে আমি নেই। তাছাড়া এত সময়ই বা কোথায়? এতে বরং বিকেলে পড়াশুনোও করা হয় আবার একটু বিশ্রামও নেওয়া হয়, মন্দ কি?

তার মানে আমাদের সঙ্গে আর বেড়াতে যাবি না, তাই বল্। আমরা জানি, তুই আর আমাদের আগের মত দেখতে পারিস না। চল্ রে কমল চল্। এই বলিয়া মধু তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। কমল যাইবার সময় আর একবার আমায় অনুরোধ করিল, কিন্তু আমি বলিলাম, তোরা যা ভাই, আমার বেড়াতে ভাল লাগে না।

ইহার পর তাহারা আরো কয়েকদিন আসিয়াছিল আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য, কিন্তু আমি যাই নাই, তাহাদের ফিরাইয়া দিয়াছি। তাহাদের সঙ্গে যাইয়া আর আমি পূর্বের ন্যায় আনন্দ পাইতাম না। বেড়াইতে গিয়া তাহারা কেবল আমাকে নানা প্রশ্ন করিত—এ বইটা কেমন, ও বইটা কেমন, এটার মানে কি, ও বইতে এই কথাটা লিখেছে কিন্তু 'ডিক্সনারীতে' এর মানে অন্যরকম, আচ্ছা তুই ও-বইটা পড়েছিস্ ত—ইত্যাদি। কেবল লেখাপড়ার কথা তাদের মুখ হইতে শুনিতে শুনিতে আমার কান যেন ঝালাপালা হইয়া যাইত। আমি মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম—তাহাদের সঙ্গে কি আমার কেবল ওই এক সম্পর্ক! কেবল তাহাদের জ্ঞানের পিপাসা আমাকে মিটাইতে হইবে? আমার দিকে—আমার মনের দিকে—আমার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের দিকে কেহ কি একটিবার ফিরিয়া চাহিবে না? তাহাদের বাড়িতে মা-বাপ, ভাই-বোন সব আছে,—তাঁহাদের নিকট হইতে স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া তাহাদের মন আছে ভরিয়া—তাই বুঝি আমার কাছে আসিয়া কেবল লেখাপড়ার কথা ছাড়া অন্য কিছু তাহারা ভাবিতে পারে না। জগতে সবই পাইল ইহারা, কিন্তু আমি কী পাইলাম? তাহারা যাহা চায়, আমার মন যে তাহাতে ভরে না, কেমন করিয়া একথা তাহাদের বুঝাইব? তাই আমি তাহাদের অনুরোধ আর রক্ষা করিতে পারিতাম না, তাহারাও আমাকে ভুল বুঝিয়া আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিত।

সেবার হাফ-ইয়ার্‌লি পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হইলাম। তবে এবারে ফার্স্ট হওয়ার একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, সকল বিষয়েই আমি সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পায়ইাছিলাম—শুধু বাঙলা ছাড়া ; হেডপণ্ডিতমশায় ওটাতে আমায় সাত নম্বর কম দিয়াছিলেন।

হেডমাস্টার মশায়ের স্ফূর্তি দেখে কে। তিনি হেডপণ্ডিতমশায়কে বলিলেন, দেখলেন পণ্ডিতমশায়, আমি বলেছিলুম এ ছেলে কখনো এত কম নম্বর পেতে পারে না—একটা কিছু কারণ নিশ্চয়ই ছিল যার জন্যে গত বাৎসরিক পরীক্ষাটা খারাপ করে ফেলেছে।

পণ্ডিতমশায় মাথাটা চুলকাইয়া বলিলেন, আপনি এই ছ'মাস ওর পেছনে যা খাটলেন তাতে যে-কোন সাধারণ 'মেরিটে'র ছেলেও ভাল না করে পারে না।

হেডমাস্টার মশায় হুঁকোতে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, শুধু স্কুলের প্রেস্টিজের জন্যে—বুঝলেন না পণ্ডিতমশায় ? ওকে ভাল করে পড়াবার জন্যে আমায় দুটো ট্যুইশানি ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই বলিয়া একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, কেবল আপনার বাঙলাটায় যা একটু কম নম্বর পেয়েছে—

পাবে না। কি ডেঁপো ছেলে—রচনা লিখবে যা-তা তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। আর পাঁচটা ছেলে যেমন বইটই দেখে তৈরি হয়ে আসে, ও একেবারে তার ধার দিয়েও যাবে না। কেবল বুড়োমি—কতকগুলো নামকরা লেখকদের বাঙলা ও ইংরেজি লেখা উদ্ধৃত করে খাতায় বিদ্যে ফলাবে। আরে বাবা, তুই যে দু-চারখানা বাইরের বই পড়েছিস তা সবাই জানে। তা বলে তাকে এর মধ্যে টেনে আনবার দরকার কি। আমি তোর রচনা দেখতে চাইছি—তুই তার ভেতরে অন্যে কি বলেছে না-বলেছে ঢোকাতে যাস কেন।

হেডমাস্টার মশায় হুঁকায় আরো ঘন ঘন বার কতক টান দিয়া বলিলেন. আপনি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবেন ভাল করে।

পণ্ডিত মশায় রাগতকণ্ঠে বলিলেন, কে মশায় ও-ছেলেকে ক্লাসের মধ্যে বোঝাতে গিয়ে অপমানিত হবে ? সেদিন যেমন ওই কথা বললুম, অমনি পকেট থেকে একটা ছোট ইংরেজি বই বার করে বললে, রচনা লিখতে গেলে পাঁচটা 'কোটেশন' দিতে হয় স্যার। এই দেখুন বিখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিকের 'এসে' বই। কি নাম সে বইটার ভুলে গেছি। বুঝলেন না মাস্টারমশায়, কলকাতার স্কুলের ছেলে ওরা, লেখাপড়া যত না শেখে আড়ম্বরটা শেখে তার দশগুণ।

হেডমাস্টার মশায় বলিলেন, আচ্ছা আমি আলোককে বলে দেবো'খন—তবে আপনি একটু নজর রাখবেন।

পাশের ঘর হইতে তাঁহাদের সব কথাই আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

পরদিন হেডমাস্টার মশায় আমায় ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, বেশ লিখেছিস্ তুই বাঙলা রচনা, আমি ভারি খুশি হয়েছি। স্কুলে দু-দশ নম্বর কম পাস্ বলে কিছু ভাবিস্ নি—ইউনিভার্সিটিতে তুই এখানকার চেয়ে আরো বেশি নম্বর পাবি

দেখে নিস্। আমি তোর খাতা দেখেছি। তবে ক্লাসের বইগুলো একটু ভাল করে পড়তে হবে—বইয়ের প্রশ্নের উত্তর যদি বই থেকে ঠিকভাবে না দিতে পারিস, তাহলে 'মার্ক' কমে যাবে।

জ্যাঠামশায় আমার পরীক্ষার এই খবর শুনিয়া আমায় উৎসাহ দিতে আসিলেন। তিনি সংসারের কোন খবর রাখিতেন না। কে কি করিতেছে, কে কি খাইতেছে, কাহার জন্যে কি ব্যবস্থা করা উচিত, এ সমস্ত জ্যাঠাইমাই করিতেন। শুধু উৎসাহ দিবার সময় নিজে আসিয়া বলিতেন, আমার মুখটা রাখিস বাবা—একটা ছেলে মানুষ করা যে কী ব্যাপার, তা ঈশ্বর জানেন! দশের কাছে যেন আমার মাথা হেঁট না হয়।

এখন বুঝি, ছেলে মানুষ করার অর্থ কী। তাই আজ হাসি পায় জ্যাঠামশায়ের সেদিনকার 'মানুষ-করা' কথাটি মনে করিয়া। দুটো খাইতে দিলে, কিংবা দুই-খানা কাপড় পরিতে দিলেই মানুষ করা হয় না। মানুষের অন্তরের ভালবাসা, মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ না পাইলে কেহ কখনো মানুষ হইতে পারে না!

১৩

এমনি করিয়া আরো কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর একদিন হঠাৎ শুনিলাম শান্তির বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার কোন ধনীর সন্তানের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, এক পয়সা তাহারা লইবে না, বরং শান্তির মাথা হইতে পা পর্যন্ত সোনারুপায় মুড়িয়া দিবে। শান্তির হস্তরেখা বিচার করিয়া পাত্রের পিতা দেখিয়াছেন যে, সে অত্যন্ত সুলক্ষণবতী। তাই তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শান্তির এই অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া তাহার মায়ের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, সুতরাং অতি সত্বর শুভকার্য যাহাতে সম্পন্ন হয় সেজন্য তিনি সেই মাসের শেষ তারিখেই দিন ধার্য করিয়াছেন।

তখনো পাঁচ দিন বাকি ছিল মাসকাবারের। আর মাত্র চারদিন পরে বিবাহ—কথাটা শুনিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। শান্তিকে আগে যতটা ছেলেমানুষ ভাবিয়াছিলাম আসলে নাকি তাহার চেয়েও তাহার বয়স বেশি ছিল। জ্যাঠাইমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া তাহার মাকে বলিতে শুনিয়াছি, এই তেরো পূর্ণ হয়ে চোদ্দয় পড়লো, শান্তিকে আর যেন রাখতে সাহস হয় না দিদি!

যাহা হউক, শান্তির মা আসিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন এবং বিশেষ করিয়া আমার ও ভূতোর নাম উল্লেখ করিয়া জ্যাঠাইমাকে বলিলেন, ওদের একটু সকাল সকাল নিয়ে যেয়ো দিদি, ওদেরই ত আমোদ বেশি,—তা ছাড়া ওদের একটু খাটতে-খুটতে হবে। আমার দেখাশুনো

করবার আর লোক নেই।

ভুতো ও আমি দুজনে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ভুতো একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, আমি লুচি পরিবেষণ করবো কাকিমা!

তিনি বলিলেন, আচ্ছা। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আলোক, তুই কি পরিবেষণ করবি বললি না ত?

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ভুতো বলিয়া উঠিল, ও জল আর নুন পরিবেষণ করবে কাকিমা, লুচির ধামা নিয়ে ও নড়তেই পারবে না!

আমার দেহ একটু ক্ষীণকায় ছিল বলিয়াই হউক কিংবা ভুতোর চেয়ে আমি বয়সে ছোট ছিলাম বলিয়া, জানি না, তাহা শুনিয়া শান্তির মা বলিলেন, ঠিক বলেছিস, তুই তা হলে এই কাজগুলোই করবি—একটু সকাল সকাল যাস্ বাবা। এই বলিয়া তিনি আমাকে ও জ্যাঠাইমাকে অনুরোধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জ্যাঠাইমা শান্তির মায়ের সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা পার হইয়া মাঠের রাস্তা পর্যন্ত গেলেন—বিয়েতে কে কে আসিবে, কত খরচ হইবে, আর সেই টাকাটা কে দিবে ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে করিতে।

আমি সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, শান্তির বিয়ে আর ক'দিন পরে, অথচ শান্তি ত আমাকে কিছুই বলিল না! একবারও ত সে কাল আমাকে সে কথা জানাইতে পারিত!

এমন সময় ভুতো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ভাবছিস্ কেন আলো, আমার কাছে লুচির ধামা থাকবে আর ভাঁড়ার থেকে সন্দেশ পানতুয়া চুরি করে এনে তোকে গেলাস গেলাস খাওয়াবো। তুই ত জল দিবি, তোর কাছে কত গেলাস থাকবে, কেউ জানতেও পারবে না। ওঃ কেয়া মজা! আর দ্যাখ্, তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত আমাকে এসে বলে দিবি—আমি লুকিয়ে গোয়াল ঘরের পিছনে গিয়ে তোকে খেতে দেবো, কেউ জানতেও পারবে না।

আমি গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে চুপ করিল এবং আমার দেহ হইতে সহসা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। আমি সেখান হইতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তারপর খাতা বই গুছাইতে লাগিলাম হেড্মাস্টারের বাড়ি পড়িতে যাইবার জন্য। ভুতো তখন ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, ভাই আলো, রাগ করলি?

না। বলিয়া আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

সেদিন মাঠে সবাই খেলিতে আসিল, কিন্তু শান্তি আসিল না, পরের দিনও তাহাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কতক গুলি ফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আমি নিজে তখন তাহার বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া শান্তি একেবারে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইল।

আমি বলিলাম, শান্তি, তুমি খেলতে যাওনি কেন? কালকে যাওনি, আজও গেলে না—

শান্তি কি একটা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ যেন সেটা সামলাইয়া লইল। তারপর মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা যে যেতে দেয় না।

বলিলাম, কেন শান্তি?

সে আর সেকথার উত্তর দিতে পারিল না, কেবল একবার পিছন দিকে ও একবার আশেপাশে চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিল। আমি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, শান্তি, তোমার নাকি বিয়ে?

অর্ধস্ফুটস্বরে সে বলিল, ধ্যেৎ! তারপর আমার মুখের দিকে বিদ্যুৎগতিতে একবার তাকাইয়া খপ্ করিয়া তাহার শাড়ির একটি প্রান্ত দাঁতের কোণে চাপিয়া ধরিয়া এক হাতে তাহা পাকাইতে লাগিল। শুধু চকিতে তাহার চোখে মুখে কিসের একটা রঙ যেন ছিটকাইয়া উঠিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল। আমি তাহা দেখিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। মনে হইল, এ শান্তি যেন সে শান্তি নহে—যাহাকে আমি এতদিন ধরিয়া দেখিয়াছি, যাহার সহিত কত খেলা করিয়াছি, এমন কি দুই দিন পূর্বেও যে আমার অতি নিকটে ছিল, আজ তাহাকেই যেন দূরের কোন্ স্বপ্নলোকের বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার মধ্যে একটা নূতন রূপ দেখিয়া আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সহসা এই কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, শান্তি, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আমার কথা মনে থাকবে ত?

শান্তি কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল এমন সময় সহসা তাহার মা সেখানে আসিয়া পড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁরে শান্তি, তুই কি কানে কালা হয়েছিস? কখন থেকে আমি যে চেঁচিয়ে মরছি শুনতে পাচ্ছিস্ না? বলি, সন্ধ্যে যে হলো, তুলসী তলায় পিদীম দেখাতে হবে না?

যাচ্ছি মা—বলিয়া শান্তি তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন আমার দিকে চাহিয়া তাহার মা বলিলেন, বাবা আলো, সকাল সকাল আসিস বিয়ের দিন—শান্তির বিয়েতে তোকে যে কোমর বেঁধে খাটতে হবে।

নিশ্চয়। আমাকে যে কাজ আপনি করতে বলবেন আমি করে দেবো। এই বলিয়া সেদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। শান্তির সহিত দেখা হইয়াছিল বলিয়া মনটাও খুব খুশি ছিল।

১৪

বিয়ের দিন সকাল সকাল শান্তিদের বাড়ি আমরা সকলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা তখন সবে লাগিয়াছে। আলোয়, লোকের ভিড়ে, চীৎকারে, লুচি ভাজার গন্ধে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে। জ্যাঠাইমাকে লইয়া আমি ও ভূতো একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। খেঁদী তাহার ছোট ছোট ভাইবোনের দলকে সামলাইতে সামলাইতে ভিড়ের ভিতরে কোথায় হারাইয়া গেল। জ্যাঠাইমা আমাকে বলিলেন খেঁদীর সন্ধান লইবার জন্য। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে শান্তিদের শোবার ঘরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভীষণ ভিড়—ক'নে সাজান হইতেছিল। বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাটজন স্ত্রীলোক—বালিকা, যুবতী বৃদ্ধা সকলে মিলিয়া শান্তিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যেন কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। মনে মনে আমার বাসনা ছিল শান্তির সহিত একটু দেখা করিবার, কিন্তু সে ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাহার কাছে যাওয়া দূরে থাক্, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাই তখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। আমি সারা বিকাল ধরিয়া ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করিয়া একটি মালা গাঁথিয়াছিলাম। শান্তিকে দিবার জন্য। যে ফুলগুলি সে বিশেষ করিয়া পছন্দ করিত সেইগুলি দিয়াই সযত্নে এই মালাটি তৈরী করিয়াছিলাম। তাই নিজে হাতে করিয়া সেটি তাহাকে দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। অবশেষে খেঁদীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মারফৎ উহা শান্তির নিকট চালান করিলাম।

এদিকে রাত্রি আটটা বাজিতেই বর আসিল পাল্কী করিয়া। চার-পাঁচটি শাঁখ তৎক্ষণাৎ একত্রে বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে দিতে বাড়ির বাহিরে ছুটিয়া গেল। এই সময়ে একসঙ্গে যেন বিবাহবাড়ির কোলাহল সর্বোচ্চ স্তরে উঠিল। আমাদের কাজ এইবার শুরু হইল। আমরা কয়েকটি ছেলে বরযাত্রীদের চা, জল, পান, সোডা, লেমোনেড প্রভৃতি খাওয়াইতে লাগিলাম। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আবার তাহাদের খাওয়াইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইল। কুশাসন বিছাইয়া, মাটির গ্লাসে জল দিয়া, পাতা পাতিয়া তাহাতে নুন দিয়া আমরা সব প্রস্তুত করিতেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরিবেষণ করিতে লাগিলেন লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। ভূতো এই দলে ছিল। জলের জগ হাতে করিয়া আমি ও আরো দুইজন ছেলে সেখানে মোতায়েন রহিলাম ভোজনরত বরযাত্রীদের শূন্য গেলাস তাঁহাদের হুকুমমত পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য।

ইহার ফাঁকে আমি চট করিয়া একবার বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম যদি শান্তির সঙ্গে দেখা হয় এই আশায়। আমি তাহাকে দেখিলাম বটে কিন্তু শান্তি আমাকে দেখিতেই পাইল না। সে যেন কোন দেবী, পূজার বেদীতে বসিয়া

আছে, আর অসংখ্য ভক্ত চারিদিক হইতে তাহার অর্চনায় ব্যস্ত, আমি তাহার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম কিন্তু দেবী আমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

তখন বিবাহ শুরু হইয়া গিয়াছে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন বরের হাতের উপর শান্তির হাত রাখিয়া। বধূবেশে শান্তিকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। তাহার সর্বাঙ্গে লাল বেনারসী শাড়ি, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের তিলক, দুই হাতে নবনির্মিত স্বর্ণালংকার ঝিকিমিকি করিতেছে—শান্তিকে যেন আর চেনা যায় না। সে যেন কোন কল্পলোকের রাজকন্যা। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই কি সেই শান্তি! কোথা হইতে সে এমন অপূর্ব শ্রীময়ী মূর্তি পাইল? আর তাহার পার্শ্বে শান্তির বর —তাহারই বা কি রূপ! তরুণ যুবক, কন্দর্পকান্তি চেহারা—অগ্নিশিখার মত যেন জ্বলিতেছে। মনে হয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা বুঝি শান্তির সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য মর্তলোকে আসিয়াছে। বাস্তবিক, তাহাদের দুইজনকে একত্রে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। দেখিয়া আশা মেটে না, আরো দেখিতে ইচ্ছা করে।

আমি কিন্তু সে দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম না। শান্তি যদি আমার দিকে চাহিত, আমায় দেখিত, তাহা হইলে হয়ত সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার বিবাহ দেখিতে পারিতাম; কিন্তু তাহার এই অবহেলা যেন আমার মর্মে শেলাঘাত করিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে সে কি আমায় ভুলিয়া গেল! এইরূপ আরো কত কি চিন্তা করিতে করিতে আমি আবার বাহিরে আসিয়া কাজে লাগিয়া গেলাম। জল, কলাপাতা, মাটির গেলাস, খুরি লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। কত লোক আসিল, কত লোক খাইয়া গেল, কিন্তু আমার মনে সর্বক্ষণ শান্তির সেই অবহেলার কথাটাই পাক খাইয়া মরিতে লাগিল।

হঠাৎ একবার মনে হইল, হয়ত আমি শান্তির উপর অবিচার করিতেছি—সে আমায় দেখিতে পায় নাই। ওই ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া হয়ত আমারই উপর সে রাগ করিয়াছে। এই চিন্তা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ইহাই ঠিক, তাহা না হইলে শান্তি কখনো ইচ্ছা করিয়া আমায় না দেখিয়া থাকিতে পারে!

আমি আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম—অতি সঙ্গোপনে। আশায় আশংকায় আমার মন তখন দুলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ভুতো ছুটিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, এই আলো, এই সন্দেশ দু'টো খেয়ে ফেল— তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে! কি করবো ভাই, বুড়ো হারাণ ঠাকুর্দাটা ভাঁড়ার থেকে কিছুতেই নড়ে না—একবার ফাঁক পেতেই, পান নেবার নাম ক'রে, বাস্—একেবারে একমুঠো সরিয়েছি। ওঃ ক্ষিদেয় আমার পেটে যেন কুকুর কাঁদছে। নে নে, খেয়ে নে টপ্ করে, এখুনি আবার কেউ এসে পড়বে!

আমি বলিলাম, তুই খেয়ে ফেল ভাই, আমার এখনো ক্ষিদে পায়নি।

ভুতো কোন কথা শুনিল না। আমার মুখে দুইটা সন্দেশ পুরিয়া দিয়া বলিল, খাটতে খাটতে ক্ষিদেটা অনুমান করা যায় না, বুঝলি—কিন্তু খেয়ে যেতে হয়, তা না হলে পরে আর কিছুই মুখে দিতে পারবি না। এই বলিয়া যেমন সে ঝড়ের মত আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মত চলিয়া গেল।

আমি তাহাকে আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সন্দেশ দুইটা তখন আমার গলার মধ্যপথে যাইয়া এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল যে, না পারি তাহা গিলিতে, না পারি বাহির করিতে। মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—বুঝি শ্বাস বন্ধ হয় এখনি! তবু 'জল, জল' বলিয়া আমি প্রাণপণে তখন চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিন্তু কেহ বোধ হয় সে কথা বুঝিতে পারে নাই, কেননা আমার মুখ দিয়া তখন জলের পরিবর্তে গোঁ-গোঁ করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছিল। কে তাহার অর্থ বুঝিবে? শেষে একটি লোক কোথা হইতে হঠাৎ সেখানে ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাকে চিনি না, সে বোধ হয় আমার অবস্থা দেখিয়া দূর হইতে অনুমান করিতে পারিয়াছিল; তাই আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না না করিয়া 'জল, জল' বলিয়া এমনভাবে সে চীৎকার করিয়া উঠিল যে. চার-পাঁচ জন ছেলে জলের জগ হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আরো বহু লোক আসিয়া আমাকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। 'কি হয়েছে' 'কি হয়েছে'—সকলের মুখে তখন এক কথা! সবাই আশংকা করিতেছিল যেন কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

দুর্ঘটনা সত্যই, কিন্তু তাহা মুখে বলিবার নয় এমনই লজ্জাকর। তবু লজ্জার মাথাটা খাইয়া কথাটা বলিতে হইল। তখনই একটা হাসির রোল উঠিল আমার চারিদিকে। কে একজন চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, চুরি ক'রে খেতে গেলে এই রকমই হয়! এইভাবে আরো কত লোককে কত কথা বলিতে শুনিলাম। কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা ফিরিয়া পাইয়াছি বলিয়া তখন সবই যেন সহ্য হইল। আমি শুধু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে সবাইকে কাজে ব্যস্ত দেখিয়া আরো যেন সুস্থ বোধ করিলাম। মনে ভাবিলাম, যাক্ এখানকার কেহ ত আমায় সেই অবস্থায় দেখে নাই।

সবে এই কথাটি চিন্তা করিতেছি এমন সময় কোথা হইতে শান্তির মা ছুটিতে ছুটিতে একেবারে আমার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই যে আলো তুই বাবা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্—আমি চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথায় গেল বলে। লাগেনি ত বাবা বেশি? কোথায় পড়ে গিয়েছিলি?

আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, পড়ে গিয়েছিলুম কে বললে?

তিনি বলিলেন, আমি শুনলুম তোর মাথা ফেটে গেছে—মাথায় সবাই মিলে জল দিচ্ছে, হাওয়া করছে। ভয়ে মরি একেবারে, আজ একটা শুভ দিনে এ কি

কাণ্ড হলো! তাই ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মাথার কোন জায়গাটা কেটেছে দেখি? এই বলিয়া তিনি আমার মাথাটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, পড়েও যাইনি, মাথাও ফাটেনি।

তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, তবে?

গোটা দুই ঢোক গিলিয়া বলিলাম, গলায় খাবার আটকে গিয়ে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

তাই ভাল, বাবা, এ দেশের মানুষগুলো কি—দিনকে একেবারে রাত করে দেয়! এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, যাক, তোকে আর কোন কাজ করতে হবে না—যা, তুই বাসর-ঘরে গিয়ে বসগে যা—বর-কনে এখন সেখানে আছে।

যাচ্ছি। বলিয়া পা বাড়াইতেই প্রথমে মনে হইল ভাগ্যিস শান্তির কানে আমার এই দুর্ঘটনার কথা পেঁছায় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল শান্তি শুনিতে পাইলে যেন ভাল হইত; সে হয়ত এখনি ছুটিয়া আমায় দেখিতে আসিত। একই সঙ্গে এইরূপ বিপরীতভাবাপন্ন কথা যখন চিন্তা করিতেছি তখন তিনি আবার সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁরে আলো, শান্তির বর কেমন হয়েছে—দেখেছিস?

বলিলাম, হাঁ দেখেছি।

তিনি আবার বলিলেন, তোর কেমন লাগল?

বার দুই ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম, বেশ সুন্দর হয়েছে কাকিমা!

তিনি একেবারে খুশিতে গদ্‌গদ্‌ হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া একেবারে গিয়া বাসরঘরের দরজার কাছে বসাইয়া দিলেন।

বাসরঘরে তখন নাচ গান ও রঙ্গ-তামাসার বন্যা চলিতেছিল। পাড়ার বৃদ্ধা ক্ষান্তপিসী তোবড়ানো মুখে আলতা পাউডার মাখিয়া কাহার একখানি নতুন বেনারসী শাড়ি পরিয়া নাচিতেছেন—আর গান গাহিতেছেন—'আমার ভাঙা বাগান যোগান দেওয়া ভার, ফুলে নেই সে বাহার।'

বিদ্যাসুন্দর নাটকের হীরা মালিনীর বিখ্যাত গান এটি। ক্ষান্তপিসী লেখাপড়া জানেন না, তবে তাঁহার যৌবনকালে যাত্রা শুনিয়া ইহার সুর তাল, লয়, এমন কি গাহিবার বিশেষ ভঙ্গি ও নাচিবার ঠাটটি পর্যন্ত হুবহু নকল করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে কতবার কত বাসরঘরে তিনি সেই গানটি গাহিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন সে কথা তখন উপস্থিত সকলে বিশ্বাস না করিলেও ক্ষান্তপিসি কিন্তু ভুলিতে পারেন নাই। তাই সকলে যখন সেই পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধার নাচ-গান শুনিতে শুনিতে চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল, তখন তিনি সহসা একটি মেয়ের গালে ঠোনা মারিয়া বলিলেন,—আ মর্ ছুঁড়ী, হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লি যে! এই ক্ষেন্তিপিসীর নাচ দেখবার জন্যে সাত গাঁয়ের মেয়ে-মদ্দ ভেঙে পড়তো,

বাসরঘরে জায়গা হতো না—জিগ্যেস করিস্ তোর বাপকে—আমার নাচের কথা তুই কি জানবি ?

আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া শান্তির বরের হাসি আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতে তাহার চোখ মুখ যখন লাল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় ক্ষান্তপিসী গিয়া নতুন বরের হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি ভাই সুন্দরের পাটটা করো, তা না হলে জমছে না, আমার মনে ঠিক রঙ লাগছে না—তাই এই ছুঁড়িরা এত হাসছে।

শান্তির বর ছিল ভারি আমুদে। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষান্তপিসী তখন তাহার দুই হাত ধরিয়া নাচিতে শুরু করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বর হইতে শুরু করিয়া সকলে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া শান্তির হাসি যেন আর থামিতে চায় না—সে পেট টিপিয়া বারংবার তাহার পার্শ্ববর্তিনী সঙ্গিনীর ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল।

আমার আর ইহা সহ্য হইল না। শান্তিকে ওই রকম প্রবলভাবে হাসিতে দেখিয়া আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। কেন, তাহা বুঝি নাই। তবে আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, হয়ত আমাকে দেখিতে পাইলে শান্তির হাসি থামিবে। কিন্তু ইহাতে কোন ফলই ফলিল না। সে আমাকে দেখিতে ত পাইলই না—উপরন্তু তাহার হাসির রোলও যেন আরো বাড়িয়া গেল। আমি তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। তবুও আসিবার আগে আর একবার শান্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িলাম না। খেঁদী বাসরঘরে বসিয়া হাসিতেছিল। বিনা কারণে আমি তাহাকে ডাকিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, খেঁদী, বাড়ির চাবিটা তোর কাছে ঠিক আছে ত—দেখিস্ সাবধানে রাখিস, ভিড়ের মধ্যে যেন হারিয়ে না যায়।

খেঁদী হাসি থামাইয়া ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাহার আঁচলের প্রান্তটা একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, ঠিক আছে। আমি এমনভাবে কথা বলিতেছিলাম যাহাতে শান্তির কানে তাহা গিয়া পেঁছায়, কিন্তু ইহাতেও যখন শান্তির কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটিল না তখন পুনরায় বলিলাম, খেঁদী, তুই এখান থেকে যেন কোথাও যাসনি, আমি এখনি খেয়ে এসে চাবি নিয়ে বাড়ী চলে যাবো, তোরা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যাস্।

এর পরও যখন শান্তি একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল না তখন সত্যই আমার মনে বড় আঘাত লাগিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর এখানে থাকিব না। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিবাহ-বাড়ির সমস্ত আনন্দ কে যেন আমার চোখের উপর হইতে হরণ করিয়া লইল ! লোকের হাসি-ঠাট্টা, ছুটাছুটি খাওয়া-দাওয়া, উৎসব-আয়োজন কোনটাতেই আর আমার কোন উৎসাহ রহিল না। আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামান্য কিছু খাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মনে

হইতে লাগিল—সারা পথ শান্তির সেই উচ্চ হাসি যেন আমাকে অনুসরণ করিতেছে। মনে আছে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাইতে পারি নাই।

পরের দিন সকালে বরকনে বিদায় হইবে। জ্যাঠাইমা ও খেঁদী সকাল সকাল কাজকর্ম সারিয়া শান্তিদের বাড়ি ছুটিল। ভুতোও ছোট ছোট ভাইবোন সঙ্গে করিয়া সেখানে গেল। আমি সকাল হইতে উঠিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম কিছুতেই যাইব না। তাই ভুতো যাইবার সময় যখন আমাকে ডাকিতে আসিল, বলিলাম, পড়া হয়নি ভাই, এখন আমি যেতে পারবো না, তুই যা।

ভুতো চলিয়া গেল। এদিকে বরকনের বিদায়ের সময় যত আসন্ন হইতে লাগিল ততই আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল শান্তিকে দেখিবার জন্য। অবশেষে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঘন ঘন জোড়া শাঁখের আওয়াজ আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেই বই ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুততম পদক্ষেপে একেবারে বিয়েবাড়ির নিকট গিয়া হাজির হইলাম।

সেখানে গিয়া দেখি শান্তিদের বাড়ির সম্মুখে আর তিল ধারণের স্থান নাই। স্ত্রীলোক ও বালক বোধ হয় পাড়ার আর কেহ বাকি ছিল না, সকলেই আসিয়াছে। দুইখানি পাল্কী প্রস্তুত। একখানিতে পুরোহিত ও পরামাণিক বরের জিনিসপত্র লইয়া উঠিল, সেখানি প্রথমে ছাড়িয়া দিল। তারপর আসিল বরকনের পাল্কী। আমি ভিড় ঠেলিয়া একেবারে ইহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। বরকনে তখনো ভিতর হইতে আসে নাই। সকলেই তাহাদের দেখিবার জন্য মুহুর্মুহু দরজার দিকে তাকাইতেছিল। এমন সময় পাঁচ-ছয়টি শাঁখ একত্রে বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতা যেন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল! তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিতেই যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষু সহসা সজল হইয়া উঠিল।

শান্তি কাঁদিতেছে, তাহার মা কাঁদিতেছে, তাহার মামা-মামী কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজন সকলেই কাঁদিতেছে। আর কাঁদিতেছে দর্শকবৃন্দ—যত স্ত্রীলোক সেখানে ছিল—বৃদ্ধা ও বালিকা নির্বিশেষে। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। কেহ বা ঘন ঘন আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে, কেহ বা সজল চোখে সেই বিদায়োন্মুখ দম্পতির মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। এমন কি বরের পর্যন্ত চক্ষু ছলছল করিতেছিল। সেই মুহ্যমান দর্শকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া শান্তি তাহার বরের পিছু পিছু আসিয়া পাল্কীর ভিতরে উঠিল। উড়ে বেহারারা পাল্কী কাঁধে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইল। তখন শেষবারের মত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইতে গিয়া শান্তি কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। শ্রাবণের ধারার মত তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

ক্ষান্তপিসী এতক্ষণ পরে কোথা হইতে একটা লাঠিতে ভর দিয়া ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে একেবারে পাল্কীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে একটু ঠেলা মারিয়া বলিলেন, আ মর্, এই ছোঁড়াগুলো, তোরা এখানে কি দেখতে এসেছিস্—সরে যা।

আমি সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি পাল্কীর মধ্যে মুখ গলাইয়া এক হাতে করিয়া শান্তির চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, তোরা করিস কি, আজ শুভদিন, এখন কি চোখের জল ফেলতে আছে! চুপ কর শিগ্‌গির। এই বলিয়া তিনি পুনরায় দর্শকদের ধমকাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পাল্কীর ভিতরে যখন এই দৃশ্য তখন সহসা বাহিরে যেন অশ্রুসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সমবেত মহিলাবৃন্দের ঘন ঘন চোখের জল ও ফোঁপানির শব্দে সেখানকার আকাশ-বাতাস থমথম করিতে লাগিল। আর তারি সঙ্গে সেই একটানা শাঁখের আওয়াজ মাঠ ছাড়াইয়া, বনজঙ্গল পার হইয়া, দূর হইতে দূরান্তরে যেন সেই বেদনার বার্তাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

পাল্কী চলিয়া গেল।

আমি সেই দিকে চাহিয়া অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সহসা যেন আমার চমক ভাঙিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তিকে আর একবার দেখিবার জন্য মন বড় উতলা হইয়া পড়িল। কেন তাহা জানি না, তবে মনে হইতে লাগিল এখনি তাহাকে আর একবার চোখে না দেখিলে আমি মরিয়া যাইব। তাই গোপনে, অপর কেহ না দেখিতে পায় এইভাবে, আমি বনজঙ্গল ভাঙিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ দূরে গিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেখানে কেহ নাই, আমি একা, শান্তি এবার নিশ্চয়ই আমায় দেখিতে পাইবে, হয়ত বা একটা দুইটা কথাও কহিবে কিংবা একটু হাসিবে—এই রকম আরো কত কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই পাল্কীটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

মিনিট কয়েক পরেই দূরে পাল্কী দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পন্দিতবক্ষে একেবারে পথের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু হায়, শান্তি একবারও ফিরিয়া চাহিল না, সে তখনো তেমনিভাবে কাঁদিতেছিল। পাল্কী চলিয়া গেল আমার সম্মুখ দিয়া। মূঢ় বিহ্বল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আমি নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন বাড়িঘর, লেখাপড়া, এই পৃথিবী, সব যেন আমার কাছে কেমন অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শান্তি যে আমার অন্তরে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিল, সে চলিয়া যাইবার পর তাহা আমি প্রথম আবিষ্কার করিলাম। একের বিহনে আমার সমস্ত যেন অন্ধকার হইয়া গেল। আমি খোলা জানালার ভিতর দিয়া সুদূর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি দেখিতেছিলাম, কি ভাবিতেছিলাম জানি না। তবে মনে পড়ে, শান্তি যে নাই শুধু এই কথাটাই যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর সেদিন আমায় জানাইতেছিল। কেমন করিয়া শান্তি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমার মনকে এমনভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল সেই চিন্তাই বোধ করি করিতেছিলাম, এমন সময় খেঁদী পিছন হইতে ডাকিল, আলোকদা?

চমকাইয়া উঠিলাম। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়াছিল আমি তাহা টেরও পাই নাই। তাহার দিকে ফিরিবার সামর্থ্যও তখন যেন আর আমার দেহে ছিল না, তাই তেমনিভাবে জানালার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিলাম—কি?

সে আমার আরো কাছে সরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে একবার শুধু গভীর দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আলোকদা, শান্তির জন্যে তোমার মন কেমন করছে, না?

আমি কোন জবাব না দিয়া তেমনি চুপ করিয়া রহিলাম। খেঁদী এই নীরবতার কী অর্থ বুঝিল জানি না, তবে সেও কিছুক্ষণ কোন কথা না বলিয়া তারপর যেন কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার সুরে বলিল, জানো আলোকদা, সুন্দর বর হয়েছে বলে মেয়ে একেবারে আহ্লাদে ফেটে পড়ছেন, আমাদের সঙ্গে ত ভাল করে কথাই কইলে না, এমন কি তোমার সঙ্গে পর্যন্ত কিছু বললে না!

ইহারও আমি কোন জবাব দিলাম না দেখিয়া খেঁদী বোধ করি একটু বিস্মিত হইল। তারপর আমার একেবারে সামনে আসিয়া বলিল, জানো, তোমার মালাটা আমি কাল তাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সেটা নিয়ে সে একবারও তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে না। শুধু মালাটা গলায় পরতে পরতে একবার মাত্র বললে—আলোকদা যে দিয়েছে তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তাহার মুখ হইতে ইহা শুনিয়া অন্তত আমি তাহাকে কিছু বলিব এইরূপ সে আশা করিয়াছিল কিন্তু হাঁ বা না কোন কথাই যখন আমি বলিলাম না বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মৌন হইয়া রহিলাম তখন খেঁদী আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শান্তির বিরহে আমি কতটা কাতর হইয়া পড়িয়াছি তাহা জানিবার জন্যই আমার ঘরে সে আসিয়াছিল, কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া, তাহা গবেষণা করিবার মত ইচ্ছা বা উৎসাহ তখন আমার ছিল না। তাই সে যেমন ভাবে আসিয়াছিল, তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল, আমিও তাহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া তেমনি নীরবে রহিলাম।

১৫

পরের দিন হইতে আমার যেন কি হইল। খাইয়া, শুইয়া, স্কুলে গিয়া, লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া কিছুতেই আর শান্তি পাই না। সর্বক্ষণ মনের ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—মনে হয়, এমন একটা কী বস্তু যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি যাহা এতকাল আমার সমস্ত প্রাণশক্তিকে দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল।

হেডমাস্টার মশায় পড়াইতে পড়াইতে কতদিন সতর্ক করিয়া দিয়াছেন আমি নাকি ইদানীং বড়ই পড়াশুনায় অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছি। বাড়িতেও কোথায় পেন্সিল রাখি খুঁজিয়া পাই না, হাতের মধ্যে পয়সা রাখিয়া সারা বাড়ি

অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই, জ্যাঠাইমা তিনটা জিনিস কিনিতে দিলে হয়ত দুইটা আনি একটা ভুলিয়া যাই, নয় ত অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া আনিয়া বকুনি খাই।

ইহার উপর বাড়িতে বেশিক্ষণ ভাল লাগিত না, অথচ বাহিরে গিয়াও থাকিতে পারিতাম না। শান্তিদের দলের মেয়েরা খেলিবার জন্য আমায় ডাকিত কিন্তু তাহাদের মধ্যে গিয়া মন আরো খারাপ হইয়া যাইত—শান্তি যে নাই সেই কথাটি কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িত। তাই তাহাদের সঙ্গে যেমন মিশিতে পারিতাম না তেমনি আবার একা থাকিতেও ভাল লাগিত না, কেবল চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতাম। কি যেন নাই, কি যেন ছিল অথচ হারাইয়া গিয়াছে!

বকুল গাছের তলা দিয়াও আর হাঁটিতে পারিতাম না। যে সমস্ত ফুলগাছ হইতে একদিন শান্তিকে ফুল পাড়িয়া দিয়াছি, এমন কি যে সব ফুল ছিল তাহার খুব প্রিয়, তাহাদের দিকে চাহিলেই যেন চোখে জল আসিয়া পড়িত। কেন আমার এমন হয়? অন্য সকলে যখন হাসিতেছে খেলিতেছে, পড়িতেছে লিখিতেছে, আমি তখন কেন তাহা পারি না? কেন একজনের চিন্তা অহরহ আমার মনকে এমনি করিয়া সকল কাজ ভুলাইয়া উন্মনা করিয়া তুলিত বুঝিতে পারিতাম না।

মাতৃস্নেহের জন্য আমার অন্তরে নিদারুণ হাহাকার ছিল সত্যি, কিন্তু ইহা যেন তাহার চেয়েও বৃহত্তর মহত্তর কিছু, যাহা পাইবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন একসঙ্গে লালায়িত হইয়া উঠিত। আমার কিশোর মনে কোন্ বীণায়, কী সুর সে বাজাইয়া গেল যাহা কখনো শুনি নাই, কোথাও দেখি নাই। তাই নির্জন স্থানে বসিয়া একাকী হৃদয়ের দ্বারে কান পাতিয়া থাকিতাম, যদি তখনও তাহার অনুরণন শুনিতে পাই। ভাল লাগিত না কোন সঙ্গী, কোন সাথী। মনে হইত এই বিশ্ব-সংসারে আমি যেন একান্তই একা—আমার মনের বেদনা বুঝিবার মতো দরদী হৃদয় কোথাও আর একটিও নাই।

মানুষের মন পদ্মানদীর মতো, তাহাতে কখন ভাঙন ধরে বাহির হইতে বোঝা শক্ত। তাই ইহার কিছুদিন পরেই যখন আমি সাধারণ ছেলের মতো নম্বর পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম তখন আমার চেয়েও বেশি লজ্জা পাইলেন বুঝি হেডমাস্টার মহাশয়। তাঁহার ঘাড় হেঁট হইয়া গেল সকলের কাছে, কেননা আমার সম্বন্ধে তিনি বড় মুখ করিয়া অনেকের কাছে অনেক কথাই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তিনি দমিলেন না। অন্যান্য শিক্ষকমহাশয়দের কাছে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ছেলে হাফ্‌ইয়ারলি পরীক্ষায় এ রকম আশ্চর্য নম্বর পায় সে কখনো 'অ্যানুয়েলে' এত কম নম্বর পাইতে পারে!

ইহার উত্তরে হেড পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে আমরা পাচ্ছি মাস্টারমশায়—আপনি যে ওকে কি চোখে দেখেছেন জানি না। যে ছেলে এক এক একজামিনে এক এক রকম নম্বর পায় তার ওপর কি ক'রে আপনি এত আস্থা রাখেন বুঝতে পারি না। আমাদের ত মনে হয়, বইটই টুকে কিংবা অন্য

কোন অসাধু উপায়ে নম্বর পেয়েছিল আগের সব পরীক্ষায়! এবার সুবিধা করতে পারেনি হয়ত—কি বলেন আপনারা? বলিয়া তিনি উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়দের দিকে চাহিলেন।

কেহ কেহ তাহাতে ক্ষীণকণ্ঠে সায় দিলেন, কেহ বা শুধু ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, অবশ্য এ রকম মনে করলে যে বিশেষ অন্যায় করা হবে তা নয়—তবে অন্য কোন কারণ যে একেবারে থাকতে পারে না তাও বলা যায় না!

হেডমাস্টার মহাশয় এই শেষোক্ত মন্তব্য শুনিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই! আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, কি হয়েছিল আমি খোঁজ নিচ্ছি। এই বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেই দিনই তিনি চুপি চুপি আমাকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, কি হয়েছে তোর সত্যি করে বল্, আমি জানি তুই কিছুতেই এত কম নম্বর পেতে পারিস না!

আমি কোন উত্তর না দিয়া শুধু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন তিনি আমায় বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কি হয়েছে বল্ বাবা, আমার কাছে লুকোতে নেই—শিক্ষক গুরু, পিতৃস্থানীয়—বল্ কি হয়েছে?

এইবারও তেমনি নীরব রহিলাম, শুধু দুই ফোঁটা জল আমার গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আমার কান্না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তারপর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি তুই বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে থাকিস।···আমার কাছে গোপন করিস্‌নি বাবা, বল কি হয়েছে; তোর ত সব জানা ছিল তবে লিখতে পারলি না কেন?

বলিলাম, আমার ভাল লাগে না কিছু স্যার।

কেন? তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তা বলতে পারবো না স্যার, আমার মনটা সর্বদা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হুঁ। বলিয়া হেডমাস্টার মশায় তাঁহার চশমার মোটা কাচের ভিতর দিয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বুঝেছি, 'ফিজিক্যাল এক্‌সারসাইজে'র অভাব।···তুই কতক্ষণ ধরে রোজ খেলাধুলো করিস্?

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, একদম না।

ইহা শুনিয়া তিনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তা হবে না, কাল থেকে তুই রোজ স্কুলে খেলতে আসবি।

বলিলাম, খেলতে যে আমি জানি না স্যার।

তিনি ধমকাইয়া উঠিলেন, জানি না কি! শিখে নিবি। কাল থেকে আমি রোজ মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুই আমার সামনে খেলবি। কোচিং পড়া এখন বন্ধ থাক দিনকতক—পরে হবে।

তখন হইতে প্রত্যহ তিনি মাঠে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং খেলায় আমার অপটুতা দেখিয়া অন্য ছেলেরা যখন হাসিয়া উঠিত, তাহাদের ধমকাইতেন পাছে আমি লজ্জা পাইয়া আর না খেলি এই ভয়ে তিনি নিজে যেন আমায় পাহারা দিতেন।

এই ভাবে মাস তিন-চার কাটিয়া যাইবার পর হেডমাস্টার মশায় আবার আমায় বাড়িতে পড়াইতে লাগিলেন। তবে এবার সময় খুব কমাইয়া দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে রোজ যাহাতে কিছুক্ষণ করিয়া বেড়াইতে পারি সেদিকে তিনি কড়া নজর রাখিলেন। পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ তিনি একসময় বলিয়া উঠিতেন, আর নয়, থাক্ আজ এই পর্যন্ত! আমিও বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতাম। তখন তিনি একবাটি দুধ আমায় খাইতে দিতেন। ইহা তাঁহার বিকালের খাদ্য, বাহিরের ঘরের এক কোণে বই চাপা থাকিত। আমি এই দুধ খাইতে আপত্তি করিতাম। বৃদ্ধ ও দরিদ্র শিক্ষককে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য মুখে তুলিতে কেমন লজ্জা হইত! কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা, নিজে বাটিটা আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিতেন, তুই জানিস্ না, দুধ খেলে 'মেরিট' খুব বাড়ে।

অগত্যা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইত। আজ ভাবি, হায়, সেদিন যদি তিনি আমার মাথাটার কথা চিন্তা না করিয়া মনটার দিকে মনোযোগ দিতেন তাহা হইলে হয়ত জীবনের ইতিহাস অন্যরকম হইয়া যাইত!

যাহা হউক, এইভাবে কোচিং পড়িয়া কোনদিন বিকালে বেড়াইতে যাইতাম, কোনদিন বা ভাল লাগিত না—চুপচাপ বাড়িতে গিয়া বসিয়া থাকিতাম।

একদিন চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া আছি এমন সময় খেঁদী আসিয়া কতকটা যেন গায়ে পড়িয়া এই সংবাদটি দিয়া গেল—জানো আলোকদা, শান্তিরা সকলে এখান থেকে কাল চলে যাবে—তার মামা কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পেয়েছে, তাই বাসা ক'রে সেখানে থাকবে, এখানে আর আসবে না।

ইহা শুনিয়া হঠাৎ মনটা খুব দমিয়া গেল। তাহা হইলে আর শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে না? তাহাকে দেখিবার জন্য এতদিন মনের কোণে তিল তিল করিয়া যে বাসনা জমা হইয়াছিল, আজ তাহা খেঁদী যেন নির্মম হস্তে ভাঙিয়া চুরিয়া নিঃশেষ করিয়া দিল।

শান্তির বর দিল্লীতে ভাল চাকরি করিত। তাই বিবাহের পর সেখানে সে চলিয়া গিয়াছিল শুনিয়াছিলাম, এক বৎসর পরে ছুটি লইয়া তাহারা নাকি আবার জোড়ে আসিবে। তবু একদিন দেখা হইবে—গোপনে আমার মন বুঝি সেই দিনটিরই হিসাব গুনিতেছিল। তাই আর তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না এই কথা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে মাথার দিকে ছুটিতে লাগিল। আমি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম বাড়ি হইতে। কোথায় যাইব ভাবিতে গিয়া

তখন সর্বপ্রথম মনে পড়িল সেই বকুল গাছটিকে, তাই ধীরে ধীরে তাহার তলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। গাছে ফুল ছিল না, তবু সেই গাছটির দিকে চাহিয়া আমার চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। ইহারই নীচে বসিয়া কতদিন শান্তি ফুল লইয়া মালা গাঁথিয়াছে, খেলা করিয়াছে—কত হাসিয়াছে, কত দুরন্তপনা করিয়াছে—সেদিনের সেই সব স্মৃতি যেন গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে। শান্তিকে আবার দেখিতে পাইব এই আশা যতদিন মনে ছিল ততদিন এই গাছের তলায় আসিতে পারিতাম না, মনের ভিতরটা যেন হু হু করিয়া উঠিত। অথচ আজ যখন শান্তিকে দেখিতে পাইবার আশা চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল তখন সেই স্থানটিই কেমন মধুর বোধ হইতে লাগিল। আশ্চর্য মানুষের মন।

তাহার পরের দিন হইতে, যে সব স্থানে শান্তি খেলা করিত, যে ফুল ভালবাসিত, কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন সেইদিকে আমার মনকে অহরহ আকর্ষণ করিত। তাহারা যেন আমার কাছের স্মৃতির মত প্রিয় হইয়া উঠিল। আমি চুপি চুপি তাহাদের কাছে গিয়া তখন বসিয়া থাকিতাম।

এমনি করিয়া কয়েকদিন কাটিয়া যাইবার পর একদিন আমি রায়বাগানের ভিতর দিয়া চৌধুরীদের দীঘির ধারে আসিয়া বসিলাম। জায়গাটি যেমন নির্জন তেমনি মনোরম। একদিকে দীঘির উঁচু পাড় যেন পাহাড়ের মত উঠিয়া গিয়াছে; তাহাতে পলাশ শিমুলের ঠেলাঠেলি। নববসন্তের অনুরাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সর্বাঙ্গ। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ছোট বড় অসংখ্য তরুশ্রেণী তাহাদের বক্ষে নব কিশলয় ধারণ করিয়া কিসের আবেশে যেন বার বার শিহরিয়া উঠিতেছে। আশেপাশে ছোট ছোট কত কি গাছ—তাহাদের মাথায় ফুল নাই, কিন্তু তবুও পশ্চিম আকাশ হইতে অস্তগামী সূর্যের শেষ আভাটুকু আসিয়া পড়িয়া রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। এইসবের মধ্যে শান্তি লুকোচুরি খেলিত। সেইসব দিনের কথা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, আমার পিছনে যেন কাহারা কথা বলিতেছে মৃদুস্বরে। ঘাড় ফিরাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ মনুষ্য-কণ্ঠস্বর তখনো কানে আসিতেছিল। আমার ঠিক পিছনে কতকগুলি কাশের গুচ্ছ একত্রে জড়াজড়ি করিয়া একটা পরিখার মত সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি হাত দিয়া কাশের কতকগুলো ধারালো পাতা ফাঁক করিতেই দেখিলাম অদূরে কমলের কোলে মাথা রাখিয়া মধু শুইয়া আছে। তাহারা কথা বলিতেছে, কিন্তু উভয়ের মুখ হাসিতে-খুশিতে যেন উদ্ভাসিত। ঠিক ঐ জায়গায় একদিন শান্তিকে কমলের মতো ভঙ্গিতে বসিয়া থাকিতে আমি দেখিয়াছিলাম। কমলকেও ইতঃপূর্বে কতবার দেখিয়াছি—বোধ হয় প্রত্যহই; কিন্তু আজ মনে হইল যেন নবরূপে তাহাকে দেখিলাম। নিমেষে যেন একটা বিদ্যুতের শিখা আমার সমস্ত দেহকে সচকিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কমল আমার চোখের সামনে নূতন হইয়া উঠিল। এ যেন সে কমল নয়—যাহাকে আমি এতদিন এতবার দেখিয়াছি! কোন্ শিল্পীর খেয়ালে একই মানুষ এমনি করিয়া সহসা চোখের সামনে অন্য রূপ ধরিয়া আসে তাহা বোধহয় মানুষের জ্ঞানের অতীত! তাই যে কমলকে এতদিন স্বেচ্ছায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহাকেই আবার আপন করিবার জন্য সেদিন আমার অন্তরে এক দুরন্ত বাসনা জাগিল। আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'কমল' বলিয়া ডাকিয়া একেবারে তাহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কমল ও মধুর সঙ্গ আমি বর্জন করিয়াছিলাম। ইদানীং তাহাদের দেখিলে আমার বুকের ভিতরে কেমন একটা ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিত। তাহাদের মা আছে, তাহারা সুখী আমার চেয়ে। তাই তাহাদের সঙ্গে আমি মিশিতে পারিতাম না, তাহারাও আমাকে এড়াইয়া চলিত।

কমল ও মধু বোধ হয় এতক্ষণ কোন একটা মধুর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তাই হাসিতে ও আনন্দে তাহাদের চোখমুখ অমন উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আমি তাহাদের মধ্যে যাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। যদিও তাহারা দুইজনেই সাগ্রহে আমায় অভ্যর্থনা করিল। তবুও যে হাসি তাহাদের মুখে এতক্ষণ দেখিয়াছিলাম, আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্ধানে আমার মনটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কী এমন কথা তাহারা কহিতেছিল যাহার আনন্দ আমাকে দেখিয়া তাহাদের মন হইতে বিলুপ্ত হইল! তবে কি আমি তাহাদেরও আনন্দের সাথী নহি?

ইহা লইয়া আমি যখন মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছিলাম তখন কিন্তু তাহারা দুইজনে আমায় নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিল—'কিরে, হঠাৎ আজ এদিকে কি মনে করে'—'আজ মেয়েদের সঙ্গে খেলা করলি না?' 'রোজ বিকেলে এখন কোথায় যাস্' 'কার সঙ্গে বেড়াস্' ইত্যাদি ইত্যাদি একঝুড়ি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়া বসিল।

আমি মুখে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকিলেও মনে মনে কিন্তু উপলব্ধি করিতেছিলাম যে ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটা মৃদু খোঁচা রহিয়াছে।

কমল বলিল, এতদিন পরে কি আমাদের কথা মনে পড়লো?

কমলের দেহ ছিল সুন্দর, ভঙ্গুর ও কমনীয়। মাথায় বড় বড় চুল—স্বপ্নালস দীর্ঘ চোখ, সে মিষ্টভাষী ও ভাবপ্রবণ। তখন আমার তার মুখ হইতে এই কথাটি শুনিয়া বেশ ভাল লাগিল। তাই একটু মিষ্টি করিয়াই জবাব দিবার ভাষা খুঁজিতেছিলাম,—এমন সময় মধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসিতে আনন্দের চেয়ে বিদ্রূপই যেন বেশি ছিল বলিয়া আমার মনে হইল। তবু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলাম,—এইদিকে বেড়াতে এসেছিলুম, হঠাৎ তোদের দেখতে পেয়ে এলুম।

মধু খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল, ওঃ তাহ'লে আমাদের কথা আগে মনে পড়েনি?

মনে হইল বলি, অন্তত তোমার কথা মনে পড়ে নাই, কিন্তু পারিলাম না। আমি বলিবার আগেই কমল সহসা তাহার ডান হাতখানা মধুর মুখে চাপিয়া ধরিল, তারপর উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া নীরবে কি একটা ইসারা করিল, মধু সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। সে থামিল বটে কিন্তু তাহার উপর আমার মন অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তোমরাও ত আমার কোন খোঁজ নাও না?

আমার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিবে ইহা যেন তাহারা কেহই আশা করে নাই। সেইজন্য আবার মধু ও কমল উভয়ে শুধু উভয়ের সঙ্গে একবার নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করিয়া চুপ করিল।

ইহা লক্ষ্য করিয়া আমার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের মধ্যে কোথায় কি একটা গোপন কথা আছে যাহা আমি জানি না—যাহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই!

আমি বিস্মিত হইলাম। একদিন আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যাহারা উন্মুখ হইয়া থাকিত তাহাদের এ কি পরিবর্তন! তখন বুঝিতে পারি নাই যে ইহার জন্য দায়ী একমাত্র আমি। আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় বসিয়া নিজের অন্তরে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার পর এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছি যে, কোন মানুষই কাহারো—বিশেষ করিয়া কোন প্রিয়জনের—অবহেলা সহ্য করিতে পারে না। প্রত্যেকেই চাহে, তাহার প্রতিটি ভাবভঙ্গি, স্নেহভালবাসার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিব্যক্তি যেন অন্যের কাছে উপযুক্তভাবে সমাদৃত হয়। তাই আয়নায় মুখ দেখিবার মতো, যাহার ভিতরে মানুষ নিজেকে দেখিতে পায় তাহার কাছেই সে বাঁধা পড়ে। এই বন্ধনের নাম স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রেম। বস্তু এক, কিন্তু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। একের যেন বহু রূপ!

আজ ভাবি, দোষ আমার নিজের, তাহাদের নহে। আমার অবজ্ঞাই তাহাদের দুইজনকে আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষ ছোটই কি, আর বড়ই কি—কেহ একলা থাকিতে পারে না। তাই বৃদ্ধেরা বৃদ্ধের সঙ্গ কামনা করে—যুবকরা যুবকের, বালকরা বালকের। ইহা যে মানুষের প্রকৃতি—তাহার স্বভাব-ধর্ম!

যাহা হউক, এইসব বড় বড় কথা চিন্তা করিবার মতো বয়স বা বুদ্ধি তখন আমার হয় নাই, সেইজন্য অভিমানটা কমলের উপরই হইল বেশি। ভূতোর একটি কথা তখন আমার স্মরণ হইল। সে একদিন বলিয়াছিল কমলকে আমার চেয়ে সে ভালোভাবেই চেনে। বাস্তবিক তাহার কথাই সত্য। একদিন তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়া তখন অনুতাপ হইতে লাগিল। তবু আরো কিছুক্ষণ দুই-চারিটা বাজে কথা কহিবার পর আমি বলিলাম, আচ্ছা তবে আসি ভাই!

কমল ও মধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, আমরাও যাবো, এখানে আমরা থাকতে আসিনি।

এই বলিয়া তাহারাও উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা তিনজনে তখন একসঙ্গে বাড়ির পথে হাঁটিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, আগেও এই পথ দিয়া তিনজনে একত্র বেড়াইয়া ফিরিতাম, কিন্তু সে দিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ।

তাহারা দুইজনে হাসিয়া হাসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, তবুও যেন এ হাসির সঙ্গে সেদিনের অনেক তফাৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই প্রভেদটুকুর কথা স্মরণ করিয়া কেন জানি না সারাপথ আমার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। সেইদিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর ইহাদের সঙ্গে কোনদিন বেড়াইবার নাম করিব না। একাই আমার ভালো।

বাড়িতে আসিয়া আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলাম। একে আমি বাড়িতে বেশি কথা কহিতাম না, তাহার উপর এবার পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই বলিয়া নিজেই যেন সর্বদা নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া থাকিতাম। অবশ্য জ্যাঠামশায় ইহার জন্য কিছুই আমায় বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার এই ঔদাসীন্য আমার মনকে আরো বেশি পীড়া দিত। ইহা ছাড়া জ্যাঠাইমাও ইদানীং কেমন হইয়া গিয়াছিলেন, আমার প্রতি যেন কোন অভিযোগই আর তাঁহার ছিল না। শুধু ভুতোকে দিন-রাত চোখে চোখে রাখিতেন, লেখাপড়ায় কিসে তাহার উন্নতি হয় তাহা চিন্তা করিতেন। সকলের মধ্যে থাকিয়াও আমি যেন ছিলাম একা। এক এক সময় মনে হইত ইহার চেয়ে জ্যাঠাইমার ভর্ৎসনা ছিল শতগুণে ভাল।

একদিন ঘরে বসিয়া চুপচাপ এই সব কথাই ভাবিতেছিলাম এমন সময় ভুতো কতকগুলি বই হাতে করিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধপাস্ করিয়া সেইগুলি বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নে আলোক, এতে ইংরেজী বাংলা ও সংস্কৃতের 'মেড্ঈজি' আছে, এইগুলো মুখস্থ করে ফেল দেখি। তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল, মধুটাকে তুই মারতে পারছিস্ না, দূর্ তুই কোন কাজের না—ওঃ, দু'বার ফার্স্ট হয়েছে বলে কী চাল। মাটিতে যেন পা পড়ে না। আর কমলটা—ওরও আজকাল কি রকম চাল বেড়েছে দেখেছিস—এ রকম ত আগে ছিল না?

ভুতো যেন আমার ক্ষতস্থানে নুন ছিটাইয়া দিল। তাহার পরিকল্পনা শুনিয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম যেমন করিয়া হউক এবার মধুকে পরীক্ষায় মারিতেই হইবে। শুধু যে তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা নহে, কমলের মনে যে আমার স্থান আর নাই বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য। না হয় মধু বড়লোকের ছেলে, ফার্স্ট হইয়াছে, তাই বলিয়া কি আমাকে এতটা উপেক্ষা করা উচিত? প্রতিহিংসা লইবার জন্য মুহূর্তে আমার মন উগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে ভুতো আমার অন্তরের কথা বুঝিতে পারে তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা অন্য দিকে লইয়া গিয়া বলিলাম, কিন্তু তুই পড়বি না এগুলো—এগ্জামিন ত এসে গেল?

সে বলিল, তুই ভারি বোকা, এই জন্যে তোর কিছু হলো না। আরে আমি

যদি বই পড়ে মুখ ব্যথা করবো তবে স্কুলের মাস্টারকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে গেলুম কেন ? শুধু কয়েকটা 'ইমপর্‌ট্যান্ট' মুখস্থ ক'রে যাবো, ব্যস, আর আমায় পায় কে ?

ভুতোর এই কথার কী অর্থ তাহা বুঝিতে বাকি রইল না। যাহা হউক সেই দিন হইতে আমি বাজে কথা চিন্তা না করিয়া অন্য কোন দিকে মন না দিয়া একান্তমনে শুধু নিজেকে লেখাপড়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলাম।

আবার আমার পূর্বেকার মতো উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। হেডমাস্টার-মহাশয় ইহা দেখিয়া মনে মনে খুশি হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন তাঁহার উপদেশে আমি হাতে হাতে ফল পাইয়াছি।

১৭

এমনি করিয়া যখন দিন কাটিতেছিল তখন আমায় একদিন ভুতো আসিয়া বলিল, চল্‌ আলো, আজ মাঠের পুকুরে নাইতে যাই।

পুকুরটি আমাদের বাড়ি হইতে যেমন দূরে, কমলের বাড়ি হইতে তেমনি নিকটে। তখন গরমকাল। সকালে-স্কুল আরম্ভ হইয়াছে। দূরে গিয়া স্নান করিবার মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চকর আনন্দানুভূতি ছিল। উপরন্তু এই পুকুরটির জল ছিল কাকচক্ষুর মতো এবং চারিপাশে নারিকেল, সুপারি ও অন্যান্য ছোট বড় গাছ থাকিবার দরুণ সর্বদা শীতল ও ছায়াছন্ন থাকিত। সেইজন্য অনেক দূর-দূরান্তর হইতে লোক ইহাতে স্নান করিতে আসিত।

আমরা দুইজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কমল ও মধু স্নান করিতেছে ও-পারের স্নানের ঘাটে। কমল মধুর পিঠে সাবান মাখাইয়া দিতেছে, আর মধু কমলের পিঠে।

আমাদের দেখিয়া তারা দুজনেই উল্লসিত হইয়া ডাকিল, এই, তোরা এই ঘাটে আয়—সকলে মিলে সাঁতার কাটবো।

আমরা ও-পারে গিয়ে জলে নামিলাম। তখনো তাহারা উভয়ে উভয়ের পিঠে সাবান মাখাইতেছিল। আমার একবার ইচ্ছা হইল কমলকে বলি, আমার পিঠে মধু-র মত সাবান ঘষিয়া দিতে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা উচ্চারণ করিতে পারিলাম না, কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল।

এমন সময় খানিকটা সাবানের ফেনা লইয়া মধু চট্‌ করিয়া কমলের চোখে লাগাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডুব দিয়া সে মধুর পা দুইটা জলের ভিতর টানিয়া ধরিল। তারপর চলিল ঝটাপটি। মধু তাহার কালো ও বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে কমলকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার জলে ডুব দিতেছিল।

ভুতো তাহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কমলকে উদ্ধার করিল।

মধু এক ডুব সাঁতারে একেবারে মাঝখানে পলাইয়া গেল।

আমি তখন কমলকে বলিলাম, ওঃ, তোর চোখ দুটো কি রকম লাল হয়ে উঠেছে—মধুটা ইয়ারকি পর্যন্ত দিতে জানে না।

কমল ঈষৎ মিষ্টি হাসিয়া বলিল, বেশিক্ষণ জলে থাকলে তোরও এই রকম হবে। তারপর বাড়ি যেতে যেতে সব ঠিক হয়ে যাবে। রোজ আমাদের এই রকম হয়।

ইহা শুনিয়া শুধু একটি কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, রোজ কি মধু স্নান করতে আসে এত দূর থেকে?

কমল বলিল, হাঁ, ত নাহলে আমিই-বা এখানে আসবো কেন? আমার বাড়ির সামনেই ত পুকুর রয়েছে।

এমন সময় মধু সেখানে আসিয়া তাহার সাবানটা আমার সামনে ধরিয়া বলিল, এই আলো, মাখ না সাবান?

কেন জানি না সে-সাবান আমার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, থাক্ ও আমার সহ্য হবে না ভাই।

মধু বলিল, ওঃ, না হয় ভগবান তোর গায়ের চামড়াটা একটু কটা করেছে, তাই বলে, এত অহংকার ভাল নয়। বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘাটে যাহারা ছিল সকলেই এই হাসিতে যোগ দিল, শুধু কমলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখে হাসি নাই।

মনে হইল, তবে কি সত্যসত্যই কমল মধুকে এইরূপ ভালবাসে যে, সামান্য ঠাট্টাটুকু পর্যন্ত সহ্য করিতে পারে না?

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই চিন্তাই আমার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। একবার মনে হইল, আচ্ছা, কমল মধুর মধ্যে কী দেখিয়াছে? শুধু ফার্স্ট হইয়াছে বলিয়াই কি তাহার সঙ্গে এত—

আর ভাবিতে পারিলাম না। এবার যেমন করিয়া হউক ফার্স্ট হইতেই হইবে, মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম।

সংকল্প জয়যুক্ত হইল। প্রথম শ্রেণীর অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হইলাম। ভুতো আমাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল। হেডমাস্টার মহাশয়ও গদ্‌গদ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কমল? তাহার উৎসাহ ইহাতে বাড়িল কি কমিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার বুকের ভিতরে একটা স্থান কেবলি খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

কমলের এই ঔদাসীন্য আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। যেমন করিয়া হউক তাহার মন আমি মধুর দিক হইতে ফিরাইয়া আমার দিকে লইয়া যাইব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। এতদিন আমার সঙ্গেই ছিল তাহার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাহাকে আমার, একান্ত আমারই করিতে না পারিলে মনে হইতে লাগিল যেন আমার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে। মধুর সঙ্গে তাহার এত ভাব আমি কোনমতেই সহ্য করিতে পারিব না।

আবার আমি তাহার সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিলাম। স্কুলে তাহার পাশে বসিতাম, পূর্বের মত লাইব্রেরী হইতে ভাল ভাল বই লইয়া তাহাকে পড়িতে দিতাম ; আবার তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম।

এই সব ব্যাপারেই মধু কমলের সঙ্গে থাকিত। আমার সঙ্গেও মধুর বাহ্যত কোন অসদ্ভাব ছিল না। কমলেরই মত আমিও তাহার সঙ্গে মিশিতাম, গল্প করিতাম, বেড়াইতে যাইতাম। সবই হইত, তবে কমলের মনে মধুর প্রতি স্নেহ ঠিক কতখানি তাহা জানিবার জন্য সর্বদা আমার মন কেন যে এমন উৎসুক হইয়া থাকিত তাহা আজও বুঝিতে পারি না।

প্রতিদিন হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ি হইতে তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করিয়া আমি একেবারে খেলিবার মাঠে গিয়া কমল ও মধুর সঙ্গে মিলিত হইতাম। তারপর যেটুকু সময় থাকিত, তিনজনে একত্র বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। তিনজনে একসঙ্গে চলিতে চলিতে কত গল্প হইত।

যদি কোনদিন মধু না আসিত বা মামার বাড়ি যাইত, তাহা হইলে আমার আনন্দ হইত খুব। কমলকে লইয়া একাকী বহুদূরে চলিয়া যাইতাম—ফিরিবার কথা আর মনে আসিত না। এই সময় কত কথা তাহাকে বলিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু কমলের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া সকল উৎসাহ নিভিয়া যাইত। মনে বড় রাগ হইত, কমল কি কিছুই বোঝে না।

হয়তো এইরকম একটা কোন দিনে চৌধুরীদের দীঘির ধারে দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া আছি—পশ্চিম আকাশ হইতে এক টুকরো রঙ চুপি চুপি আসিয়া কমলের সুন্দর গালে, চোখে, মুখে লাগিয়াছে, বনফুলের সুগন্ধের সঙ্গে কদাচিৎ দু'একটা পাখীর কণ্ঠস্বরও ভাসিয়া আসিতেছে। কোন একটা কথা হয়ত তাহাকে বলিব বলিয়া মনে ভাবিতেছি এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, জানিস্ আলোক, মধু এখন মামার বাড়ী কি করছে ? খুব ডাব খাচ্ছে—ওর এক মামাত' ভাই আছে তার নাম ঘেঁটু না কি—ওঃ, কি ওস্তাদ সে ডাব চুরি করতে। একটা লম্বা দড়ি সঙ্গে করে সে গাছে উঠে পড়ে, তারপর এমন কায়দা করে ডাবের কাঁদি নামিয়ে দেয় যে, কেউ জানতেও পারে না। আর জানিস্, মধুরা এক-একজন আটটা-দশটা করে ডাব খায়।

বলিতে বলিতে উৎসাহে তাহার চোখমুখ এমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যে মনে হয় যেন সে নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

আবার কোনদিন হয়ত তাহার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া দামোদরের বাঁধের উপর বেড়াইতেছি। অদূরে ক্ষীণ জলরেখা, একপাল গোরু পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেল, ও-পারে ধূ ধূ করিতেছে বালির চর মরুভূমির মত, তাহার শেষ প্রান্তে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষের মাথা একটা সবুজ প্রাচীরের মত দেখাইতেছে। সেই দিকে চাহিয়া আছি—এমন সময় কমল বলিয়া উঠিল, জানিস্ আলোক, এইখানে একদিন মধুর বাবা একটা সাপ মেরেছিল তাঁর লাঠি

দিয়ে। ওঃ পাঁচ হাত লম্বা একটা গোখরো সাপ। যদি বেড়াবার লাঠিটা তাঁর হাতে না থাকতো তাহ'লে কি হতো বল্ দেখিনি? মধুর বাবার খুব সাহস, না? আমার, ভাই, সাপ দেখলে গায়ের ভেতর কেমন শির্‌শির্ করে—তোর ভয় করে না? মধুরও কিন্তু সাহস খুব, হেলে সাপগুলোর লেজ ধরে হাতে করে কি রকম ঘোরায়।

এইভাবে, মধু অনুপস্থিত থাকিলেও কমলের মুখে তাহারি গল্প শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝালাপালা হইয়া যাইত। আমি চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইতাম, কোন কথা বলিতাম না। এক-একদিন মনে হইত, তাহার মনে হয় ত আমার কোন স্থানই নাই, আমিই শুধু তাহার কথা চিন্তা করিয়া মরি! কিন্তু একথা মনে করিতেও যেন বুক ভাঙ্গিয়া যাইত। এ সংসারে আমি যাহাকে চাহিব তাহাকে কি কখনই পাইব না? আমার আপন বলিতে কেহই কি নাই? সবাই পর? কেন? আমি কি তাহাদের ভালবাসিতে জানি না, না আমার ভিতরে ভালবাসিবার মত কোন কিছু তাহারা দেখিতে পায় না! ভগবানকে অভিসম্পাত দিই—কেন আমায় এমন করিয়া সৃষ্টি করিলে! ভালবালা না পাইলে এবং ভালবাসিতে না পাইলে মানুষ যে বাঁচিতেই পারে না। তাই ভালবাসা আমার চাই, যেমন করিয়া হউক! জ্যাঠাইমার স্নেহ পাইলাম না, শান্তিকে ভালবাসিয়া হারাইলাম। আবার কমলকেও পাইব না! না না—এ অসহ্য!

আবার কিছুক্ষণ পরে মনটা শান্ত হইত তখন ভাবিতাম হয়ত আমার অনুপস্থিতিতে কমল মধুর কাছে আমার সম্বন্ধেও এইভাবে গল্প করে—কে জানে? মনটা আবার সতেজ হইয়া উঠিত। আবাব কমলকে ভাল লাগিত।

এমনিভাবে সন্দেহের দোলায় দুলিতে দুলিতে আমার মন এক-একদিন অত্যন্ত দমিয়া যাইত। তখনি নিজের কাছে নিজে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিতাম, আর কোন-দিন কমলের সঙ্গে বেড়াইব না; ইহার চেয়ে সেই সময়টা লেখাপড়ার চর্চা করিলে ঢের বেশি উপকার হইবে। এই মনে করিয়া পরের দিন কোচিং পড়ায় বেশি সময় অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু যত বিকাল বাড়িতে থাকিত এবং বেড়াইবার সময় নিকটে আসিত ততই যেন আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। কিসের এক অমোঘ আকর্ষণে আমার মন ছুটিত সেইখানে, যে স্থানটি কমলের কথায়, কমলের হাসিতে, কমলের গায়ের গন্ধে মদির ও বিহ্বল। কমল কিশোর, কমল সুন্দর! সে যেন ধরণীর বুকে প্রথম অরুণোদয়, বিকাশোন্মুখ পুষ্পের প্রথম সৌরভনিবেদন! তাহার রূপ বর্ণনা করা যায় না—সে যেন ধরার মাঝে অ-ধরা, রূপের মধ্যে অ-রূপ!

আমি এইভাবে যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতাম, এক একদিন কমল আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিত, এত দেরি করলি কেন? আমরা তোর জন্যে কখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মধু ত চলে যেতে চাইছিল, বলে তুই আজ আসবি না, কিন্তু আমি তাকে বললুম, নিশ্চয় আলোক আসবে দেখে নিস।

আমার সম্বন্ধে কমলের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া আমার সর্বাঙ্গ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। তবুও কথাটা কতদূর সত্য, যাচাই করিবার জন্য বলিতাম, মাইরি ?

কমল বলিত, জিজ্ঞেস কর না মধুকে ?

মধু সে-কথা সমর্থন করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটা কঠিন শপথ করিয়া বসিত। এই ধরনের কথা শুনিলে আমার অবস্থা যে কিরূপ হইত তাহা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। তবে যতদূর মনে পড়ে, আমার তখন কোন একটা বীরত্বপূর্ণ কাজ করিবার দারুণ ইচ্ছা হইত। কিন্তু হাতের কাছে যথোপযুক্ত কিছু না পাইয়া শেষে এক হাত মধুর কাঁধে ও অপর হাত কমলের কাঁধে রাখিয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতাম। চলিতে চলিতে অনেক বড় বড় প্ল্যান আমার মাথায় আসিত। আমরা তিনজনে মিলিত হইয়া করিতে পারি এইরূপ কত সম্ভব অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা ! কিন্তু সেগুলি তৎক্ষণাৎ কমল ও মধুকে না বলিয়া আমি সুস্থ হইতে পারিতাম না। তাহারা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। নয়ত বলিত, পাগল, তোর যেমন মাথা খারাপ।

তথাপি আমার উৎসাহ কমিত না। প্রতিদিন তাহাদের সঙ্গে সেই লইয়া আলোচনা করিতাম।

এইভাবে আবার কমল ও মধুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল। প্রত্যহ আমি হেড্‌মাস্টার মশায়ের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া খেলার মাঠে কমল ও মধুর সঙ্গে গিয়া মিলিত হইতাম। মধু খেলা করিত আর কমল তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। খেলাধুলায় মধু ছিল যেমন ওস্তাদ তেমনি ভীরু ছিল কমল। তাই সে নিজে না খেলিয়া অন্যের খেলা দেখিতে ভালবাসিত।

আমার কাছে কিন্তু ইহা এক একদিন সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ লইয়া আসিত। ভাবিতাম কমল শুধু মধুকে খেলায় উৎসাহ দিবার জন্য মাঠে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাই মধুর সৌভাগ্য দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঈর্ষিত হইতাম। খেলাধুলা জানি না বলিয়া তখন রীতিমত অনুশোচনা হইত ! হঠাৎ মনে হইত আমার কি কোন যোগ্যতা নাই ? ছেলেবেলা হইতে বহু সাহিত্য পড়িবার ফলে কিছু কিছু লিখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প লিখিয়া স্কুলের হাতেলেখা মাসিকপত্রে দিতাম। সহসা মনে হইল যদি একটা এইরকম হাতেলেখা কাগজ আমরা বাহির করি, তাহা হইলে হয়ত কমলকে আমি আরো নিকটে পাইতে পারি। কমল তখন সবে দুই একটা কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছে। সে কাহাকেও না দেখাইয়া তাহা গোপনে রাখিত। একদিন খাতার ভিতরে ইহার একটি আমার চোখে পড়িয়া যাওয়াতে কমল দারুণ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাই আমার এ প্রস্তাব শুনিয়া কমল প্রথমটা মুখে একটু আপত্তি জানাইলেও শেষে রীতিমত উৎসাহী হইয়া উঠিল। সে বলিল, জানিস আলোক, মধু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে, তাছাড়া ওর হাতের লেখাও খুব ভালো।

শুনিয়া মধুর মুখ লজ্জায় বেগুনী হইয়া উঠিল। ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল, না রে আলোক, ওর কথা বিশ্বাস করিসনি! কমল কী সুন্দর কবিতা লেখে তুই দেখিস নি—ওর একটা খাতা ভরে গেছে।

এইবার কমল কণ্ঠে কৃত্রিম রাগ আনিয়া বলিল, এই মধু, মিথ্যে কথা বলিসনি বলছি—। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, না রে, অনেক নয়—বিশ্বাস করিসনি ওর কথা।

মধু বলিল, তুই কেন আমার নামে মিথ্যে কথা বললি?

তুই ছবি আঁকিস না, সত্যি করে বল তো?

ইহার উত্তর না দিতে পারিয়া মধু বলিয়া উঠিল, তুই একগাদা কবিতা লিখিসনি? সেই 'দুষ্ট শশী', 'স্বপন', 'গোলাপের প্রতি', 'বসন্তের ভ্রমর'—আরো নাম করবো? জানিস আলো, এ ছাড়াও কত আছে!

যেন আমার কাছে কোন দোষ করিয়া ফেলিয়াছে এইভাবে কমল বলিল, না রে আলোক, ওর কথা শুনিসনি—আমি বেশি লিখিনি।

এমনি করিয়া তাহারা নিজের মুখে নিজেদের গুণের কথা আমার কাছে যখন প্রকাশ করিয়া ফেলিল তখন আর কাগজ বাহির হইতে কোন বাধা রহিল না। অবিলম্বে সুন্দর একটি খাতা মধুর আঁকা ছবি ও হাতের লেখায় সুশোভিত হইয়া বাহির হইল। আমার লেখা তাহাতে বেশি থাকিলেও, কমল ও অন্যান্য ছেলের আরো রচনা ছিল। সম্পাদক হিসাবে আমার নাম দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আমি ইহার সহিত কমলের নামটাও জুড়িয়া দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এইবার হয়ত কমলকে আমি মধুর চেয়ে বেশি কাছে পাইব, কিন্তু কার্যকালে ফল হইল সম্পূর্ণ উল্টা। কাছে পাওয়া দূরে থাক্, সে যেন আরো দূরে চলিয়া গেল। মধু যখন পত্রিকা লিখিত কমল তখন তাহার সম্মুখে বসিয়া সেইগুলি বলিয়া যাইত। এমনও হইত, পড়িবার নাম করিয়া কমল রাত্রে মধুর বাড়িতে যাইত আর দুইজনে রাত জাগিয়া ইহা লিখিত। আমার কিন্তু ইহা আদৌ ভাল লাগিত না। তাই মাস-দুই পরে আসন্ন টেস্ট পরীক্ষার অজুহাত দেখাইয়া পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য ইহাতে কমল যেরূপ ক্ষুণ্ণ হইল, আমি সেইরূপ খুশি হইলাম।

আবার পূর্বপ্রথানুসারে আমরা বিকালে একসঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম। সেই সময় কত গল্প হইত—লেখাপড়ার, খেলাধুলার, আসন্ন পরীক্ষার, আরো এমন সব বিষয়ে যাহাকে কোন সংজ্ঞাতে অভিহিত করা যায় না। কমলের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা ছিল খুব বেশি। আমাকে সে এই সময় নানারকম প্রশ্ন করিত—ভারতের অবস্থা ফরাসী বিদ্রোহের সময় কিরূপ ছিল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম, সপ্তর্ষিমণ্ডল কাহাকে বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। কমল যখন এই সব প্রশ্ন মধুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাকে করিত, তখন সত্যই আমার বুকটা দশহাত হইয়া উঠিত। তাহা হইলে মধুর চেয়ে লেখাপড়ায় ও জ্ঞানে যে আমি বড়, ইহা কমল বুঝিতে পারিয়াছে!

এইভাবে কমলের সঙ্গে যখন আলোচনায় দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন স্কুলে গিয়া দেখিলাম কমল ও মধু আসে নাই। বৈকালে মাঠে গিয়া দেখিলাম সেখানেও তাহারা নাই। কি হইল, কোথায় গেল চিন্তা করিতে লাগিলাম! অপর ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও কেহ বলিতে পারিল না। কমলের বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মধুর খুব অসুখ করিয়াছে বলিয়া কমল স্কুলে যাইতে পারে নাই। সারাদিন রোগীর কাছে বসিয়া আছে।

একথা শুনিয়া আমি রাস্তায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মধুকে দেখিতে যাইব কিনা। আমার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা মনুষ্যত্ব বলিল যাওয়া উচিত, কিন্তু মন তাহাতে কিছুতেই সায় দিল না। কেন, তাহা বোধ করি যিনি মানুষের মনকে এমন জটিল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই।

মোট কথা, সেদিন আর আমি মধুকে দেখিতে যাইতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিনও যখন কমল স্কুলে আসিল না, তখন আমি মধুর বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। দুইদিন ক্রমাগত একশো চার ডিগ্রি জ্বর ভোগ করিবার পর সেইদিন দুপুরে সবে তাহার জ্বর ছাড়িয়াছে। দেখিলাম, মধুর শয্যার পাশে বসিয়া কমল তাহার মাথায় হাওয়া করিতেছে, ঔষধ-পথ্য দিতেছে। সেবায় কমলের এইরূপ ঐকান্তিকতা দেখিয়া কেন জানি না আমার আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিল না, কিছু খুচরো আলাপ করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন কমল স্কুলে আসিল। শুনিলাম, মধুর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, সে ভাল আছে।

ও-রকম ম্যালেরিয়া জ্বর পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে হয়, এমন লোক নাই যে ইহাতে ভোগে না। তাই কমলকে প্রশ্ন করিলাম, মিছেমিছি দুটো দিন কেন কামাই করলি, ম্যালেরিয়ার জ্বর এই ত দুদিনেই ছেড়ে গেল, অথচ কত দরকারী জিনিস এই দুদিনে পড়ানো হলো। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা, এখন কি কখনো কামাই করে?

কমল বলিল, কিন্তু মানুষের অসুখ হলে পরীক্ষার কথা ভাবতে গেলে ত চলে না! সে ত রোজই আছে। আর রোগের কথা কে বলতে পারে? একটা ভালমন্দ যদি হয়, তখন? টেস্ট এগ্‌জামিন বড়, না মানুষের জীবনটা বড়? এই বলিয়া সে আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া তাকাইল। ভাবপ্রবণতা কমলের একটু বেশি, যখন যাহা বলে, একেবারে তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়ে। তাই মধুর এই সামান্য জ্বর লইয়া সে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছিল মনে হইলেও, কমলের অন্তরটাকে কিন্তু আমি সামান্য বলিয়া কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

চাঁদসদাগরের উপাখ্যানটা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল।—মনসাদেবী সকলের পূজা পাইয়াও খুশি হন নাই; তাই চাঁদসদাগর, যিনি পরম শৈব, মহাদেব ছাড়া অন্য কাহাকেও দেবতা বলিয়া মনে করিতেন না, তাঁহার পূজা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ একনিষ্ঠ ভক্তের হাত হইতে পূজা পাইবার জন্য যেমন মনসাদেবী বিচলিত হইয়াছিলেন আমারও তেমনি হইল। মধুর মতো কমলের হাত হইতে এইভাবে সেবা লাভ করিবার জন্য সমস্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল। তাই কমলের মুখ হইতে সেই কথা শুনিয়া আমি আর তাহাকে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, শুধু চুপ করিয়া রহিলাম। সেদিন ক্লাসে কখন কোন্ মাস্টার আসিলেন, কী পড়াইলেন, কিছুই আমার যেন হুঁশ ছিল না। শুধু কমলের সেই কথাটি সমস্তক্ষণ ধরিয়া আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

স্কুল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াও সেদিন কিছু করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কোচিং পড়িতে যাওয়া দূরে থাক্, কথা বলিবার উৎসাহ পর্যন্ত যেন আমার কে হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই একা চুপ করিয়া পশ্চিমের খোলা জানালাটার দিকে চাহিয়া শুইয়াছিলাম।

বাঁশঝাড়ের মাথার উপর তখনো একটুক্রো আকাশ দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যা হয় নাই—বিলীয়মান দিবালোকের বিরহে সমস্ত প্রকৃতি যেন ম্লান। সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, আমার জীবনে কি এতটুকু ফাঁক কোথাও নাই? শুধু অন্ধকার, শুধু ব্যর্থতাভরা আমার আকাশ? এ সংসারে আমি একা, আমার আপন বলিতে কেহ নাই?

এমন সময় খেঁদী আসিয়া বলিল, আলো-দা, তুমি এমন সময় শুয়ে আছ কেন, কি হয়েছে?

বলিলাম, কিচ্ছু হয়নি।

সে শুনিল না।—কিচ্ছু হয় নি তো শুয়ে আছো কেন এই ভর্‌সন্ধ্যেবেলায়? তাহার কণ্ঠে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুর।

কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময় খেঁদী আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়া বলিল, দেখি, জ্বর হয়নি ত?

তাহার কণ্ঠস্বরে এইরূপ ব্যাকুলতার আভাস পাইয়া আমার কি মনে হইল, আমি ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম। খেঁদীর সেই ক্ষুদ্র কোমল হাতখানির মধ্যে আমি সেদিন আমার বিরাট বিশ্বকে যেন প্রথম অনুভব করিলাম। মনে হইল, আমি ত একা নহি। এ ত কোনদিন আমার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে নাই। অতীতের দিকে চাহিয়া বরং লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। এমনি এক একটা ক্ষণ আসে মানুষের জীবনে, যখন সে নিজেকে সত্য করিয়া দেখিতে শিখে। খেঁদী যে কুরূপা, তাহার কুৎসিত ভাবভঙ্গি, কুরুচিপূর্ণ স্বভাব—সমস্ত যেন সেই পরমমুহূর্তে মিথ্যা আবরণের মত খসিয়া

পড়িল, আর তাহার ভিতর হইতে মানুষের সেই পরমসত্য চিরসুন্দর রূপটি আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

খেঁদী তখন কী ভাবিতেছিল জানি না, হয়ত আমার নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার সে আশা করে নাই। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি হয়েছে ভাই আলোদা?

ভাবিলাম তাহার কাছে আজ কিছুই গোপন করিব না—নিঃশেষে নিজেকে প্রকাশ করি, বলি সে যদি এমনি করিয়া আরো কিছুদিন আগে আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইত তাহা হইলে আমার জীবন হয়ত অন্যরূপ হইয়া যাইত; একাকী থাকিয়া এত আত্মনির্যাতন আমায় সহ্য করিতে হইত না! কিন্তু মুখ দিয়া তাহা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। তাই কিছু না বলিয়া আমি শুধু তাহার হাতখানিকে আরো জোরে মুঠা করিয়া ধরিলাম।

আরো কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। তারপর সহসা খেঁদী আমার মুঠা হইতে নিজের হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনি তুলসীতলায় পিদীম দিতে হবে—আমি যাই আলো-দা?

আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলিতে পারিলাম না। খেঁদী চলিয়া গেল। শুধু তাহার বিলীয়মান পদধ্বনি স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আমার চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল।

১৯

কমলের সঙ্গ আবার আমি বর্জন করিলাম; উহা শুধু আমার যন্ত্রণা বাড়ায়। কমল আমাকে ভালবাসে না—ইহা স্থির করিয়া আমি আবার একাকী থাকিতাম। কিন্তু সাত আট দিন যাইতে না যাইতে মনে হইল যেন মধুকে আগের চাইতে হর্ষোৎফুল্ল দেখাইতেছে। তবে কি আমার পরাজয়ে সে এইরূপ খুশি হইয়াছে? ভাবিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরো কত কি মনে পড়িল—যাহা হয়ত সম্ভব হয় নাই কিংবা হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু তবুও সেই সব চিন্তা আসিয়া আমার মনকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল যে কমলের সান্নিধ্যলাভের জন্য আবার আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই হঠাৎ আবার একদিন আমাকে মাঠে দেখিয়া কমল বলিয়া উঠিল, কি রে আলোক, কি মনে করে? এখন এলি যে, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না? বাব্বা, খুব যাহোক দেখালি, টেস্ট পরীক্ষা আমরাও দেবো।

মধু হঠাৎ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, দেবে, কিন্তু ওর মতো ফার্স্ট ত হতে পারবে না—তার ওপর আবার হেডমাস্টার চেষ্টা করছেন যাতে ও স্কলারশিপ্ পায়।

ইহা শুনিয়া মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। বলিলাম,—দেখ মধু, আমাকে যা

ইচ্ছে বল তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু হেডমাস্টার মশায়ের নামে কোন কথা বললে ভাল হবে না বলছি—ও কি শিক্ষকদের নিয়ে ঠাট্টা !

মধু বলিল, আমি ত ঠাট্টা করিনি, সত্যি কথাই বলেছি।

আমি বলিলাম, হেডমাস্টার মশায় বুঝি কেবল তোর কানে এই কথা বলতে গিয়েছিলেন ?

মধু জোর গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কর কমলকে হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে তিনি বলেছেন কিনা !

কমল একটা ধমক দিয়া বলিল, এই মধু, চুপ কর্, তোর কী দরকার ওসব কথায় থাকবার ?

মধু সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। তখন কমল বলিল, হ্যাঁরে আলো, এতদিন আসিস্‌নি কেন ভাই ? হেডমাস্টার মশায় বুঝি ছাড়েন নি—আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাস্ বলে বকেছেন ?

দূর্, বকবেন কেন, বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমি কমলের দিকে তাকাইলাম।

মধু আবার বলিল, স্কলারশিপ ও পাবেই, তা হেডমাস্টার জানেন।

তখনো টেস্ট পরীক্ষার মাসখানেক দেরি ছিল, কিন্তু এইভাবে তাহারা আমাকে খোঁচা দিয়া কথা বলিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিতাম না, তাহাদের সঙ্গেই বেড়াইতাম।

কমলের সঙ্গ তখন আমার কাছে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

দিন পনেরো পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম কমলের বাবা তাহার পৈতা দিবার জন্য টেস্টের আগেই দিন ঠিক করিয়াছেন। কমলের মা ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি নাকি তাহা শোনেন নাই। বলিয়াছেন, তিনদিন পড়া না করলে যে ছেলের পরীক্ষা খারাপ হয় তার লেখাপড়া না করাই উচিত।

কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে কমলের মা আর আপত্তি করেন নাই, দিনও স্থির হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, এই উপলক্ষে কমলকে কি উপহার দিব তাহাই তখন আমার কাছে বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলাম, জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া কমলকে একটি ভাল বই কিনিয়া উপহার দিব। কিন্তু কার্যকালে তাহা অন্যরূপ হইল কেন তাহা বলিতেছি।

কমলের উপনয়নের যখন আর মাত্র পাঁচদিন বাকি তখন হঠাৎ একদিন মধু কমলকে ও আমাকে বলিল, চল্ আজ রাস দেখতে যাই।

রাসযাত্রা উপলক্ষে ও-অঞ্চলে এক বিরাট মেলা বসিত। তাহাতে কলিকাতা হইতে বহু ব্যবসায়ী আসিয়া দোকান খুলিত। একমাস ধরিয়া এই মেলা চলিত, দেশ-বিদেশ হইতে বহু লোক আসিত তাহা দেখিতে। দ্রষ্টব্য জিনিস যাহা থাকে

পল্লীগ্রামের লোকদের একবার দেখিয়া আশ মেটে না, প্রতি বছরই বার বার অনেকেই দেখিয়া থাকে—বিশেষ করিয়া যাহাদের বাড়ি কাছে তাহাদের ত কথাই নাই।

বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাম হইতে এই স্থানটি নিকটেই এবং আমরা ইতিপূর্বে দুই দিন মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। এখান হইতেই আমি কমলের জন্য বই কিনিব মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। তবু মধু সেদিন মেলায় যাইবার কথা বলিতে আমি ও কমল কেহই আপত্তি করিলাম না, আবার গেলাম।

মধু সেখানে গিয়া প্রথমেই একটি ফটোর দোকানে ঢুকিল এবং কমলের এক-খানি বড় করিয়া ফটো তৈয়ারি করিয়া দিবার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম দিল। সোনালী ফ্রেমে বাঁধাইয়া কমলের এই ছবিখানির মোট দাম পড়িবে বারো টাকা। মধু ইহা কমলের পৈতায় উপহার দিবে।

কমল ইহাতে বেশ খুশি হইয়া উঠিল দেখিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যে কিরূপ খারাপ হইয়া গেল তাহা বোধ করি কমল বা মধু কেহই বুঝিতে পারিল না। আমি যে দরিদ্র এই কথাটা বার বার তখন আমার মনে পড়িতে লাগিল। আর সেইজন্যই বোধ হয় কমল আমার চেয়ে মধুকে বেশি পছন্দ করে এই চিন্তা আমার মনকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিতে লাগিল।

যাহা হউক এই সব ভাবিতে ভাবিতে মেলার মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ একটা গ্রামোফোনের দোকানের সামনে কমল থমকিয়া দাঁড়াইল। আমরাও তাহার সঙ্গে দাঁড়াইলাম। একখানি গান বাজিতেছিল। ভারি সুমিষ্ট সুর! মিনিট দুই পরে গানটি শেষ হইতেই কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, গ্রামোফোন যন্ত্রটা বেশ, না আলো,—যে গানটা আমার ভাল লাগবে যতবার ইচ্ছে খুশিমত বাজিয়ে শুনবো?

গান শুনিতে আমিও খুব ভালবাসিতাম, তাই তাহার এই কথা সায় না দিয়া পারিলাম না। মধুও আমাদের সঙ্গে একমত হইল। তারপর আমরা সকলে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

এই ঘটনার শেষ এইখানে হইলেও আসলে কিন্তু ইহার জের চলিয়াছিল বহু-দিন পর্যন্ত। সেই কথাই এখন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে।

কেন জানি না পৈতার আগের দিন হঠাৎ আমার মনে হইল, আচ্ছা যদি আমি কমলকে একটা গ্রামোফোন উপহার দিই তাহা হইলে কেমন হয়?

মনে মনে কদিন ধরিয়া এ বিষয়ে কত কী তোলাপাড়া করিয়াছিলাম কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। তাই ইহা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে শুধু যে কমলকে খুশি করা হইবে তাহা নহে, মধুর উপরেও রীতিমত প্রতিশোধ লওয়া হইবে। মধুর ফটোখানি কি ম্লান হইয়া যাইবে না এই গ্রামোফোনের কাছে? কথাটা মনে হইতেই একপ্রকার ক্রূর ও নিষ্ঠুর আনন্দে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সংসারে যে ইচ্ছা করিলেই সব জিনিস পাওয়া যায় না তাহা বিশ্বাস করিবার মতো বয়স বোধ করি তখন আমার হয় নাই, তাহা হইলে অন্তত একবারও মনে হইত যে আমার মত নিঃস্ব ও পরাশ্রয়ীর পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব—বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাওয়ার মত। তাই পরের দিন সহসা যেন আমার স্বপ্ন-ভঙ্গ হইল। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া আমার কল্পনা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। টাকা কোথায়? কী দিয়া এই কলের গানটি ক্রয় করিব? আর কেই বা দিবে আমায় সেই টাকা?

আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। যেদিক তাকাই, দেখি অন্ধকার। রজতমুদ্রার ক্ষীণতম রশ্মি পর্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তবে কি কাল ছেলেমানুষের মতো শুধু আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছি? লজ্জায় নিজের কাছেই যেন নিজের মুখ দেখাইতে ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। অথচ আর সময় নাই—সেইদিন সন্ধ্যায় কমলের বাড়ি নিমন্ত্রণ, তাহাকে একটা কিছু উপহার দিতেই হইবে!

নিস্তব্ধ দুপুর। জ্যাঠাইমা খাওয়াদাওয়া সারিয়া পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁহার কোলের মেয়েটিকে লইয়া। শুধু তাহার উপরের ছেলেটি তখন ঘরের মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। ভূতোরও ছুটি, সে টেস্টের পড়া পড়িবার জন্য হেডপণ্ডিতের বাড়ি গিয়াছে। অঙ্ক কষিতে কষিতে সহসা আমার মনে হইল জ্যাঠাইমার কথা। একদিন তিনি বিনা কারণে আমায় চোর অপবাদ দিয়াছিলেন, শুধু তাঁহার বিছানায় হাত দিয়াছিলাম বলিয়া। তবে কি সত্যিই তিনি বিছানার নীচে টাকা লুকাইয়া রাখেন? কৌতূহল হইল পরীক্ষা করিবার জন্য।

পা টিপিয়া টিপিয়া তখন তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। আমার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিতেছিল। বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই আমার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল যদি এখুনি ওই পাঁচ বছরের ছেলেটি জাগিয়া উঠে কিংবা আর কেহ আসিয়া পড়িয়া আমায় এই অবস্থায় দেখিতে পায়, তাহা হইলে কী ভাবিবে! একবার মনে হইল, দরকার নাই, ফিরিয়া যাই, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে পড়িল কমলের কথা! গ্রামোফোন দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর তাহা লক্ষ্য করিয়া মধু বিমর্ষ হইয়া পড়িবে। হয়ত কমল এইবার প্রথম বুঝিতে পারিবে যে আমি তাহাকে মধুর চেয়ে বেশি ভালবাসি। আর ভাবিতে পারিলাম না। নিমেষে আমার শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা সভ্যতা সমস্ত যেন কোথায় ডুবিয়া গেল। আমি জ্যাঠাইমার বিছানার একোণ ওকোণ উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম এবং সত্যসত্যই শেষে আবিষ্কার করিলাম একটি ছেঁড়া কাঁথার ভাঁজ হইতে পাঁচখানি দশটাকার নোট! কম্পিত হস্তে আমি সেগুলি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বার বার পিছন দিকে তাকাইতে তাকাইতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

তারপর সন্ধ্যার সময় একটি ছোট কলের গান ও খানকয়েক রেকর্ড কিনিয়া লইয়া আমি একেবারে সোজা কমলের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। কমল আমাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিল, কিরে এ সব কি ?

বলিলাম, আজকের দিনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তোকে এইটে উপহার দিলুম ভাই !

কমল তখন অভিযোগের সুরে বলিল, মিছেমিছি তুই এত টাকা খরচ করতে গেলি কেন ? হ্যাঁ রে সত্যি করে বল্‌ত কোথা থেকে এত টাকা পেলি ?

আমি বার-দুই ঢোক গিলিয়া বলিলাম, আমার বাবা যে আমার জন্যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন, জানিস্‌ না ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে আমার দারিদ্র্যকে কটাক্ষ করিল তাহা চিন্তা করিয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

কমল আর কোন কথা না বলিয়া আমার হাত হইতে সেটি লইল এবং গান শুনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহাতে একখানি রেকর্ড লাগাইয়া দিল। সুমিষ্ট কণ্ঠে ও করুণ সুরে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাজিতে লাগিল—

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হ'য়ে গেল ঢালা,
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে
বেড়ানু বহিয়া সারারাতি ধ'রে ;
লও, তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙীন হোলো ;
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোল হে তোলো।
সে রসে মিশাক্‌ তব নিশ্বাস
নবীন ঊষার কুসুম-সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

অদ্ভুত সুর ও অত্যাশ্চর্য বাণীর সমন্বয়ে মহাকবির এই গানটি যখন শেষ হইল তখন কাহারো মুখে কোন কথা নাই—কিসেব আবেশে যেন সবই মুহ্যমান ! মিনিট কয়েক এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রথম কথা বলিল বড় করুণ ভাই, ভাল লাগে না।

বলিয়া সে কাজে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় সেই যন্ত্রটিকে বন্ধ করিয়া একটি নিভৃত স্থানে রাখিতে রাখিতে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, খবরদার, এতে কেউ হাত দিবিনি, দামী জিনিস ভেঙে যাবে তাহ'লে।

কমলের ভাল লাগিল না শুনিয়া আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল।

তবে কি আমার সমস্তই ব্যর্থ হইল ? এত কাণ্ড করিয়াও তাহার মন পাইলাম না ! ক্ষোভে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে আমার যেন তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

এইরূপ ভারাক্রান্ত মন লইয়া যখন কমলের ওখান হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ির দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। সারা পল্লী নিশুতি, কিন্তু তখনো আমাদের বাড়িতে আলো জ্বলিতে দেখিয়া আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মনে পড়িল, আজ আমি চোর, চুরি করিয়াছি জ্যাঠাইমার টাকা—ইহা আর জানিতে কাহারো বাকি নাই, তাই আমারই জন্য আলো জ্বালাইয়া সবাই অপেক্ষা করিতেছে। তবে কোন্ মুখ লইয়া বাড়িতে ঢুকিব ! কম্পিত বক্ষে বাহিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। তাহার উপর, পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার ফাঁক দিয়া বাড়ির ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই আমার সর্বশরীর ভয়ে হিম হইয়া গেল। দেখিলাম, জ্যাঠাইমা একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে রকে বসিয়া আছেন। ইহা যে আমারই জন্য তাহা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। কী করিব বুঝিতে না পারিয়া আমি সেখান হইতে কিছু তফাতে গিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম।

এই সময় একবার হঠাৎ—'কে' বলিতে বলিতে জ্যাঠাইমা আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন, তারপর কাহাকেও সেখানে দেখিতে না পাইয়া আবার খিল আঁটিয়া দিতে দিতে আপন মনেই বলিলেন, আ মর্, কেউ ডাকেনি অথচ আমার মনে হলো যেন কে কড়া নাড়লো ! ছোঁড়ার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথার ঠিক নেই। রাত দুপুর হলো, আসুক আজ বাড়ী মজা দেখাবো !

জ্যাঠাইমার মুখ হইতে এইসব কথা শুনিয়া আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। চুরি যে ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি যে আমারই জন্য জাগিয়া বসিয়া আছেন সে সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন সর্বপ্রথম যাহাদের কথা মনে পড়িল সে কমল ও মধু ! মনে হইল তাহাদের কানে একথা কাল সকালেই নিশ্চয় গিয়া পেঁছিবে, আর আমারই চোখের সামনে আমারই দেওয়া উপহার লইয়া কত না লাঞ্ছনা তাহারা করিবে। ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। তারপর মনে পড়িল, তাহারা হয়ত স্কুলের অন্যান্য ছেলেদের কাছে ইহা বলিবে--তার পর, যদি হেডমাস্টার শোনেন—! না, না, অসম্ভব, ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না ! আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী তখন যেন ভূমিকম্পের মত কাঁপিতে লাগিল। সামনে পিছনে ডাইনে বামে—যেদিকে দেখি, অন্ধকার ! আমাকে সান্ত্বনা দিবার, আমাকে 'আহা' বলিবার কেহ নাই—আমি একা যেন অনন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়াছি। তবে কাহার কাছে যাইব—কে সান্ত্বনা দিবে ?

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, সংসারে যদি কেহ আমায় না চায়, কেহ যদি

আমায় ভাল না বাসে—তবে আমার স্থান কোথায়? আর ভাবিতে পারিলাম না। মাথা গরম হইয়া উঠিল। এবং তখনই স্থির করিয়া ফেলিলাম আমি এখান হইতে পালাইব—আজই, এখনি, এই রাত্রেই!

স্নেহ-ভালবাসাই মানুষকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে। যাহার তাহা নাই, গৃহ-ত্যাগ করা তাহার কাছে খুবই সহজ। তাই সেই রাত্রে চুপি চুপি বাড়ি ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া, একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। গৃহত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্তির আনন্দে আমার মনে তখন যেন কত নূতন বল সঞ্চারিত হইল।

মাঠের পর মাঠ, জঙ্গলের পর জঙ্গল ছাড়িয়া আমি চলিলাম, নূতন রাজ্যে, নূতন জীবনের পথে—যেখানে কমল নাই, মধু নাই, জ্যাঠাইমা নাই, যেখানে আমার বলিতে কেহ নাই, যেখানে আমি একা এবং অপরিচিত! কোন আকর্ষণ, কোন মোহ আর আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পরীক্ষা, নিজের ভবিষ্যৎ লোকলজ্জা সমস্তের চেয়ে তখন আমার কাছে বড় হইয়া উঠিল সেই স্থান ত্যাগ করা।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সেই অন্ধকার রাত্রে একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যখন ভোরের দিকে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন এক অভূতপূর্ব আনন্দে আমার প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। বাঁধন ছেঁড়ার আনন্দ যে কিরূপ তাহা সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। তারপর বিনা টিকিটে মার্টিন কোম্পানির ছোট গাড়িতে চাপিয়া একেবারে হাওড়া ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একে নূতন শীত পড়িয়াছে, তাহাতে ভোরের গাড়িতে ও-লাইনে যাত্রীও বিশেষ ছিল না। অস্পষ্ট আলোকে যখন স্টেশনে নামিলাম তখন টিকিট চাহিতেও কেহ আসিল না দেখিয়া বাঁচিলাম। পকেটে আমার একটি পয়সাও ছিল না, একেবারে এক কাপড় ও এক জামায় নিমন্ত্রণবাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

২০

কতকাল পরে আবার কলিকাতায় আসিলাম! সেই নিবিড় পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া এতদিন পরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহরের উপর প্রথম সূর্যোদয় দেখিয়া মনে হইল যেন আমি কোন স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলো যখন প্রখরতর হইয়া উঠিল তখন সহসা আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। মনে পড়িল, আমি বিদেশে একাকী এবং কপর্দকহীন! কি করিব, কোথায় যাইব, বহুক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার ধারে বসিয়া ভাবিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শুধু বার বার এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, পরিচিত লোক বলিতে যাহা বুঝায় সেরূপ একজনও ত আমার এখানে নাই। অবশেষে দুই একজন ভদ্রলোকের কাছে পরামর্শ চাহিলাম। তাঁহারা রাস্তা দিয়া

চলিয়া যাইতেছিলেন, সেখানে আমার পরিচিত লোক কেহ নাই শুনিয়া কেহ পরামর্শ দিলেন ধর্মশালায় যাইতে, কেহ বা হোটেলে। আমার মূলধন সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের জানাইলাম তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহারা সবেগে প্রস্থান করিলেন, পাছে আমি কিছু চাহিয়া বসি বোধ করি এই ভয়ে। আবার যাইতে যাইতে কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্যও করিতে ছাড়িলেন না যে, কলিকাতা শহরে যে সমস্ত ভদ্রবেশধারী জুয়াচোর ঘুরিয়া বেড়ায় আমি তাহাদেরই একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ !

ইহা শুনিয়া নিজের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না—পথে যদি না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল।

কলিকাতায় রাস্তার অন্ত নাই। ইহার যে কোন একটা রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কতদূর যে চলিয়া যাইতাম তাহার ঠিক নাই—সমস্ত দিনও যেন পথ ফুরাইতে চাহে না। বড় বড় বাড়ি, চওড়া রাস্তা, রঙ-বেরঙের গাড়িঘোড়া দিবারাত্র জনস্রোত দেখিয়া দেখিয়া আমার যেমন বিস্ময় বোধ হইত, তেমনি আরো দেখিতে ইচ্ছা করিত। পা ব্যথা করিলে কোন এক জায়গায় বসিয়া একটু বিশ্রাম লইতাম, তারপর আবার চলিতে শুরু করিতাম। নব নব পথ আমাকে নব নব উৎসাহে আকর্ষণ করিত। শুধু এক পথ হইতে অন্য পথে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

কিছু না খাইয়া, কাহারো সাহায্য না লইয়া, শুধু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আমার ভাল লাগিত। ক্ষুধা পাইলে কলের জল খাইতাম এবং ঘুম পাইলে রাত্রে কোনদিন গঙ্গার ঘাটে, কোনদিন বা পার্কের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইতাম। ক্ষুধার জ্বালায় এক একবার মনে হইয়াছে কাহারো কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করি, কিন্তু লজ্জায় তাহা পারি নাই।

এইভাবে তিনদিন কাটিবার পর চতুর্থদিন আর হাঁটিবার যেন শক্তি ছিল না। দুই চার পা অগ্রসর হইলেই মাথা ঝিমঝিম করে, চোখে অন্ধকার দেখি। অবশেষে কিছুদূর যাইয়া একটা বাড়ির রকে বসিয়া পড়িলাম। বড়লোকের বাড়ি, হঠাৎ যদি কাহারো নজরে পড়িয়া যাই হয়ত আমার জীবনে বহু উন্নতি হইতে পারে—বসিয়া বসিয়া এইসব ভাবিতেছিলাম। বইয়ে ত এইরকম কত কাহিনী পড়িয়াছি—আমার ভাগ্যে কি একটাও সে-রকম জুটিবে না ? এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় চিন্তা শক্তি পর্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় আমারই সমবয়সী একটি ছেলে সেই বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া আমারি পার্শ্বে রকের উপর বসিয়া একটি বিড়ি ধরাইল। তাহাকে বিড়ি খাইতে দেখিয়া আমার কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। এত অল্পবয়স্ক কোন ভদ্রসন্তানকে ইতিপূর্বে আমি ওই দুষ্কার্য করিতে দেখি নাই, তাই সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। ছেলেটির চেহারা ভাল, তবে গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি ও কালো একটা হাফপ্যাণ্ট পরা দেখিয়া

ভাবিয়াছিলাম হয়ত তাহাদের বাড়ির অবস্থা খারাপ।

আমাকে তাহার মুখের দিকে ওইভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বার-কতক খুব জোরে জোরে বিড়িটা টানিল, তারপর মুখ হইতে সেই অর্ধদগ্ধ অংশটি লইয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, এই নে, খা ভাই। নেশার জিনিস একজনকে খেতে দেখলে আর একজনের মুখ চুলকায়, না?

তাহার মুখ হইতে ধূমপান-তত্ত্বের এইরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার রাগ হইল। কিন্তু তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি শুধু বলিলাম, না আমি বিড়ি খাই না।

সে বলিল, ও, আধখানা দিয়েছি বলে রাগ হলো? আচ্ছা এই নে একটা গোটা দিচ্ছি। এই বলিয়া সে তাহার হাফপ্যাণ্টের পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিতে করিতে বলিল, সকালে দু পয়সার কিনেছি, এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল!

তখন বোধ হয় বেলা এগারোটা বাজিয়াছে। আমি তাহার মুখ হইতে উহা শুনিয়া তাহাকে জানাইলাম যে আমি বিড়ি খাই না। প্রথমে সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই কিন্তু কেন জানি না এবারে করিল! তাই একটা ঢোক গিলিয়া সে আমায় প্রশ্ন করিল, তুই কোথায় কাজ করিস ভাই?

বলিলাম, কোথাও না।

সে বলিল, তবে কী করিস্?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমার চোখে তখন জল আসিয়া পড়িয়াছে।

ছেলেটি বলিল, আমাদের এখানে কাজ করবি? খেতে পাবি, থাকতে পাবি—এছাড়া আবার মাইনেও পাবি।

চারিদিন ধরিয়া অনাহারে, আশ্রয়হীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার পর থাকা এবং খাওয়ার কথা শুনিয়া আমি আর না বলিতে পারিলাম না। মাহিনার কথা কিংবা কি কাজ করিতে হইবে তাহাও চিন্তা করিবার মতো অবস্থা তখন আমার ছিল না—তাই বিনা আপত্তিতে তাহার এই প্রস্তাবটিতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

ছেলেটি বলিল, চল্ তবে—আমার বাবুর কাছে। এই বলিয়া সে আমাকে লইয়া সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, ইহা একটা তামাকের আড়ত। সামনের প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানিতে চারিদিকে তামাকের অসংখ্য টিন ও তাল তাল তামাক খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের কড়িকাঠ হইতে লোহার শিকলে বাঁধা একটি বড় কাঁটা ঝুলিতেছে, তাহাতে মণ মণ তামাক ওজন হইতেছে। সেই ঘরেরই এক কোণে একটা উঁচু গদির উপর একটি লোক বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল। তাহার কাছে যাইয়া ছেলেটি বলিল, বাবু, এ কাজ করতে চায়—বংশী ত দেশে গেছে—এখনো ফিরলো না—

লোকটি পূর্ববঙ্গীয় এবং জাতিতে কর্মকার—যেমন কালো তেমনি বেঁটে এবং তেমনি মোটা। পরনে একটি পাঁচহাতি ধুতি, খালি গা, মহিষের মতো সারা গায়ে

লোমভরা। হুঁকায় সশব্দে একটা বড় রকমের টান মারিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি রে ছোঁড়া, তোর নাম কি রে?

নাম বলিলাম।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জাত রে তুই?

বলিলাম, ব্রাহ্মণ।

মুখটা বিকৃত করিয়া তিনি কহিলেন, হ্যাঁ সব শালা ব্রাহ্মণ! চুরিটুরি করে পালাবি না ত? কাজ করতে জানিস্? তারপর হুঁকায় আরো গোটা কতক টান দিয়া বলিলেন, কলকাতায় কোন জানাশোনা লোক আছে যে তোর হয়ে জামিন থাকতে পারবে?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

তিনি আবার বলিলেন, এর আগে কোথায় কাজ করতিস্?

বলিলাম, কোথাও না।

তিনি তখন একসঙ্গে বার আষ্টেক ঘন ঘন হুঁকায় টান মারিয়া আবার বলিলেন, খাওয়া আর দু'টাকা মাইনে দিতে পারি—পোষায় থাকো, আর না পোষায় পথ দেখো। তবে ভাল কাজ করতে পারলে পরের মাস থেকে আরো দু'টাকা মাইনে বাড়বে। এই বলিয়া তিনি একগাল ধোঁয়া আমার মুখের উপর ছাড়িয়া দিলেন।

'না' বলিবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। দুইটি ভাত খাইবার জন্য তখন বোধ হয় আমি পারিতাম না এমন কোন কাজ ছিল না পৃথিবীতে। তাই, সমস্ত রকমের অপমান ও হীনতা সহ্য করিয়াও তাঁহার শর্তেই রাজী হইলাম।

তিনি তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার গদিতে ছোঁড়ারা যেমন খেতে পায় এমন আর কলকাতার কোন্ শালা আড়তদার দেয়, শুনি? এইজন্যে যে-শালা একবার আমার এখানে আসে, সে আর নড়তে চায় না! শুধু পুঁইশাক চচ্চড়ি আর ডাল এখানে পাবে না। দস্তুরমতো আলু-বেগুনের তরকারী আর দু'বেলা মাছ একখানা করে। তাছাড়া ভাতও যত ইচ্ছে খাও, অন্য আড়তের মত পেট মাপা নেই যে দুটি বেশি চাইলে আর পাবে না। বংশী শালা সাত দিনের ছুটি নিয়ে গেল, অথচ এক মাস হয়ে গেছে তবু তার দেখা নেই। এই বলিয়া আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে ছোঁড়া, যখন তখন বাড়ি যেতে চাইবি না ত?

পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না। আমার চাকরি হইল।

আমার মতো ও আমার চেয়ে কিছু ছোট ও বড় আরো নয়জন ছোকরা সেই আড়তে চাকরি করিত। তাহাদের মধ্যে পালা করিয়া এক একজনকে এক একদিন রাঁধিতে হইত। আমিও ইহা হইতে রেহাই পাইলাম না। কি করিয়া রাঁধিতে হয় আমি একেবারেই জানিতাম না, তথাপি কর্তার গালাগালির ভয়ে রান্না চাপাইয়া দিতাম। যে ছেলেটির জন্য আমি চাকরি পাইয়াছিলাম তাহার নাম কেষ্ট; বাবু ডাকিতেন কেষ্টা বলিয়া—সে-ই আমাকে রান্না দেখাইয়া দিত। ইহা

ছাড়া দিনের মধ্যে আট-দশবার বাবুকে তামাক সাজিয়া দিতে হইত। এখানেও ছিল পালা, একজনের পর আর-একজনকে যাইতে হইত। বাবুর মুখে তামাকের নলটি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তামাক ফুরাইতেই তিনি হুঙ্কার ছাড়িতেন—'ওরে ছোঁড়ারা, তামাক দিয়ে যা!' কাহার পর কে যাইবে—ছেলেদের মধ্যে ঠিক করা ছিল। আমাকেও তাহাদের দলভুক্ত হইতে হইল। আমার সমস্ত অন্তর ইহাতে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। এক একবার মনে হইত পলাইয়া যাই, কিন্তু কোথায় যাইব? একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে পয়সাকড়ি কিছুই নাই সঙ্গে। তবুও এখানে দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইতেছি, কে-ই বা ইহা দিবে? ক্ষুধার যে কী জ্বালা তাহা তিনদিন না খাইয়া বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম—তাই মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিতাম।

পরের মাসে আমার মাহিনা হইল চার টাকা। বাবু আমার কাজে সন্তুষ্ট হইলেন। অন্য সকলের মাহিনা আমার চেয়ে বেশি ছিল—কেবল দুইজন ছাড়া। সকলের মাহিনা ছিল আট টাকা, কেবল সেই দুইজন দশ টাকা পাইত। ইহারা ছিল বাবুর প্রিয়পাত্র। তাঁহার মাথা টিপিয়া দিত, পা টিপিয়া দিত এবং রাত্রে পালা করিয়া এক একজন তাঁহার নিকট থাকিত। বাবু আড়তের উপরে দোতলার একটি ঘরে থাকিতেন, আর আমরা সকলে তাহার নীচের একটি বড় ঘরে শুইতাম। দেখিতাম, মনে মনে অন্য সকলে বাবুর প্রিয়পাত্র সেই ছেলে দুইটির এইরূপ সৌভাগের জন্য হিংসা করিত।

এইভাবে আরো একমাস কাটিয়া গেল। তখন একদিন কেষ্ট আমায় চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল, এই, বাবু তোর ওপর খুব খুশি হয়েছেন, তিনি বলছিলেন তুই যদি একটু রাত্রে বাবুর কাছে থেকে তাঁকে দেখাশোনা করিস তাহলে পরের মাসেই তিনি তোর মাইনে আট টাকা করে দেবেন। এই বলিয়া আমার পিঠটা একবার চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, ওঃ তোর ভাগ্যটা খুব ভাল—আমরা তিন চার বছর ধরে চাকরি করেও যা করতে পারিনি তুই দু'মাসে তাই করলি। যাক্‌, আমায় কিন্তু একদিন রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে দিস ভাই।

আমি বলিলাম, দরকার নেই আমার মাইনে বেড়ে—আমি চাই না বাবুর এই অনুগ্রহ।

বাবুর আচার-ব্যবহার চালচলন আমার মনকে অনুক্ষণ পীড়া দিত।

তবুও সহ্য করিতাম আর উপায় নাই বলিয়া।

কেষ্ট বলিল, আরে বোকা তোকে কোন কাজ করতে হবে না—বাবুর বাতের ধাত কিনা, যেদিন বাড়বে, হয়ত একটু মালিশ করে দিলি, নয়ত একবার দু'বার ওষুধ খাওয়ালি, ব্যস—তোফা বাবুর খাটের ওপর ইয়া মোটা গদীওলা বিছানায় শুয়ে থাকবি! তোর ত আরো মজা!

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, চাই না মজা—ও তোরাই ভোগ করগে!

কেষ্ট কল্পনাও করিতে পারে নাই যে স্বেচ্ছায় এত বড় সৌভাগ্য তাহাদের

মধ্যে কেহ ত্যাগ করিতে পারে, তাই ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া সে আমাকে বোকা বলিয়া চলিয়া গেল।

কয়দিন হইতে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। সর্বদা ভাবিতাম, এই-ভাবে কি আমার দিন কাটিবে—তামাক ওজন করিয়া, বাবুর জন্য তামাক সাজিয়া, ভাত রাঁধিয়া, কতকগুলি অশিক্ষিত ও নীচ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ছেলের সাহচর্য করিয়া? তাহার উপর আবার কেষ্টর মুখ হইতে ওই কথা শুনিয়া আমার সমস্ত অন্তর যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে সেই কাজ আর আমার একেবারেই ভাল লাগিত না। সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতাম। সহকর্মীরা প্রায়ই প্রশ্ন করিত, বাড়ির জন্যে তোর মন কেমন করছে, না রে?

কিন্তু আমি তাহাদের এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিতাম না।

এমনি করিয়া আরও কয়েকদিন কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ একদিন বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আমি যাইতেই একটি কাপড়ের পুঁটলি হাতে দিয়া সেটিকে তাঁহার ভায়ের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে বলিলেন।

তাঁহার ভায়ের বাসা নিকটেই। আমি যখন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাড়ির ভিতর পা দিতেই কানে আসিল বাবুর ভ্রাতুস্পুত্রটি পড়িতেছে। সে এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, তাই চীৎকার করিয়া তাহার ইংরেজী পড়া মুখস্থ করিতেছিল। যে অংশটি সে তখন পড়িতেছে, সেটি আমারও মুখস্থ ছিল। ইহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভিতরটা কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। প্রথমেই মনে হইল স্কুলের কথা। তারপর মনে হইল, আজ কত তারিখ? তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম আর চারদিন মাত্র বাকী আছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার!

সেদিন রাত্রে আমার কি হইল কি জানি, কোন রকমে একমুঠা ভাত মুখে দিয়া, চুপ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিলাম। কিন্তু শুইয়াও শান্তি পাইলাম না। কিছুতেই যেন চোখে ঘুম আসিল না, বিছানায় পড়িয়া কেবলই ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম।

গভীর রাত। কলিকাতা শহর বোধ করি তখন একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; সহসা আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল দেশে যাইবার জন্য। সে ব্যাকুলতা এমনই দুর্দমনীয় যে আমি কিছুতেই নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। চুপিচুপি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। তামাকের আড়তের মনিব ও সহকর্মীরা যখন সকলে ঘুমাইতেছে আমি তখন তাহাদের না জানাইয়া দেশে যাইবার জন্য স্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। কিন্তু স্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, ভোরের গাড়ি কিছুক্ষণ পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে—পরবর্তী ট্রেন সেই বেলা একটায়।

দুপুরের মধ্যে বাড়ি গিয়া পৌঁছিব মনে করিলাম কিন্তু আরো কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে ভাবিয়া আমার মন যেন অস্থির হইয়া উঠিল। তখন মনে পড়িল

কমলকে, মনে পড়িল খেঁদীকে ; মনে পড়িল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা, ভুতো প্রভৃতি সকলকে ; এমন কি সেখানকার গাছপালা ডোবা পুষ্করিণী মাঠ বন জঙ্গল—সমস্ত দেখিবার জন্য আমার উৎকণ্ঠিত তৃষিত অন্তর যেন সহসা কাঁদিয়া উঠিল।

২১

যাহাদের একদিন একান্ত পর ভাবিয়াছিলাম আজ আবার তাহাদের এমনই আপনার মনে হইতে লাগিল যে তখনি সকলকে দেখিবার জন্য সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিচিত্র মানুষের মন! একদিন যাহাকে ভাল লাগে না, আর একদিন তাহাকেই দেখিবার আগ্রহে অন্তর কেন যে এমন করিয়া উঠে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

মোট কথা দেশে ফিরিবার জন্য তখন আমার মন এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া আমার কী অবস্থা হইবে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু গাড়ি যত দেশের নিকটবর্তী হইতে লাগিল তত সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম জ্যাঠাইমার কাছে কোন্ মুখে গিয়া দাঁড়াইব! এতদিনে টাকা চুরির রহস্য নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ; হয়ত আমাকে দেখিয়া সকলে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে। খেঁদী, ভুতো হইতে শুরু করিয়া মধু কমল পর্যন্ত এ কথা হয়তো কাহারো কানে যাইতে বাকি নাই। তাহাদের কাছেই বা কি করিয়া মুখ দেখাইব। তাহার উপর টেস্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষারও আর তিনদিন মাত্র বাকি—হেডমাস্টার মশায় ও জ্যাঠামশায়কেই বা কী বলিব? মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল, একবার ইচ্ছাও হইল গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ি। কিন্তু পারিলাম না। কিসের একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ আমাকে অমোঘ বলে সেই পল্লীর দিকে টানিয়া লইয়া গেল। অল্প কয়েকদিনেই যে বিচিত্র রসের আস্বাদ পাইয়াছিলাম—হউক তাহা দুঃখের, হউক তাহা ছিন্নভিন্ন জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও ব্যথা-বেদনার কাহিনী, তবু যেন মনে হইতেছে সেই বহু দূরে ফেলিয়া আসা দিনগুলির স্মৃতি আজও আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের ভাঙাচোরা পথে প্রদীপের আলোর মতই মৃদু মৃদু করিয়া জ্বলিতেছে।

যাহা হউক, সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। চৌধুরীদের দীঘি ও রায়বাগানের কাছে আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলাম, যেন কাহাকে দেখিবার আশায় আমার মন সহসা আকুল হইয়া উঠিল। আমি চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিলাম। যে পথে কতবার চলিয়াছি, সেই পথই যেন আজ নূতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল! তাহার ধারে ধারে কত স্মৃতি—কত আনন্দ, কত বেদনা, কত বিস্ময়!

মাঠ পার হইয়া একটা বাঁক ফিরিতেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা

নজরে পড়িল। ধড়াস করিয়া উঠিল বুকের ভিতরটা! এইবার সত্যই মনে হইতে লাগিল কেন ফিরিয়া আসিলাম, বেশ ত ছিলাম সেই অপরিচিত দেশে।

এমন সময় 'আরে আলোদা যে' বলিয়া নেড়ী ও বুঁচি ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়া পড়িল। খেঁদীর ছোট নেড়ী, তাহার পর বুঁচি! নেড়ী ও বুঁচি একসঙ্গে বলিল, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে আলোদা, বাবা তোমার জন্যে চারিদিকে কত খোঁজাখুঁজি করলেন!

বুঁচি ইতিমধ্যেই চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাড়ির দিকে ছুটিয়াছিল—ও মা, আলোদা এসেছে, দেখবে এসো!

আমি সেই ফাঁকে নেড়ীকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল আমার চুরির অপবাদটা তাহাদের কাহার মনে কতখানি আঘাত দিয়াছে তাহা জানিয়া লওয়া। নেড়ী নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, বোধ হয় বয়সে বছর বারো হইবে। সে প্রথমেই বলিল, জানো আলোদা, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে!

খেঁদীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সত্যই আমি একটু আশ্চর্য হইলাম; তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলাম, কবে রে?

সে আপনার মনের আনন্দে বলিয়া চলিল, এই এক মাস হলো আলোদা। দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। তারপর একদিন জামাইবাবু এসেছিল, আমাদের সকলকে এক-একটা করে টাকা দিয়ে গেছে।

আমি সেকথা চাপা দিয়া আসল কথাটার দিকে তাহার মন টানিয়া আনিবার জন্য বলিলাম, হ্যাঁরে নেড়ী, আমি চলে যাবার পর আর কিছু হয়নি বাড়িতে?

ও—হ্যাঁ—তোমায় বলতে ভুলে গেছি আলোদা, তুমি চলে যাবার পরদিনই একটা চোর এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বলিয়া সে বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইল।

চোর! আমিও ততোধিক বিস্ময়ের ভাণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল, হুঁ্যা। চোরটা মার বিছানার নীচ থেকে পঞ্চাশটা টাকা আর রান্না ঘর থেকে একটা বড় জলের ঘড়া নিয়ে পালিয়েছে।

আমি আরো বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি করে তোরা জানলি যে চোর টাকা আর ঘড়া চুরি করেছে?

সে বলিল, বা-রে, মা যে চোরটাকে দেখেছে পালাতে!

কণ্ঠে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম?

কি রকম আবার! জলের ঘড়াটা ছিল রান্নাঘরে চাবিবন্ধ। কখন যে সেই ঘরের চাবি ভেঙে চোর চুপি চুপি ঢুকেছে আমরা কেউ টের পাইনি, তারপর হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মার ঘুম ভেঙে যায়—তখন মা যেই চোর বলে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চোরটা ছুট মেরেছে। জানো, মা জানলা দিয়ে নিজের চোখে চোরটাকে পালাতে দেখেছে, তার গায়ে একটা কালো রঙের জামা ছিল—জানো!

নেড়ীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল! আমার মনে হইতে লাগিল নেড়ী যেন এক বিরাট পাষাণভার আমার বুক হইতে নামাইয়া দিল।

ইতিমধ্যে আমরা একেবারে বাড়ির দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। জ্যাঠাইমা খেঁদীকে সঙ্গে লইয়া আমাকে দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে দেখিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম, তারপর কোন কথা না বলিয়া জ্যাঠাইমার পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম। তিনি কোনও আশীর্বাদ না করিয়াই বলিলেন, ধন্যি ছেলে বাবা, তোমাদের সাতগুষ্ঠির পায়ে নমস্কার! এত বড় ছেলে তুই, লেখাপড়া শিখেছিস, অথচ কোথায় যে রইলি একটা চিঠি লিখে খবর পর্যন্ত দিতে নেই?

খেঁদী মায়ের মুখের উপর ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি থামো দিকি মা, মানুষটা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই শুরু করলে! ওর কী হয়েছিল না হয়েছিল আগে শোনো!

মায়ের মুখের উপর এই প্রথম আমি খেঁদীকে কথা কহিতে শুনিলাম। বিবাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বালিকাত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহারা কেমন ভারিক্কি হইয়া পড়ে। বেশ লাগিল আমার খেঁদীকে। চিরকাল তাহাকে মায়ের নিকট হইতে বকুনি খাইতে দেখিয়াছি, তাই আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনটা সত্যই তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

মেয়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া মুহূর্তে জ্যাঠাইমার চোখ দুইটি আরো বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি একবার আমার মুখের দিকে আর একবার খেঁদীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দ্যাখ্ খেঁদী, ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না—কালকের মেয়ে গলা টিপলে দুধ ওঠে, তুই কিনা এসেছিস্ আমায় শেখাতে কখন কাকে কী বলতে হয়? জানিস্, আমি ব'লে তাই চুপ করে আছি, অন্য জ্যাঠাই হ'লে আজ আর ওকে বাড়ির চৌকাঠ ডিঙতে দিতো না। এই বলিতে বলিতে তিনি সবেগে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন, তারপর আপন মনে গজগজ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন আমি তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। নেড়ী ও বুঁচি সেখানে আর দাঁড়াইল না, জ্যাঠাইমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া খেঁদী আমার হাত ধরিয়া বলিল, আলোকদা, ভাই, মার কথায় যেন রাগ ক'রো না—দিনরাত খেটে খেটে ওঁর আর মাথার ঠিক নেই—তাছাড়া বয়েসও ত বাড়ছে দিন দিন…

ইহার উপর আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। খেঁদীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম।

যে ঘরে আমি থাকিতাম সেটা এখন খেঁদির হইয়াছে দেখিলাম। ঘরটা ঠিক তেমনিই আছে শুধু খেঁদীর বিবাহের নতুন তোরঙ্গ বাক্স প্রভৃতি দুই চারিটা জিনিস আমারই তক্তাপোষের তলায় রহিয়াছে। খেঁদী আমাকে জামাকাপড়

ছাড়িতে বলিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্য এক ঘটি জল আনিয়া দিল এবং হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইলে একটা রেকাবীতে করিয়া মুড়ি ও খানচারেক বড় বাতাসা আনিয়া আমায় জল খাইতে দিল।

তারপর আমি যতক্ষণ খাইতে লাগিলাম সে ততক্ষণ আমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। সে কত কথা, যেন ফুরায় না—এতদিন কোথায় ছিলাম কি করিয়াছি, কোথায় খাইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা কোনদিন কাহাকেও বলিব না ভাবিয়াছিলাম, সে এমন সস্নেহে ভুলাইয়া আমার নিকট হইতে তাহা বাহির করিয়া লইল যে, আমি তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। খাইতে খাইতে আমার মন কোথায় যে চলিয়া গিয়াছিল জানি না, হঠাৎ এক সময় হুঁশ হইতে দেখি খেঁদী চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। তারপর সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, আলোদা, একটি কথা সত্যি করে বলবে?

সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, খেঁদীর কাছে যে কিছু গোপন করিতে পারি ইহা তখন আমার কল্পনারও অতীত। তাই সাগ্রহে বলিলাম, কী বল?

খেঁদীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, আচ্ছা, তুমি এখান থেকে কেন পালিয়ে গেলে, কেন পড়াশুনো নষ্ট করে এই রকম কষ্ট ভোগ করতে গেলে? কী তোমার মনে হয়েছিল তখন সত্যি করে বলো না—আমার কাছে গোপন করো না লক্ষ্মীটি?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

খেঁদী তখন আমার একটা হাত ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, বলো, আমার কাছে আজ তোমায় বলতেই হবে, লক্ষ্মী ভাইটি!

তাহার সেই ব্যাকুলতাভরা চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, জানি না!

খেঁদী আর কিছু বলিল না, তেমনিভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, যেন কিসের গভীর চিন্তায় সে মগ্ন।

এমন সময় জ্যাঠাইমার তীব্র কণ্ঠস্বর আসিয়া আমাদের উভয়ের নীরবতাকে যেন টুকরা টুকরা করিয়া দিল। তিনি কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝিতে পারিলাম না! তবে এইটুকু কানে গেল—লোকের বাড়ি সন্ধ্যে দেওয়া হয়েছে কখন, আর মেয়ের আমার গল্প ফুরোয় না! যত সব অলক্ষীপনা দু' চোখে দেখতে পারি না—আমার ভাগ্যে জুটেছে সব তেমনি!

মা বকছে আলোদা, এখনো বোধহয় সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি, আমি যাই। বলিতে বলিতে সে ত্বরিতপদে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি ঘরে একাকী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার শঙ্খ তখন সবে একটা দুইটা করিয়া বাজিতে শুরু করিয়াছে। বহুদূর হইতে যে দুই-তিনটার মিলিত ধ্বনি আসিতেছিল, আমি কান পাতিয়া তাহা শুনিতেছিলাম।

হঠাৎ ঘরে কাহার পায়ের শব্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, সরলা ঝি ঘরে আলো দিতে আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই সে ভৎর্সনাভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কী ছেলে তুমি দাদাবাবু, বাড়ি থেকে যদি চলে যাবে জানো ত একবার কাউকে বলে যেতে পারলে না,—আর কাউকে বলে যেতে যদি লজ্জাই হয়েছিল ত সরলা ত মরেনি তাকে বলে গেলেই পারতে? বাবা, কী কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে খুন। মা ত তিনদিন পর্যন্ত মুখে কুটোটা কাটেনি—এক গেলাস জলও কেউ তাকে খাওয়াতে পারলে না; বলে, ওর মা থাকলে সে কি আজ মুখে খাবার তুলতে পারতো? ছোটবৌ যে মরবার সময় ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। এইসব ব'লে এমন ভাবে কাঁদতে তাঁকে আমি আর কোনদিন দেখিনি। আর, বাবু কত পয়সা খরচ করে একে ওকে তাকে চারিদিকে যে পাঠালে তোমায় খুঁজতে তা কী বলবো! শেষে নিজে দশবারো দিন ধরে ঘুরে ঘুরে ভীষণ জ্বরে পড়লো।

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া শেষ একটু থামিয়া দম লইয়া সে আবার বলিল, বলি কোথায় গিয়েছিলে এতদিন শুনি?

আমি তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্মিতকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম হ্যাঁ সরলা, জ্যাঠাইমা আমার জন্যে কেঁদেছিল?

সরলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কাঁদবে না! তোমার মত ত ওরা আর সবাইকে পর ভাবে না? বলে, বনের পশুপক্ষী একটা বাড়ি থেকে গেলে লোকে চুপ করে থাকতে পারে না, তা আপনার জন! কথায় বলে—রক্তের সম্পর্ক—

সরলা আরো কত কি কথা বলিয়া চলিল কিন্তু আমার কানে তাহার একটি বর্ণও তখন ঢুকিল না। শুধু বার বার তাহার একটি কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল—সত্যিই কি জ্যাঠাইমা আমার জন্য কাঁদিয়াছেন? ইহা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল জানি না, হঠাৎ আবার সরলার প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিলাম। সে বলিল, বলি, আমি যে এত বকে মলুম, তা কি তোমার কানে ঢুকলো না—কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

বলিলাম, যমের বাড়ি।

আচ্ছা, বলতে হবে না। বলি 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর'! আমি কোথায় দুটো ভালো কথা জিজ্ঞেস করতে এলুম, না আমার ওপর রাগ! কোন্ হারামজাদি আর তোমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করে।

বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। আমি কিছুই তাহাকে বলিতে পারিলাম না। আমার তখন এক অদ্ভুত অবস্থা। জাগিয়া থাকিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম জ্যাঠাইমাকে। তিনি কাঁদিতেছেন আমার জন্য—একটা মাদুরে তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন, বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, সকলে তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন 'আমি কোন্ প্রাণে মুখে জল দেবো, বাছা আমার হয়ত না খেয়ে এখনো পথে পথে ঘুরে

বেড়াচ্ছে···ওর মা নেই, ছোটবৌ যে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে !···'

ভাবিতেছিলাম আরো কত কি ! একবার ইহাও মনে হইল, তবে কি জ্যাঠামাইকে আমি এতকাল ভুল বুঝিয়াছি ?

এমন সময় ভিতর হইতে জ্যাঠাইমারই গলার আওয়াজ পাইয়া আমার সে স্বপ্ন যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি বলিতেছিলেন, বলি শুনেছ, তোমার আদরের ভাইপো যে চোদ্দপুরুষের মাথা কিনে ফিরে এসেছেন—যাও তাকে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করগে !

জ্যাঠামশায় বাড়িতে ছিলেন না. বুঝিলাম তিনি ফিরিয়াছেন। মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই তিনি আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গিয়াই আমি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলাম। কান্না দেখিয়া কিনা বলিতে পারি না, তিনি বেশি কিছু আমায় বলিলেন না। শুধু বলিলেন, এ বছরটা মিছামিছি নষ্ট করলি ত, আবার একটা বছর পড়তে হবে। তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন রে, অসুখবিসুখ কিছু করেছিল নাকি ?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না, তেমন কিছু নয়।

তিনি আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একবার দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুই যদি একটা খবরও দিতিস্ তাহলে আর আমার অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ হতো না। এই বলিয়া আমার নিকট হইতে কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

জ্যাঠামশায় চলিয়া যাইবার একটু পরেই ভুতো আসিয়া আমার ঘরে ঢুকিল। যেন সে এতক্ষণ পিতা চলিয়া যাইবার অপেক্ষায় নিকটে কোথাও লুকাইয়া ছিল। সে আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কোথায় ছিলি ভাই আলো এতদিন ? যাক্, খুব দিনকতক ঘুরে এলি, বেশ আছিস্ তুই মাইরি ! তুই যদি যাবার সময় আমায় একটু বলতিস্ তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে চলে যেতুম। হ্যাঁরে, খেঁদী বলছিল, তুই নাকি এতদিন কলকাতায় ছিলি ? সত্যি ? মাইরি বলছি, আমার ভারি ইচ্ছে করে কলকাতায় থাকতে, এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও নেই। রাস্তাগুলো কেমন বাঁধানো—ধুলো নেই কাদা নেই, ধোয়া-মোছা একেবারে খট্ খট্ করছে। কোথাও এতটুকু জঙ্গল নেই, পচা পুকুরের নাম-গন্ধও নেই, কেবল বড় বড় বাড়ি রাস্তার দুধারে মালার মত গাঁথা। আর আলো-গুলো কি সুন্দর ভাই ! রাত্তির হয়েছে কি হয়নি বোঝাই যায় না। অন্ধকার ত নেইই, মনে হয় যেন দিনের আলোয় চারিদিক হাসছে। আর রাস্তার দুধারে কত খাবারের দোকান—দেখেছিস্ ? হ্যাঁরে, সব দোকানের অত খাবার বিক্রি হয় রোজ ?

এইসব বলিতে বলিতে একসময়ে সে নিজেই স্কুলের কথা পাড়িল, কতগুলি ছেলে এ বছরে টেস্টে এলাউ হইয়াছে বলিল এবং মধু যে ফার্স্ট হইতে পারে নাই

তাহা বলিতে বলিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ভুতোর কথা শুনিয়া মনে মনে বেশ কৌতুক উপভোগ করিতেছিলাম কিন্তু স্কুলের কথা উঠিতেই আমার মন যেন কেমন হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই পরীক্ষা দিবে, পাশ করিবে, কেবল আমিই পারিব না। আর তিনদিন পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। আমি নীরবে ভুতোর মুখের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, ভুতো কিন্তু তখনো নিজের উৎসাহে বলিয়া চলিয়াছে—জানিস্ আলো, আমাদের 'সিট' পড়েছে দ্বারভাঙ্গা বিলডিং-এ। তুই দেখেছিস সে বাড়িটা? হ্যাঁরে, সেটা নাকি খুব উঁচু, এত উঁচু যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাথা ঘোরে? আমরা একঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকবো হেডমাস্টারমশায় বলেছেন।

হেডমাস্টারের নাম শুনিয়াই আমার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন তাহাদের কাছে? একবার মনে হইল ভুতোকে জিজ্ঞাসা করি সেকথা, কিন্তু পারিলাম না; কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল।

ভুতো কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না। শুধু আপনার আনন্দে আপনি বকিয়া চলিল, কবে তাহারা পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় যাইবে, এবং সেখানে গিয়া তাহাদের দেশের কোন্ লোকের 'মেস্' এ তাহারা সকলে থাকিবে। একটু চুপ করিয়া সে আবার বলিল, শুধু মধু আর কমল তাহাদের সঙ্গে যাইবে না। তাহারা দুইজনে স্বতন্ত্র থাকিবে। মধুর কোন্ এক মামা নাকি খুব বড়লোক, কলিকাতায় তাঁহার বাড়ি আছে—মধু ও কমল কাল সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

এক নিশ্বাসে অনর্গল এইসব কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ এক সময় আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভুতো থামিয়া গেল। বোধহয় সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার কথাগুলি আমার একেবারেই ভাল লাগিতেছে না। তাই কতকটা যেন আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আবার বলিল, ভাই আলো, তুই যদি এবার এগ্‌জামিন দিতিস্ তা'হলে বেশ হতো—আমরা দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় যেতুম। সত্যি বলছি, তোর কথা মনে হলে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায় ভাই—কেন তুই এ বছরটা মিছিমিছি নষ্ট করলি এমন করে? এই বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যেন কোন প্রত্যুত্তরের আশায়।

ইহার জবাবে কী বলিবার আছে তাহা আমি নিজেই জানিতাম না, তাই চুপ করিয়া রহিলাম। আমি যে তাহাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারিব না, একমাত্র সেই চিন্তাই তখন আমার সমস্ত অন্তরকে ব্যথিত করিতে লাগিল। শুধু মধু ও কমল পরীক্ষা দিবার জন্য ইতিমধ্যে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল।

ভুতোও কী কথা বলিয়া এই নীরবতা ভঙ্গ করিবে তাহা বোধ করি খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তাই আমারই মতো চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইভাবে কিছু-

ক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, জানিস আলো, হেডমাস্টারমশায় তোকে 'টেস্টে' এলাউ ক'রে দিয়েছিলেন, যদি তুই এসে পড়িস্ এই আশায়—

যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ হইল। দপ্ করিয়া মনটা জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ভুতোকে কী বলিতে যাইতেছিলাম, অমনি মনে পড়িয়া গেল এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর হঠাৎ এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভুতো কি ভাবিবে! তাই অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা যথাসম্ভব দমন করিয়া শুধু বলিলাম, তারপর কি হো'ল।

তারপর আর কি হবে, তুই এলি না দেখে হেডমাস্টার খুব মুষড়ে পড়লেন।

এমন সময় জ্যাঠাইমা দরজার কাছে আসিয়া ভুতোকে বলিলেন, মুখপোড়া এখনো বসে আড্ডা দিচ্ছিস্, আর তিনদিন পরে এগ্‌জামিন—একঘণ্টা রাত হয়ে গেল তোর সেদিকে হুঁস নেই?

ভুতো আর কোন কথা না বলিয়া একরকম ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন আমার দিকে আরো দুই-পা আগাইয়া আসিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন, বলি নিজে ত কিছু করলি না, আবার যারা করছে তাদেরও মাথাটা কি এমনি করেই খেতে হবে? দেখছিস্ যে আর তিনদিন পরে পরীক্ষা, কোন্ আক্কেলে তুই ওর সঙ্গে বসে বসে এখন আড্ডা দিচ্ছিস্? বলি পাঁচ বছরের খোকাটি ন'স্ যে কিছু বুঝিস্ না—সব জেনেশুনেও মানুষ যদি একাজ করে, তবেই দু'কথা বলতে হয়। আর হক্‌কথা বললেই লোকে মনে করবে, জ্যাঠাইমা দুচোক্ষে দেখতে পারে না! এইভাবে আপনমনে বিলাপ করিতে করিতে তিনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভুতোকে আমি ডাকি নাই, সে নিজেই আসিয়াছিল এবং একটির বেশী কথাও তাহার সহিত আমি কহি নাই; তবুও জ্যাঠাইমা যখন অকারণে আমায় ভর্ৎসনা করিলেন আমি তখন তাহার কোন জবাব দিতে পারিলাম না, মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিলাম। শুধু একাকী সেই নির্জন ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কেন ফিরিয়া আসিলাম, কিসের আকর্ষণে? সেই ঘর, তাহার ভাঙা দেওয়াল, তাহার মলিন বিবর্ণ জিনিসপত্তর—সব যেন তখন জ্যাঠাইমার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া একসঙ্গে আমার গলা টিপিয়া ধরিতে লাগিল। আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, কালীচরণ বাড়ি আছো হে?

আরে, এ যে হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর! আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম।

জ্যাঠামশায়ের নাম ধরিয়া আর একবার ডাকিতেই তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর হেডমাস্টারমশায়কে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আপনি, মাস্টারমশাই—এই রাত্রে, অন্ধকারে একলা বেরিয়েছেন কি মনে

করে ? কারুর অসুখবিসুখ করেছে নাকি ? তা ওষুধ নিতে আর কাউকে পাঠালেই পারতেন—আপনি বুড়োমানুষ এতটা পথ কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন ?

হেডমাস্টারমশায় বলিলেন, কষ্ট আর কি বাবা, লণ্ঠনটা হাতে থাকলে যেতে আসতে আমার বিশেষ কষ্ট হয় না—তা তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না কালীচরণ, অসুখ-বিসুখ কারো করেনি—বাড়ির খবর নারায়ণের কৃপায় একরকম সব ভাল।

জ্যাঠামশায় তখন বলিলেন, তবে এই রাত্রে কি মনে করে মাস্টারমশায় ?

তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ হে. শুনলাম তোমার ভাইপো নাকি ফিরে এসেছে ? তাই তার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। হলধরের ছেলে বললে, সে নাকি তাকে পথে আসতে দেখেছে।

তা এই অন্ধকারে আপনি না এসে কাউকে দিয়ে একটু খবর পাঠালেই ত হতো মাস্টারমশাই, ও নিজে এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতো ?

না না, তার সঙ্গে আমারই বিশেষ দরকার, ডাক দেখি তাকে শিগ্‌গির একবার এখানে।

আচ্ছা, আপনি ঘরের ভেতরে এসে বসুন, আমি তাকে ডেকে আনছি। এই বলিয়া জ্যাঠামশায় হেডমাস্টারমশায়কে ঘরের ভেতরে বসাইয়া আমাকে ডাকিতে আসিলেন। আমার বুকের ভিতরটায় তখন কে যেন হাতুড়ী পিটাইতেছিল। ঘাড় হেঁট করিয়া ফাঁসির আসামীর মতো আমি জ্যাঠামশায়ের পিছনে পিছনে গিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। জ্যাঠামশায় আমায় ইঙ্গিত করিলেন প্রণাম করিবার জন্য।

আমি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই তিনি একেবারে আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর সস্নেহে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—আমি জানতুম, ও ঠিক ফিরে আসবে—আলোক আমার তেমন ছেলে নয়—বুঝলে কালীচরণ ? এই বলিয়া তিনি হি হি করিয়া ছোট ছেলের মত হাসিয়া উঠিলেন।

ইহা দেখিয়া জ্যাঠামশায় একটু অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বার দুই তিন ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি জানতেন মাস্টারমশায় ?

নিশ্চয়ই ! আমার মন জানতো যে, আলোক কখনও এগ্‌জামিন না দিয়ে থাকতে পারে না—যেখানেই থাক্‌, অন্তত এগ্‌জামিনের আগে ও বাড়িতে আসবেই।

জ্যাঠামশায় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিলেন, কোন্‌ এগ্‌জামি-নের কথা আপনি বলছেন মাস্টারমশায় ?

কেন, এই ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথা। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

তা কি করে সম্ভব, আর ত মাত্র তিনদিন বাকি। এই বলিয়া জ্যাঠামশায় বিস্ফারিত নেত্রে হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি টাকা জমা দেওয়ার

রসিদ ও পরীক্ষার 'এডমিট্ কাড'' পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন।

জ্যাঠামশায় তাঁহার হাত হইতে সেগুলি লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, মাস্টারমশায় আপনি তাহ'লে ওর হয়ে নিজে 'ফি' জমা দিয়েছিলেন ?

আর একবার ছোট ছেলের মত হাসিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, হাঁ আমার মন জানতো ও যেখানেই থাক 'এগ্জামিন' কখনো কামাই কর্বে না।

জ্যাঠামশায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তা আমাকে বললেই পারতেন টাকা জমা দেবার জন্যে—আপনি যখন জানতেন ও আসবেই। আমি মনে করলুম ওর কোন পাত্তাই নেই—মিছেমিছি টাকাগুলো নষ্ট করে লাভ কি।

আরে লাভ-লোকসান পরে হবে কালীচরণ—ওসব হিসেব এখন থাক্। এই বলিয়া তিনি তাঁহার অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ চাপিতে চাপিতে আমার হেঁটমুখটি তাঁহার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ক'দিন বেশ ভাল করে পড়েছিস্ ত ?

আমি হাসিব, কি নাচিব, কি কাঁদিব কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তাই শুধু ঘাড় নাড়িলাম। কিন্তু কোন্ দিকে যে নড়িল তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি জানি তোর সব ভাল করে পড়া আছে—তা এখন কি করছিলি, তোর পড়া ত আমি শুন্তে পাইনি ?

আমি ইহার কি জবাব দিব ভাবিতেছিলাম এমন সময় তিনি নিজেই আবার বলিলেন, আচ্ছা কাল সকালে উঠেই আমার কাছে পড়তে যাবি—এ তিনটে দিন একটু ভাল করে বই দেখে নিলেই চলবে। এই বলিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া জ্যাঠামশায়কে বলিলেন, আচ্ছা কালীচরণ, তবে এখন আসি।

আমি আর একবার হেডমাস্টারমশায়কে প্রণাম করিলাম। ইচ্ছা করিতেছিল তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদি।

হেডমাস্টারমশায় চলিয়া যাইতেই জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমাকে ডাকিতে ডাকিতে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিলেন—ওগো, শুনছো, আলোও এবার এগ্জামিন দেবে।

কে বললে ? বলিতে বলিতে তিনি একেবারে রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যাঠামশায় তখন সেই কাগজ দুইটি তাঁহার সামনে ধরিয়া বলিলেন, এই দ্যাখো মাস্টারমশায় নিজে টাকা জমা দিয়েছিলেন ওর হয়ে।

কঠিন দৃষ্টিতে একবার তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভুতোকেও কি এইরকম সব কাগজ দিয়েছে ?

জ্যাঠামশায় সাগ্রহে বলিলেন, হ্যাঁ, একেবারে এক—এই দ্যাখো—

—দেখে আমার কি চারটে হাত বেরুবে, তুমি দ্যাখো। এই বলিয়া তিনি সবেগে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন এবং বিনা প্রয়োজনেই ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিতে লাগিলেন।

২২

ইহার পরের অবস্থা বোধ করি না বলিলেও কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। বলা বাহুল্য পরীক্ষার হলে আমাকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বিশেষ করিয়া কমল ও মধুর। তাহারা আমাকে প্রথম দেখিল সেইখানে। কমল একেবারে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বুঝিলাম, আমাকে পরীক্ষা দিতে দেখিয়া তাহার যথার্থ আনন্দ হইয়াছে। আর একজন খুব খুশি হইয়াছিল, সে ভূতো।

আমাকে পরীক্ষা দিতে দেখিয়া যেমন সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল তেমনি আবার পরীক্ষার ফল দেখিয়াও সকলে হতবাক হইয়া গেল। শুধু যে প্রথম বিভাগে আমি উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম তাহাই নহে, তিনটি 'লেটার' পাইয়া আমাদের স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলাম।

হেডমাস্টার মশায়ের কাছে এই সংবাদ পেঁৗছিতে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথম ছুটিলেন হেডপণ্ডিত মশায়ের বাড়ি। তারপর সেখানে গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেছেন পণ্ডিত মশায়, আলোকের 'রেজাল্ট'টা ? আমি বলেছিলুম না, এ ছেলে আমাদের স্কুলের নাম রাখবে। এই বলিয়া তিনি আবার ছেলেমানুষের মত সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সোজা একেবারে সেখান হইতে জ্যাঠামশায়ের কাছে আসিয়া হাজির হইলেন এবং 'গেজেট'টা তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, দেখলে কালীচরণ, আমি বলেছিলুম যে আমার মন জানে ও ভাল রেজাল্ট করবেই।

আনন্দে, গর্বে তাঁহার মুখ যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, জ্যাঠামশায়েরও তেমনি দেখিলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া হেডমাস্টার মশায়কে নমস্কার করিতে বলিলেন। আমি প্রণাম করিলে, তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা, তুই আমার মান রেখেছিস্ !

জ্যাঠামশায় বলিলেন, শুধু কি আপনার, আমারও মুখ রক্ষা করেছে। এর জন্যে গৌরব অবশ্য সবই আপনার প্রাপ্য।

হেডমাস্টার মশায় জিভ কাটিয়া বলিলেন, ও কথা বলতে নেই—সবই তাঁর আশীর্বাদ। এই বলিয়া তিনি আকাশের দিকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

ভূতো সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করিয়াছিল। কিন্তু সে ঠিক আমার মতো সকলের আলোচ্য-বস্তু হইয়া উঠে নাই দেখিয়া জ্যাঠাইমার মনটা দমিয়া গিয়াছিল। তাই হেডমাস্টার মশায় চলিয়া যাইবার পর আমাকে ও জ্যাঠামশায়কে এক ঘরে দেখিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—বলি পাশ কি আর পৃথিবীতে কেউ কোনদিন করেনি, না করবেনা, যে, তুমিও ওদের সঙ্গে নাচতে শুরু করলে। আর যদি নাচতেই হয় ত আগে ভাত খেয়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাও—আমি

হাঁড়ি গলায় করে আর কতক্ষণ বসে থাকবো—তারপর জ্যাঠা-ভাইপোয় হাত ধরাধরি করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত ইচ্ছে নাচো গে, কেউ একটি কথাও বলতে আসবে না। এই বলিয়া তিনি যেমনভাবে আসিয়াছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই আবার প্রস্থান করিলেন।

তখন জ্যাঠামশায় একবার নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন আর আমি একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তারপর উভয়েই উভয়ের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ইহার পর আরো কিছুদিন কাটিল। মধু ও কমল কলিকাতায় 'সেণ্ট্ জেভিয়ার্স' কলেজে ভর্তি হইল—কমল আই-এ, ও মধু আই. এস-সি।

ভূতোকে জ্যাঠামশায় 'ক্যাম্বেলে' ভর্তি করিয়া দিলেন ডাক্তারি পড়িবার জন্য। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তখনো তাঁহারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া মনটা বড়ই মুষড়াইয়া পড়িল। কলেজে পড়িবার ইচ্ছা অন্য ছেলেদের চেয়ে আমার যে কিছুমাত্র কম ছিল না তাহা কাহাকে বুঝাইব আর কে-ই বা বুঝিবে!

আমি গরীবের ছেলে, তায় পিতৃমাতৃহীন—সংসারে এমন কেহ নাই যাহার কাছে আব্দার করিলে তাহা রক্ষিত হইতে পারে। কাজেই মনের আরো বহু কামনা-বাসনার যেভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে ইহাও যে তেমনি করিয়া যেখান হইতে উঠিয়াছে সেইখানেই একদিন সমাধিলাভ করিবে তাহা জানিতাম। তবু আমি যে কলেজে পড়িব, সে ইচ্ছা ভূতো এবং অন্যান্য ভাইবোনদের নিকট প্রায়ই প্রকাশ করিতাম, যাহাতে জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমার কানে গিয়া তাহা পেঁছায়! পেঁছিয়াছিল কিনা জানি না, তবে একদিন বুঁচীর মুখে শুনিলাম, আমার জন্য নাকি জ্যাঠামশায় কোথায় চাকরি ঠিক করিয়াছেন—মাহিনা মাসিক পঁচিশ টাকা তবে কাজ ভাল করিলে মাস দুই পরে আরো পাঁচ টাকা বাড়িবে।

চাকরি! অন্য সকলে কলেজে পড়িবে আর আমাকে চাকরি করিতে হইবে! ভাবিতেও যেন বুক ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। সেদিন আমার মুখে ভাত তিক্ত হইয়া উঠিল এবং রাত্রে কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না।

যখন একাকী বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলাম তখন হঠাৎ কানে আসিল জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায়ের কণ্ঠস্বর। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম তাঁহাদের আলোচনা।

জ্যাঠামশায় বলিতেছেন, তুমি কিছু বোঝো না, তার বাপের এতগুলো টাকা আমার হাতে রয়েছে, যদি পরে কোনোদিন চেয়ে বসে তবু ত বলতে পারবো যে, তোমার লেখাপড়া শেখার বাবদ সব খরচা হয়ে গেছে, এখন আর কিছু নেই?

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তোমার এই রকম বুদ্ধির জন্যেই আজ আমার এই দুর্দশা। লেখাপড়া শিখিয়ে এত টাকা খরচ হয়েছে বলার চেয়ে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি, তার দরুন সব টাকা খরচ হয়ে গেছে বলা আরো

সহজ। তা ছাড়া এই সময়টা আলোক লেখাপড়া না শিখে যদি চাকরি করে তা' হলেও ত তবু দশ-পনেরোটা করে টাকা মাসে মাসে ঘরে আসবে।

জ্যাঠামশায় তখন গলা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, কথাটা তুমি বলেছো ঠিক-ই, তবে কি জানো—লোকে কি বলবে? নিজের ছেলেকে ডাক্তারি পড়াচ্ছি, আর ওর মা-বাপ নেই বলে, ওই একফোঁটা ছেলেকে চাকরি করতে পাঠালুম!

জ্যাঠাইমা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, ওঃ ভারি আমার লোক রে—তুমি আছো বলে তাই—তারপর ভগবান না করুন, মানুষের শরীরের কথা কে বলতে পারে—কাল যদি একটা ভাল-মন্দ কিছু তোমার হয়—তখন লোকে কি আমায় দেখতে আসবে? এতগুলো ছেলেমেয়ের হাত ধরে হয়ত আমায় গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! ঠাকুরপোর টাকার কথা দেশের লোক জানলে কি করে, তুমি ত কাউকে কিছু বলোনি। তাছাড়া সেই টাকার ভরসাতেই ত ভুতোর ডাক্তারি পড়া আর মেয়েদের বিয়ে দেবার চেষ্টা করা। নগদ টাকা তোমার কি আছে—জায়গা জমি বেচে এসব করতে গেলে খাবে কোথা থেকে শুনি? করো ত বিনি পয়সার ডাক্তারি—হোমিওপ্যাথি আবার ওষুধ, তা লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে কেন?

এইসব শুনিয়া আমার মাথা আরো গরম হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহা মনে পড়িল যে, জ্যাঠামশায় সবাইকে বলিয়া বেড়াইয়াছেন, আমার বাবার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঋণ করিতে হইয়াছে। জ্যাঠামশায় মিথ্যাবাদী! এই কথা চিন্তা করিয়া সহসা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিল। তিনি কি তবে আমায় আন্তরিকভাবে ভালবাসেন না? এই ভালবাসার মধ্যে তাঁহার এত বড় স্বার্থসিদ্ধি রহিয়াছে! ঘৃণা হইল তাঁহার প্রতি। আমার বাবার পয়সায় ভুতো পড়িবে, তাহার বোনেদের বিবাহ হইবে, অথচ আমি যাইব চাকুরি করিতে! অসম্ভব। ইহা কিছুতেই হইবে না। কালই আমি জ্যাঠামশায়কে নিজে ডাকিয়া বলিব আমাকে পড়াইতে হইবে—আমার বাবার টাকা যদি তাঁহার কাছে থাকে ত তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। উত্তেজনায় সমস্ত রাত আর চোখে ঘুম আসিল না।

কিন্তু পরের দিন কিছুতেই সে কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। দুই তিনবার জ্যাঠামশায়ের ঘরে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম—সঙ্কোচে আমার জিহ্বা যেন জড়াইয়া আসিল, বুক কাঁপিতে লাগিল।

জ্যাঠামশায় ইতিমধ্যে একদিন আমার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমার ইচ্ছা কি। বলা বাহুল্য, আমি পড়িবার কথাই বলিলাম। তখন তিনি আমায় বুঝাইতে লাগিলেন একটা দুইটা পাশ করিয়া কি হইবে, তাহার পরে ত সেই চাকরি ছাড়া উপায় নাই। তারপর, গ্রামের কোন্ কোন্ ছেলে বাপের কিরূপ কষ্টোপার্জিত পয়সা ধ্বংস করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াও কেহ তিরিশ, কেহ চল্লিশ টাকার চাকুরিতে দশ বৎসর পর্যন্ত ঘষিতেছে তাহার একটা হিসাব তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে আমাকে শুনাইয়া দিলেন। আবার সেই সঙ্গে লেখাপড়া একেবারে জানে না

এমন কত ছেলে যে কলিকাতায় চাকরি করিয়া মাসে একশত দেড়শত টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতেছে তাহাও বলিলেন। এবং সব শেষে ইহাও বলিলেন যে পাটের অফিসে চাকরি করিতে ঢুকিয়া তাঁহার এক বন্ধু একেবারে লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন অথচ তিনি কেবলমাত্র একটা পাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরো এমন বহু লোকের উদাহরণ দিলেন যাহারা শুধু সামান্য মাহিনায় পাটের অফিসে চাকরি করিতে ঢুকিয়া অল্প দিনেই ধনী হইয়াছে।

সেদিন জ্যাঠামশায়ের মুখ হইতে সেই সব গল্প শুনিতে শুনিতে আমিও যে নিজে অদূর ভবিষ্যতে সেইরূপ ধনী হইবার কল্পনা করি নাই তাহা নহে, তবে কল্পনা যে কল্পনাই এবং বাস্তব যে বাস্তব তাহাদের দুই-এর মিলন একেবারে অসম্ভব, তাহা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিতেছি।

মোট কথা যখন ভুতো ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়িতে গেল আমি তখন কলিকাতার এক পাটের গুদামে চাকরি করিতে ঢুকিলাম। জ্যাঠামশায় ভুতোকে তাহার পড়ার সুবিধার জন্য যেমন কলেজের নিকটবর্তী 'হোস্টেলে' থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তেমনি আমার অফিসের পথ সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য যতটা না-হউক আমার কলিকাতার ব্যয় সঙ্কোচের জন্য বহুবাজারের নিকটে এক অন্ধকারময় গলির ভিতর পুরনো এক সস্তার মেস্ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেইখানে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই মেস্‌বাড়িতে নাকি তিনি যৌবনকালে অনেকদিন ছিলেন। তখন তিনি কলিকাতায় ওষুধের দালালি করিতেন। সেখানকার খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে এবং কোন্ ঘরটায় থাকিলে কিরূপ হাওয়া-বাতাস পাওয়া যায়—সবই তাঁহার জানা ছিল। তাই অন্য কোথাও চেষ্টা না করিয়া আমাকে লইয়া গিয়া একেবারে সেইখানে হাজির হইলেন। এবং দোতলার একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, দেখ আলো, এই ঘরটার দক্ষিণে, পূর্বে ও উত্তরে বড় বড় বাড়ি দেখে মনে হয় বটে ঘরটায় একেবারে হাওয়া ঢোকে না কিন্তু আসলে তা নয়। রাত্রে দেখবি এই দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে এত হাওয়া দেয় যে শীত ধরিয়ে দেবে। তারপর আমার থাকিবার বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইবার সময় আমায় কানে কানে বলিলেন, ঠাকুর ও চাকরগুলোর সঙ্গে যেন ঝগড়া করিসনি, ওদের মধ্যে মধ্যে দু'চারটে পয়সা বকশিশ দিবি, দেখবি এমন যত্ন করবে যে, মা-বাপের কাছেও লোকে তা পায় না। বড় মাছটি, ভাল খাবারটুকু ভাতের ভেতরে, ডালের বাটির মধ্যে লুকিয়ে দেবে। ইহার পর তাঁহাকে নিয়মিত চিঠি লিখিবার উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

২৩

এইভাবে থাকিবার একটা আশ্রয় পাইলাম বটে কিন্তু কি আশ্রয়, কিরূপ আশ্রয় তাহা না-ই বা বলিলাম। আমাদের দেশে কত লোক ত রাস্তার ধারে ফুটপাথের

উপর শুইয়া দিন কাটায়, তাহার চেয়ে ত ইহা ভাল ! আমার চেয়ে অনেক বেশি মাহিনা পান এমন বহু ভদ্রলোক যখন সেখানে রহিয়াছেন—কেহ আট বছর কেহ দশ বছর একাদিক্রমে—তখন আমিই বা থাকিতে পারিব না কেন ?

এদিকে, অফিস বলিতে ছেলেবেলায় মনের মধ্যে একটা ছবি যেমন সকলের থাকে আমারও তেমনি ছিল। কিন্তু প্রথম দিন অফিস দেখিয়া আমার প্রাণ যেন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এ কি অফিস ! একটা টিনের লম্বা 'শেড'—তাহারি মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটা ওজনের কল—মাঝে মাঝে কাঠের রেলিং-ঘেরা এক একটা বিভাগ। তাহাতে একটা করিয়া কাঠের পুরানো টেবিল ও দুই-তিনটা নড়বড়ে চেয়ার। চারিপাশে পাটের অসংখ্য গাঁইট ছড়ানো। দুম্‌দাম্‌ করিয়া কোথাও গাঁইট ওজনের শব্দ হইতেছে—টিনের ছাদে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—কোথাও বা তাহাতে কালি দিয়া দাগ দেওয়া হইতেছে—কোথাও কানে পেন্সিল গুঁজিয়া একটি পৌঢ় ভদ্রলোক দড়িবাঁধা পুরু কাচের চশমা পরিয়া হাতে বাদামী রঙের কাগজ লইয়া সেইগুলি মিলাইয়া দেখিতেছেন। কোথাও বা কাচের গ্লাসে গাঢ় লালবর্ণ চা সহযোগে কোন বাবু লেড়ো-বিস্কুট চিবাইতে চিবাইতে পাশের কোন একটি কেরানী বাবুর সঙ্গে রসিকতা করিতে করিতে চা পান করিতেছেন। টিনের ছাদ হইতে রোদের তীব্র ঝাঁঝ আসিয়া ঘরের ভিতরটা যেন অগ্নিকুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে—তাহা ছাড়া পাটের ফেঁসো সেখানকার বাতাসের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গোটাকতক করিয়া যেন নাকের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে মনে হয়। আমি নাকে কাপড় চাপিয়া ঘরে ঢুকিতেই বড়বাবু বলিলেন, তুমি এইভাবে নাকে কাপড় দিলে ত চাকরি করতে পারবে না এখানে ?

আমি বিনীতকণ্ঠে বলিলাম, বড্ড পাটের ফেঁসো উড়ছে কিনা !

তিনি তোব্‌ড়ানো গালে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, পাটের গুদামে পাটের ফেঁসো উড়বে না ত কি ফুলের রেণু উড়বে ? এই চেয়ারে উনিশ বছর কাটলো—তা আমি কি একেবারে মরে গেছি ? আর আমার এই চেহারাও ত দেখছো—ছেলেমেয়ে ন'টি হয়েছে, আরো যে হবে না তা মনে করো না। এই বলিয়া হেঁ-হেঁ করিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ হাসি থামাইয়া বলিলেন, বলি বিয়ে করেছো ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, আজ্ঞে না।

তবে আর চাকরি করতে এসেছো কেন—এখন চাঁদের আলোয় শিস্‌ দিয়ে ঘুরে বেড়াওগে।

এই বলিয়া হাতের উড্‌ পেন্সিলটা কানে গুঁজিয়া রাখিলেন। এমন সময় একটা বেয়ারা মোটা কাচের গ্লাসে করিয়া রক্তবর্ণ চা ও একটা লেড়ো-বিস্কুট তাঁহার টেবিলের উপর দিয়া গেল। তিনি সেই চায়ের পাত্রটি আমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি নতুন লোক, এটা খাও হে—আমি আর এক গেলাস আনিয়ে নিচ্ছি।

সবিনয়ে বলিলাম, আজ্ঞে আমি চা খাই না।

চা খাও না! বলিয়া তিনি চশমার পুরু কাচ দুইটির ভিতর দিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তাহলে এখানে কাজ করবে কি করে হে?

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কেন?

তিনি একেবারে হাসিতে ফাটিয়া পাড়িয়া বলিলেন, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, এ যে আমাদের 'জীবন-সুধা', যতটুকু খাবে ততটুকু পরমায়ু বাড়বে।

তাঁহার রসিকতাটা যে ঠিক ধরিতে পারি নাই তিনি আমার মুখ দেখিয়াই তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই বলিলেন, আরে আমাদের জীবন মুখুজ্যের চায়ের দোকান হে—চেনো না? কলিকাতার শহরে এমন লোক নেই যে তার নাম না জানে। তুমি দেখ্ছি একেবারে 'র', কিছুই জানো না। বিশ বছরেরও ওপর হয়ে গেল এই দোকান। ওর 'জীবন-সুধা' পান করেনি এমন লোক ত বাবা শহরে দেখি না। জানো, একবার আমার এক বন্ধু সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়েছিল, সেখানে এক বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার দেখা। তিনি প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবনবাবুর চায়ের দোকানটা এখনো আছে ত মশায় কলকাতায়? এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি পকেটে হাত ঢুকাইয়া একটা টিনের কৌটা বাহির করিলেন। তারপরে একটি বিড়ি তাহার ভিতর হইতে লইয়া আমার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, নাও ততক্ষণ তবে এটা চালাও, পান এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছে।

এইবার আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, মাপ করবেন স্যার, আমি ওসব কিছুই খাই না। তা ছাড়া আপনি আমার বাবার চেয়ে বয়সে বড়—

তিনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আরে তার জন্যে লজ্জা করার কিছু নেই—আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি খাও। একসঙ্গে চাকরি করতে গেলে এত সব বয়সের বাছবিচার করলে কি চলে?

বলিলাম, লজ্জা নয়, জীবনে আমি কোনদিন ওসব স্পর্শ করিনি।

করোনি ব'লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—চাকরি কি এর আগে কোনদিন করেছিলে?

আমি আর সে কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি তখন চায়ের গেলাসে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, বয়স কত হলো শুনি?

বলিলাম, সতেরো পূর্ণ হতে আর দেরি নেই বেশি।

তিনি আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আরে তাহলে ত তুমি সাবালক হয়ে গেছ। সেই যে বাল্মীকি না বেদব্যাস কোন্ মুনি কি একটা 'শোলোক' লিখে গেছেন,—'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রো মিত্রো বদাচরেৎ।' আমরা বাবা সেকেলে লোক, মুনিঋষিদের বাক্য এখনো তোমাদের মত অবহেলা করিতে শিখিনি, তাই সকলকেই বন্ধু বলে মনে করি।

এই বলিয়া তিনি দুই হাত জোড় করিয়া একবার সেই সব মহাপুরুষদের উদ্দেশে কপালে ঠেকাইলেন। তারপর বলিলেন, জানো, আমি প্রথম নেশা করিতে শিখি এই অপিসে ঢুকে ; তখন আমার বয়স তোমার চেয়েও কিছু কম ছিল। বড়বাবু ছিলেন নরেন মিত্তির—পঞ্চাশের বেশি তাঁর বয়স—তিনি নিজে ডেকে ডেকে আমায় বিড়ি দেশলাই দিয়েছেন—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। তারপর হাসি থামিতেই মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, নাতজামাই !

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমবয়সী একটি টাকওয়ালা ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমাকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন, একে 'দাগ ডিপার্টমেণ্ট' নিয়ে যাও—আজ থেকে এর নতুন চাকরি হলো।

'দাগ ডিপার্টমেণ্ট' অর্থাৎ যেখানে পাটের গাঁইটের উপর কালি দিয়া নম্বর লেখা হয়—এইখানেই হইল আমার চাকরি। প্রতিদিন এই একই কাজ আমায় করিতে হইত। কিন্তু দিন আষ্টেক যাইতে যাইতেই আমার মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল সেই চাকরির উপর। আমার মনে হইত এই দাগ দিবার জন্য একজন মাট্রিক পাশকরা লোকের কি দরকার? আর সকলের চেয়ে বেশি পীড়া দিতে লাগিল আমার সহকর্মীদের নীচ প্রকৃতি ও ততোধিক নীচ ব্যবহার। কোন ভদ্রসন্তানের মন যে এত হীন হইতে পারে ইহা আমি পূর্বে কখনো কল্পনা করিতে পারি নাই।

তাহার উপর আবার মেসেও শান্তি ছিল না। সেখানকার লোকগুলি ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ; যেমন অশিক্ষিত, তেমনি কৃপণ আর নোঙরা। ঘরের মেঝেয় ময়লা বিছানা পাতিয়া তাহার উপর শুইয়া থাকে, মাথার কাছে হুঁকা কলিকা প্রভৃতি তামাকের সরঞ্জাম, বিছানায় শুইয়া তামাক টানে আর ঘরের মেঝেয় থুথু ফেলে। ইহা ছাড়া সর্বদা কুৎসিত আলাপ আলোচনা করে। বোধ করি বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের আর কোন খবরই তাহারা রাখে না। তাহারা স্বার্থপর, এতটুকু স্বার্থের হানি ঘটিলে, পরস্পরে পরস্পরের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া বসে। মোট কথা ঘরে ও বাহিরে আমার ছিল সমান অবস্থা। আমার মন ইহার ভিতরে থাকিয়া কিছুতেই যেন নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিতেছিল না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমার মনের যখন এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তখন একদিন আমি বিনা কারণে অফিস কামাই করিয়া বসিলাম। কিছুতেই, কেন জানি না, সেদিন অফিসে যাইতে ইচ্ছা হইল না। অথচ মেসের আবহাওয়ায় বসিয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছিল না। তাই মনে করিলাম একবার কমলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। সে শিয়ালদহের নিকট একটি মেসে থাকিত—একদিন আমি অপরাহ্ণে বেড়াইতে গিয়া তাহার ঘর দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কমল কলেজে পড়ে আর আমি চাকরি করি এইজন্যই বোধ হয় তাহার সামনে যাইতে ইদানীং আমার কেমন সংকোচ বোধ হইত ; তাই যথাসম্ভব তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতাম।

কমল বৈকালের দিকে তাহার সঙ্গে প্রত্যহ দেখা করিতে বলিত, কিন্তু আমি যইতাম না বলিয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণবশত, সে রোজ মধুর হোস্টেলে গিয়া একসঙ্গে কাটাইত। ইহা ছাড়া কোনদিন বা তাহারা খেলাধূলা করিয়া দূরে কোথাও বা বেড়াইতে যাইত।

তাই সেদিন সকালের দিকেই আমাকে দেখিয়া কমল বলিয়া উঠিল, কি রে আলো, আজ আপিস যাবি না?

বলিলাম, না, আজ ছুটি নিয়েছি।

কমল বলিল, বেশ ত, চল্ তবে আমাদের কলেজটা আজ তোকে দেখিয়ে আনি। আজ আমার মোটে একটা ক্লাস আছে, তারপরেই ছুটি। তুই একটা ঘণ্টা 'কমনরুমে' বসে থাকবি তারপর একসঙ্গে আমরা দুজনে বেড়াতে যাবো—কি বলিস্?

কমল এমনভাবে অনুরোধ করিল যে আমি কিছুতেই তাকে 'না' বলিতে পারিলাম না। অগত্যা তাহাদের কলেজে গেলাম। মধুও ওই একই কলেজে পড়ে, তাহারও সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নাই, ভাবিলাম এক কাজে দুই কাজ সারা যাইবে।

ট্রাম হইতে নামিয়া পার্ক স্ট্রীট ধরিয়া মিনিট কয়েক হাঁটিবার পরই আমরা দুইজনে 'সেণ্ট্ জেভিয়ার্স' কলেজের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম।

কমল বলিল, এইটে আমাদের কলেজ।

অতি সুন্দর একটি বাড়ি। সম্মুখে সুশোভিত অনেকগুলি বড় বড় থাম। বাহির হইতে প্রকাণ্ড একটি সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়িটির আয়তন যেমন বিরাট তাহার চারিপাশে তেমনি অসংখ্য গাছপালা। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই সামনে প্রশস্ত 'হল'। হলের উভয় দিকে অনেকগুলি ঘর, সেখানে পড়ানো হয়। হলটি চেয়ার টেবিল দ্বারা সুসজ্জিত। তাহার দুই পাশে কার্পেট পাতা রাস্তা বরাবর ভিতরের বারান্দা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। হলের সামনে মখমলের পর্দা ঝোলান একটি স্টেজ। বিলাতী পরিচ্ছন্নতা ও বিলাতী পারিপাট্য তাহার সর্বত্র ঝক্‌মক্ করিতেছিল। কলেজ যে দেখিতে এত সুন্দর হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

কমল আমাকে 'কমন-রুমে' বসাইয়া ক্লাসে চলিয়া গেল। বলিল, তুই ততক্ষণ খবরের কাগজ বা কোন 'ম্যাগাজিন' পড়্—আমি একটা ঘণ্টা পরেই আস্‌ছি।

'কমন-রুমে'র চারিদিকে নূতন নূতন আলমারি, তাহাতে হাজার হাজার বই ঠাসা, কাচের ভিতর দিয়া তাহাদের সোনালী রঙ ঝলমল করিতেছে। টেবিল চেয়ারগুলির দিকেও চাহিলে যেন চোখ জুড়ায়, মনে হয় যেন সেগুলি সবই নতুন কেনা হইয়াছে। মাথার উপর সারি সারি ইলেক্‌ট্রিক পাখা, সবগুলি ঘুরিতেছে।

বাঙালী, সাহেব, হিন্দু, মুসলমান সকল জাতির ছাত্র একসঙ্গে সেখানে বসিয়া আছে নিস্তব্ধভাবে, কেহ কাগজ পড়িতেছে, কেহ আপন পাঠ্য-পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেছে। যাহার মুখের দিকে তাকাই দেখি ফিটফাট চক্‌চকে! আমি একটা কাগজ খুলিয়া বসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার চোখ ছিল সেই সব ছাত্রদের মুখের দিকে। আশ্চর্য! তাহাদের দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ আমার মনে হইল আমি যদি এই কলেজে পড়িতাম তাহা হইলে আমিও উহাদের মতই হইতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমল আসিবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া পড়িয়া বাহিরে পলাইয়া আসিলাম।

সেদিন কি হইল জানি না, সেখান হইতে ফিরিয়া আর আমি সেই জঘন্য মেসে ঢুকিতে পারিলাম না এবং চাকুরিতেও সেইখান হইতে 'সেলাম' করিলাম। মন বলিয়া উঠিল, যেমন করিয়া হউক এই জীবনকে আমায় ভুলিতেই হইবে, —এ পথ আমার নয়, এ পথে এমন করিয়া আর আমি কোনমতেই চলিতে পারিব না!

সেদিন সেইক্ষণে আবার কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় আমার জীবনের নতুন পথ খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

২৪

বেশ জায়গা এই শহর! সবাই এখানে অপরিচিত। কেহ কাহাকেও চেনে না, কেহ কাহারও খোঁজ রাখে না। অথচ ধনী-দরিদ্র-ইতর-ভদ্র সকলে একই পথ দিয়া হাঁটে। একজন আর-একজনের গায়ে ধাক্কা মারিয়া চলিলেও কাহারো ফিরিয়া চাহিবার সময় নাই। সবাই ছুটিতেছে পয়সার লোভে; এখানকার পথেঘাটে অলিতে-গলিতে যেন পয়সা ছড়ানো আছে। ফুটপাথের উপর বড়-ছোট অসংখ্য দোকান; ফিরিওয়ালার মাথায়, ভিক্ষুকের কাতর মিনতিতে পর্যন্ত ব্যবসা। পয়সা উপার্জন করিবার যত রকমের সম্ভব অসম্ভব পন্থা জগতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বোধ হয় সবগুলির মহাতীর্থস্থান এই কলিকাতা। অথচ ইহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া সেদিন আমার মনে হইতে লাগিল, উপার্জনের আর কোন পথই আমার জন্য খোলা নাই—সবগুলিই প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত লোকে যেন ভর্তি। তবু ঘুরিতে লাগিলাম। কত পথে, কত অলিগলি দিয়া আমি যে চলিতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যত চলি, তত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে সেই সুন্দর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজটি, কত-ছেলে সেখানে পড়িতে যাইতেছে—মধু ও কমল বই খাতা লইয়া সাজিয়া গুজিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। আর দেখিতে পারি না, হঠাৎ চোখ ঝাপসা হইয়া আসে।

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন আমি মনে মনে

কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলাম যেমন করিয়া হউক আমিও কলেজে পড়িব। ট্যুইশানি করিয়া হউক, ভিক্ষা করিয়া হউক, লোকের হাতেপায়ে ধরিয়া যেমন করিয়া হউক, আমাকে কলেজে পড়িতেই হইবে—তাহা না হইলে আমি বাঁচিব না, কমল ও মধুর কাছে আর মুখ দেখাইতে পারিব না।

সমস্ত দিনের অনাহার, পথশ্রমের ক্লান্তি—সব ভুলিয়া গিয়া আমি তখন লোকের বাড়ি বাড়ি যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইবার জন্য কেহ মাস্টার রাখিবেন কিনা। অনেকে যেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া শুধু 'না' বলিয়াই বাড়ির দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল, তেমনি আবার কতকগুলি লোক সকৌতূহলে আমার মুখের দিকে চাহিয়া নানা রকমের প্রশ্ন করিতে লাগিল—আমার বাড়ি কোথায়, কি নাম, কি জাতি, শহরে কোথায় থাকি ইত্যাদি। একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিবার পর কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রায় এক কথা বলিলেন, কলকাতায় আমার এমন কেউ লোক আছে কিনা যে আমায় চেনে এবং আমার হইয়া জামিন থাকিতে পারে?

সবিনয়ে যখন জানাইলাম যে সেরূপ কোন ব্যক্তি আমার এখানে নাই তখন সকলেই এই বলিয়া আমায় নাকচ করিয়া দিলেন যে, আমার মত একজন অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের হাতে তাঁহারা কেহ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার তুলিয়া দিতে পারিবেন না।

অগত্যা আমি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গার ঘাটে ক্লান্ত শরীরটা এলাইয়া দিলাম। আহার করিতে সেদিন আদৌ ইচ্ছা হইল না। গণ্ডা কয়েক পয়সা আমার পকেটে ছিল, শুধু একবার হাত দিয়া অনুভব করিলাম সেগুলি আছে কি না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি মাথা ঘুরিতেছে—শরীরে এমন সামর্থ্য নাই যে উঠিয়া দাঁড়াই। কোন রকমে একটা হিন্দুস্থানীর দোকানে গিয়া কিছু চালকড়াইভাজা লইয়া ঢক ঢক করিয়া একপেট জল খাইলাম, তারপর আবার চলিলাম ট্যুইশনির সন্ধানে। সেদিনও হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু একজন পরিচিত লোক নাই বলিয়া কেহ আমায় বিশ্বাস করিল না। আমার মুখে চোখে, আমার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের যে চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল তাহা দেখিয়া বোধ করি ধনীরা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কি জানি যদি তাহাদের সর্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া পালাই। একজন ত আমায় স্পষ্টই সেকথা শুনাইয়া দিল।

যাহা হউক, এইভাবে যখন আরো তিনদিন কাটিল তখন আমি হতাশ হইয়া ঘাটে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম কি করিব। একবার মনে হইল কোন অনাথ আশ্রমে গিয়া সাহায্য ভিক্ষা করি। কিন্তু ভিক্ষা করিবার কথা মনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকের ছেলে, একটা পাশও করিয়াছি, তবুও পরের অনুগ্রহ লইতে হইবে? আমার পৌরুষ তখন সেই প্রবৃত্তিকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু ভগবান শেষে আমায় এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিলেন। আরো একদিন এমনি করিয়া কাটাইবার পর একটি ছেলে-পড়ানো যোগাড় হইল বাগবাজার অঞ্চলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি।

দারুণ গ্রীষ্মে গলায় গরমের কাপড় জড়াইয়া, পায়ে মোজা আঁটিয়া যেসব ভদ্রলোকেরা রোজ সকালে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাইয়া ক্ষুধা করিতে আসেন, আমি তাঁহাদের একজনের কাছে যাইয়া সেদিন আমার সকল দুঃখ নিবেদন করিলাম। কি জানি কেন, আমার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিলেন। কথা হইল এখন তিনি শুধু দুইবেলা খাইতে দিবেন এবং তাহার পরিবর্তে তাঁহার চারিটি ছেলেমেয়েকে তিনবেলা আমায় পড়াইতে হইবে। তখন আর প্রত্যাখ্যান করিবার মত অবস্থা আমার ছিল না, যেখানে হউক একটা ভদ্র আশ্রয় মিলিলে বাঁচি। তাই তৎক্ষণাৎ তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম।

ছেলেমেয়েগুলি যেমন দুরন্ত তেমনি মাথামোটা। তাহাদের অঙ্ক বুঝাইতে আমার প্রাণান্ত হইত। ইহার উপর আবার কর্তা ছিলেন এত কৃপণ যে ছেলেমেয়েদের হাতে কোনদিন একটি পয়সা দিতেন না। বাড়িতে জলখাবার করা থাকিত, স্কুল হইতে আসিয়া তাহা খাইত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের তাহাতে মন উঠিত না, ফেরিওয়ালা দেখিলে এটা ওটা কিনিবার জন্য কান্নাকাটি করিত। আমাকে আবার ইহার জন্যই তাহাদের প্রতিদিন শাসন করিতে হইত।

কর্তা তাহাদের গালাগালি করিতেন। তিনি বাজে খরচা একদম পছন্দ করেন না। ছেলেমেয়েরা কিন্তু ফেরিওয়ালা দেখিলেই তাহার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

শুধু আমার জন্য বরাদ্দ ছিল দুই পয়সার জলখাবার। অফিসে যাইবার সময় বড় ছেলের কাছে তিনি সেই পয়সা দিয়া যাইতেন।

আমি কোনদিন জল খাইতাম, আবার কোন কোনদিন বা না খাইয়া ওই পয়সা দুইটা জমাইতাম। আমার আর কোন আয় ছিল না এবং অন্য কোন জায়গা হইতে পয়সা আপাতত আর হাতে আসিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তাই যক্ষের মত সেই পয়সা'টি জমাইতাম শুধু ভবিষ্যতের ভরসায়। কি জানি কত রকমের বিপদ হইতে পারে!

মাসখানেক পরে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্তাবাবু খুব খুশি হইলেন। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার তাহারা সবাই বেশি নম্বর পাইয়াছে প্রত্যেক বিষয়ে; তাই তামাক খাইতে খাইতে তিনি আমাকে একদিন বলিলেন, আমার বড় মেয়ের বিয়েটা হয়ে যাক্, তারপর থেকে আপনাকে দু'টাকা করে হাতখরচা দেবো। যতদিন না বিয়েটা হচ্ছে ততদিন বড্ড টানাটানি, বুঝলেন না?

আমার নিজের টাকার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু ভাবিতাম কেমন করিয়া কলেজে ভর্তি হইব। তাই না খাইয়া কেবল পয়সা জমাইতাম। জানি

তিল তিল করিয়াই একদিন তাল হয়। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম কলেজে পড়িবই। তাই দুই চারি দিন অন্তর আমি সেই পয়সাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া গুনিয়া দেখিতাম, আর ভাবিতাম কবে অনেক টাকা জমিবে, কবে তাহা দিয়া আমি কলেজে ভর্তি হইতে পারিব।

হঠাৎ একদিন জামার পকেটে হাত দিয়াই আমার মুখ শুকাইয়া গেল। দেখিলাম একটা টাকা নাই। তাহার আগের দিন রাত্রে গুনিয়া রাখিয়াছিলাম পাঁচসিকা, অথচ এখন একটি মাত্র সিকি পকেটে পড়িয়া আছে! কে নিল? আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও পাইলাম না। বাড়িতে ঝি, চাকর বা অন্য কোন বাহিরের লোক নাই। ছেলেমেয়েগুলির স্বভাব-চরিত্রও অত্যন্ত ভালো, আমি বেশ ভাল করিয়া একথা জানিতাম। তাহার উপর রাত্রে দেখিয়াছি পকেটে আছে, সকালে উঠিয়াও আমি বাড়ির বাহির হই নাই, তবে কোথায় গেল টাকা ঘরের ভিতর হইতে। একটা টাকা তখন আমার কাছে একটা মোহরের সমান! দুঃখে দুশ্চিন্তায় সেদিন আমার মুখে ভাত পর্যন্ত যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

সকাল হইতে মনটা খুব খারাপ হইয়াছিল, তাই সেদিন বৈকাল হইবার পূর্বেই বেড়াইবার জন্য বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি জানি কেন বেড়াইতেও বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না, ঘণ্টাখানেক পরেই আবার ফিরিয়া আসিলাম বিষণ্ণ মনে

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। দেখি ছেলেমেয়েগুলি কেউ খাইতেছে চপ, কেউ কাটলেট, কেউ ঘুগ্‌নি।

ছোট মেয়েটি আমায় দেখিয়া বলিয়া উঠিল, এই দেখুন মাস্টার মশাই, আমরা চপ খাচ্ছি, দিদি দিলে—আপনি খাবেন?

এই দিদিটিকে আমি আড়ালে আবডালে দেখিয়াছি, কোনদিন তিনি আমার সামনে আসেন নাই বা আমার সঙ্গে কথা বলেন নাই। তাঁহারই বিবাহের জন্য কর্তার দুশ্চিন্তা।

একবার মনে হইল, সত্যই কি দিদি আমাকে খাওয়াইবার জন্য তাঁহার ছোট-বোনকে দিয়া বলাইতেছেন? কিন্তু পরমুহূর্তে আবার কি মনে হইল, চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর সেই মেয়েটিকে প্রশ্ন করিলাম, খুকু তোমার বাবা কোথায়?

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল, বাবা এখনো আপিস থেকে আসেননি মাস্টার মশাই।

আমি আর কিছু বলিলাম না, শুধু চুপ করিয়া আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তারপর সন্ধ্যা হইতেই ছাত্রছাত্রীদের লইয়া যথারীতি পড়াইতে বসিলাম।

ইহার পর আরো দুইবার আমার পকেট হইতে পয়সা চুরি গেল, একবার চার আনা, আর একবার দুই আনা। ইহার শোকেও রাত্রে আমার চোখে ঘুম আসিত না। আমি গোপনে কেবল চোখের জল ফেলিতাম। কাহাকে বলিব এই দুঃখের কথা। কর্তাকে বলিলে হয়ত উল্টা ভাবিবেন, মনে করিবেন তাঁহার ছেলেমেয়েদের

প্রতিই আমি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে ভাবিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলাম।

সিঁড়ির নীচে যে ছোট্ট ঘরের মত জায়গা তাহাতে একটি চটের পর্দা টাঙানো ছিল। সেইখানে একটা তক্তপোষের উপর বিছানা বিছাইয়া আমি শুইয়া থাকিতাম। সেইখানেই থাকিত আমার জামাকাপড় একটি আলনায় ঝোলানো, একেবারে আমার মাথার কাছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল কে যেন আমার জামার পকেটে হাত দিতেছে। ঠুন্ ঠুন্ করিয়া কিসের মৃদু আওয়াজও একবার আমার কানে আসিল! অন্ধকার ঘর, তাহাতে গভীর রাত্রি—কিছুই চোখে দেখা যায় না। তবু নিঃশব্দে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সেই জামার পকেটটা দেখিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছি অমনি কাহার হাতের সঙ্গে হাত আমার লাগিয়া গেল। আমি যে ভয় পাই নাই তাহা নহে, তবু সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতটা একেবারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু নারীর কোমল হাত ও চুড়ির স্পর্শ পাইতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম এবং ভয়ার্ত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, কে, কে তুমি?

কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর্তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং আলোর সুইচটা টিপিয়া দিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম! দেখি, আমি যাহার হাত ধরিয়া আছি, সে তাঁহার সেই বিবাহযোগ্যা জ্যেষ্ঠা কন্যা।

আমাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া অস্ফুটস্বরে কর্তার মুখ হইতে শুধু দুইটি কথা বাহির হইল—ওঃ, বুঝেছি। তারপর ক্রুদ্ধ সিংহের মত আরক্ত চোখে আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

আমি কাহাকে কি বলিব বুঝিতে না পারিয়া শুধু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া কর্তা আমাকে তাঁহার নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারপর কঠিন স্বরে বলিলেন, আজই এখুনি আপনি এখান থেকে চলে যান—আপনার মত মাস্টারের আমার প্রয়োজন নেই। দুশ্চরিত্র, লম্পট! দয়া করে ঘরে স্থান দিয়েছিলুম বলে এই তার প্রতিদান না? ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না?

আমি বলিলাম, কিন্তু আপনি আমার কথা না শুনেই—

—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না, তুমি এখুনি আমার বাড়ি থেকে বেরোও। এই বলিযা একরকম জোর করিয়াই তিনি আমায় বাড়ি হইতে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিলেন।

আমি ঘাড় হেঁট করিয়া অপরাধীর মত বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

শুধু গলিটার শেষ প্রান্তে আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া শেষবারের মত সেই বাড়িটার দিকে তাকাইতে গিয়া দেখিলাম, সেই বড় মেয়েটি তিনতলায় ছাদের উপর উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া নিশ্চল পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার চোখে চোখ পড়িতেই ঘৃণায় আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া আবার চলিতে শুরু করিলাম।

২৫

আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আবার আশ্রয়হীন হইলাম। তবে পূর্বের চেয়ে এবার আমার গৌরব কিছু বর্ধিত হইয়াছিল। এতদিন ছিলাম শুধু দরিদ্র, এবার তাহার সহিত দুশ্চরিত্রতার অপবাদ যুক্ত হইল। আরো কি আছে বরাতে —চিন্তা করিতে করিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলাম বহুক্ষণ। এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুর নাগাদ আমি একেবারে শ্যামবাজারের এক চিত্রগৃহের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলাম।

তখন নির্বাকচিত্রের যুগ। সেই ঘরের দেওয়ালে একটি যুবকের ছবি দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। যুবকের মুখচোখে একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। সে ছুটিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে একদল লোক লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছে।

ছবিটির দিকে তাকাইয়া মনে হইল, হয়ত সে আমারই মত হতভাগ্য—কোন দোষ করে নাই, অথচ অবস্থাবিপাকে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। কে জানে, ইহা হইলেও ত হইতে পারে। যুবকটির জন্য মনে কেমন অনুকম্পা জাগিল। চিত্রগৃহের বারান্দায় কাচের ফ্রেমের মধ্যে আরো যেসব ছবি টাঙানো ছিল, তাহা দেখিবার জন্য তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

প্রত্যেক ছবির নীচে ইংরাজীতে দুই একটি করিয়া লাইন লেখা ছিল, আমি তাহা পড়িয়া দেখিতেছিলাম। এমন সময় পিছন হইতে কে আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখি কমল এবং তাহার পাশেই মধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তাহারা দুপুরের শো'তে বায়োস্কোপ দেখিতে আসিয়াছিল সেখানে।

আমি প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তারপর সে ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিবার জন্য বলিলাম, ছাড় ভাই কমল, বড় গরম।

কমল হাসিতে হাসিতে বলিল, হ্যাঁ আমি ছেড়ে দিই, আর তুমি পালাও। কতদিন ধরে আমরা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কোথায় পালিয়ে ছিলি রে চাকরি-বাকরি ছেড়ে? তোর জ্যাঠা এসে কত খোঁজাখুঁজি করে চলে গেলেন, ভুতো কত ছুটোছুটি করলে, কিন্তু কোন পাত্তাই কেউ পেলে না। এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলি? তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, তুই দেখছি একটা আস্ত পাগল, তোর এই পালানো অভ্যাসটা কি এখনো গেল না? তোর জ্যাঠা আমাদের বলে গেছেন খবর পেলেই যেন তাঁকে জানাই টেলিগ্রাফ করে। এইবার চোর ধরা

পড়েছে, তাঁকে খবর পাঠাই ? এই বলিয়া কমল সশব্দে হাসিয়া উঠিল ! আর মধুও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। তাহাদের এই প্রবল ও প্রাণময় হাসি দেখিয়া আমার মন তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, ছাড়্ ভাই কমল, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।

সে আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, এখন তো ভাল লাগবেই না ! আর আমরা যে তোকে খুঁজে খুঁজে কলকাতার শহর চষে ফেলেছিলুম, তার মজুরি দেবে কে ?

বলিলাম, কে তোদের খুঁজতে বলেছিল ?

কেউ বলেনি, আমাদেরই ঘাড়ে ভূত চেপেছিল তাই তোমায় খুঁজতে গিয়েছিলুম—হয়েছে ?

এই বলিয়া কমল চুপ করিতেই মধু বলিল, না রে আলোক, তোকে ও 'গুল্' দিচ্ছে, বিশ্বাস করিসনি ওর কথা। কলকাতার শহর, চারিদিকে গাড়ি-ঘোড়া, মানুষের বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। তাই আমরা আগে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়ে তারপর পুলিশের থানা ক'টায় খবর করেছিলুম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর ?

মধু বলিল, তারপর আর কি—যা বোঝবার তাই বুঝলুম—আবার আগের রোগ ধরেছে ! আচ্ছা আলোক, তুই পালাস্ কেন ভাই ? এর জন্যে তোকেই তো কত কষ্ট ভোগ করতে হয়। তুই কি বুঝিস্ না যে আজকালকার বাজারে মানুষ কত কষ্ট করেও এখন একটা চাকরি পায় না, আর তুই কিনা এমনি ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলি ?

বলিলাম, থাম্, তোর মুখে এই সব উপদেশ শুনলে গা জ্বালা করে।

কমল বলিল, এই মধু, চুপ কর !

মধু চুপ করিল।

তখন কমল অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, আচ্ছা এইবার দয়া করে বলুন—আমাদের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া হবে কি না।

রহস্যে কমল যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। মধুও তাহার এইরূপ ভঙ্গি দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমল তখন মধুর দিকে তর্জনী তুলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, খবারদার, চুপ ! দেখছিস্ না আমাদের সামনে গুরুজন দাঁড়িয়ে, তাঁর কাছে রঙ্গতামাসা করতে তোর লজ্জা করে না ?

হায়রে, তাহারা যদি জানিত তখন আমি কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ করিতে পারিত না। তাই তাহারা যখন পুনরায় বায়োস্কোপ দেখিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিল, আমি বলিলাম, না।

কমল বলিল, না ! শুনবো না তোর কথা, কোন্ রাজকার্য এখন তোর বয়ে

যাচ্ছে শুনি ! দু'ঘণ্টার তো ব্যাপার—দুটো থেকে চারটে—তারপর যেখানে খুশি যাস্, কিছু আমরা বলবো না।

এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সহসা কমলের মুখের চেহারাও যেন বদ্লাইয়া গেল। সে তখন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে, এখন তুই কোথায় থাকিস্ ভাই ?

কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাদের কাছে কোন কথা ভাঙিব না। তাহাদের সঙ্গে আমার জীবনের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাহারা কি বুঝিবে আমার কথা ! হয়ত বা ব্যঙ্গ করিয়া আমার এই দারিদ্র্যকে আরো দুঃসহ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু মধু ও কমল কিছুতেই ছাড়িল না। তাহারা বলিল, আমরা তোর বাড়িতে বলতে যাবো না, অন্তত এটুকু বিশ্বাস আমাদের উপর রাখতে পারিস্ !

তাহারা এমনভাবে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, আমার পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হইল না। তখন আমি বলিলাম, একজনের বাড়ি 'গার্ডিয়ান টিউটর' ছিলাম, কিন্তু আজ সে চাকরি গেল।

কমল বলিয়া উঠিল, এখন তাহলে কি করবি ?

বলিলাম, তাই তো ভাবছি।

মধু বলিল, কত মাইনে দিত তারা রে ?

সেকথা আর জিজ্ঞেস করিসনি। এই বলিয়া আমি গম্ভীর হইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তাহাদের দুইজনেরও মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে মধু বলিল, আচ্ছা আলোক, তুই শিবপুরে থাকতে রাজি আছিস্ ? আমার এক মাসিমা থাকেন সেখানে, মার পিস্তুতো বোন্, তাঁর সঙ্গে সেদিন মামার বাড়িতে দেখা হয়েছিল, তিনি একজন মাস্টার খুঁজছিলেন—বাড়িতে থাকবে, আর তাঁর ছেলেপিলেদের পড়াবে—অবশ্য মাইনেও দেবেন কিছু ; থাক্‌বি সেখানে ?

কমল বলিল, চল্ আগে ভেতরে গিয়ে বসা যাক্, তারপর সব কথা হবে'খন। সময় আর নেই।

তাহাই হইল। ভিতরে গিয়া মধুর সঙ্গে এই পরামর্শ হইল যে, বায়োস্কোপ দেখা শেষ হইলে সে নিজেই আমাকে লইয়া গিয়া সেখানে রাখিয়া আসিবে।

বায়োস্কোপ ভাঙিলে কমল তাহার মেসে ফিরিয়া গেল, আর মধুতে আমাতে শিবপুরে চলিলাম।

সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ আমরা মধুর মাসির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মধু রাস্তায় যাইতে যাইতে আমার কাছে তাহার এই মাসির সম্বন্ধে কত গল্প বলিল। তাঁহার নাকি একটি ভয়ানক দুর্বলতা আছে, কেহ মা বলিলেই তিনি গলিয়া যান, তখন তাঁর নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিয়া কেহ বিমুখ হয় না। কবে কোন্ ভিখারি শুধু মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়াছিল,

সে কাহিনীও সে সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

শুনিয়া আমি মনে মনে সেই করুণাময়ী অপরিচিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি হইলাম মধুর প্রতি। তাই সেদিন যখন আমাকে তাহার মাসিমার নিকটে রাখিয়া মধু চলিয়া আসিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, ভাই মধু, আমায় ক্ষমা কর।

মধু হাসিতে হাসিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ক্ষমা? সে আবার কি! কিসের জন্য?

বলিলাম, অপরাধ করেছি তোকে ভুল বুঝে।

অপরাধ করেছিস্ তুই, আমার কাছে? দূর পাগলা! এই বলিয়া তাড়াতাড়ি আমার হাতখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া নাড়িতে নাড়িতে সাহেবী কায়দায় বলিল, 'গুড্‌বাই'!

আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। কোন কথা আর আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না, শুধু বারবার চোখে জল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

সেইদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আবার আশ্রয় পাইলাম মধুর মাসিমার কাছে।

আমার খবর বাড়িতে সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার জন্য আমি মধু ও কমলকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহারাও সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল; জ্যাঠামশাইরা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

২৬

মধুর মাসিমাকে পাড়ার সবাই 'ছোড়দি' বলিয়া ডাকিত—যাহারা বয়সে ছোট তাহারাও বলিত আবার যাহারা বড় তাহারাও বলিত। মোট কথা, তিনি ছিলেন সরকারী 'ছোড়দি'। বিপদে আপদে তিনি সকলকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত।

কাহার ছেলের অসুখ করিয়াছে—রাত জাগিতে হইবে, কাহার মেয়ের রাত-দুপুরে প্রসব-বেদনা উঠিয়াছে—তাহাকে প্রসব করাইতে হইবে, কাহার স্বামী 'রেস' খেলিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিয়াছে—তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে—এই সমস্ত দিকে তাঁহার ছিল তীক্ষ্ন দৃষ্টি। অবস্থা তাঁহার ভগবানের কৃপায় ভালই ছিল, স্বামী চাকরি করিয়াও কি একটা ব্যবসা করিতেন তাহাতে বেশ দু'পয়সা উপার্জন হইত। সংসারের মধ্যে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী। ইঁহাদের বড় ছেলেদুটিকে আমায় পড়াইতে হইত। তাহাদের একটি পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে, আর একটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

প্রথম প্রথম মধুর মাসিমা মুখে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ দেখাইলেও, অন্তরে যেন আমার প্রতি তাঁহার কেমন একটা ঔদাসীন্য ছিল ; ইহা লক্ষ্য করিয়া আমার মনটাও যেন ঠিক সুস্থ বোধ হইত না। কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেই একেবারে চাকা ঘুরিয়া গেল। প্রথম প্রথম মা বলিয়া ডাকিতে আমার কেমন লজ্জা বোধ হইত, তাই দিন কতক বলিতে পারি নাই। শেষে মধুর কথা মনে পড়িতেই সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া একদিন হঠাৎ 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিলাম এবং তাহার ফলও হাতে হাতে ফলিল।

আমি একতলার বৈঠকখানা হইতে একেবারে দোতলার সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানিতে আশ্রয়লাভ করিলাম ; এবং শুধু আশ্রয় দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আমাকে অবিলম্বে হাওড়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমি ইহাতে পাছে লজ্জাবোধ করি, এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, যখন মা বলেছ, তখন, মায়ের যা কর্তব্য সে তো আমাকেই করতে হবে—তোমার আর কে আছে বাবা।

শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। কি যে বলিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, ভগবান সত্যসত্যই যেন আমার মাকে এতদিন পরে মিলাইয়া দিয়াছেন। ভাল খাবারটি, বড় মাছটুকু— ইহা ছাড়া যে জিনিসটি আমি খাইতে ভালবাসি, সেটি তৈয়ারি করিয়া—তিনি আমায় খাওয়াইতেন। উপরন্তু ঠাকুর-চাকর এমন কি নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত, ডাকিয়া বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, 'আলো যে আমার পেটের ছেলে নয়, একথা যেন কেউ বুঝতে না পারে—তোমরা কোন বিষয়ে যেন তাকে পর ভেবো না।'

শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়া পড়িত, আমি অতিকষ্টে তাহা সম্বরণ করিতাম। সত্যই মাতৃস্নেহ যে কি জিনিস্, এতদিন পরে তাঁহার কাছে আমি সেই বহুবাঞ্ছিত অমৃতের প্রথম আস্বাদ পাইলাম। তিনি নিজের হাতে আমার বিছানা পাতিয়া দিতেন, কলেজ যাইবার সময় পরিষ্কার জামাকাপড় আনিয়া আমার হাতে দিতেন এবং কোন একটা ভাল জিনিস খাইব না বলিলে, পীড়াপীড়ি করিয়া না খাওয়ানো পর্যন্ত ক্ষান্ত হইতেন না! নিজের ছেলেমেয়ে থাকিতেও পরের ছেলেকে কেহ যে এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে ইহা অন্য কেহ বলিলে হয়ত আমি নিজেই তাহা বিশ্বাস করিতাম না।

কতদিন কত মহিলা আমাকে ভুল করিয়া মাসিমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছেন! মনে পড়ে ইহাতে আমি যতটা লজ্জিত হইতাম, তাহার চেয়েও বেশি খুশি হইতেন তিনি।

প্রথম দিনের কথা আজও মনে আছে। কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলাম দুই-জন অপরিচিতা তাঁহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে চাহিয়া বলিলে, হ্যাঁ ভাই ছোড়দি, এটি বুঝি তোমার বড় ছেলে? বাবা দেখতে দেখতে মাথায় কত লম্বা হয়ে গেছে! লোকে বলে মেয়ে-

মানুষের কলাগাছের বাড়—আমি ত দেখছি কেউ কম যায় না! এই এতটুকু আমি এ'কে দেখে গিয়েছিলুম ওবছর পুজোর সময় এসে! বাপের বাড়ি দু'বছর আসিনি আর তারই মধ্যেই পাড়ার অর্ধেক ছেলেমেয়েদের দেখলে চিনতে পারি না।

শুনিয়া গর্বে ও আনন্দে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশিনী তখন পরম উৎসাহে বলিতেছিলেন, হ্যাঁ ভাই ছোড়দি, এর রঙটা আগে যখন দেখেছিলুম কেমন মাজা-মাজা ছিল, না? এখন যেন বেশ ফরসা হয়েছে বলে মনে হয়! এ রঙটা তোমার মতো পেয়েছে বটে কিন্তু মুখচোখ-গুলো কার মত হয়েছে ভাই? ওর বাপের চোখ ত এত বড় নয়?

এইবার তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবেশিনীটির সঙ্গিনীও খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাঁহার গায়ে একটা ঠেলা মারিয়া বলিল, আ মরণ, ও তোর ছোড়দির ছেলে হতে যাবে কেন—ও যে মাস্টার, বাড়িতে থেকে ওর ছেলেমেয়েদের পড়ায়।

এই অপরিচিতদের মধ্যে একজন ননদ ও একজন ভাজ। যিনি আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তিনিই ননদ। দুই তিন বৎসর অন্তর ভায়ের বাড়ি আসেন কয়েকদিনের জন্য।

ননদটি এই কথা শুনিয়া ভাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোড়দি যেন কী ভাই! এতক্ষণ চুপ করে মজা দেখছিল! ভাই প্রথম থেকেই আমার মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল—এই সে বছর এতটুকু দেখে গেলুম আর এরি মধ্যে এত বড়টা হল কি করে?

ভাজটি বলিল, তোমার মাথা! ছোড়দির বড় ছেলে কি করে এত বড় হয়! আমার গণেশ আর সে দু'মাসের ছোটবড়, না ছোড়দি?

মা বলিলেন, ওমা তোর গণেশ তখন কোথায়? আমার বলাই যখন পেটে সেই বছর ত তোর বিয়ে হলো! দিন দিন তোদের যেন সব বেভ্রম হচ্ছে। আমার বেশ মনে আছে তোর বিয়ের দিন ঠাকুরপো এসে কত সাধাসাধি করলে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু আমার শাশুড়ী কিছুতেই মত দিলেন না; বললেন, 'হোক না পাড়া, তবু ভরা পোয়াতি, এই রাত্রে এতগুলো গাছতলা দিয়ে যেতে হবে ত? আমি কোন্ ভরসায় পাঠাই।'—তখন আমার আট মাস!

বলিয়া মা থামিলেন বটে কিন্তু সেই প্রসঙ্গ ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইতে কাহার কোন্ বছরে বিবাহ হইয়াছে তাহা উঠিল এবং তাহা হইতে শেষে বয়সের হিসাবে গিয়া ঠেকিল। তখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে মায়ের বয়স একত্রিশ আর তাঁহারা দুইজন তাঁহার চেয়ে দুই বছরের ছোট।

এইসব কথা যখন হইতেছিল আমি তখন উপরে ছিলাম। সেখান হইতে সবই আমার কানে আসিতেছিল। এমন সময় সহসা মা আমায় চেঁচাইয়া ডাকিলেন,

আলো—ও আলো ?

বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আমি বলিলাম, আমায় ডাকছো মা ?

—হ্যাঁ বাবা। আমার জরদার কৌটোটা বিছানার ওপর ফেলে এসেছি, দিয়ে যা না চট্ করে ?

আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আবার যখন উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম তখন আমার কানে আসিল এই কয়টি কথা—আলোক আমায় মা বলতেই অজ্ঞান, কি চোখে যে দেখেছে ভাই তা কি বলবো ! বলে কিনা, তুমি আমার আর জন্মের মা ছিলে !

শেষের কথাটি বলিবার সময় তাঁহার গলা আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। আমি যে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকি ইহাতেই তিনি যেন কৃতার্থ হইয়াছেন, তাই সাড়ম্বরে সেই কথাটি যাহার সঙ্গে দেখা হইত তাহাকে একবার না বলিয়া তাঁহার মনে শান্তি হইত না।

এমনিভাবে একমাস দুই মাস করিয়া এক বছর কাটিয়া গেল। আমি 'ফার্স্ট ইয়ার' হইতে 'সেকেণ্ড ইয়ারে' উঠিলাম তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া। ইহাতে কলেজে রীতিমত ভাল ছেলে বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়া গেল। আর পাড়ায় ত কথাই নাই ! মায়ের মুখ হইতে সবাই শুনিয়াছিল। তাহা ছাড়া পাড়ার যেসব ছেলেরা আমার সঙ্গে পড়িত তাহারাও আমার সুনাম রটাইয়াছিল। কাজেই পাড়ায় আমার খাতির বাড়িয়া গেল। আমি ইহাতে যত না গৌরব অনুভব করিতাম তাহার চেয়ে বোধ করি সহস্রগুণ বেশি করিতেন মা !

একদিন তিনি পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা আলো, আসছে বারে ফার্স্ট হতে পারবিনে ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, পারবো, তুমি যদি একটু কম করে ভালবাসো মা !

ইহা শুনিয়া তিনিও হাসিলেন কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু যেন সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। বলিলেন, যদি তোর মা থাকতো আজ তা হলে কত ভালবাসতো বল্ দেখি ?

বলিলাম, তবে কি তুমি আমার মা নও ?

তিনি আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, তুই কি আমায় সত্যি তাই মনে করিস্ ?

না, বলিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

তিনিও হাসিয়া বলিলেন, দুষ্টু ছেলে !

২৭

আমি মায়ের সাধ পূর্ণ করিবার আশায় পড়াশুনায় সত্যি সত্যি আরো বেশি মনোযোগ দিলাম। এমনি করিয়া যখন লেখাপড়ার মধ্যে মনকে একেবারে ডুবাইয়া রাখিতাম তখন একদিন দুপুরবেলা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মা কাহার সহিত বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাঁহার নূতন মুখ, একেবারে নূতন চেহারা! ইতিপূর্বে কোনদিন তাঁহাকে আমি দেখি নাই।

আমাকে দেখিয়া তিনি মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিতেই সঙ্গে সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন, ও কি লো, একফোঁটা ছেলে আলো, ওকে দেখে আবার মাথায় ঘোমটা দিচ্ছিস্ কি,—দিন দিন তুই যেন কচি খুকী হচ্ছিস—ও যে আমাদের আলোক!

বুঝিলাম আমার ইতিহাস যথানিয়মে ইঁহার কাছেও বলা হইয়াছে। তাই তিনিও আবার মাথার কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন. ও, আমি মনে করেছিলাম বোধ হয় আর কেউ!

মা তখন বলিলেন, আলোক, ইনি তোমার মাসিমা হন, নমস্কার করো। আমার ছোট বোন, আজ হঠাৎ এসেছে দিল্লী থেকে।

তাঁহাকে দেখিয়া আমিও কেমন সঙ্কুচিতও হইয়া পড়িয়াছিলাম। অপরিচিতা বলিয়া নহে, অসাধারণ রূপসী বলিয়া। সুন্দরী বলিলে যে ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে ইহা সে রূপ নহে। ইহা যেন চন্দ্রকিরণে প্লাবিত ভরা গঙ্গা। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, মন ভরিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় পুলকোচ্ছ্বাসে!

তিনি বসিয়া ছিলেন রাজেন্দ্রাণীর মতো! আমি নমস্কার করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইলাম অমনি তিনি পা দুইটি সরাইয়া লইলেন। বলিলেন, থাক্ থাক্, পায়ে আর হাত দিতে হবে না।

এই বলিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি আবার সেই হাত তাঁহার মুখে ঠেকাইলেন।

মা বলিলেন, দিলেই বা পায়ে হাত—তুই যে গুরুজন হ'স পূর্ণিমা!

না দিদি, কেউ পায়ে হাত দিলে আমার বড্ড লজ্জা করে! সেখানে এমনি আমার এক দেওর আছে, আমিও তাকে পায়ে হাত দিতে দেবো না, সেও ছাড়বে না। এমন দুষ্টু ছেলে, কি বলে জানো দিদি? বলে, তোমার নমস্কার করি শুধু তোমার ওই সুন্দর পাদু'টো একবার হাত দিয়ে ছোঁব বলে!

বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। অদ্ভুত সে হাসি। আমার মনে হইল হঠাৎ যেন কোন বীণার অনেকগুলি তার একসঙ্গে সুরে সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

মা আমায় বলিলেন, যাও, বইপত্তর রেখে হাতমুখ ধুয়ে এসে মাসিমার সঙ্গে আলাপ করো। বলাই, টুনু, অঞ্জু, বাসনু সব খেলতে বেরিয়ে গেল। কতবার বললুম, মাসির কাছে তোরা বোস্, আজ আর খেলতে যেতে হবে না—কিন্তু কে কার কথা শোনে! বলাইবাবুর আজ স্কুলে ফুটবল ম্যাচ খেলা, টুনু আবার গেল দাদার সঙ্গে তাই দেখতে, আর মেয়ে দু'টো বেরিয়েছে পাড়ায় তাদের সঙ্গিনীদের ডাকতে—মাসিমার কাছ থেকে একটা টাকা পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে! আজ পুতুলের বিয়ে হবে—ওই দেখনা, একে একে সব বাগানের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে!

ইহা শুনিয়া মাসিমা মন্তব্য করিলেন, দিদির যেন কি হয়েছে—ছেলেমানুষ ওরা, খেলাধুলো না ক'রে আমার মুখের কাছে এসে হাঁ করে বসে থাকবে—না?

আরপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ও কোথায় সমস্ত দিন কলেজ থেকে পড়াশুনো করে এলো, এখন একটু বিশ্রাম করবে, না—অমনি হুকুম হলো আমার কাছে বসবার জন্যে। না বাবা আলোক, দিদির কথা শুনো না, তুমি ততক্ষণ জিরোও গে, আমি ওপরে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো'খন। দিদির সব তাড়াতাড়ি! এই বলিয়া মাকে সস্নেহ ভৎর্সনা করিলেন।

কোন কথা না বলিয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। কিন্তু ঘরে পা দিতেই এই কথাটি আমার কানে ভাসিয়া আসিল, তুই ভেবেছিস্ পূর্ণিমা, ওকে বারণ করলি বলে ও তোর কথা শুনবে? আমি যখন বলেছি তখন ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এলেও কেউ ওকে রোধ করতে পারবে না, আমার কথা যেন ওর কাছে বেদবাক্য!

মাসিমা ঠিক কি ভাবিয়াছিলেন জানি না, তবে আমাকে অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাবা, ছেলের কি মাতৃভক্তি!—মায়ের কথাটাই সব হ'লো আর আমি যে মাসি, এত করে বললুম একটু বিশ্রাম করতে, সেকথা বুঝি কানেই ঢুক্‌লো না? এমনি ক'রে দিদির কাছে আমায় অপমান করলে ত? মায়ের বোন আমি, তার কথার সম্মান কি একটুও রাখতে নেই বাবা? এই বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলিলাম, মায়ের বোন মাসি, কিন্তু আগে মা তারপর মাসি!

মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তুই আমার ছেলেকে ঠকাবি ভেবেছিস্—ও কি আমার বোকা হাঁদা ছেলে? দিনরাত কত বই পড়ে; এবার কলেজে থার্ড হয়েছে, আস্‌ছে বারে ফার্স্ট হবে বলেছে। এই বলিয়া তিনি সগর্বে ভগিনীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

বেশ বাবা, এই তো চাই! মায়ের মুখ ছেলেই ত উজ্জ্বল করবে; তার চেয়ে সুখ আর জগতে কি আছে। দিদির মুখে আমি তোমার কথা সব শুনেছি—আর যেটুকু বাকি ছিল তাও এই চোখে দেখলাম।

তারপর, কবে আমাদের আই-এস-সি পরীক্ষা শুরু হইবে, কবে কলেজের টেস্ট হইবে, সব একে একে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, আমি মুখ্যু মানুষ, তোদের এসব কথা কিছুই বুঝি না।

তারপর আমাকে বলিলেন, তোর মাসিমাকে সব বল্ না আলোক, ও সব জানে—তোর মেসোমশায় ওকে বিয়ের পর মাস্টার রেখে অনেক ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আচ্ছা তোরা মাসি বোন্-পো ততক্ষণ গল্প কর্, আমি আলোকের জলখাবারটা নিয়ে আসি।

বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে আমি পরম উৎসাহে মাসিমাকে আমার কলেজের গল্প বলিয়া চলিলাম। এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওমা; কি ঘাম ঘেমেছিস্! এই বলিতে বলিতে তাঁহার রঙীন শাড়ীর আঁচল দিয়া আমার মুখটা মুছাইয়া দিলেন।

তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত সেবায় আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এবং সেই লজ্জাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য বলিলাম, আমার গরমের দিনে বড্ড ঘাম হয় মাসিমা—আপনার হয় না?

তিনি বলিলেন, আমাদের দিল্লীর গরম এখানকার মত ভ্যাতভেতে নয়; যে টানের দেশ—ঘাম হয় না, তবে গা পুড়ে যায়। অনবরত এই গা দিয়ে জল গড়ানোর চেয়ে সে বাবা ঢের ভাল!

এমন সময় মা একটা থালায় করিয়া পরোটা ও হালুয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। তারপর থালাটা আমার সামনে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ওই যা, জলের গেলাস ভুলে ফেলে এলুম রান্নাঘরে।

মাসিমা বলিলেন, তুমি বসো দিদি, আমি গেলাসটা নিয়ে আস্‌ছি।

গেলাসটি আনিয়া তিনি হাতে করিয়া ধরিয়া আমার সামনে বসিয়া রহিলেন। আমি গেলাসটি তাঁহাকে মেঝের উপর রাখিতে বলিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কেন, আমি হাতে করে ধরে আছি বলে তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে?

বলিলাম, আপনার মিছিমিছি কষ্ট হচ্ছে!

ও, মাসির কষ্ট দেখে দরদ যে একেবারে উথ্‌লে উঠলো। দেখি কত দিন এ দরদ থাকে। আমি ত এবার এখান থেকে শিগগির যাচ্ছি না—তোমার মেসো সেই জানুয়ারী মাসে এসে আমায় নিয়ে যাবেন।

মা বলিলেন, হ্যাঁরে পূর্ণিমা, তোর ছেলেমেয়ে তোকে ছেড়ে একলা এতদিন থাকতে পারবে?

খুব! ওরা বাপকে পেলে আর কিছু চায় না দিদি। তাছাড়া আমার বড় জা রয়েছেন, তাঁকে ছেলেমেয়েরা খুব ভালবাসে। পাঁচ বছর পরে আমি কলকাতায় এলুম—কোথায় বলে দিনকতক একটু থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে বেড়াবো, তা নয়, আবার ওই সব ঝক্কি ঘাড়ে করে আনবো—তুমি কি ক্ষেপেছ দিদি?

মা বলিলেন, ভগবান বেশি দেননি এই রক্ষে, এ-বছর আর-বছর যদি হতো তাহলে কি করতিস্?

যাও দিদি—ছেলেমানুষের সামনে কী যে তুমি বলো ! এই বলিয়া হঠাৎ তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

না না, হক্ কথা বলবো তাতে আবার লজ্জা কি। তোর দু'টি ছেলেমেয়ে তাও তারা ডাগর হয়ে গেছে, তাই ত এমন ঝাড়া হাত-পা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছিস্ ; তা না হ'য়ে ওই মানুর মার মতো হ'লে কি করতিস ?

মাগো, শুয়োরের পালের মতো বছর বছর বিয়োচ্ছে—ওর কথা আর ব'লো না দিদি, শুনলে আমার যেন গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করে।

এই বলিয়া ঘৃণায় তিনি মুখটা বিকৃত করিলেন।

মা বলিলেন, তা ও কী করবে, ভগবানের দান—

তুমি থামো ! ভগবানের দানের কথা আর আমার কাছে ব'লো না। এই বলিয়া ধমক দিয়া তিনি মাকে থামাইয়া দিলেন।

তোরা সব লেখাপড়া শিখে দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিস্—আমি মুখ্যু মানুষ, তোদের কথা অতশত বুঝতে পারি না। এই বলিতে বলিতে মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মাসিমা তখন আবার আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আজ তোমার বিকেলের খেলাটা মাটি করলুম—মনে মনে আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছো ত ?

বলিলাম, আমি ত কোনদিন খেলতে যাই না।

তবে বিকেলটা কী করো, ঘরে বসে বসে কেবল পড়ো নাকি ?

বলিলাম, তা পড়ি, তবে খানিকক্ষণ গঙ্গার ধারে ঘুরে ফিরে আসবার পর।

তাহলে আমার জন্যে বেড়ানোটা আজ হলো না, এই ত ? তা না হয় মাসির জন্যে একটা দিন নষ্টই হলো—কি বলো আলো ?

আমি বলিলাম, নষ্ট ? বলেন কি !

তবে কি লাভ বলবে ? বলিয়া মাসিমা হাসিয়া উঠিলেন।

সাগ্রহে বলিলাম, হ্যাঁ। এই যে এতক্ষণ ধরে আপনার সঙ্গে কথা বললুম, এইটাই ত আমার লাভ। আর কোনদিন ত এ সৌভাগ্য আমার হয়নি !

ইহা শুনিয়া তিনি কি যেন ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, যাক্, তবু শুনে সুখী হলুম যে তোমার লোকসান করিনি। এমন সময় মাকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, শুনচো দিদি, তোমার ছেলে কী বলে, আমার সঙ্গে কথা কওয়া নাকি সৌভাগ্য !

মাসিমার উপর আমার রাগ হইল। এই কথাটি মাকে কি না বলিলে চলিত না ? তিনি যেন ইচ্ছা করিয়া মার কাছে আমায় অপ্রস্তুত করিতে চান !

মা কিন্তু কিছুমাত্র দমিলেন না ; বরং আরও উল্লসিত হইয়া বলিলেন, ঠিকই বলেছে, গুরুজনদের কথা শুনতে পাওয়া সকলের ভাগ্যে কি জোটে ? এই বলিয়া তিনি যেন আমাকে বাঁচাইলেন।

বলিতে বলিতে তিনি মাসিমার জলসিক্ত পিচ্ছিল বাহু দুইটি তাঁহার গলা হইতে নামাইয়া দিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে মাকে লইয়া মাসিমা গভীর জলে গিয়া পড়িয়াছিলেন। মা বেঁটে মানুষ, সাঁতার কাটিতে কাটিতে খপ্ করিয়া এক সময় আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দেখ্ না আলো তোর মাসির কাণ্ড!

আমি গলাজলে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মাসিমা অমনি সঙ্গে সঙ্গে একমুঠি জল ছুঁড়িয়া আমার চোখে মারিয়া বলিলেন, ওরে দুষ্টু ছেলে, মাকে আবার ধরা হচ্ছে! এই বলিয়া তাঁহাকে আরো গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়া নিজে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা সিঁড়ির উপর আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তারপর মায়ের দিকে চাহিয়া ছোট মেয়ের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কেমন জব্দ করেছি, এখন কাটো সাঁতার! এমন সুন্দর পুকুর, তা একবার ভাল করে গা ধুতে তোর ইচ্ছে করে না দিদি?

আমি মাসিমার পায়ের দিকে চাহিয়া ছিলাম। সেখান হইতে তাঁহার সিক্ত-দেহের সুন্দর প্রতিচ্ছবি কালো জলের ঢেউয়ের সঙ্গে দুলিতে দুলিতে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছিল।

আয় তো বাবা, তোকে একটু সাবান মাখিয়ে দিই। এই বলিয়া সাবান লইয়া তিনি আমার হাতে পিঠে মাখাইয়া দিতে দিতে, হঠাৎ কানের পিছনটায় হাত দিয়া বলিলেন, ইস্, কত ময়লা জমে আছে, দেখ দিদি—

মা বলিলেন, ওসব সাবান মাখানো-টাখানো আমার আসে না ভাই—ওরা নিজেরা নিজেরা কখন কি করে আমি জানিও না।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আলো, আর জলে থেকো না, উঠে পড়ো।

আমার সে জল ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। মাসিমার সুন্দর সাবানের গন্ধে ঘাটের জল অপূর্ব সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছিল, আমি বার বার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তাহার আঘ্রাণ লইতেছিলাম।

মাসিমা আমাকে সাবান মাখানো শেষ করিয়া তারপর মায়ের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, এসো দিদি, তোমায় একটু মাখিয়ে দিই।

হ্যাঁ, তা মাখাবে না! এই বুড়োবয়েসে সাবান মাখতে দেখলে লোকে কি বলবে! দেখ্ পূর্ণিমা. ভাল লাগে না, ছাড়্!

মাসিমা তখন তাহার কথা না শুনিয়াই মুখে সাবান লাগাইতে শুরু করিয়া দিয়াছেন।

তোর সঙ্গে যদি কেউ পারবে! বলিয়া মা অগত্যা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বেশ করিয়া সাবান মাখাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাসিমা বলিলেন, কে তোমায় বুড়ো বলে দেখি, আজ আসুক দাদাবাবু!

আ মরণ, তোর দাদাবাবু কেন বলতে যাবে? এই বলিয়া মা মাসিমার গালে

একটা ঠোনা মারিলেন।

তবে?

জানি না, যা! বলিয়া মা মুখটা নীচু করিয়া জলের উপর চাপিয়া ধরিলেন। মাসিমা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ দেখি দিদি, তোমার ছেলের কেমন ধবধব করছে চেহারা!

আমি লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম। মাসিমা চট করিয়া বলিলেন, ওরে ছেলে, দিব্যি গা ধুয়ে পালানো হচ্ছে—তা হবে না। এই বলিয়া খপ্ করিয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং পিছন ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, দে ত বাবা আমার পিঠটায় একটু সাবান ঘষে? ওঃ, একদিনে কত ঘামাচি হয়ে গেল, কি দেশ বাবা তোদের! আমার গায়ে কেউ কোনদিন একটা ঘামাচি দেখেছে?···

আমি কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার সারা পিঠটায় সাবান ঘষিতে লাগিলাম।

মাসিমা আবার বলিলেন, হ্যারে আলো, অনেক হয়েছে, না? পিঠটা একেবারে বিশ্রী দেখাচ্ছে ত?

বলিলাম, কৈ না, বেশি হয়নি ত? 'দু'চারটে।

তাঁহার দুগ্ধশুভ্র ত্বকের উপর মধ্যে মধ্যে এই রক্তবর্ণ বিন্দুগুলি যেন শ্বেতপদ্মের বুকে লাল চন্দনের ফোঁটার মত শোভা পাইতেছিল।

২৮

সেদিন জল ঘাঁটিবার ফলে মায়ের মাথা ধরিয়া গেল। তিনি দুই রগে চন্দন লাগাইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মাসিমা রান্নাঘরে বসিয়া আমাদের সকলকে খাওয়াইলেম। ঠাকুরকে হুকুম করিতে লাগিলেন কাহাকে কি দিতে হইবে—যেন তিনি এই বাড়ির কতদিনের গৃহিণী। বৈকাল হইতে মাসিমার অন্তরের যে যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, খাইতে বসিয়া তাহা একে একে আমার মনে উদয় হইতে লাগিল।

এমন সময় মা এক হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

মাসিমা তাঁহাকে দেখিয়া তিরস্কার করিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, তুমি আবার উঠে আসতে গেলে কেন।

তিনি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, ওই ছেলের জন্য, একদিন কাছে না থাকলে অমনি কম খেয়ে উঠে পড়ে।

মাসিমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইস্ কম খেয়ে উঠে পড়বে, দেখি কেমন সাধ্যি আছে! আমি চৌকিদারের মত এখানে বসে আছি না! জানো দিদি, দস্তুরমত তোমার ছেলে আমায় ভয় করে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকগে!

হ্যাঁ তাই যাই। বলিয়া তিনি আরো দু পা অগ্রসর হইয়া আমার পাতে কি আছে যেমন দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে যাইবেন অমনি মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, দেখছো কি, পাতে কিছু ফেলে রাখতে দিইছি কি আমি! জানো দিদি, এমন দুষ্টু ছেলে বলে পেট ভরে গেছে—আমি তার উপর আবার দু'খানা রুটি জোর করে খাওয়ালুম!

আমি প্রত্যহ যাহা খাই তাহার চেয়ে যে আজ বেশি খাইয়াছি ইহা শুনিয়া কিনা জানি না মা আর একদণ্ডও সেখানে দাঁড়াইলেন না।

এমন কি মাসিমার মুখের দিকে না তাকাইয়া তিনি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—আমি জানি তুই যখন আছিস্ আমার আর ভাবনা নেই!

মা চলিয়া যাইবার পর মাসিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে, কেমন তোমার গুণের কথা সব দিদিকে বলে দিলুম!

এইভাবে সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আমি ঘরে গিয়া পড়িতে বসিলাম। আর বলাই, টুনু, অঞ্জু, বাসনু মাসিমাকে ঘিরিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিল। মা সেইখানে একটা রঙীন মাদুরের উপর শুইয়াছিলেন। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু দক্ষিণের উন্মুক্ততা! বাগানের পর বাগান। ছোট বড় অসংখ্য গাছের মাথায় হাজার হাজার জোনাকির আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জমাট অন্ধকারকে যেন মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। মা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। মাসিমা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বোনপো-বোনঝিদের নানা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছিলেন। এমন সময় মা বলিলেন, হ্যাঁরে পূর্ণিমা, তোর আগেকার সেই সব গান মনে আছে? গা না ভাই একটা। এর আগের বারে যখন এসেছিলি তখনো তোর গলা কি সুন্দর ছিল!

মাসিমা বলিলেন, সে সব গান ভুলে গেছি—এখন কতকগুলো রবি ঠাকুরের গান শিখেছি—জানো দিদি, এই বুড়োবয়সে উনি মাস্টার রেখে আমায় শিখিয়েছেন!

ছেলেমেয়েগুলি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, রবি ঠাকুর কে মাসিমা?

মাসিমা বড় বড় চোখ বাহির করিয়া বলিলেন, ইয়া দাড়িওলা এক বুড়ো, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তাঁর জ্যোৎস্নার মত ধবধবে রঙ, আর নীল আকাশের মত চোখ। আর যা কথা বলেন, হয় সব হয়ে যায় গান—নয়ত কবিতা।

সব চেয়ে ছোট হইল অঞ্জু। সে বিস্মিত হইয়া বলিল, তিনি কি আকাশে থাকেন মাসিমা?

মাসিমা বলিলেন, না, তিনি থাকেন আমাদের দেশে, আমাদের মতন।

মাসিমা, আমি তাকে দেখবো। এই কথা অঞ্জু যেমন বলিল, বাসনুও অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমিও দেখবো মাসিমা, আমায় নিয়ে যাবে!

মা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ সকলকে নিয়ে যাবে, এখন চুপ কর্ দেখি—তুই গান ধর্ এইবার পূর্ণিমা, যত চুপ করে থাকবি তত ওরা বকাবে।

এই বলিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি ঘরে পড়িতেছিলাম কিন্তু কান পড়িয়া ছিল সেখানে ; পাছে মা কিছু ভাবেন সেইজন্য আসিতে পারিতেছিলাম না। মাসিমা গান গাহিবেন শুনিয়া আমি একেবারে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। আমি আসিতেই মাসিমা গান ধরিলেন—

তুমি পাও নাই, পাও নাই মোর পরিচয়···

পনেরা মিনিট ধরিয়া তিনি এই গানখানি গাহিলেন। শুধু দুইটি ওষ্ঠ ছাড়া তাঁহার দেহের আর কোন অংশ নড়িল না। মর্মর মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া তিনি সেই অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া গাহিতেছিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর যেন সুরে লয়ে তানে মীড় ও মূর্চ্ছনায় নাচিতে নাচিতে কাঁপিতে কাঁপিতে এই পৃথিবী ছাড়াইয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। আমাদের কাছে বসিয়া গান গাহিলেও আমার মনে হইতেছিল তিনি যেন গান শোনাইতেছেন অন্য কাহাকে—যিনি আমাদের কাছে নাই, যিনি ধরার মাঝে থাকিয়াও অ-ধরা—যিনি রহিয়াছেন ওই আকাশের তারায়, ওই জোনাকির পাঁতিতে, ওই বৃক্ষলতায়, আলোয় আঁধারে জগতের প্রতি ক্ষুদ্র ও বৃহতের মধ্যে—যিনি এক, কিন্তু বহু হইয়া রহিয়াছেন আমাদের সকলের মধ্যে! এমন গান, এমন সুর, আমি কখনো শুনি নাই—সে যেন এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গের! তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টিতে মাসিমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি ভাবিতেছিলাম তিনি মানবী না দেবী! কখন গান থামিয়াছে আমার হুঁস ছিল না, হঠাৎ মাসিমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, বলি মাসিমার গান শুনে যে একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে গেল! পেলা দাও, শুধু হাতে গান শুনলে চলবে না।

বলিলাম, মাসিমা, কি সুন্দর তোমার গলা! আর একটা গাও না?

মাসিমা বলিলেন, গাইতে পারি যদি পাওনা ভাল হয়! এই বলিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া তিনি আর একটা গান গাহিলেন।

সে রাত্রে আমার আর কিছুতেই পড়ায় মন বসিল না। কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কথাই মনে হইতে লাগিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তাঁহার যে পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

পরের দিন সকালে আমি ঘরে বসিয়া পড়িতেছি আর বলাই ও টুনু আমায় মধ্যে মধ্যে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছে, এমন সময় মাসিমা একটি জলখাবারের থালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। প্রথমে তিনি বলাই ও টুনুকে খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর আমার কাছে আসিয়া হাঁ করিতে বলিলেন। আমি হাঁ করিলে তিনি একটি একটি করিয়া দুইটি রসগোল্লা আমার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন। তারপর আমায় খাওয়া শেষ হইলে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জলের গ্লাসটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, দেখছিস্‌ বলাই, তোদের মাস্টার মশায়কে এখনো খাইয়ে দিতে হয় কচি ছেলের মত! এঃ, ছাত্রদের সামনে কী অপমান—যাই আমি দিদিকে বলে দিয়ে আসি। এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া

গেলেন। ছাত্রেরা আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল এবং আমি লজ্জায় আরো গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোথাও মাসিমাকে দেখিতে পাইলাম না! চুপি চুপি উপর নীচের সব ঘরগুলি খুঁজিয়া আসিলাম কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। মাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি এমন সময় অঞ্জু আসিয়া বলিল, আলোকদা, দেখবে এসো মাসিমা কেমন আমাদের দোলায় দুলছে—ওঃ কি জোর দোল খাচ্ছে কি বলবো!

ইহা শুনিয়া মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বলিলেন, চল তো বাবা দেখে আসি—বুড়ো বয়সে হাত-পা ভেঙে শেষকালে কি একটা কেলেঙ্কারি করবে, আমার যেমন হয়েছে সহস্র জ্বালা! আপন মনে এই সব বকিতে বকিতে মা চলিলেন এবং আমি ও অঞ্জু তাঁহার অনুসরণ করিলাম। শেষে বাগানে হাজির হইয়া দেখি জামরুল গাছের ডালে বলাই তাহার ভাইবোনদের জন্য যে দোলা তৈরি করিয়া দিয়াছিল মাসিমা তাহাতে বসিয়া প্রবলবেগে দুলিতেছেন।

মার ভয় বরাবরই একটু বেশি, তাহার উপর ওই অবস্থায় মাসিমাকে দেখিয়া তিনি একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোকেও কি রাতদিন অঞ্জু-বাসনুর মত চোখে চোখে রাখতে হবে? নাম শিগ্‌গির দোলা থেকে, আমার গায়ের মধ্যে যেন কি রকম করছে—তারপর পড়ে গিয়ে একটা হিতে বিপরীত হোক্ তখন আমার মুখে সবাই চুনকালি দেবে!

মাসিমা দোলা হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিলেন, বাবা! তোমার জন্যে দেখছি আমায় আত্মহত্যা করতে হবে—এত ভয় কিসের, আমার কি এতটুকু আক্কেল নেই যে ওখান থেকে পড়ে মরতে যাবো!

জানি না—যা ইচ্ছে হয় কর্। বলিতে বলিতে মা আবার ঘরের দিকে ফিরিলেন।

মাসিমা ছুটিতে ছুটিতে মার কাছে গিয়া তাঁহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, দিদি, ভাই, আমার ওপর রাগ করলি?

ইহার পর বোধ হয় তিন-চার দিন আর মাসিমা দোলায় চড়েন নাই। তারপর আবার একদিন বৈকালে তাঁহাকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বাগানে গিয়া দেখিলাম তিনি সেইভাবে দোলায় দুলিতেছেন, আর অঞ্জু বাসনুর দল তাঁকে দোলা দিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আয় ত বাবা, তোকেই আমি খুঁজছিলুম, এরা মোটে দোল দিতে পারে না—খুব জোরে তুই আমায় দুলিয়ে দে ত?

বলিলাম, যদি পড়ে যাও?

ওঃ—দিদির মত তোমারও বুঝি ভয়?

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জু বাসনু বলিয়া উঠিল, জানো মাসিমা, আলোকদার কি ভয়!

একটু জোরে দোল দিলেই বলে, মাথা ঘুরছে !

তাই নাকি? বলিয়া তিনি ঝুপ করিয়া নামিয়া পড়িয়া আমাকে একপ্রকার জোর করিয়া ধরিয়া দোলায় বসাইয়া দোল দিতে লাগিলেন। যত জোরে তিনি দেন তত আমি তাঁহার পায়ে ধরি থামাইবার জন্য। আর আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ততই হাসিয়া গড়াগড়ি যান। আর ছেলেদের ত কথাই নাই। শেষে আমার প্রতি অনুকম্পাবশত তিনি নিজে উঠিয়া বসিলেন আমার পাশে এবং বলিলেন, দাঁড়া আমি শিখিয়ে দিচ্ছি কি ক'রে দোল খেতে হয়, তাহ'লে আর মাথা ঘুরবে না। এই বলিয়া আমাকে ভরসা দিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে তিনি একসময় এমন জোরে দোলা দিলেন যে ভয়ে আমি একেবারে মাসিমাকে জড়াইয়া ধরিলাম। তখনো তিনি থামিলেন না, শুধু আমায় বলিলেন চোখ বুজিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিতে।

এইভাবে কখনো তিনি আমার সঙ্গে ছোট ছেলের মত খেলা করিতেন, কখনো বা ভয় দেখাইতেন, আবার কখনো ভালবাসিতেন। কোনদিন যদি কলেজ হইতে একটু দেরি হইত ফিরিতে, দেখিতাম তিনি জানলার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু পাছে আমি ইহা বুঝিতে পারি এইজন্য আমাকে দূর হইতে আসিতে দেখিলে তিনি চট করিয়া লুকাইয়া পড়িতেন। তারপর বাড়িতে ঢুকিলে তিনি আসিয়া বলিতেন, বাবুর এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল ?

ইহা শুনিয়া মাও তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিতেন, হ্যাঁরে আলোক, আজ এত দেরি হলো কেন? মাসি যে তোর জন্যে 'হেদিয়ে' গেল—বার বার কেবল জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর দুষ্টুমি করার জন্যে একজন সঙ্গী চাই ত ! এই বলিয়া তিনি মাসিমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিলেন।

ইহা শুনিয়া মাসিমা ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমার বয়ে গেছে ওর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবার ! গাছের ওপর একটা কি সুন্দর পাখী বসেছিল তাই দেখছিলুম।

আবার কোন কোন দিন হয়ত কলেজ হইতে হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম মা ও মাসিমা খাইতে বসিয়াছেন, তখন আরো মজা হইত। আমি রান্নাঘরে পা দিবামাত্র মাসিমা চেঁচাইয়া উঠিতেন, এই দেখ দিদি, তোমার ছেলে আমার খাওয়ায় নজর দিতে এসেছে।

মাসিমার খাওয়া ছিল খুব কম কিন্তু আমি তখন তাঁহাকে রাগাইবার জন্য বলিতাম, মা দেখছো মাসিমা আমাদের তিনজনের খাওয়া একলা খাচ্ছে, আবার মুখে বলে আমি বেশি খেতে পারি না !

শুনিয়া মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিতেন, সেই জন্যেই ত তুই চলে যাবার পর খেতে বসি। তারপর এক টুকরো মাছ ভাতের সঙ্গে মাখিয়া হাতে করিয়া বলিতেন রাক্ষস, একটু গিলে যাও, তা নাহ'লে কি আমার হজম হবে ?

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাতের কাছে বসিয়া পড়িয়া

'হাঁ' করিতাম।

মা ইহা দেখিয়া স্নেহের হাসি হাসিতেন। এ রকম প্রায়ই হইত। তাই মাসিমা প্রায়ই আমাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিতেন, দেখ দিদি, আলোকের কখনো এত সকাল সকাল ছুটি হয় না—ও আমার কাছে খাবার লোভে পালিয়ে আসে নিশ্চয়!

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। একদিনের কথা আজও মনে আছে, এমনি করিয়া যখন তিনি আমায় খাওয়াইতেছিলেন তখন একফোঁটা চোখের জল হঠাৎ তাঁহার হাতের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছিল—কেন তাহা বলিতে পারিব না।

মাসিমা তখন কোন কথা না বলিয়া শুধু নীরবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সেই স্নেহস্নিগ্ধ চোখ দু'টির উপর আমার দৃষ্টি পড়িতেই আমি ঘাড় হেঁট করিলাম। তারপর দু'জনের মধ্যে আর কোন বাক্যালাপ হইল না। আমি নীরবে খাইয়া উপরের ঘরে চলিয়া গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়াও সেদিন আমার পড়াশুনা করিতে একেবারে ভাল লাগিল না—শুধু চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

নিস্তব্ধ দুপুর। বাড়ির সকলেই তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। কেবল আমার চোখে ঘুম ছিল না। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম। সহসা এক সময় আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম—দেখি, মাসিমা আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন, নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে।

সহসা তিনি আমার মাথাটি তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, কি হয়েছে বাবা, বল্—আমার কাছে লুকোস্নি!

আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া আরো কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিলাম।

তিনি চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, ছিঃ বাবা, কাঁদতে নেই—তুমি এখন বড় হয়েছো, সব বুঝতে পারো—তোমার দুঃখ কিসের। আমরা ত সব রয়েছি তোমার!

মাসিমা আমার চোখের জল দেখিয়া কী বুঝিলেন জানি না, তবে আমার মনে হইল, আমার সমস্ত অন্তরের কথা যেন একমাত্র তিনিই বুঝিয়াছেন! তাই বোধ হয় স্নেহের ছোট বড় অজস্র দানে তিনি প্রতিদিন আমার অন্তরের ভিক্ষাপাত্র অলক্ষ্যে এমনি করিয়া ভরিয়া তুলিতেন। সেইজন্য বুঝি প্রতি কাজে তাঁহার স্নেহস্পর্শ লাভ করিবার জন্য আমার হৃদয় সর্বদা তৃষিত হইয়া উঠিত!

মাসিমাও আসিবার দিন হইতে আমাকে কী চোখে দেখিয়াছিলেন জানি না! মা আমার জন্য যে সব কাজ করিতেন তাহা মাসিমা স্বেচ্ছায় তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, উপরন্তু আমার ছোটখাটো প্রতিটি কাজ তিনি স্বহস্তে করিয়া দিতেন। মা ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিতেন, তুই দু'দিনের জন্যে আমার কাছে বেড়াতে এলি, আর আমি তোকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারলুম!

আবার মা যখন কোন কাজ করিতে যাইতেন, মাসিমা তাঁহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিতেন, তুমি ত বারো মাস করছো দিদি, তবু যে দু'টো দিন আমি কাছে রয়েছি একটু না হয় জিরোলে—আমি ত আর রোজ রোজ সেখান থেকে এসে তোমায় দেখতে পারবো না! ছোট বোনেরা বড় বোনদের কত সেবা করে, কিন্তু এমন পোড়া দেশে গিয়ে পড়েছি যে ইচ্ছে করলেও আসবার উপায় নেই!

মা তাঁহার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া বোধ করি বিগলিত হইয়া যাইতেন, তাই নিজ মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিতেন, আর দেখছিস্ পূর্ণিমা, আলোকও মাসি বলতে একেবারে অজ্ঞান! তোকে পেলে যেন ও আর কিছু চায় না! আহা, বাছা আমার মাসি কি জিনিস তা জানে না—তাই তোর কাছে যখন আদর আবদার করে, দেখে আমার চোখে জল এসে পড়ে!

আমার আবার একটু ম্যালেরিয়ার ধাত ছিল। তাই মা প্রায়ই আমার গায়ে হাত দিয়া জ্বর অনুভব করিতে করিতে বলিতেন, দেখ্ ত পুণ্য, ওর গা-টা গরম কি না, আমি আবার ছাই ভাল বুঝতে পারি না!

মাসিমা প্রথমে কপালে ও বুকে হাত দিয়া দেখিতেন তারপর তাঁহার ঠাণ্ডা গালটি আমার গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, কৈ দিদি জ্বর—গা ত একেবারে ঠাণ্ডা।

আবার জ্বর হইলে মাসিমার সে কি সেবা! মা ছিলেন একটু দুর্বল প্রকৃতির, কাহারো অসুখ শুনিলে তাঁহার আর কোন কাজে হাত-পা আসিত না। তাই আমার জ্বর হইলে তিনি মাসিমাকে আগে ডাকিয়া বলিতেন, ভাই পূর্ণিমা, রাত্তিরটা তুই একটু ওর কাছে থাক্ না—এত জ্বরে ছেলেকে কি একলা রাখা ভাল?

মাসিমা তখন আমার রোগশয্যায় বসিয়া সারা রাত কাটাইয়া দিতেন। কখনো জল খাওয়াইয়া, কখনো বা মাথায় জলপটি দিয়া, কখনো বা ওষুধ খাওয়াইয়া, কখনো বা পাখার বাতাস করিয়া তিনি আমার শুশ্রূষা করিতেন।

মাসিমার হাতের এই সেবা এইরূপ আন্তরিক মনে হইত যে কখনো কখনো আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে, অসুখ তাড়াতাড়ি ভাল না হয়!

এমনিভাবে ক্রমশ এমন হইল যে আমার মন সকল সময় তাঁহার চিন্তায় ডুবিয়া থাকিত। পড়িতে পড়িতেও কখন্ যে মন তাঁহার কাছে চলিয়া যাইত বুঝিতে পারিতাম না। বই সম্মুখে খোলা রহিয়াছে, পাতার পর পাতা পড়িয়াও যাইতেছি, অথচ দেখি কী পড়িতেছি মনে থাকে না।

এইভাবে পরীক্ষা যত কাছে আসিতে লাগিল আমার মনও তত বই হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ফলে কোন রকমে যদি বা 'টেস্ট এগ্জামিনে' সাধারণ ছেলের মত পাশ করিলাম কিন্তু ইউনিভার্সিটীতে একেবারে 'ফেল' হইয়া গেলাম?

ওঃ, সেদিনের কথা মনে হইলে আজও আমার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমি যে কোনদিন সত্যই 'ফেল্' করিব ইহা আমিও যেমন কল্পনা করিতে পারি

নাই তেমনি বোধ হয় আর কেহও ভাবে নাই। বিশেষ করিয়া মা ও মাসিমার খুবই উচ্চ ধারণা ছিল আমার সম্বন্ধে। তবুও কেন যে 'ফেল' হইলাম তাহা কে বলিবে! একদিন মনে হইত, মাসিমার এই অত্যাধিক স্নেহ-ই হয়ত ইহার জন্য দায়ী!

মোট কথা পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য মা ও মাসীমার মত আমারও উৎসাহের অবধি ছিল না। যেদিন 'রেজাল্ট' বাহির হইল সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুপুরবেলা আমি খাওয়াদাওয়া করিয়া যখন প্রস্তুত হইলাম তখন মাসিমা আসিয়া বলিলেন, সন্দেশ হাতে ক'রে আজ বাড়িতে ঢুকতে হবে, আমি কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবো!

মা বলিলেন, খবর জেনে আসুক, তারপর তোর ভগ্নীপতি বলেছে, যে যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবে!

ওসব হবে না, আজ আলোককে খাওয়াতেই হবে—এই বলিয়া মাসিমা ছেলে মানুষের মত হাসিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

আমি যাত্রা করিবার পূর্বে প্রথম মাকে নমস্কার করিলাম। তারপর মাসিমাকে নমস্কার করিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি অমনি একটি পাঁচ টাকার নোট তিনি চুপি চুপি আমার পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আসবার সময় একেবারে নিয়ে তবে বাড়িতে ঢুকবে—দিদিকে যেন ব'লো না কে টাকা দিয়েছে—আমার জিৎ হওয়া চাই!

মা তখন তুলসীতলা হইতে প্রণাম করিয়া মাটি আনিতে গিয়াছিলেন আমার জন্য। তাড়াতাড়ি আসিয়া তিনি একটু মাটি আমার মাথায় দিলেন। আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। তারপর কিছুদূর গিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিলাম, মাসিমা তখনো সদর দরজা ধরিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন।

ইউনিভার্সিটিতে গিয়া দেখি ভিড়ে ভিড়! তাহারি মধ্যে ঢুকিয়া কম্পিত বক্ষে আমার 'রোল নম্বর' খুঁজিতে লাগিলাম। হঠাৎ কলেজের কতকগুলি ছেলেকে এক জায়গায় জটলা করিতে দেখিয়া আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমাকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করিয়া ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। আমি তাহাদের ডাকিলাম কিন্তু তাহারা যেন শুনিতেই পাইল না আমার কথা।

ইহার কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই, একটু পরেই সব স্পষ্ট হইয়া গেল। দেখিলাম আমার নামের পাশে ব্লু পেন্সিলের একটি চিকে মারা রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক টিপটিপ করিয়া উঠিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। নিমেষে আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। তখন সর্বপ্রথম মনে পড়িল মাসিমার কথা—তাঁহাকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব, তিনি যে সন্দেশ লইয়া যাইবার জন্য পাঁচটা টাকা দিয়াছেন!

তারপর মনে পড়িল মায়ের কথা। তাঁহার কত আশা, কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার সম্বন্ধে—কত টাকা তিনি আমার লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই বা কি বলিব ?

তারপর মনে পড়িল, কমল, মধু, বৃন্ধ হেডমাস্টার মশায় প্রভৃতির কথা। তাঁহাদের সকলকে আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব !

আর ভাবিতে পারিলাম না। যত ভাবি তত যেন জিহ্বা শুষ্ক হইয়া পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে থাকে। গোলদিঘিতে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম কি করিব। কিন্তু ইহার কোন উপযুক্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া শেষে স্থির করিলাম, এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। কলিকাতা হইতে কোন দূর দেশে যাইয়া বাস করিব এবং যতদিন না আবার উপযুক্ত হই, ততদিন আর কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মাসিমার কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি হয়ত এতক্ষণ আমারই জন্য দরজার পাশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন ! ইহা মনে হইবামাত্র আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তখন মনে মনে স্থির করিলাম মাসিমাকে একটা চিঠি লিখিয়া জানাইয়া তবে বিদায় গ্রহণ করিব।

পোস্ট অফিসে গিয়া কাগজ কলম লইয়া তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখিতে বসিলাম। কিন্তু কী লিখিব ! ভাবোচ্ছ্বাসে বার বার আমার চোখে জল আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং হাত পা কাঁপিতে লাগিল। মাসিমা, মা—যাঁহাদের কাছে আমি জীবনে সব চেয়ে বেশি ভালবাসা পাইয়াছি—তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব কেমন করিয়া, কি লিখিয়া ?

তাই অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে স্থির করিলাম কাহাকেও কিছু না জানাই-য়াই চলিয়া যাইব। কিন্তু কোথায় যাইব ? পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, মাসিমার দেওয়া সেই পাঁচটি টাকা রহিয়াছে। বুকে বল আসিল। একটি পয়সা হাতে না লইয়া বেড়াইবার অভিজ্ঞতা যাহার আছে তাহার আর ভয় কি ! পাঁচটা টাকা তখন আমার কাছে পাঁচটি মোহর বলিয়া মনে হইল। আর শুধু তাহাই নহে, উহাকে মাসিমার শেষ আশীর্বাদ মনে করিয়া মাথায় লইয়া আবার যাত্রা করিলাম অজ্ঞাত পথে—সমস্ত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

২৯

জীবনে এই প্রথম 'ফেল' হইলাম। ইতিপূর্বে কোন পরীক্ষায় কখনো ফেল করি নাই। কম বেশি নম্বর হয়ত পাইয়াছি—হয়ত বা প্রথম হইতে পারি নাই ; কিন্তু একেবারে অকৃতকার্য হওয়া এই প্রথম। যে বাল্যকাল হইতে বরাবর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা কম শোচনীয় ঘটনা

নহে। ভাল ছেলে হওয়ার সুনামই যাহার জীবনের একমাত্র মূলধন তাহার যে মনের অবস্থা তখন কিরূপ তাহা কাহাকে বুঝাইব? মানুষ ভালবাসা পায় যেখানে সবচেয়ে বেশি সেইখানেই বুঝি তাহার সবচেয়ে বেশি অভিমান, বেশি সঙ্কোচ! তাই সম্মুখে ও পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি চলে আমি কোথাও চাহিয়া চাহিয়া কোন আশ্রয় দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল যেন আমি নিজে হাতে করিয়া সব ঘুচাইয়াছি,—যেন আত্মহত্যা করিয়াছি! আমার অহঙ্কার, আমার লেখাপড়া জানার সমস্ত গৌরব আজ কাচের পাত্রের মত ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে ত আমি হারাইয়াছি। এখন কোথায় যাইব?

একাকী পথ চলিতে চলিতে এই সব লইয়া মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল হইয়া উঠিল আমার মনের প্রবৃত্তিগুলি—অবচেতনার গভীর তলদেশে যাহারা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ তাহারা যেন কোন্ রুদ্রের ইঙ্গিতে ফুলিয়া গর্জিয়া উঠিল! কাহাকে থামাইব! একটিকে শান্ত করিতে গেলে অপর দশটি যেন একসঙ্গে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ বাদে ঝড় থামিবার পরের অবস্থার মতো আমার মনে একটা সুনিবিড় প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল। তখন ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী আমি নিজেও নহি, ঈশ্বরও নহেন। যাহারা তাহাদের স্নেহ মায়ামমতা ভালবাসা হইতে আমায় এতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল দায়ী কেবল তাহারাই।

অর্থাৎ, আমার জীবনের এই সুগভীর ব্যর্থতার জন্য দায়ী শুধু মানুষের মনের কোমলতম অভিব্যক্তি—ভালবাসা!—যাহা বর্ষার ধারার মতো মানুষের চিত্তকে উর্বর ও ফলপ্রসূ করিয়া তোলে, আবার যাহার অভাবে বা আতিশয্যে অন্তরের সব সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যায়।

মোট কথা পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। অজ্ঞাতবাস ছাড়া আর কোন পথই আমি সামনে দেখিতে পাইলাম না। অনেক ভাবিয়া শেষে হাওড়া জেলা ছাড়িয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় একেবারে হুগলীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বেশ লাগিল জায়গাটি। লোকজন কম, বনজঙ্গল বেশি—নির্জন বাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

হুগলী স্টেশনের কাছে একটি উড়ের হোটেল ছিল। কোর্টের যাত্রীরা সেখানে নগদ পয়সা দিয়া খাইত। ইহাছাড়া রাস্তায় যে সব কুলিমজুররা কাজ করে, তাহারাও মধ্যে মধ্যে সেখানে খাইতে আসিত। আমি সেই হোটেলটিতে আশ্রয় লইলাম। যদিও সেখানে লোকজনকে থাকিতে দিবার মত অতিরিক্ত ঘর ছিল না, তবুও আমি তাহারই মধ্যে ভাঁড়ার ঘরের এককোণে একটু আশ্রয় পাইয়াছিলাম। অবশ্য ইহার জন্যও স্টেশনমাস্টারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কারণ প্রথম দুইদিন আমি স্থানাভাবে সেই হোটেলে খাইয়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে শুইয়া

থাকিতাম। কিন্তু স্টেশনমাস্টারের দৃষ্টিতে ইহা এড়ায় নাই। তাই তৃতীয় দিন তিনি নিজে আমায় ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে সেই হোটেলের মালিককে বলিয়া দিলেন আমায় একটু আশ্রয় দিবার জন্য। স্টেশনমাস্টারকে সেই উড়িষ্যা দেশীয় লোকটি দেবতার মতো ভক্তি করিত, তাই যে ঘরটিতে সে ভাঁড়ার রাখিত তাহারি মধ্যে একটি তক্তপোষে আমার স্থান করিয়া দিল।

কিতু পাঁচটি টাকায় আর কয়দিন চলবে? যদিও সেই হোটেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ আমার দৈনিক পাঁচ হইতে ছয় আনা খরচ হইত তবুও অতি কৃপণের মতো হিসাব করিয়া চলিতে চলিতে একদিন তাহা ফুরাইয়া গেল। তখন আমার বেকার-জীবনযাত্রা শুরু হইল। এই কয়দিন নগদ পয়সা দিয়া খাইয়াছিলাম বলিয়া হোটেলওয়ালা আরো কয়েকটা দিন ধারে খাইতে দিল। কিন্তু প্রতিদিনই খাইবার সময় মনে হইত যদি আজ পয়সা চাহিয়া বসে তাহা হইলে কি বলিব? চাকরির চেষ্টা যে হুগলী বা চুঁচুড়া শহরে আমি করি নাই তাহা নহে, কিন্তু বৃথা। আমার মতো অজ্ঞাতকুলশীলের স্থান সেখানেও ছিল না। তাই আরো কয়েকদিন এইভাবে চাকরি বা টুাইশানি—যাহা হউক একটা কিছুর চেষ্টায় ঘুরিয়া যখন কিছুই যোগাড় করিতে পারিলাম না তখন একটা বুদ্ধি মাথায় আসিল। সেই উৎকলীয় মালিকটিকে বলিলাম, তাহার হোটেলের হিসাব নিকাশ আমি করিয়া দিব কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমায় আহার ও বাসস্থানটুকু দিলেই যথেষ্ট হইবে, মাহিনার প্রয়োজন নাই।

বেতন লাগিবে না শুনিয়াই বোধহয় সে রাজী হইল। কিন্তু এমনি করিয়া যখন প্রায় দুইমাস কাটিয়া গেল তখন সহসা একদিন আমার মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিল। উচ্চাশা, আত্মসম্মানবোধ, শিক্ষাভিমান প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী একসঙ্গে আমার মনে জাগিয়া উঠিল। এইরূপে পশুর মত জীবন-যাপন করা যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমার সমস্ত অন্তর যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল তখনই সেখান হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু কোথায় যাইব? একটি পয়সাও ত আমার হাতে নাই।

মনে পড়িল কমল ও মধুর কথা। তাহারা হয়ত এতদিনে নতুন কলেজে ভর্তি হইয়াছে—বি. এ. পড়িতেছে। আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম যেমন করিয়া হউক আবার কলেজে ভর্তি হইব, আবার লেখাপড়া শিখিব।

এইরূপ উচ্চাশা লইয়া আমি তখন একটা ট্যুইশানির চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুই জোগাড় করিতে পারিলাম না। শেষে হতাশ হইয়া সেই স্টেশনমাস্টারের শরণাপন্ন হইলাম।

স্টেশনে আমি রোজ খবরের কাগজ পড়িতে যাইতাম। মাস্টার লোকটিও ছিলেন অতি অমায়িক—তাঁহার কাছে আমি পূর্বে চাকরির কথা কখনো বলি নাই। আজ সে কথা শুনিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি

একটা দরখাস্ত করে দাও—ক'দিন ধরে দেখছি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে··· এক পুস্তক-ব্যবসায়ীর একটি শিক্ষিত কর্মচারী দরকার—বেতন আঠারো টাকা।

টাকার সংখ্যাটা শুনিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল। কিন্তু স্টেশনমাস্টার ইহাতে আদৌ দমিলেন না। তিনি বলিলেন, মাইনে অল্প তাতে কি হয়েছে, আমার মনে হয় যে এ সুযোগ তোমার কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়। প্রত্যেক কাজেই শিক্ষানবিশী করবার একটা সময় আছে—তারপর কাজ শিখলে ভবিষ্যতে উন্নতির কত সুযোগ মিলবে।

এই বলিয়া তিনি আমায় বুঝাইতে শুরু করিলেন সামান্য বেতন হইতে কত লোক পরে ধনী হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার পরামর্শ মতো একটা দরখাস্ত করিয়া দিলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক তৃতীয় দিনে তাহার জবাব আসিল—আমার চাকরী হইয়াছে।

পরদিনই ভোরের গাড়িতে আমি স্টেশনমাস্টারের নিকট হইতে কয়েক আনা পয়সা ধার করিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম।

বেলা দশটার সময় আমার অফিসে জয়েন করিবার কথা। আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ঠিকানার বাড়িটি বাহির করিলাম। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের এক সরু অন্ধকার গলির মধ্যে এই অফিসটি। গলিটি এমনই ঘোরালো যে পাছে কেহ বাড়িটি চিনিতে না পারে সেইজন্য ছোট ছোট টিনের উপরে একটি করিয়া হাত আঁকা এবং তাহার নীচে লেখা আলকাতরার কালো অক্ষরে—'জয়ডঙ্কা' অফিস এই গলির ভিতরে। অফিসটি সাবেক আমলের বাড়ি, যেমন পুরানো তেমনি নীচু; ইহার গায়ে একটি বড় সাইন বোর্ডে লেখা ছিল—'জয়ডঙ্কা' বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক—মূল্য এক পয়সা। বাড়িটাও একটু অদ্ভুত ধরণের। সামনে একটা প্রকাণ্ড ফটক; তাহার ভিতর ঢুকিয়াই সামনে সরু টানা বারান্দা—তাহাতে সাবেকী ঢঙের গোল গোল থাম, সবগুলির কিন্তু ইঁট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের দেওয়াল ও বারান্দার ছাদের অবস্থাও সেইরূপ! প্রত্যেক থামের মাথায় গোলাপায়রার বাসা। ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা বসিয়া বক্-বকম্ বক্-বকম্ করিতেছে। পায়রার শুষ্ক বিষ্ঠা চারিদিকে ছড়ানো—বারান্দায়, থামের মাথায়, দেওয়ালের গায়ে। বাহির হইতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে আসিতেই সেই পুরানো জীর্ণ বাড়িটাকে যেন আরো পুরাতন বলিয়া মনে হয়। সামনে যেটুকু উঠান তাহার আবার একপাশে একটা বড় শেওলাধরা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার গায়ে একটি ঢ্যাঙা জলের কল, তাহার মুখে নেকড়া জড়ানো, কলটি সব সময় খোলাই থাকে, তাহা হইতে অনবরত চৌবাচ্চায় জল পড়িতেছে। জলের উপর পায়রার পালখ, পায়রার শুষ্ক বিষ্ঠা, ছেঁড়া কাগজের টুকরা ভাসিতেছে। চৌবাচ্চার পাড়ে একটা বড় ভাঙা টিনের মগ ও একটুকরা কালিমাখা কাপড় কাচা সাবান রহিয়াছে।

প্রথমে ফটক দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ভূতের বাড়ি

নাকি ? তাহার পর একটু সাহস হইল, দেখিলাম ডান দিকের দুই তিনটি ঘরের দরজা খোলা, আর তাহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে ছাপাখানার সরঞ্জাম। কোণের একটা ঘর হইতে আবার মৃদু আর্তনাদের মতো এক প্রকার অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। পরে জানিলাম উহা ছাপার মেশিনের শব্দ! মেশিনটা পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া সময় সময় এইভাবে তাহার অক্ষমতা জানায়! ইহাই ঠিক পাশেই যে দুইখানি ঘর—তাহাতেই অফিস।

প্রথম ঘরটিতে ঢুকিয়া দেখিলাম, তিন-চারটি পুরাতন আলমারী ও তাহাতে নানা রঙের পুস্তক ঠাসা। একটি ছোট টেবিল, একখানা লোহার বাঁকা চেয়ার ও একটি নড়বড়ে পুরাতন বেঞ্চি। বুঝিলাম, ইহাই পুস্তকবিভাগ! আবার ইহার ভিতরের ঘরটিতে দেখিলাম, একটি সাবেকী আমলের বড় ভারী টেবিল, তাহার উপর নানা প্রকার কাগজপত্র, দোয়াত কলম ও লেখাপড়ার সরঞ্জাম—ইহাই সাপ্তাহিক কাগজ 'জয়ডঙ্কা'র অফিস। পুরু চশমা চোখে দিয়া একটি ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন।

ভিতরে ঢুকিয়া আমি সেই ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কা'কে চান ?

বলিলাম, উমেশবাবু আছেন ?

তিনি সন্দিগ্ধনেত্রে তখন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন।

আমি কিছু না বলিয়া, পকেট হইতে সেই মনোনয়ন-পত্রখানি বাহির করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ও—আসুন, আসুন—আমিই উমেশবাবু! আপনিই বুঝি দরখাস্ত করেছিলেন চাকরির জন্যে ?

আমি আর-একবার দুই হাত তুলিয়ে কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম,—আজ্ঞে হাঁ।

তিনি একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া আমায় বসিতে বলিলেন। তারপর চশমাটা একবার কাপড় দিয়া মুছিয়া চোখে লাগাইয়া বলিলেন, আপনি এত ছেলেমানুষ তা আমি ভাবিনি ? বলিয়া মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া আবার বলিলেন, তা এক রকম ভাল, আমি এই রকম ছেলেমানুষই পছন্দ করি—তারা খাটতে পারে—তাদের মনে ভবিষ্যতের উন্নতির আশা থাকে। আমি সত্যই আপনাকে দেখে ভারি খুশি হয়েছি। তবে কি জানেন, ছেলেমানুষদের মন ভারি চঞ্চল, সব সময় একটা কাজে লেগে থাকতে পারে না। পাঁচজনের মুখে পাঁচ রকম কথা শুনলেই তেতে ওঠে—নিজেদের বুদ্ধি তরল কিনা, তাই মতিস্থির করতে দেরি হয়!

আমি বলিলাম, কিন্তু সকলে এক রকম না-ও হতে পারে ত!

তিনি বলিলেন, না না, আমি আপনাকে লক্ষ্য করে বলছি না—আমি বুঝেছি আপনি সে প্রকৃতির নয়। সেইজন্যে আপনাকে দেখা পর্যন্ত কেবলই আমার মনে হচ্ছে যেন আপনার মতো একজনকেই আমি এতদিন খুঁজেছি! এই বলিয়া একটু

থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, তা আজকে থেকেই কাজে লেগে যান—কেন মিছিমিছি একটা দিন নষ্ট করবেন ?

আমি তখনি রাজী হইলাম। তিনি আমাকে কাজ বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাঁহার প্রকাশিত বইগুলি আমায় বিক্রী করিতে হইবে আর সেইখানে বসিয়া বসিয়া তাহার একটা হিসাব রাখিতে হইবে—ইহাই নাকি আমার মোটামুটি কাজ। কোন বইয়ে কত কমিশন, কাহাকে কী দিতে হইবে, আর কোন্ আলমারীতে কী বই আছে আমায় তখন তিনি তাহা আলমারী খুলিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

সবে দুই তিনটি বইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এমন সময় একটি বছর-ছয়েকের ছেলে আসিয়া বলিল, বাবা, তোমাকে মা ডাকছে।

আচ্ছা যাচ্ছি, যা। বলিয়া বিরক্তিপূর্ণ মুখে তিনি আবার আমাকে বই দেখাইতে লাগিলেন।

ছেলেটি চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার একটু পরে আসিয়া বলিল, শিগ্‌গির এসো বাবা,—মা কখন্ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

থাকুক দাঁড়িয়ে—দেখছিস না আমি একটা কাজ করছি ? এই বলিয়া ছেলেটিকে তিনি একটা ধমক দিলেন। ছেলেটি কিন্তু এবার নড়িল না, সঙ্কোচহীন কণ্ঠে বলিল, মা বললে, ও কাজ দু'মিনিট পরেও ত হতে পারে ? তুমি আগে চলো—

এইবার তিনি খিঁচাইয়া উঠিলেন। তার কাজ বুঝি আর দু'মিনিট পরে হলে চলে না—যত সব হয়েছে বিবেচনাহীন মেয়েছেলে—হুঃ—জ্বালিয়ে মারলে মশায়—একটা কাজ যদি সুস্থির হয়ে করবার জো আছে ! এই বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া নিম্নতর কণ্ঠে কহিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।

বলিতে বলিতে তিনি যেমন ভিতরে চলিয়া গেলেন অমনি একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, আপনি বুঝি আমাদের এখানে চাকরি করবেন ?

বলিলাম, হ্যাঁ।

সে বলিল, হ্যাঁ ত সবাই মুখে বলে কিন্তু কেউ ত থাকে না—দু'দিন কাজ করতে না করতেই পালিয়ে যায়।

তাই নাকি ! বলিয়া সস্নেহে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইয়া আসল কথাটি কী তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, খোকা, তুমি যা বললে তা কি সত্যি ?

সে বলিল, তা নয় ত কি—আমি কি আপনার সঙ্গে তামাসা করছি ?

বলিলাম, না না—তা কি আমি বলছি ?

সে বলিল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় ত আপনি বরং বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন,—এই এক মাসের মধ্যে কত লোক এলো আর কত লোক পালালো ! বোধ হয় দশ-এগারো জনের কম হবে না !

বলিলাম, দশ এগারো জন ! হাঁ খোকা, তারা চলে গেল কেন ভাই ?

তা আমি কি ক'রে জানবো ?—ওই বাবা আসছে, আমি পালাই। বলে হঠাৎ সে ছুটিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

উমেশবাবু আসিয়া আবার আমায় বই দেখাইতে লাগিলেন। তারপর হিসাবপত্র কিভাবে রাখিতে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। তিনি আমার কাজের সময় ঠিক করিয়া দিলেন সকাল আটটা হইতে বেলা বারোটা, আবার একটা হইতে ছয়টা ; ইহা ছাড়া দুপুরবেলা খাইবার জন্য একঘণ্টা ছুটি। তিনি যতক্ষণ এই সব বুঝাইয়া দিতেছিলেন ততক্ষণ আমার মনের মধ্যে কিন্তু সেই একটি কথা ঘুরিয়া মরিতেছিল। কোন কর্মচারী থাকে না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাটি যেন আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করিয়ে বিঁধিতে লাগিল। এক একবার মনে হইল, লোকটি কি খাটাইয়া শেষে পয়সা দেয় না ? কিন্তু আবার ভাবিলাম, না, তাহাই বা হইবে কেমন করিয়া ! এক মাস পুরা কাজ না করিলে ত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে একমাসের মধ্যে দশ-এগারো জন লোক ফিরিয়া যায় কেন ? তবে কি লোকটি কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ? কিন্তু উমেশবাবুকে ত দেখিয়া সে প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইল না। তবে ছেলেটি কেন এই কথা বলিল ? এইভাবে নানা রকমের চিন্তা করিয়া শেষে স্থির করিলাম যে, ভাবিয়া লাভ নাই, কয়েকদিন কাজ করিলেই ত আসল পরিচয় বাহির হইয়া যাইবে।

যাহা হউক সেইদিন হইতেই কাজে লাগিলাম। এবং হিসাবের খাতা বাহির করিয়া উমেশবাবু যেমনভাবে দেখাইয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে হিসাবপত্র রাখিতে লাগিলাম।

বেলা বারোটা বাজিবার কয়েক মিনিট আগেই উমেশবাবু আসিয়া বলিলেন, এইবার আপনি বাসায় যান—খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া আমি খাতাপত্র বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহার পর কি ? বাসা কোথায় যে বিশ্রাম করিব ? তাছাড়া পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম মাত্র চারটি পয়সা আছে। অথচ ক্ষুধার জ্বালায় আমার সর্বশরীর তখন ঝিমঝিম করিতেছিল। একবার মনে হইল উমেশবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলি। আবার মনে হইল, তাহা না বলিয়া শুধু কয়েক আনা পয়সা ধার চাহিয়া লই।

যখন এইভাবে ইতস্তত করিতেছিলাম তখন আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া উমেশবাবু একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, খাবার পয়সা নেই নাকি ?

তখন আর গোপন করিতে পারিলাম না। তাঁহার নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলাম। উমেশবাবু বলিলেন, তিনি নাকি আমার মুখ দেখিয়া আগেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঘরের ভিতর হইতেই তিনি তখন চীৎকার করিয়া

ডাকিলেন—রামেশ্বর ! রামেশ্বর !

রামেশ্বর হইল 'জয়ডঙ্কা' প্রেসের সর্বপুরাতন কম্পোজিটার, উনিশ বছর ওইখানে কাজ করিতেছে। ক্ষয়াঘষা ছোট্ট মানুষটি, দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন—চল্লিশও হইতে পারে, আবার চৌষট্টিও হইতে পারে। তাহার হাঁপানি ছিল ; কাশির বেগ সামলাইতে সামলাইতে সে উমেশবাবুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। খালি গা, হাপরের মতো বুকের পাঁজরার হাড়গুলির ভিতর নিঃশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার দুই হাতেই কালি, দড়িবাঁধা পুরু চশমা নাকের একেবারে ডগায়, একগাছি পৈতা কালো দড়ির মত গলার কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝুলিতেছিল।

উমেশবাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, আজ থেকে ইনি আমাদের অফিসে কাজ করবেন। কলকাতায় এঁর থাকা খাওয়ার কোন জায়গা নেই, এঁকে নিয়ে গিয়ে তোমার হোটেলে একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। টাকাপয়সা যা লাগে মাসের শেষে আমিই দেবো, ভয় নেই।

যে আজ্ঞে, বলিয়া রামেশ্বর তৎক্ষণাৎ আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া তাহার হোটেলে চলিল। শ্যামবাজারের খালের ধারে একটা টিনের দোতলা মাঠকোঠা, তাহার নীচে এই হোটেলটি। শুনিলাম দুই বেলা খাইতে আমার লাগিবে সাড়ে তিন আনা। আর সেইখানে উপরে যে ঘরে রামেশ্বরবাবু ও প্রেসের আর-একজন কম্পোজিটার থাকিত তাহারি একপাশে আমার থাকিবার একটু জায়গা করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, এই ঘরটির ভাড়া চার টাকা। আপনাকে মাসে এর জন্যে এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা দিতে হবে।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সম্মতি জানাইতে তিনি আবার বলিলেন, তাও আমি অনেক দিন এখানে আছি বলে। আপনি একলা এলে এক টাকা বারো আনার কম কিছুতেই নিতো না। বাড়িওলা লোকটা ভারি পাজি—দু'বছর ধরে চেষ্টা করছি মশায় ভাড়াটা কমিয়ে সাড়ে তিন টাকা করবার কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। আরে সবাই জানে তুই ত লাখোপতি—এই সাড়ে পাঁচগণ্ডা ক'রে পয়সা ছেড়ে দিলে তোর কি টাকা কমে যেতো ! হিন্দুস্থানী বাচ্ছা ওরা, আসলের চেয়ে সুদটা বোঝে ভাল।

যাহা হউক, এইভাবে তবু থাকা এবং খাওয়ার একটা স্থান মিলিল।

রাত্রে আবার একটা ছেঁড়া মাদুর ও তৈলাক্ত একটা পুরানো বালিশ রামেশ্বর-বাবু তাঁহার বিছানা হইতে বাহির করিয়া দিয়া আমায় বলিলেন, আমার জিনিস নিতে লজ্জা ক'রো না ভায়া ! রামেশ্বর চাটুজ্যের এই পেশা—এই হোটেলে কত লোক তোমার মতো খালি হাতে খালি পায়ে এসে ওঠে—তখন এই রামেশ্বরই তাদের গতি করে দেয়। তবে হাঁ, আগে বলে রাখা ভাল—এর জন্যে দৈনিক দু' পয়সা ভাড়া নিই।

এছাড়া আমার গামছা এবং আমার কাপড়ও তুমি ব্যবহার করতে পারো তার

জন্যে আর এক পয়সা অতিরিক্ত দিয়ো।

বলিয়া আরো বারকয়েক কাশিয়া তিনি বলিলেন, তুমি ত দেখছি কিছুই আনোনি—আর আনবেই বা কোথা থেকে, থাকলে ত? আমিও যখন কলকাতায় আসি চাকরি করতে ঠিক তোমার মত অবস্থায় এসেছিলুম। কাজেই তোমার মনের কথা আমি যেমন বুঝবো আর কেউ কি তা পারবে? কি বলো ভায়া? এই বলিয়া তোবড়ানো গালে হাসিতে গিয়া তিনি খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া ফেলিলেন এবং সেই কাশির বেগ সামলাইতে সামলাইতে তাঁহার চোখ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রামেশ্বরবাবুর কাপড়, গামছা, মাদুর ও বালিশের চেহারা দেখিয়া আমার গা বমিবমি করিতে লাগিল কিন্তু তবুও উহাতেই আমার এক মাস কাটাইতে হইল। কি করিব, আমার মত কপর্দকহীন দরিদ্রের ইহা ছাড়া আর উপায় কি! এক মাস না হইলে ত মাহিনার টাকা পাইবার উপায় নাই।

রাত্রি কোনরকম কাটিয়া গেল।

পরের দিন সকালে খাতা খুলিয়া কাজে বসিয়াছি এমন সময় উমেশবাবুর দুইটি ছেলে বই লইয়া আসিয়া বলিল, আলোকবাবু, আমাদের এই ইংরিজী পড়াটা একটু বলে দিন না! বড়টির বয়স বোধ হয় বারো কি তেরো, আর পরেরটির উহার চেয়ে এক-আধ বছরের কম। পড়া বলিয়া দিলাম। তাহারা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন আবার হিসাবপত্রে মনোযোগ দিলাম।

৩০

পরের দিন সকালে আবার তাহারা দুইজনে খাতা বই লইয়া ঠিক সেই সময়ে আসিল কিন্তু এবার শুধু ইংরেজী পড়িল না। তাহার সহিত বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক ও জ্যামিতি পড়িল। কাজেই সময়ও এইজন্য কিছু বেশী ব্যয় হইল তাহাদের পিছনে। এদিকে ছেলে দুইটি চলিয়া যাইবার একটু পরে যেমন আমি হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিয়াছি অমনি আর একটি ছেলে ও আর একটি মেয়ে তাহাদের বই খাতা লইয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আস্তে আস্তে বলিল, আলোকবাবু, আমাদের পড়াটাও একটু দেখিয়ে দিন না?

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর হইতে বড় ছেলে দুইটি ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, চল্ শিগগির ভেতরে, দিদি তোদের পড়া বলে দেবে।

তাহারা বলিল, না দিদির কাছে পড়বো না—আলোকবাবু আমাদের পড়া বলে দেবে। এই বলিয়া তাহারা যখন কিছুতেই ভিতরে যাইতে রাজী হইল না, তখন

বড় ছেলে দুইটি তাহাদের কান ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি শুরু করিল। ইহাতে ছোট মেয়েটি ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং ছেলেটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তাহারা উভয়েই তখন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখুন না আলোকবাবু, আমাদের মারছে!

বড় ছেলে দুইটি ধমক দিয়া বলিল, আলোকবাবুকে কি তোরা কাজ করতে দিবিনি? শিগগির চল ভেতরে।

ভারী ফুটফুটে মেয়েটি, বড় সুন্দর দেখিতে। আমি বলিলাম, থাক থাক ওকে মেরো না—আচ্ছা আমি ওদের পড়া বলে দিচ্ছি। দেখি তোমরা কি বই পড়ো। বলিয়া তাহাদের কাছে ডাকিতেই বড় ছেলে দুইটি ভিতরে চলিয়া গেল।

পরের দিন ঠিক ইহারই পুনরভিনয় হইল। অর্থাৎ তাহারা চারজনেই আবার পড়িতে আসিল। এবং আমি কাহাকেও না বলিতে পারিলাম না। তাহার পর হইতে রোজই সকালে তাহারা এইভাবে খাতা বই লইয়া আসিত আর আমিও তাহাদের পড়াইতাম। এমনি করিয়া আমার চাকরির সঙ্গে এই ছেলে পড়ানোর ব্যাপারটিও যুক্ত হইয়া গেল।

ছেলে পড়াইতে আমি যে বিরক্তিবোধ করিতাম তাহা নহে, তবে চারটি ছেলে-মেয়ের পিছনে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পরিশ্রম করিবার পর আবার পুরাদস্তর হিসাবনিকাশ করিতে হইত বলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। ইহার উপর আবার কয়েকদিন পরে উমেশবাবু বক্তৃতা দিবার ভঙ্গিতে বলিলেন যে, জীবনে যদি উন্নতি করিতে চাও তাহলে শুধু একটা কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না, সব রকমের কাজ শিক্ষা করতে হয়। এই বলিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার টেবিলের উপর যে পুরাতন 'টাইপরাইটার' টি পড়িয়া রহিয়াছে, আমি যদি উহা লইয়া প্রতিদিন টাইপ শিক্ষা করি তাহা হইলে অতি সহজেই তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিব।

তাঁহার কথামত আমি ওই কাজেও লাগিয়া গেলাম। এবং মাস দুই টাইপ ঠুকিয়া ঠুকিয়া একদিন বেশ চিঠিপত্র ছাপিতে শিখিলাম। এত শীঘ্র এই নূতন বিদ্যাটি আয়ত্ত করিয়া সত্যসত্যই আমি মনে মনে বেশ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার চেয়ে বেশী খুশী হইলেন উমেশবাবু। তিনি তখন তাঁহার অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র আমাকে টাইপ করিতে দিতেন। অর্থাৎ আমার আরও একটি কাজ বাড়িয়া গেল। আবার এতগুলি কাজ আমায় একলা সুশৃঙ্খল-ভাবে করিতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। এক একদিন এমনও হইত যে কার্যদক্ষতার প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি উচ্ছ্বাসের মাথায় বলিয়া ফেলিতেন—তোমার মধ্যে অত্যাশ্চর্য প্রতিভা লুকানো আছে, তুমি একদিন চাকরিতে খুব উন্নতিলাভ করবে এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি। তুমি হয়ত এটা ঠিক বুঝতে পারো না, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি একা যা করতে পারো দশজন কেরানীও তা পারে না। তোমার মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে তাতে ক'রে

তুমি যে কাজে হাত দেবে তা শিখে ফেলতে তোমার এতটুকুও দেরি হবে না।

পর পর কয়েকদিন আমাকে উহা শুনাইয়া শেষে তিনি আর একটি নূতন কাজের ভার আমার উপর চাপাইলেন। 'বাস' কোম্পানীর উপহৃত একখানি পাশ আমার হাতে দিয়া 'জয়ডঙ্কা' কাগজটির জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন। ইহা একেবারে নতুন কাজ, কেমন করিয়া কি করিতে হইবে এবং কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি তিনি আমায় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, কেবল ঘোরো, যত ঘুরবে তত তোমার লাভ। কলকাতার রাস্তাঘাটে ব্যবসা ছড়ানো রয়েছে। যত লোকজনের সঙ্গে মিশবে তত শিখবে।

তখন হইতে প্রতিদিন দুপুরের দিকে একঘণ্টা করিয়া বিজ্ঞাপনের চেষ্টায় বাহির হইতাম। প্রথম দিনকতক কিছুই করিতে পারিলাম না, জিনিসটি বুঝিতেই আমার সময় গেল। কিন্তু তাহার পর নানা অফিস ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনমাসের মধ্যে প্রচুর টাকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। ইহা দেখিয়া উমেশবাবুর আর আনন্দ ধরে না। তিনি আবার আমাকে তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি শুনাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য উমেশবাবুর মুখ হইতে এইরূপ উৎসাহবাণী শুনিয়া আমি যেমন যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম তেমনি ভয় হইত আবার হয়ত কি নতুন কার্যের ভার ঘাড়ে চাপাইয়া দিবেন!

আর হইলও তাই। ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি আর এক নতুন কাজে আমায় নিযুক্ত করিলেন। এইবার তিনি 'জয়ডঙ্কা' পাব্লিশিং হাউসের প্রকাশিত বই লইয়া স্কুলগুলিতে ক্যানভাস করিতে বলিলেন। কাগজের আয় বৃদ্ধি হইবার পর তিনি তাঁহার প্রকাশিত বইগুলি চালাইবার চেষ্টা করিলেন। আশ্চর্য এবারও সাফল্যলাভ করিতে আমার বেশী দেরি হইল না, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বহু পুস্তক আমি স্কুলে বিক্রি করিয়া দিলাম। এইবারে আমার উপর উমেশবাবু এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে তখন হইতে প্রত্যহ আমার জলখাবারের ব্যবস্থা হইল তাঁহার বাড়ীতে।

ইহার পূর্বে কোনদিন তাঁহার বাড়ীর ভিতরে আমি প্রবেশ করি নাই। প্রথম দিনের কথা এখনো আমার মনে আছে। আমি সব চেয়ে বেশী টাকার বই যেদিন স্কুলে বেচিয়া আসিয়া উমেশবাবুকে হিসাব বুঝাইয়া দিলাম, তিনি টাকাটা ক্যাশ-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া একবার বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তারপর আবার তখনি ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, যাও তোমাকে একবার ভেতরে ডাকছে।

কে ডাকছে, কেন ডাকছে তাহা না বলিয়া তিনি নিজে ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে দিলেন আমাকে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য। উমেশবাবুর স্ত্রী দরজার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া অতি পরিচিতের মত একেবারে সম্ভাষণ করিলেন, তুমি ত ছেলেমানুষ, আমায় দেখে লজ্জা করো না বাবা, যখন খুশি তুমি ভেতরে আসবে যাবে, তুমি ত আমাদের পর নও? এই বলিয়া তিনি তাঁহার বড় মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, ওরে, লিলি, তোর আলোকদাকে খাবার দিয়ে যা।

পনেরো-ষোল বছরের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে আসিয়া জলখাবারের থালাটা আমার সম্মুখে রাখিয়া গেল। উমেশবাবুর স্ত্রী আসন পাতিয়া এক গেলাস জল দিয়া আগেই আমাকে বসাইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে আমার সঙ্গে সে পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ যেন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রোজই বৈকালে জলখাইবার জন্য আমি ভিতরে যাইতাম। প্রথম প্রথম উমেশবাবুর স্ত্রী খাবার সময় আমার কাছে বসিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, অবশ্য ইহার অধিকাংশই আমার নিজের সম্বন্ধে। কেননা দেশের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই আমি বলিতাম, আমার দেশ নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। কথাটা মিথ্যা হইলেও সত্যই আমি মনে মনে তাহাদের ওইরূপ কল্পনা করিতাম। তাহারা আমাকে ঠকাইয়াছে আর তাহাদের জন্যই আমার জীবনের পথে এত সংগ্রাম।

যাহা হউক এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর এক সময় দেখিলাম, উমেশবাবুর স্ত্রীর পরিবর্তে তাঁহার কন্যা লিলির হাতেই আমার জলখাবারের সম্পূর্ণ ভার চলিয়া গিয়াছে। লিলিকে আমার কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। সে শুধু নিঃশব্দে তাহার কর্তব্যপালন করিয়া যাইত কিন্তু মুখে বেশী কথা বলিত না, কোন চাপল্য প্রকাশ করিত না। ঠিক গাম্ভীর্য নয় অথচ এমন একটা সুগভীর সুষমার অন্তরালে সর্বদা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিত যে তাহার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইত সে যেন কোন সুদূর জগতের লোক—তাহার কাছে যাওয়া যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় কিন্তু বোঝা যায় না। বেশী কথা সে বলিত না কিন্তু যাহা মুখ দিয়া বাহির করিত তাহা যেন অমান্য করা দুঃসাধ্য। বেশ মনে পড়ে, তিন-চার দিন চা খাই না বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার পর সে একদিন হঠাৎ বলিল, এ ত বিষ নয়, খেতে দোষ কি—আমরা ত সকলেই রোজ খাই?

বলিলাম, না দোষ নেই, তবে কখনো খাইনি বলে আর ইচ্ছে করে না।

ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বাঁকাইয়া সে বলিল, কোনদিন যা করেন নি জীবনে কি তা করবেন না।

না ঠিক তা নয়, তবে তুমি যদি বলো খেতে পারি।

লিলির মুখচোখের রেখাগুলি মুহূর্তে কঠিন হইয়া উঠিল। সে স্পষ্ট অথচ মৃদু স্বরে বলিল, আমি বলতে যাবো কেন, আমার দায় পড়েছে—আপনার ইচ্ছে হয় আপনি খাবেন।

বলিলাম, আমি যে চা খাই না তাও তুমি জানো, তবে আবার এখন কথাটা তুমি নতুন ক'রে তুললে কেন?

সে তেমনি সহজ ও দ্বিধাবিহীন কণ্ঠে উত্তর করিল, জানতুম তবে কেন খান না তার কারণটা শোনবার জন্যে।

প্রশ্ন করিলাম, কারণটা তাহলে কি বুঝলে?

সে বলিল, বুঝলুম ওটা শুধু ভাল ছেলে সেজে থাকার একটা ফন্দী—যা

আরো পাঁচজনে করে তাকে অস্বীকার ক'রে বাহবা নেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এর ভেতরে।

কথাটা শুনিয়া রাগ হইল। বলিলাম, হ্যাঁ এইখানে সকলের সঙ্গে আমার তফাৎ, আমার বৈশিষ্ট্য।

লিলি মুখ টিপিয়া এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যে মনে হইল যেন সে আমার ভণ্ডামি ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমার সম্বন্ধে তাহার এইরূপ মনোভাব আমার সব ভাল লাগিত না। আমার সঙ্গে সে বেশী কথা বলিত না কিন্তু যাহা বলিত তাহা এমনভাবে বিঁধাইয়া বলিত যে, মনে হয় যেন তাহার সঙ্গে গোপনে কোথায় আমার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আমি ত অনেক ভাবিয়াও ইহার কোন হেতু নির্ণয় করিতে পারিতাম না। এক-একদিন সে যেন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত এক-একটা বাণী ছাড়িত আমার উপর। কেন যে সে বলিত এবং কোথায় যে উহার উৎপত্তি কিছুই আমি বুঝিতে পারিতাম না। সমস্তটাই যেন একটা হেঁয়ালী বলিয়া আমার কাছে মনে হইত। সব কথা আমার এখন স্মরণ নাই। তবে দুই-একটি কথা এখনো ভুলিতে পারি নাই।

একদিন জলখাবার খাইতে দিয়া সে বলিল, শুধু পান খাই না, চা খাই না, সিগ্রেট খাই না বললেই ভাল ছেলে সাজা যায় না। মনটা ভালো করতে হয় আগে।

কথাটা আমার কানে তীরের মত আসিয়া বিঁধিল। তাড়াতাড়ি মুখ হইতে খাবারটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার দিকে তাকাইতেই দেখিলাম, তাহার চোখে মুখে একটা তীব্র বিদ্রূপ! রাগ হইল তাহার এই প্রগল্‌ভতা দেখিয়া। আমার চেয়ে বয়সে সে দুই তিন বছরের ছোটই হইবে, তাই ছোটর মুখে এইরূপ বড় বড় কথা শুনিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, আমি ত কারুর কাছে ভাল ছেলে সাজতে যাইনি—তোমার এ কথার অর্থ কি?

সে বলিল, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, লিলি, তোমার এই ঘুরিয়ে বলা কথা আমি বুঝতে পারি না। তুমি কি বলতে চাও আমায় স্পষ্ট করে বলো!

সে আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে শুধু আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। তার এই উদাসীন দৃষ্টি যেন আমার ক্রোধকে আরো বাড়াইয়া দিল। বলিলাম, মনটা ভালো কি মন্দ সে পরীক্ষা কি তোমার কাছে দিতে হবে?

আমার গরজ পড়েছে—

তাই যদি, তবে তুমি ওকথা বলো কেন?

বলি তাদের জন্যে যাদের কাছে আপনি একটা আশ্চর্য রকমের ভালো ছেলে সেজে আছেন।

বলিলাম, দেখো লিলি, এই সেজে থাকা কথাটা তুমি বার বার উল্লেখ করো কেন বল ত? আমি ত কারুর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করি না যে ফাঁকি দিয়ে,

সেজে থেকে তাকে ভুলিয়ে নেবো।

সে আমার মুখের দিকে এইবার গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, কারুর কাছ থেকে কিছুই কি প্রত্যাশা করেন না?

বলিলাম, না।

ইহা শুনিয়া সে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইল। তারপর মুহূর্ত-কয়েক ইতস্তত করিয়া বলিল, কিন্তু আপনি না করলেও অন্য কেউ ত আপনার কাছে প্রত্যাশা করতে পারে।

অন্যে কি পারে বা না-পারে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আর যার থাক অন্তত আমার নেই।

বেশ। কথাটা জানা রইল, আর বলবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কিন্তু একটু পরেই আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা আলোকবাবু, আপনি বুঝি কোন মেয়েকে ভালবাসেন?

কথাটি এরূপ অপ্রত্যাশিত যে প্রথমটা আমি যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। তারপর আশেপাশে ও পিছন দিকে ভাল করিয়া একবার তাকাইয়া লইয়া বলিলাম, সে কথা শুনে তোমার লাভ?

লাভ কিছু নেই তবে আমার অনুমানটা সত্যি কিনা একবার মিলিয়ে দেখতুম!

মনে করিলাম তাহাকে নিষেধ করিয়া দিই যে এইরূপ প্রশ্ন যেন সে পুনরায় কোনদিন আমার সম্মুখে উত্থাপন না করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে একটু কৌতুহল হইল, তাহার মনের আসল উদ্দেশ্যটা কি তাহা জানিবার জন্য, তাই বলিলাম, সেকথা আমি তোমায় বলতে পারবো না!

সে রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া আমার চোখের দিকে চাহিল, তারপর ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ভয় নেই, আমি কাউকে বলবো না—সবাই জানে যে আপনি ভাল ছেলে, 'ভাজা মাছটি উলটিয়ে খেতে জানেন না'।

বলিলাম, আবার হেঁয়ালী, তুমি কি কোনদিন স্পষ্ট করে কথা বলতে পারবে না?

স্পষ্ট ক'রে বলার এতে আর আছে কি? আপনি যে একজনের প্রেমে অন্ধ হয়ে আছেন তা যার এতটুক চোখ আছে, সে-ই বুঝতে পারে! এই বলিয়া সে আবার রহস্যময় হাসি হাসিল।

ইহার উত্তরে আমি তাহাকে কি বলিব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় সে আবার বলিল, কি, চুপ ক'রে রইলেন যে—তাহ'লে আমার কথাটা মেনে নিচ্ছেন ত?

আমি বলিলাম, ওসব মানামানির মধ্যে আমি নেই, আর অন্ধটন্ধও বুঝি না। তবে এইটুকু জানি যে মানুষ একজনকেই জীবনে ভালবাসতে পারে।

ইহা শুনিয়া লিলি মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর আবার মুখে ছোট একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, সেই একজন কে আলোকবাবু?

'কে' কথাটা শুনিবামাত্র সহসা যেন বুকের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস কেবল নিজের অন্তরের মধ্যেই অতিকষ্টে চাপিয়া লইলাম, কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

লিলি আমার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা জানি না, তবে সে আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এবং কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন হইতে একাদিক্রমে প্রায় আট-দশ দিন লিলিকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার ছোট বোন এই সময় আমার জলখাবার দিত। সে কেন আসে না বা তাহার কি হইল, সে কথা অনাবশ্যকবোধে আমি কাহাকে জিজ্ঞাসাও করি নাই। তবে আবার যেদিন সে হঠাৎ খাবারের থালা আমার সামনে আনিয়া দিল তখন আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, লিলি, তোমাকে এত দিন দেখিনি কেন?

সে শুধু নীরব ভঙ্গিতে আমার দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল, তা জেনে আপনার দরকার কি?

বলিলাম, না, দরকার কিছু নেই তবে অনেকদিন—

থাক, দরকার যখন নেই তখন আর অনাবশ্যক ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এই বলিয়া সে যেন তাহার নীরব ধমকে আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। আমিও আর কোন কথা না বলিয়া শুধু খাইয়া চলিয়া আসিলাম।

ইতিমধ্যে প্রায় ছয় বছর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে উমেশবাবুর স্ত্রী একদিন আমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা ও শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলিয়া বলিলেন, এইবার একটা বিয়ে-থা করো বাবা!

বিয়ে! কথাটা শুনিয়াই যেন মনে হইল তিনি আমার সঙ্গে রসিকতা করিতেছেন। আঠারো টাকা মাহিনার কেরানী তাহার আবার বিয়ে! মনে মনে রীতিমত চটিয়া উঠিলাম তবু মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, আমার অবস্থার কথা আপনি ত সবই জানেন, তবে আর ওকথা বলে লজ্জা দেন কেন?

লজ্জা! ওমা, পুরুষমানুষের আবার লজ্জা কিসের! জানো আমাদের বাবুর যখন বিয়ে হয় তখন ও'র অবস্থা কি ছিল।

বিনীত কণ্ঠে বলিলাম, দেখুন, ও'র সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না।

কেন করবো না! তুমি ত তবু চাকরি করছো, আর ও'র অবস্থা কি ছিল জানো? সবে তখন কলেজে পড়ছেন। বাপ ছেলেবেলায় মরে গিয়েছিলেন, তাই মা তাঁর গয়না বেচে ছেলেকে মানুষ করছিলেন। স্ত্রীভাগ্যে পুরুষের ধন! এটা ও'র মাও যেমন মানতেন উনিও তেমনি মানতেন, তাই এক কথায় বিয়ে হয়ে যায়। তাই ত বলি, এত কষ্ট করলে শরীর টিকবে কেন বাবা, একটা বিয়ে করে ফেল—একটা ভদ্র গেরস্থ ঘরের মেয়ে আনো, দেখবে কত সুখী হবে!

তাঁহার এই কথা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল। বলিলাম,—ভদ্রগেরস্থ ঘরের মেয়ে আমায় দেবে কেন? তার চেয়ে মেয়ের হাত-পায়ে দড়ি বেঁধে তারা জলে ভাসিয়ে দেবে।

তিনি বলিলেন, ইস্, কেন? এমন সোনার চাঁদ জামাই কটা লোকের ভাগ্যে জোটে শুনি? তোমাকে কি দেখতে খারাপ? না চাকরিবাকরি করো না, না লেখাপড়া জানো না? বলি কোনটার অভাব?

বলিলাম, অভাবের কথা যদি বলেন ত আপনি যে কটা গুণের নাম করছেন সব কটারই অভাব! প্রথমেই ধরুন লেখাপড়ার কথা, একটা পাশ আবার পাশ নাকি? তারপর চাকরিতে আসুন—আমি যা মাইনে পাই তা ত আপনি সবই জানেন। আর চেহারার কথা যদি বলেন ত এমন রূপবান নই যে কন্দর্পকান্তি বলা চলে, মানে রঙটা কটা এই যা—অর্থাৎ আপনার ভাষায় বলতে গেলে সবই আছে কিন্তু কিছুই নেই। আজকের দিনে পৃথিবীতে এইরকম লোকের স্থান নেই। মাঝামাঝিতে কিছু হয় না, সব কিছুরই চূড়ান্ত চাই!

এই বলিয়া আমি থামিতেই তিনি বলিলেন, আচ্ছা সে ভার আমার ওপর রইল।

আমি আপত্তি করিলাম কিন্তু সেকথা তিনি কানে না তুলিয়া আপন মনেই বলিলেন, সে তখন দেখা যাবে।

কথাটা সেদিন যখন এমনিভাবে হঠাৎ উঠিয়া আবার হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল, তখন ভাবি নাই যে সত্যসত্যই আমার বিবাহের জন্য তাঁহার ঘুম হইতেছিল না। তাই আরো কয়েক মাস পরে তিনি যখন আবার আমার কাছে বিবাহের কথা পাড়িয়া বলিলেন যে তিনি একরকম পাত্রী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমার রীতিমত রাগ হইল কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া শুধু বলিলাম, বিবাহ আমি করিব না।

তিনি বিস্মিত নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সে আবার কি কথা?

বলিলাম, যতদিন না অবস্থা ভাল হয়, ততদিন বিয়ে করবো না।

তিনি আবার এক যুক্তিবিহীন মেয়েলী ধরণের প্রশ্ন করিলেন,—তাহ'লে যাদের অবস্থা ভাল নয় তারা কি বিয়ে করে না?

তারা হয়ত করে কিন্তু আমি করতে পারবো না। এই বলিয়া সে প্রসঙ্গ যেন শেষ করিয়া দিলাম।

এদিকে আমার কর্মদক্ষতা দেখিয়া আমার সম্বন্ধে উমেশবাবু দিন দিন এরূপ উচ্চাশা পোষণ করিতে লাগিলেন যে আমার উপরে তিনি তাঁহার অফিসের যাবতীয় কার্যের ভার অর্পণ করিয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে খুশী করিবার জন্য তিনি যে কাজ যখন বলিতেন তাহাই করিয়া দিতাম। পরিশ্রম করিতে আমি ভয় পাইতাম না কখনো। 'জয়ডঙ্কা' কাগজে যত লেখা বাহির হইত তাহার প্রুফ দেখিয়া আবার আমায় বানান ভুল সংশোধন করিয়া দিতে হইত। ইহা ছাড়া বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, লেখকদের বাড়ী গিয়া লেখা আনা ইহা তো ছিলই। ইহার উপর আবার কপি কম পড়িলে তাহাও উমেশবাবু আমায় এক একদিন লিখিয়া দিতে

হুকুম করিতেন। প্রথম যেদিন তিনি ইহা বলেন সেকথা আমার আজো মনে পড়িলে হাসি পায়।

সকালবেলা আমি ছেলেদের পড়াইতেছিলাম। এমন সময় তিনি হঠাৎ আমায় ডাকিয়া বলিলেন, একটা কিছু ছোটখাটো লিখে দাও ত, কপি কম পড়ে গেছে—প্রেস বসে রয়েছে ফর্মাটা আঁটতে পারছে না।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে তিনি বলিলেন, ভয় কি ?

বলিলাম, আজ্ঞে, আমি ছাপার জন্যে ইতিপূর্বে কখনো লিখিনি ?

আরে লেখোনি ত হয়েছে কি ? সবাই কি মায়ের পেট থেকে পড়ে লিখতে শেখে ? এইভাবেই একদিন শিখতে হয়। জানো এই যে হলধর দত্ত—যার বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে একটা হৈচৈ পড়ে যায়, তোমারই মত এইখানে চাকরি করতে করতে এই "জয়ডঙ্কা" কাগজে লিখতে শেখে।

বলিয়া একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, তোমার মধ্যে তার চেয়েও বড় প্রতিভা আছে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। আমার এক পয়সার কাগজ-এর জন্যে কি রবি ঠাকুর না শরৎ চাটুয্যের মত লেখা আমি তোমায় লিখতে বলছি, তাহ'লে দুদিনেই কাগজ উঠে যেতো। আঠারো বছর ধরে আর আমার কাগজ চালিয়ে খেতে হতো না।

আমাকে তখনো ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আরে একটা আধুনিক প্রেমের গল্প লিখে দাও—এতে ভাবনার কি আছে ?

বলিলাম, আধুনিক প্রেমের গল্প, সেটা কি রকম ?

তিনি বলিলেন, ধরো পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কলেজের হোস্টেলের ছেলের প্রেম হলো। মেয়েটা বামুন আর ছেলেটা জাতে চাঁড়াল। তারপর মেয়ের বাপ গোপনে সে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ের ঠিক করে ফেললে অন্য জায়গায়। এদিকে বিয়ের দিন বর এসে যখন ছাঁদনাতলায় দাঁড়ালো তখন কনেকে আনতে গিয়ে দেখা গেল কনে ঘরে নেই। কোথায় ? খোঁজ খোঁজ রব চারিদিকে ! পুলিশ এসে পাশের বাড়ীটা ঘেরাও করলে। দেখা গেল সেই চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে সেই মেয়ের বিয়ে চলছে। মেয়ের বাপ ছেলেটিকে দেখে মারতে উদ্যত হলে মেয়েটি নাটকীয়ভাবে বাপের সামনে এগিয়ে এসে বললে, খবরদার, ওর গায়ে কেউ হাত দিয়ো না—'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। ব্যস, বাপ চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল আর হোস্টেলের ছেলেরা তার পেছনে হাততালি দিতে লাগল। ব্যস্ এই ত হয়ে গেল গল্প। এইটে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে দাও না। আর না হয় শেষটা একটু অন্যরকম করতে পারো। পুলিশ এসে দেখলে মেয়েটি ছাদের দরজা বন্ধ করে চিলকুটরীর মধ্যে সেই ছেলের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে মরে পড়ে আছে। মাথার কাছে এক লম্বা প্রেমের ফর্দ।

বলিয়া তিনি আমায় খুব উৎসাহ দিয়া বলিলেন, লেখো দিকি এই রকম একটা। দেখবে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে কি রকম হাততালি পাবে।

সেদিন ওই রকম একটা গল্পই লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার জন্য হাততালি সম্মুখে কি পশ্চাতে পাইয়াছিলাম জানি না। যাহা হউক এইভাবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমি 'জয়ডঙ্কার' বিজ্ঞাপন ক্যানভাসার হইতে লেখকের পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইহা ছাড়া প্রতিদিন উমেশবাবুর চারটি ছেলেমেয়েকে পড়ানো, 'জয়ডঙ্কা' পাবলিশিং হাউসের হিসাব লেখা, চিঠিপত্র টাইপ করা এবং স্কুলে স্কুলে ঘুরিয়া বই বিক্রী করা প্রভৃতি কাজ করিতে হইত। আবার অন্দরমহল হইতেও ফরমাস আসিত এবং তাহাতেও আমি 'না' বলিতে পারিতাম না। অর্থাৎ উমেশ-বাবুর স্ত্রীর ষষ্ঠী পুজো, ওলাবিবির পুজো, শীতলা পুজো, মনসা পুজো প্রভৃতি আমাকেই ঠাকুরবাড়ী পেঁছাইয়া দিতে হইত। হ্যাঁ একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। উমেশবাবু আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন বটে তবে পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই সমস্ত কাজ একলা করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু একটি পয়সাও মাহিনা বাড়ান নাই। সেই আঠারো টাকাই আমার বরাবর বাহাল ছিল। উমেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হওয়ার দরুণ কিনা বলিতে পারি না আমিও কখনো মুখে মাহিনা বাড়াইয়া দিবার কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই। উমেশবাবু যে একটু কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন তাহা আমি জানিতাম।

মাহিনা বেশী না পাইলেও আমি কিন্তু রামেশ্বরবাবুর হোটেলে প্রথম মাসটার বেশী আর একদিনও থাকিতে পারি নাই, তারপর একটি ভাল মেস খুঁজিয়া লইয়া-ছিলাম। এবং বছর খানেক সেই মেসে থাকিবার পর উমেশবাবু নিজে উপযাচক হইয়া আমায় বাগবাজারে তাঁহার এক খুড়তুতো শ্যালকের বাড়ীর নিচের একখানি পৃথক ঘর নামমাত্র ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার এই শ্যালকের নাম শশধর চক্রবর্তী, অতি ভদ্রলোক। তাঁহার আশ্রয়ে অতি নিরাপদে আমার দিন কাটিত। আমি 'ইকমিক কুকারে' নিজে রাঁধিয়া খাইতাম। ইহা অবশ্য উমেশবাবুরই উপদেশক্রমে। তিনি বলিয়াছিলেন, হোটেল মেসে খেলে কখনো স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। শরীর আগে তবে অন্য সব। কথাটা যে খুবই খাঁটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না, তাই কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমি তাঁহার নির্দেশ মানিয়া লইয়াছিলাম। অবশ্য একটি পৃথক ঘরের আমারও খুব বেশী প্রয়োজন ছিল। আমি রাত্রে এক অবৈতনিক স্কুলে মাস্টারী করিতাম বিনা পয়সায়। এবং ইহা যে নিছক পরোপকারের জন্য করিতাম তাহা নহে। মাস্টারী না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাইভেট' ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেওয়া যায় না বলিয়া আমি ইহা স্বেচ্ছায় খুঁজিয়া লইয়াছিলাম এবং দুই বৎসর পরে আই-এ পরীক্ষাটা পাশ করিয়া আবার বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তিন বৎসর ধরিয়া নিজে পড়িয়া এবার বি-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতিও পাইয়াছিলাম—শুধু টাকা জমা দেওয়া বাকী ছিল। এত কাজের মধ্যে কিন্তু আমি নিজের

ভবিষ্যতের কথা ভুলি নাই। লেখাপড়া যেমন করিয়া হউক শিখিবই ইহা ছিল আমার কঠিন প্রতিজ্ঞা। আই-এ পরীক্ষা দিবার সময় উমেশবাবুই প্রথমে টাকাটা ধার দিয়াছিলেন, তারপর মাসে মাসে আমার মাহিনা হইতে কিছু করিয়া কাটিয়া লইতেন। বি.এ. পরীক্ষার জমা দিবার টাকাটাও তিনি ওই ভাবে আমায় দিবেন স্থির ছিল কিন্তু অকস্মাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনায় পড়িয়া সব ওলটপালট হইয়া গেল। কি করিয়া তাহা বলিতেছি।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকও উমেশবাবুর কিছু কিছু ছিল তাহা ভালই চলিত। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে উহা লইয়া আমাকে বাংলাদেশের স্কুলে স্কুলে হেডমাস্টার মশাইদের কাছে ক্যানভাস করিতে যাইতে হইত এবং যাহাতে বিশেষ করিয়া উমেশ বাবুর বইগুলি স্কুলেপাঠ্য বলিয়া নির্বাচিত হয় তাহার জন্য অনুরোধ জানাইতে হইত। ঘোর পল্লী যেখানে গাড়ী ঘোড়ার অসুবিধা সেখানে বিশেষ যাইতাম না। মোটামুটি সহজগম্য স্থানগুলিতে ঘুরিতাম। কিন্তু সে বছর উমেশবাবু আদেশ করিলেন একেবারে দুর্গম স্থানগুলিতে যাইতে। যে সব স্কুলে সহজে লোক যাইতে পারে না সেখানে যাইলে কাজ যে নিশ্চয় ভাল হইবে তাহা তিনি যুক্তি-দ্বারা আমায় বুঝাইয়া দিলেন! সেই মত আমিও সুদূর পল্লীর স্কুলগুলিতে যাইতে শুরু করিলাম।

৩১

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন আমি হুগলী জেলার এক সুদূর পল্লীতে গিয়া হাজির হইলাম।

দুর্গম স্থান।

ইতিপূর্বে কোনদিন সেখানে যাই নাই। তারকেশ্বর হইতে ছোট লাইনের গাড়িতে যাইতে হয়। স্টেশন হইতে সাত মাইল হাঁটা পথ। কোন যানবাহন নাই, এমন কি গো-গাড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। পাল্কীই একমাত্র ভরসা, তাও আগে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়।

মাঠের পথ ভাঙিয়া পুকুরের পাড় দিয়া, লোকের বাড়ির আনাচ-কানাচ ঘুরিয়া মাটির পথ চলিয়া গিয়াছে আঁকিয়া বাঁকিয়া। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোন রকমে স্কুলটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তারপর কাজ সারিয়া আবার যে পথে গিয়াছিলাম সেই পথ ধরিলাম।

অপরাহ্ণ শেষ হয় হয়, মেয়েরা পুকুরঘাট হইতে গা ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিতেছে। আমি ক্লান্ত দেহটাকে টানিতে টানিতে যথাসম্ভব জোরে চলিতে-ছিলাম। রাত্রি আটটায় শেষ ট্রেন। সে গাড়ি ধরিতে না পারিলে সারারাত অনাহারে স্টেশনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। সকাল ছ'টায় কলিকাতা হইতে বাহির

হইয়াছি ; আবার রাত্রি এগারোটায় ফিরিয়া যাইব। মাত্র দুখানি ট্রেন সমস্ত দিন যাতায়াত করে।

ট্রেনের যাত্রী কম। গ্রামে লোকজন যাহা আছে তাহার অধিকাংশই কৃষি-জীবী। অথচ এককালে গ্রামটা যে খুব বর্ধিষ্ণু ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনো রহিয়াছে ইঁট বার করা বড় বড় বাড়ি ও দীঘির ভগ্নপ্রায় শানের ঘাটে।

চলিয়াছিলাম আপন মনে, এই সব গ্রামের কথা চিন্তা করিতে করিতে। এক-দিন ইহাদের কী ঐশ্বর্য ছিল আর কী হইয়াছে! একটা পল্লী পার হইয়া সবে আমবাগানের পর ধরিয়াছি—এমন সময় একটি ছোট ছেলে পিছন দিক হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, আপনাকে কাকিমা ডাকছে!

কাকিমা! আমায় ডাক্‌ছে! বিস্মিত হইয়া ছেলেটিকে প্রশ্ন করিলাম।

ছেলেটি কোনরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া স্পষ্টভাষায় বলিল, হ্যাঁ, আপনাকেই ত ডাকছে।

কে এই কাকিমা—মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেহ যে এইরূপ স্থানে কোথাও থাকিতে পারে তাহা কিছুতেই আমি ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ আমাকে কে ডাকিতেছে এই অপরিচিত স্থানে তাহা জানিবার জন্যও কৌতূহল বড় কম হইল না। তাই আর একবার স্মৃতির খাতার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত উল্টাইতে উল্টাইতে ছেলেটির সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

একটা বিরাট পাঁচিলঘেরা ভাঙা বাড়ির মধ্যে ছেলেটি আমাকে সঙ্গে লইয়া ঢুকিল। সে সঙ্গে না থাকিলে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে ইহার মধ্যে কোন মানুষ থাকে।

একটা মহল ছাড়িয়া আর একটা মহল, আবার সে মহল ফেলিয়া আর একটা মহলের উদ্দেশ্যে চলিলাম। প্রথম দু'টি মহল একেবারে ভগ্নস্তূপ, তৃতীয় বা অন্দরমহলটির অবস্থাও ভাল নহে, তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মতো কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই ভিতর ঢুকিয়া অন্দরমহলের দরজায় পা দিতেই সচকিত হইয়া উঠিলাম সামনে একটি নারীমূর্তি দেখিয়া।

চম্‌কে উঠ্‌লে যে? আমি ভূত নই আলোকদা—চিন্‌তে পারছো না?

শান্তি! আমার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে প্রথম এই কথাটি বাহির হইয়া পড়িল। তারপর বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বোধ হয় আট নয় বছর পরে তাহাকে দেখিলাম। যাহাকে ভালবাসি অথচ আর কখনো দেখিতে পাইবার আশা ছিল না তাহাকে এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে চোখের সামনে দেখিতে পাইলে যে কী আনন্দ হয় তাহা মুখে কী বলিব। সেই পুরানো দিনের সব স্মৃতি যেন একসঙ্গে আমার মাথায় তখন ভিড় করিয়া আসিল। বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই শান্তি সেই! যাহাকে কিশোরী

দেখিয়াছিলাম সে আজ পূর্ণ যুবতী ! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে তাহার চেহারা ! মাথায় ঢেঙা হইয়াছে, রঙ আরো ফরসা হইয়াছে—তবে শীতের নদীর মতো ঈষৎ শীর্ণা, সে পূর্ণতা বুঝি নাই।

সে বলিল, তবু ভাল এখনো মনে আছে, আমি ভেবেছিলুম বুঝি ভুলেই গেছ !

তাহার চোখে মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শান্তিকে আমার মনে আছে কি না তাহার জবাব কোন্ ভাষায় বলিলে সে ঠিক বুঝিতে পারিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শুধু বলিলাম, শান্তি, তোমার ত বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছিল ?

কেন, এখন কি আমায় বড়লোকের স্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে না আলোকদা ? এই বলিয়া শান্তি হাসিয়া উঠিল অদ্ভুত কণ্ঠে। কথাটা শুনিয়া আমিও যেন কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। যদিও তাহার দেহে কোন মূল্যবান অলঙ্কার ছিল না এবং বেশভূষাও ছিল অতি সাধারণ, তবুও তাহার সর্বাঙ্গে এমন একটা আভিজাত্য জড়ানো ছিল যে তাহার মুখ হইতে ওই কথা শুনিয়া আমার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল ! তাই তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলাম, না—আমি বলছিলুম কি, তোমাকে যেন এ জায়গায় ঠিক মানাচ্ছে না !

অর্থাৎ তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে ভাল মানাতো, এই ত ? এই বলিয়া আমাকে ঈষৎ খোঁচা মারিয়া সে ছোট মেয়ের মতো হাসিয়া উঠিল !

আমিও শান্তির সেই আঘাতকে জয় করিবার জন্য তাহার হাসিতে যোগ দিলাম। হাসি থামিতেই শান্তি সম্রাজ্ঞীর মতো তাহার কণ্ঠে এক প্রকার অদ্ভুত গাম্ভীর্য আনিয়া বলিল, জানো আমি কে ? এখানকার জমিদার-গৃহিণী—রাণীমা। আর এই বিরাট প্রাসাদের একমাত্র অধিকারিণী।

এই কথা শুনিয়া আমি আবার রীতিমত নার্ভাস হইয়া পড়িলাম। শান্তিকে কী বলি তাই ভাবিতেছি এমন সময় সে আস্তে আস্তে আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, আলোকদা, মনে আছে তুমি আমার বিয়ের দিন একটা ফুলের মালা পাঠিয়ে দিয়েছিলে খেঁদীর হাতে দিয়ে ?

আছে। কিন্তু থাক্ শান্তি, ওকথা তুলে আর আমার মনে কষ্ট দিও না।

কষ্ট ! আলোকদা, সত্যি কি তুমি আজও কষ্ট পাও ? বলিয়া শান্তি তাহার আয়ত দুইটি চক্ষু এমনভাবে আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল যে আমি তাহাকে কী বলিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহার হাতখানি ধরিয়া শুধু নিষ্পলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি তাহার আঁচলের প্রান্ত দিয়া আমার সজল চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিল। তারপর বলিল, ছিঃ, তুমি না পুরুষ মানুষ ?

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার

হাত হইতে আমার হাতখানা মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলাম, শান্তি, পুরুষের হৃদয় কঠিন বলেই ত সে বেদনা পায় বেশি। মনে রেখো কাদামাটির ওপর দাগ সহজেই মিলিয়ে যায়, কিন্তু পাথরের দাগ চিরস্থায়ী।

বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিলাম, এখন তবে আসি? আর দেরি করলে চলবে না, গাড়ি ফেল হয়ে যাবো!

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া শান্তি তখন বলিল, গাড়ী ফেল্ হলেও তুমি ত জলে এসে পড়নি আলোকদা।

বলিলাম, আজ আমার ভয়ানক দরকার, ফিরতেই হবে শান্তি। বরং আর একদিন আসবো—এবারে ঘরবাড়ি সব ত চিনে গেলুম!

মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, ওমা তাই কি হয়? জমিদারবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো না, তাছাড়া এতদিন পরে দেখা, তোমায় দেশঘাটের খবর সব জিজ্ঞেস করি। মামারা ত কেউ আমার খোঁজই নেয় না। যেন আমায় বিদেয় করে তারা বেঁচেছে!

ইহা শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। জমিদারের সঙ্গে পরিচয় হইলে কি আমার চারিটা হাত বাহির হইবে! তাই বলিলাম, শান্তি, রহস্য রাখো, পুরুষের জীবন কি এতই হেয় যে, তাকে নিয়ে মেয়েরা ছিনিমিনি খেলবে সারা-জীবন ধরে? আমাকে আজ যেতেই হবে! বলিয়া সুটকেসটা হাতে তুলিয়া লইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সে আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আলোদা, একটা রাত তোমাকে এখানে থেকে যেতেই হবে—আমার ঘরকন্না আমার সুখ-ঐশ্বর্য অন্তত একবেলার মতো তোমায় চোখে দেখতেই হবে। আজ আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবো না।

বলিলাম, তাতে আমার লাভ?

সে বলিল, তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। আমার সম্বন্ধে তোমার মনে যে ভুল ধারণা আছে তা নিয়ে আমি তোমায় চলে যেতে দেবো না। এই বলিয়া সে তাহার কণ্ঠের সমস্ত মিনতি ও অনুনয় ঢালিয়া দিয়া এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইল যে আমি তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম! শান্তির এই রূপ ত কোনদিন আমার চোখে পড়ে নাই। মনে হইল চঞ্চলা নদী যেন অকস্মাৎ সরোবরে পরিণত হইল—তাহার ঢেউ নাই আছে গভীরতা, চাঞ্চল্য নাই আছে স্থৈর্য! সে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—দীপ্তি নাই দাহিকাশক্তি আছে! সেদিকে চাহিয়া আমি আর 'না' বলিতে পারিলাম না। অগত্যা থাকিতে স্বীকৃত হইলাম।

তখন শান্তি আমায় লইয়া গিয়া তাহার নিজের ঘরে বসাইল। ঘরটি পরি-পাটি করিয়া সাজানো—খাট বিছানা মূল্যবান আসবাব-পত্র এখনো যা দুই একটা আছে তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে এককালে ঐশ্বর্য ও ধনসম্পত্তি তাহাদের প্রচুর ছিল। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু চারখানা ঘর এখনো ভাঙিয়া না পড়িয়া দাঁড়াইয়া

আছে—ইহারই মধ্যে শান্তির সংসার। অবশ্য সংসার বলিতে, সে আর তাহার স্বামী এবং একটি বুড়ি ঝি!

শান্তি আসন পাতিয়া বসাইয়া আমাকে জল খাইতে দিল। তারপর একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া আমাকে লইয়া এঘর ওঘর করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাবেকী আমলের পুরাতন ঘর—ঢুকিতেই কেমন যেন একটা সোঁদা গন্ধ বাহির হইল—সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট করিয়া দুই একটা চামচিকা ঘর হইতে বাহিরে উড়িয়া গেল। তাহাদের ডানার একটা অদ্ভুত আওয়াজ সেই ঘরের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিয়া যেন কোন প্রাচীন কালের স্মৃতি আমার মনে জাগাইয়া তুলিল। চারিদিকে আমি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম—দেওয়ালে লতাপাতা কাটা নানা রঙের অস্পষ্ট দাগ তখনো রহিয়াছে। মোটা মোটা কাঠের পুরানো কড়ি হইতে কাচের ফানুস ঝুলিতেছে। তাহা দেখিয়া বুঝিলাম এককালে ইহারই মধ্যে বাতির আলো জ্বলিত! আসবাবপত্র সেখানে বিশেষ কিছু ছিল না। বলিলাম, এ ঘরটায় কে থাকে?

শান্তি বলিল, এটা আমার শাশুড়ীর ঘর—তিনি থাকতেন এখানে কিন্তু তিনি মরে যাবার পর থেকে এটা পড়েই আছে এমনি—এখন একটাতে আমি পুজোর ঘর করেছি। লক্ষ্মীপুজো হয়, সত্যনারায়ণের সিন্নী হয়।

পরের ঘরটায় গিয়া দেখিলাম তাহারও দশা সেই রকম। শুনিলাম ইহাতে তাহার শ্বশুর থাকিতেন—তিনি মারা যাইবার পর হইতে কোন আত্মীয়-কুটুম্ব আসিলে সেই ঘরে থাকেন। একটা অতি পুরানো খাটের উপর ততোধিক পুরাতন একটি বিরাট গদি পাতা রহিয়াছে। বিছানার অন্যান্য সরঞ্জামও সেই খাটের একপাশে গাদা করা রহিয়াছে। আমি সেই ঘরে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম, শান্তি তোমার কি কোন ছেলেপুলে হয় নি?

সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিল। তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হয়নি শুনলে তুমি খুশি হবে জানি, তবুও আজ আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না—শুনেছি হয়েছিল।

—শুনেছি! তার মানে?

—তার মানে আমি তখন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে ছিলুম আর পেট থেকে একটা মরা ছেলে বেরিয়েছিল। এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, সেটা অবশ্য বিয়ের এক বছর পরে, তারপর আর কিছু হয়নি।

দু'জনেই চুপচাপ। আমি কী বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। সেই নির্জন ঘর যেন নিঃশব্দে আমার টুঁটি টিপিয়া ধরিতে লাগিল।

ইহার পর তেমনি নীরবে সর্বশেষ ঘরটায় আসিয়া আমি প্রথম কথা বলিলাম—শান্তি, তোমার স্বামী ত দিল্লীতে কী চাকরি করতেন শুনেছিলুম—তবে এখানে এ অবস্থায় আবার কি করে তোমরা এলে? আর তিনি এখানেই বা কি করেন?

স্বামী ! এই বলে সে বার দুই ঢোক গিলিল। তারপর মুখে জোর করিয়া একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, জমিদাররা যা করে।

অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ বাপ যা রেখে গেছে তাই বসে বসে ওড়াচ্ছে। এ বিষয়ে সব জমিদার-পুত্রদের গতিই এক ! এই বলিয়া সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকাইল।

বলিলাম, কিন্তু চাকরি।

সে বলিল, চাকরি ? চাকরি করা কোন জমিদার-পুত্রের সহ্য হয় ?

আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া চুপ করিলাম। অনুমানে কতকটা বুঝিলাম। তবু শোভনতার খাতিরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাঁকে দেখছি না ত ?

শান্তি মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর বলিল, বোকা, জমিদারদের দর্শন কি এত সহজেই মেলে ? অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়। এই বলিতে বলিতে আবার আমাকে লইয়া তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল এবং হারিকেন লণ্ঠনটা সেখানে রাখিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় ঝিকে আমার কাছে ডাকিয়া দিয়া সে বলিল, যাই উনুন ধরে গেছে, আমি রান্নাটা চাপিয়ে এখুনি আসছি—তুমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করো।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমি তখন সেই বৃদ্ধা ঝিয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম। তার বাড়ি কোথায় কি জাত, কতদিন এই মনিবের কাছে চাকরি করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সব কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম আপাতত যাহা শুনিয়া আমার কোন লাভ নাই। এবং সেই সব কথার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার তাহার মনিবের কথাও পাড়িতে লাগিলাম।

ঝি প্রথমেই আমায় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাগা বাবু, তুমি বৌমার কি রকম ভাই হও ?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আমি ইতস্তত করিতেছিলাম, এমন সময় দরজার বাহিরে শান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে আমায় ইসারা করিল। আমি তখন গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলাম, হাঁ, তা এক রকম আপনার বলা যেতে পারে !

ঝি বলিল, কৈ, আর কোনদিন ত তোমায় দেখিনি বাপু ?

বলিলাম, নানা কাজে ব্যস্ত থাকি ব'লে আমি আসতে পারি না এতদূরে।

ঝি আবার প্রশ্ন করিল, তা কি রকমের ভাই হও তুমি বাছা—আপনার না মামাতো, না খুড়তুতো ?

আমি আবার মুস্কিলে পড়িলাম ; তাই বারকয়েক গলাটা সাফ করিয়া লইয়া একটা কিছু বলিব মনে করিতেছি এমন সময় শান্তি আসিয়া বলিল, আলোকদা, তুমি সাদা ময়দার লুচি খাবে ত ? আমাদের এখানে কিন্তু লাল আটা পাওয়া

যায় না। তোমার আবার ছেলেবেলা থেকে লাল আটা খাওয়া অভ্যেস। এই বলিয়া ঝিয়ের সঙ্গে শান্তি গল্প জুড়িয়া দিল, কবে আমি ছেলেবেলায় আচার খাওয়া লইয়া তাহার সঙ্গে কি রকম করিয়া ঝগড়া করিয়াছিলাম। তারপর তাহার উপসংহার টানিতে গিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার মনে আছে সে কথা ? বাবা কী ঝগড়া করেছি তোমার সঙ্গে—এই দেখো কুন্দর-মা, এখনো আলোদার হাতে দাগ আছে—কামড়ে দিয়েছিলুম একদিন রাগ করে।

ছেলেমানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শান্তি বলিল, কি দুরন্ত ছিলুম—না ? বলিয়াই সে সতর্ক হইয়া উঠিল ঝিয়ের দিকে চাহিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কথাটাকে অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিল। তখন কোথায় আমি কাজ করি এবং কেনই বা সে-দেশে আসিয়াছি ইত্যাদি শান্তি আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

বইয়ের দোকানে কাজ করি শুনিয়া সে একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, একখানা বই দাও না আলোদা, রাঁধতে রাঁধতে পড়ি—ওঃ কতদিন যে বই পড়িনি তার ঠিক নেই। এমন দেশ যে লাইব্রেরী কাকে বলে তা কেউ জানেই না। তোমার কাছে শরৎ চাটুজ্জের কোনো বই আছে আলোদা ?

বলিলাম, ওসব বই কোথায় পাবো—আমার কাছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক আছে, তাছাড়া মাস্টার মশাইদের উপহার দেবার জন্যে দু'চারখানা ছবিওলা প্রাইজের বইও এনেছি।

শান্তি বলিল, বেশ ত, তাই দাও আলোদা একখানা, পড়ি—

আমি একখানা বই সুট্‌কেস হইতে বাহিরা করিয়া তাহার হাতে দিলাম। শান্তি বলিল, এ বইটা কিন্তু আমি আর তোমায় ফিরিয়ে দেবো না।

বলিলাম, আচ্ছা।

সাগ্রহে তখন শান্তি প্রথম পাতাটা খুলিয়া বইয়ের নাম, লেখকের নাম পড়িল ; তারপর পাতার নীচের দিকে প্রকাশকের যে নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল সেটা পড়িয়া বলিল, তুমি বুঝি এখানে চাকরি করো ?

বলিলাম, হাঁ।

এমন সময় ঝি বলিয়া উঠিল, হ্যাঁগো বৌমা, কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে, তুমি উনুনে কী চাপিয়ে এসেছ ?

এই যাঃ, ডাল চাপিয়ে এসেছি, বলিয়া শান্তি ছুটিয়া একেবারে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি তখন আবার সেই বৃদ্ধা ঝির সঙ্গে আলাপ শুরু করিলাম। ঝি আমাকে যে প্রশ্নটা করিয়াছিল তাহা তখন বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক শান্তির কথা হইতে তাহা স্বামীর সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল ঝির কথা শুনিয়া তাহা একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

ঝি যাহা বলিল তাহার আসল কথা হইতেছে এই যে, তাহার মালিকটি ভীষণ লম্পট ও মদ্যপ। বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সমস্তই গিয়াছে জুয়ায় ও মদে। সাতদিন

আটদিন অন্তর হয়ত হঠাৎ কোনদিন রাত্রে বাড়ি আসেন এবং শান্তির উপর নানারকম অত্যাচার করেন। অতি কুৎসিত সব ব্যাধিতে জীর্ণশীর্ণ তাহার দেহ—জীবন লইয়া প্রায়ই যমে-মানুষে টানাটানি হয়। কেবল নাকি শান্তির শাঁখা-সিঁদুরের জোরে এখনো টিকিয়া আছে, নাহলে কবে শেষ হইয়া যাইত।

ঝি এই সব বলিতে বলিতে কখন যে চুপ করিয়াছিল তাহা মনে নাই। আমি তখন বোধ করি শান্তির ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘণ্টা দুই পরে শান্তি আসিয়া ডাকিল, আলোদা, তোমার খাবার দিয়েছি—এসো।

তৎক্ষণাৎ আমি উঠিয়া পড়িলাম। শান্তি রান্নাঘরে বসাইয়া আমায় প্রচুর খাওয়াইল, তারপর পান হাতে দিয়া তাহার পাশের ঘরটায় লইয়া গিয়া বলিল, এইখানে তোমার শোবার জায়গা করেছি।

দুগ্ধফেননিভ পরিচ্ছন্ন একটি বিছানা দেখিয়া আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, সটান হইয়া শুইয়া পড়িতে পড়িতে বলিলাম, শান্তি তোমার স্বামী-দেবতার দর্শন বোধ হয় আজ রাত্রে বিধাতা আর আমার ভাগ্যে লেখেননি।

—যদি পুণ্যির জোর থাকে ত বিধাতার ইচ্ছা না থাকলেও সে নিজেই এসে হয়ত তোমায় দর্শন দিয়ে যাবে। দেখো যেন তখন ভয় পেয়ো না। এই বলিয়া শান্তি হাসিয়া উঠিল। রহস্যময় অদ্ভুত সে হাসি।

—এমন নরম বিছানা পেলে কোন দেবতাই আর আমার ঘুম ভাঙাতে পারবে না, তুমি নিশ্চিত জেনো শান্তি। এই বলিয়া পাশ ফিরিলাম।

শান্তি মশারি ফেলিতে ফেলিতে বলিল, বাবা, তোমার সে ঘুমের অভ্যেস এখনো যায়নি? বৌ হ'লে কিন্তু তোমায় বিছানা থেকে দূর করে দেবে—দেখে নিয়ো। এই বলিয়া ছেলেমানুষের মত হাসিতে হাসিতে শান্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি বারোটা নাগাদ হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল একটা চেঁচামেচি শুনিয়া। ভাল করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিবার আগেই শুধু এইটুকু কানে আসিল, কে যেন বলিতেছে, হারামজাদী, চালাকি পেয়েছিস আমার সঙ্গে? তোর মতো ঢের ঢের মাগী আমি চরিয়েছি। দাদা! তোর বাবাকেলে দাদা? বল্ শিগ্‌গির, লোকটা কে—নইলে আজ তোকে খুন করবো! এই বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া কিল-চড়-লাথি সে যথেচ্ছ মারিতে লাগিল শান্তিকে।

শান্তি ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—ওগো তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমায় আর মেরো না, আমি তোমার কাছে কোন দোষ করিনি—ও আমার আলোকদা—

তাহার সেই কণ্ঠস্বরকে বিদ্রূপ করিয়া সে বলিল, আলোকদা! তোমার কোন্ চৌদ্দ পুরুষের দাদা? বলিয়া সে আরো ঘা কতক বসাইয়া দিল।

শান্তি মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

এত প্রহার করিয়াও লোকটির যেন আশ মিটে নাই। তাই পীড়নের চূড়ান্ত করিল সে একসময়। আমি শুনিতে পাইলাম লোকটি বলিল, থাক্ আজ এইখানে পড়ে—খবরদার, ঘরে ঢুকতে পাবিনি, আর ভাতও খেতে পাবিনি। এই বলিয়া সে শান্তির ভাতের থালাটা টান মারিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। ঝন্‌ঝন্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘরের মধ্যে যাইয়া খিল আঁটিয়া দিল।

এই লোকটাই যে শান্তির স্বামী একথা বুঝিতে আমার আর বাকি রহিল না। তখন আর আমি বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, সোজা হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। আমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে দ্রুতবেগে তখন মাথার দিকে ছুটিতে লাগিল। কি করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা এইভাবে কাটিয়া গেল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার যেন সেই ভাঙা বাড়ীটাকে প্রেতপুরীর মত ভয়াবহ করিয়া তুলিল। তখন আমি নিঃশব্দে চোরের মতো পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। শান্তি তখনো মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইতেছিল। তাহার মৃদু অথচ মর্মভেদী ক্রন্দন যেন সেই অন্ধকারের বক্ষে সচকিত হইয়া উঠিতেছিল বারংবার।

আমি চুপি চুপি তাহার কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলাম, শান্তি, আমার জন্যে কেন তুমি মিছিমিছি এই লাঞ্ছনা ভোগ করলে! ওঠো মাটি থেকে শিগ্‌গির, লক্ষ্মীটি! আমি আর এ দৃশ্য চোখে দেখতে পারছি না!

শান্তি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পাগলের মতো দুই হাত বাড়াইয়া আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিল, তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আলোকদা, আমায় তুমি আজই নিয়ে চলো এখান থেকে! আমি আর রোজ রোজ এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তুমি ত নিজের চোখে সব দেখলে—আমার কী অপরাধ?

আমি এইরূপ অবস্থায় জীবনে কখনো পড়ি নাই। আমি যুবক—আমার তাজা রক্তে তখন আগুন জ্বলিতেছিল; তাই সে কথার উত্তরে কী বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, তাই চলো শান্তি, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

শান্তিরও বোধ করি তখন অন্য কোন কথা চিন্তা করিবার মত অবস্থা ছিল না। আমার মুখ হইতে তাই সেই কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার হাত ধরিয়া চুপি চুপি তখনি বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রি। পথেঘাটে কোথাও কোন লোকের চিহ্ন নাই। এমন কি কোন বাড়ি হইতে এতটুকু আলো পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল না। শুধু গাঢ় জমাট অন্ধকার, বনেজঙ্গলে গাছের মাথায়, শূন্য মাঠের সর্বত্র একটা কালো পর্দা দিয়া যেন প্রকৃতির মুখ দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাত্রি যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আছে, চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাহার নাই।

শুধু মাঝে মাঝে দু-একটি নিশাচর পাখীর ডানার ঝটপট শব্দ যেন সেই কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। আমরা নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিতেছিলাম।

অবশেষে আমরা এক সময় স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সব্জীর গাড়ি ছাড়িতে তখনও দেরি ছিল। গাড়ি আসিতেই আমরা টিকিট কাটিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলাম।

সমস্ত পথটা যেন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, আমরা কেহই তাহা জানিতে পারিলাম না—আমরা শুধু বসিয়া রহিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কেউ কাউকে একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। দু'জনেই যেন কিসের গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হাওড়া স্টেশনে যখন গাড়ি আসিয়া ঢুকিল তখন সবে ফরসা হইতে শুরু করিয়াছে। কুলির চীৎকারে সহসা আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। শান্তির হাত ধরিয়া বলিলাম, ওঠো, এবার আমরা এসে পড়েছি।

সে কোন কথা না বলিয়া আমার সঙ্গে নামিয়া আসিল।

একখানা রিক্সায় চাপিয়া আমরা দুইজনে আমার বাগবাজারের বাসায় আসিয়া হাজির হইলাম। শুধু একখানা ঘর ভাড়া করিয়া আমি থাকিতাম সে জানিত। তাই ঘরের চাবিটা খুলিয়া শান্তিকে বলিলাম,—এই আমার দৌলতখানা। কেমন লাগছে তোমার?

শান্তি কোন কথা বলিল না, শুধু ম্লান মুখে একটু হাসিল আমার মুখের দিকে চাহিয়া। সে জানিত যে দুনিয়ায় আর আমার আপন বলিতে কেহ নাই। আরো জানিত আমি এখন একা। আঠারো টাকা মাহিনা পাই বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া। সে কথা অবশ্য আমিই তাহাকে বলিয়াছিলাম। তাই আমার ঘরের দৈন্য চোখে দেখিয়াও সে চুপ করিয়া রহিল।

আমি ট্রাঙ্কটা খুলিয়া তাহাকে আমার একখানা কাপড় বাহির করিয়া দিলাম। তারপর স্নান করিবার জল যে চৌবাচ্চায় থাকে সেখানে লইয়া গিয়া স্নান করিতে বলিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শান্তি যখন স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইতে বসিল, তখন আমি তাহার জন্য খাবার কিনিতে গেলাম। কাল সারারাত সে মুখে এক ফোঁটা জল দেয় নাই তাহা আমি জানিতাম। তাই যাইবার সময় বলিলাম, শান্তি, একলা থাকতে তোমার ভয় করবে না ত? না হয় দরজায় খিল দিয়ে বসো—আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে আসছি। বাঙালীর দোকানটা এখনো খোলেনি—হিন্দুস্থানীর দোকানটা খুব ভোরেই খোলে—সেটা আবার একটু দূর কিনা?

শান্তি তাহার বঙ্কিম গ্রীবাটি দুলাইয়া শুধু বলিল, ভয় আমার আর করে না আলোকদা!

খাবার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম শান্তি মাটিতে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম, এ কি শান্তি, তুমি কাঁদছ কেন?

আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া যেন তাহার কান্না আরো বাড়িয়া গেল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শান্তি, কি হয়েছে লক্ষ্মীটি বলো, কাঁদছ কেন?

সে বলিল,—আমি এখানে থাকবো না, আমায় এখুনি রেখে আসবে চলো আমার স্বামীর কাছে।

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম,—সেকি! সেখানে যাবার কি আর আমাদের মুখ আছে? কেমন ক'রে যাবো? বেলা হলে বরং তোমার মামার বাড়িতে তোমায় রেখে আসবো—তাদের ঠিকানা তুমি জানো ত?

শান্তি বলিল, না।

তা'হলে উপায়? আমার যেন মনের মধ্যেটা কেমন করিয়া উঠিল।

—তা আমি জানি না। তুমি না যেতে পারো ত আমায় গাড়িতে তুলে দাও, এখুনি আমি চলে যাই। এই বলিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মতো কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে কত বুঝাইলাম, এখন গেলে দেশের লোক তাহার গায়ে থুথু দিবে এবং সকলে যে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে তাহাও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলাম। কিন্তু সে সে-সব কোন কথায় কান দিল না, শুধু বলিল, আমি যাবই।

শেষে যখন কোন রকমেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না তখন বলিলাম, আচ্ছা, গাড়ি ত এখন নেই, সন্ধ্যায়,—কাজেই এখন খেয়েদেয়ে একটু সুস্থ হও, তারপরে দেখা যাবে'খন।

শান্তির কণ্ঠে এইবার যেন একটু দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিল। সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখা যাবে কেন? আমরা ত কোন অপরাধ করিনি আলোদা?

আমি সে কথার কি উত্তর দিব ভাবিতেছিলাম এমন সময় শান্তি খপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, বলো আলোদা তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করো?

আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শান্তি বলিল, আমি তোমার জন্যে কত যন্ত্রণা সহ্য করলুম সে ত চোখে দেখলে—আর পুরুষ হ'য়ে আমাকে আমার স্বামীর কাছে রেখে আসতে তোমার এত ভয়?

তাহার এই কথা শুনিয়া আমার মনটা কেমন হইয়া গেল। মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আচ্ছা আমিই নিয়ে যাবো শান্তি, তোমায় কথা দিলুম।

বিকেলের গাড়িতে চাপিয়া আমরা যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা

উত্তীর্ণ হইয়া বেশ রাত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম, তায় বনজঙ্গল বেশি, মনে হইতেছিল যেন গভীর রাত হইয়াছে। যাহা হোক, সেই অন্ধকারের দরুন একপক্ষে ভালই হইল—কেহ আমাদের দেখিতেই পাইল না। ফলে রাস্তায় আমরা বেশ নিরাপদে চলিতে পারিলাম। তবে বাড়ির দরজায় পা দিতেই আমার বুকের মধ্যেটা যে কি রকম করিয়া উঠিল তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। ভাঙা বাড়ি —বিনা বাধায় আমরা একেবারে অন্দরমহলে গিয়া হাজির হইলাম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার ও নিস্তব্ধ, কোন জীবিত প্রাণীর আভাস মাত্র নাই যেন।

আমি শান্তিকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, শান্তি, এখন তুমি কি করবে?

সে বলিল, তুমি চলে যাও কলকাতায়।

আমি বলিলাম, আর তুমি?

সে বলিল, আমার স্বামীর ভিটে ছেড়ে আমি আর এক পাও কোথাও নড়বো না।

বলিলাম, কিন্তু স্বামী যদি তোমাকে আর ভিটেয় স্থান না দেয়?

তাহ'লে স্বামীর ভিটেতেই অন্তত আত্মহত্যা ত করে মরতে পারবো?

এমন সময় ঝিয়ের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হইল। আমাদের গলার আওয়াজে বোধ হয় তার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে একটা ল্যাম্প হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া শান্তিকে ওইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, হ্যাঁগা বৌমা, তোমার আক্কেলটা কি বাছা—শ্বশুরের কুলে কি এমনি করে কালি দিতে হয়? তারপর কতকটা আপন মনেই যেন বলিতে লাগিল, সে ছোঁড়াটাকে দেখেই আমার তখন মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তা তুমি একেবারে দাদা বলেই অজ্ঞান! বলি আমার এই তিনকুড়ি দশ বছর বয়েস হলো, আমার চোখে ধুলো দিয়ে যায় এমন লোক ত সাতখানা গাঁয়ে নেই।

আমাকে সে বোধ হয় এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই। তাই কথাটা বলিয়া ফেলিবার পর আমাকে দেখিতে পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিল, তারপর আলোটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ও পোড়ারমুখ নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার লজ্জাও করছে না—বেহায়া না হ'লে কি ভদ্দরলোকের ঘরের ঝি-বউ নিয়ে টানাটানি করে—দূর হও শিগ্‌গির এখান থেকে। ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতে হয় এমন লোককে।

শান্তি সহসা মুখ তুলিয়া অশ্রুসজল দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, কুন্দর-মা, ওকে কেন গালাগালি দিচ্ছিস—

দেবো না, একশোবার দেবো—ওকে দেবো না ত কি তোমায় দেবো! কোথাকার এক বকাটে ছোঁড়া হুট করে এসে কিনা এত বড় সর্বনাশ করলে গা!—আবার এখনো দাঁড়িয়ে আছো—লজ্জাও করে না?

আমি আর সেখানে দাঁড়াইয়া নিজের কানে নিজের কুৎসিত কুৎসা শুনিতে পারিলাম না। তখনি স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হইলাম—শান্তি একবার কেবল

নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া, আমার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইল।

পরের দিন ভোরে যখন বাসায় ফিরিলাম তখন আর আমার দেহে বল ছিল না ; শুধু যে দৈহিক ক্লান্তি তাহা নহে, কেমন একটা মানসিক অবসাদ যেন আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কেবল মনে হইতে লাগিল যেন কি যেন কি একটা পাষাণভার আবার শান্তি আমার বক্ষে চাপাইয়া দিল যাহা আমাকে চিরকাল বহন করিতে হইবে। জামাটা খুলিয়া বিছানায় দেহটা এলাইয়া দিলাম। মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, একটু ঘুমাইয়া লইব কিন্তু তাহা ভাগ্যে জুটিল না।

ছয়টা বাজিতে না বাজিতেই শশধরবাবু আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া আমার ঘুম ভাঙাইলেন। দরজা খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে অভ্যর্থনা করিতেই তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, যান্. যান্, আর ঘরের ভেতর ডেকে ভদ্রতা দেখাতে হবে না। ওঘরে মানুষ ঢোকে ?

শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম ! তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, ব্যাপার কি মুখুজ্জে মশায় ?

যাক্, আর অত ন্যাকা সাজতে হবে না। ভেবেছিলেন ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না, কিন্তু তা মনেও ভাববেন না—শশধর মুখুজ্জের চোখ চারদিকে ! তাই ত—উমেশ এত বিশ্বাস করে তোমাকে আমার কাছে রেখেছে—

এইবার বলিলাম, সত্যি আমি আপনার কোন কথাই বুঝতে পারছি না—একটু খুলে বলুন।

তিনি মুখটা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ন্যাকা ! একেবারে যেন কিছু বোঝো না—দ্যাখো, ওসব ধাপ্পা উমেশকে দাওগে—আমার কাছে চলবে না, এটা সকল সময় মনে রেখো। এই বলিয়া আবার শুরু করিলেন—আমি তখনই বলেছিলুম উমেশকে যে, যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করলেই হলো ! ভাল করে চরিত্রের খোঁজখবর না জেনে ও কাজ ক'রো না। এইবার হলো ত—আমার কথা হাতে হাতে ফললো।

বলিলাম, কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করছেন, কার চরিত্রের খোঁজখবর নিচ্ছেন শশধরবাবু—যে, তার ওপর এত রাগ ?

—এই, তোমার হে তোমার ! তা সে কথা যাক্—আমার ঘরটা তোমায় এই মাসেই ছেড়ে দিতে হবে বলে দিলুম।

কিন্তু তার কারণটা কি জানতে পারি না ?

রাগিলে শশধরবাবুর মুখের রেখাগুলি সর্বদাই বাঁকিয়া থাকিত। তিনি তেমনি ভাবেই মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কারণ হচ্ছে এই যে, এটা ভদ্রলোকের পাড়া, এখানে বেলেল্লাগিরি চলবে না। তুমি ভেবেছো যে রাতারাতি মেয়েমানুষ এনে পার করে দেবে কেউ তা বুঝতে পারবে না—কিন্তু সেটি হবার জো নেই—এই

শশধর মুখুজ্জের চোখ এড়ানো বড় শক্ত। তাই ত উমেশ এত লোক থাকতে আমার বাড়িতে তোমায় রেখেছিল।

আমি বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, মেয়েমানুষ।

তিনি আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ। স্ত্রীলোক। পাড়ার কারুর আর তা জানতে বাকি নেই।

বলিলাম, কি আশ্চর্য—সে যে আমার আত্মীয়া হয়!

হ্যাঁ, হ্যাঁ ওকথা সবাই আগে বলে। ওরকম আত্মীয়া কত দেখলুম এই কলকাতার শহরে। যাক্ ওসব বাজে কথা বলে লাভ নেই, মোটকথা আমার বাড়ি তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে এই মাসে। নেহাৎ উমেশ আমার বন্ধু, তাই। তা না হ'লে এখুনি চলে যেতে বলতুম।

অফিসে আসিয়া দেখিলাম, সেখানেও সেই ব্যাপার! আমি আসিবার আগেই শশধরবাবু উমেশবাবুকে এমনভাবে সব কথা বলিয়াছিলেন যে তিনি আমাকে দেখিবামাত্র গম্ভীর হইয়া গেলেন। এবং আমাকে এই মাসের মধ্যেই অন্যত্র চাকরি খুঁজিয়া লইতে বলিলেন। আমি যখন দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে জানাইলাম, ইহার কারণ আমায় বলিতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন চরিত্র যার নির্মল নয় তার উপর আমি বিশ্বাস করে আমার ব্যবসা ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা চরিত্র জিনিসটা এমন যে, একবার সেটা নষ্ট হ'লে মানুষ ক্রমশই নীচে নামতে থাকে।

শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিলাম, আপনি কাজ চান, না আমার চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চান?

তিনি বলিলেন, কাজ অবশ্যই চাই—কিন্তু মানুষের চরিত্রের সঙ্গে যে কাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তাই চরিত্রকেও রক্ষা করতে চাই।

মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। যাঁহার জন্য এত করিলাম—একদিন দুইদিন নহে, দীর্ঘ ছয় বৎসর—তিনি এক কথায় একেবারে আমায় অন্যত্র চাকরির চেষ্টা দেখিতে বলিলেন! এতই অবিশ্বাস আমাকে যে, ভাল করিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করাও কর্তব্য মনে করিলেন না। তাঁহার বন্ধু শশধরবাবুর কথাই হইল তাঁহার কাছে বেদবাক্য! অথচ উমেশবাবুর ব্যবসার উন্নতির জন্য আমি কী না করিয়াছি। পাছে তাঁহার বেশি টাকা খরচ হয়, পাছে অন্য কেহ থাকিলে টাকা-পয়সা চুরি করে এইজন্য সমস্ত কাজ আমি একা এই দীর্ঘদিন ধরিয়া চালাইয়া আসিয়াছি। তাহার উপর চারিটি ছেলেমেয়েকে প্রত্যহ স্কুলের পড়া বলিয়া দিয়াছি—তাঁহার গৃহিণীরও কত ফরমাশ খাটিয়াছি! কখনো মুখে বলি নাই যে পারিব না, কখনো অতিরিক্ত কাজের জন্য মাহিনাও বেশি চাহি নাই। তাঁহাদের ঠিক পরের মতো দেখিতে পারিতাম না বলিয়া বোধ হয় এমনি করিয়া সেদিন সমস্ত কথা মনে পড়িয়া দুঃখে ক্ষোভে আমার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। যেখানে বিশ্বাস বেশি সেখানে বোধ হয় অভিমানের জ্বালাও থাকে বেশি। তাই আমিও মনে মনে স্থির করিলাম তাঁহাকে আর আমার বক্তব্য শুনিবার জন্য অনুরোধ করিব না। তিনি যখন তাঁহার 'রায়'

জানাইয়া দিয়াছেন আমি তখন তাহাই পালন করিব। আমার আত্মসম্মানে এমনি ঘা লাগিল যে, মনে হইল তৎক্ষণাৎ উমেশবাবুকে বলিয়া দিই, কাল হইতেই আমি আর আসিব না ; কিন্তু তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও যেন কেমন বাধিল। আমার সবচেয়ে দুর্দিনে তিনি ত আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন ! তাহা ছাড়া যাইবার আগে একবার 'অন্দরমহলে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর কাছে সমস্ত কথা বলিবার বাসনা ছিল। আমি জানিতাম যে তিনিই সব—তাঁহার কথার উপর কিছু বলিবার সাধ্য উমেশবাবুর ছিল না।

তাই জল খাইবার নাম করিয়া তখনি একবার বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়াও বিশেষ সুবিধার মনে হইল না। উমেশবাবুর স্ত্রীর মুখ খুব গম্ভীর এবং তিনি আমাকে দেখিয়া দ্রুত ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। কেহই আমায় কোন সম্ভাষণ করিল না দেখিয়া বুঝিলাম তাহারাও আর আমাকে চাহে না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল এই সংসারে আমি একা, আমার কেহ নাই ! অথচ কয়েক ঘন্টা আগেও তাহা ভাবিতে যেন কষ্ট হইত। বাস্তবিক উমেশবাবুর এই পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে ভাবিতে পারিতাম না আমি এখানে চাকরি করি এবং তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন দিন আমায় তাড়াইয়া দিতে পারেন ! অদ্ভুত মানুষের মন ! এত দুঃখের মধ্যেও তাই সে কথা মনে পড়িয়া আমার হাসি পাইল।

যাহা হউক আমি তখন আমার কর্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিলাম না। উমেশবাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে জল চাহিয়া খাইলাম। কিন্তু জল খাওয়া শেষ হইলে যখন ভাবিতেছিলাম এইবার কোন কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব এমন সময় উমেশবাবুর স্ত্রীই কথা বলিলেন। তিনি সহসা কহিলেন, যা হোক দেখালে বাবা, তোমার পেটে পেটে এত ছিল ! আমি ভেবেছিলুম ছোঁড়াটা কতদিন আর বাউণ্ডুলে হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াবে, মরুক গে, এইখানেই বিয়ে থা দিয়ে ওকে সংসারী করব। ওমা, আমার সকল আশায় জলাঞ্জলি পড়ল গা !

আমি আর শুনিতে পারিলাম না। একাকী বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেখান হইতে আবার অফিস ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম উমেশবাবু হিসাবের খাতা লইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী পর্যবেক্ষণ করিতেন। বুঝিলাম, টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে কিনা তাহাই মিলাইয়া দেখিতেছেন। ইহাতে আমার মনে আরো আঘাত লাগিল। আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে তাঁহার টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, কাল থেকেই আমি আর তাহলে আসবো না।

মাসকাবারের তখনো আট দিন বাকি ছিল। তিনি যেন আমার মুখ হইতে উহা শুনিয়া বেশ খুশী হইলেন বলিয়া মনে হইল। তবুও বলিলেন, ও ভেতরে ভেতরে তুমি তাহলে অন্য চাকরির যোগাড় করে রেখেছ ! এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সেই মাসের মাহিনাটা ক্যাশবাক্স খুলিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া

দিলেন। আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে টাকা কয়টা তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শশধরবাবুর ঘরও আমি সেই দিন বিকালে ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহাদের কোন সম্পর্কের মধ্যে থাকিতে যেন আর আমার ইচ্ছা করিতেছিল না।

তখনি আমি একটা রিক্সা ডাকিয়া ঘরে আমার যে সামান্য জিনিস ও বইপত্র ছিল তাহা তুলিয়া লইয়া একটি সস্তার মেসে গিয়া উঠিলাম!

৩২

এইভাবে আমার জীবনে অকস্মাৎ শান্তি আসিয়া দেখা দিল একটা কুগ্রহের মতো। কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া, কর্মচ্যুত করিয়া, আমার জীবনটাকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দিয়া গেল।

নূতন মেসে যাইয়া পরিশ্রান্ত দেহটাকে এলাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু শুইয়া ঘুম আসিল না; ভাবিতে লাগিলাম, শান্তি কি চিরকাল আমাকে কেবল দুঃখই দিবে! কেন তাহাকে লইয়া আসিলাম? সে আমার কি উপকার করিল? বেশ ত ছিলাম! কেন তাহার কথা শুনিয়া আমার মন এমন বিচলিত হইয়া উঠিল? —এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমি চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় মনে পড়িল মধুর বাবার সেই উপদেশটি—'এই ত চাই! যেমন নামবে তার দু'ডবল উঠবে—উত্থান ও পতন না থাকলে জীবনের কোন অর্থ হয় না।' কথাটি ছোট হইলেও সেই সময় উহা যেন আমার যথেষ্ট মত বল সঞ্চার করিল।

কিন্তু এইবার উত্থান কেমন করিয়া হইবে সেই কথাটাই পুনঃপুনঃ ভাবিতে লাগিলাম। পড়াশুনা করিবার তীব্র বাসনা বরাবরই আমার মনে ছিল, তাই উমেশবাবুর ওখানে সমস্ত দিন কাজ করিয়াও একটি নৈশ বিদ্যালয়ে মাস্টারি করিতাম যাহাতে 'প্রাইভেটে' পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাই। ছয় বছর মাস্টারির ফলে আই. এ. পরীক্ষাটা পাশ করিয়াছিলাম এবং বি. এ. পরীক্ষার জন্যও এবার প্রস্তুত হইয়াছিলাম। পরীক্ষার 'ফি' জমা দিবার টাকাটা উমেশবাবু ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু এক শান্তির জন্যই আমার সমস্ত মাটি হইয়া গেল। টাকা দিবার তখন আর মাত্র দশদিন বাকি। তাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম কোথায় টাকা পাইব, কে আমায় এত টাকা ধার দিবে। উমেশবাবুর কাছে চাকরি গিয়াছে বলিয়া আমার সবচেয়ে দুঃখ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে একটা বছর নষ্ট হইল। কিছুদিন পূর্বেও আমি কত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—এমনি ভাবে বি. এ. পাশ করিয়াই একদিন এম. এ. দিব, তারপর এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া একটা প্রফেসারি করিব! কিন্তু সে সব কল্পনা তখন আমার কাছে যেন বিদ্রূপের মতো মনে হইতে লাগিল।

আরো দুই-তিনটা দিন ওইভাবে কাটিয়া গেল। টাকার যোগাড় আমি

কোথাও করিতে পারিলাম না, আলাপ পরিচয় যাহাদের সঙ্গে ছিল তাহারা চাকরি গিয়াছে শুনিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। তখন হঠাৎ জ্যাঠামশায়ের কথা মনে পড়িল। বি. এ. পাশ করিবার ইচ্ছা সেই সময় আমার মনে এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে লজ্জা, ঘৃণা, অপমান সমস্ত ভুলিয়া গিয়া জ্যাঠামশায়ের কাছেই হাত পাতিব স্থির করিলাম। ইহার জন্য যদি তাঁহার পায়ে ধরিতে হয়, তাহাতেও রাজী!

পরের দিন সকালের গাড়িতে আমি দেশে রওনা হইলাম। আট বছর পরে আবার জ্যাঠামশায়ের বাড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া আশায় আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা—আর একবার এইভাবে যখন কয়েক মাস অজ্ঞাতবাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তবু সমস্ত দুর্বলতা কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। সদর দরজা ভেজানো ছিল—হাত দিতেই নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, আমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন বোধ হয় বেলা আড়াইটা কি তিনটা হইবে। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। ছেলেমেয়েরাও তখন স্কুলে, কেহ বাড়ি ছিল না। জ্যাঠাইমাও বোধ হয় তাঁহার ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। আমি চোরের মত একেবারে জ্যাঠামশায়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন দিবানিদ্রার পর বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমায় দেখিয়া তিনি একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে তিনি তাঁহার পাশে বিছানার উপর আমায় বসাইলেন। তারপর এখন কী করিতেছি, কেমন করিয়া আমার দিন চলিতেছে ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিলেন। তিনি যে চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া দিয়া কেন পলাইলাম সে সব পুরানো কাহিনী একবারও তুলিলেন না। শুধু আমি যে কেন এত কম বেতনে এতদিন উমেশবাবুর নিকট চাকরি করিয়াছি সেই কথা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আবার আপন মনেই তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, তা একটা পেট, যেমন করে হোক চলে গেলেই হ'লো। তবে শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস—খাওয়াদাওয়াটা যেন ভাল হয়।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সংসারের মোটামুটি যে চিত্র আমার চোখের সামনে ধরিলেন তাহা হইতে আমি এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে ভুতো ইতিমধ্যে ক্যাম্বেল হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া সাড়ে তিনশত টাকা বেতনের একটি চাকরি লইয়া আসামে গিয়াছে; তাহার বিবাহ হইয়াছে, একটি ছেলেও নাকি হইয়াছে। স্ত্রীপুত্র লইয়া তাহার কর্মস্থলেই সে থাকে। আর ভুতোর পরের ছেলেটি, অর্থাৎ কেলো, ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এখন আই-এ পড়িতেছে কলিকাতায়; আর পচা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে এবং ঘণ্টা ক্লাস সেভেনে। এদিকে মেয়েদের মধ্যে নেড়ী ও বুঁচি দুজনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। খেঁদীর দুই ছেলে এক মেয়ে; নেড়ীর একটি মেয়ে হইয়াছিল, কিন্তু জন্মগ্রহণ করিবার তিন দিন পরেই মারা যায়। বুঁচির বিয়ে হইয়াছে পাশের গ্রামে, এখনো এক বৎসর হয় নাই। তাহার শ্বশুর খুবই অবস্থাপন্ন। এ দিকে আন্নাকালী ও তাঁহার আরো দুই মেয়ে পাঠশালায় পড়িতেছে।

তারপর দেশের খবর বলিতে গিয়া তিনি প্রথমেই কহিলেন যে, বৃদ্ধ হারাণ চাটুজ্জে মারা গিয়াছে এবং খুব ঘটা করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছে ছেলেরা। মধু বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসিয়া এখন পাটনা কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছে। আর কমল এম. এ. পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজে একটা প্রফেসারি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো এমন অনেক খবর তিনি বলিলেন যাহা শুনিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না। শুধু ভুতো, মধু ও কমলের অবস্থার কথা মনে করিয়া আমার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিল। জ্যাঠামশায় থামিবার পরই আমি তখন আসল কথাটি পাড়িলাম। টাকার কথা শুনিয়া তিনি একেবারে সোজাসুজি বলিলেন যে, তাঁহার কাছে কিছুই নাই, এবং থাকিলে অবশ্যই তিনি আমায় দিতেন। ইহাতে আমার রাগ আরো বাড়িয়া গেল। অগত্যা আমি তাঁহাকে ওই টাকাটা ধার দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু ইহাতেও যখন তিনি রাজী হইলেন না তখন আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, আমার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর অফিস থেকে যে টাকা পেয়েছিলেন তাতেও কি আমার অধিকার নেই—তা থেকে কি এই সামান্য একশো টাকা আপনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন না আমায় ?

তিনি আমার মুখ হইতে যেন এইরূপ কথা প্রত্যাশা করেন নাই। তাই হঠাৎ ইহা শুনিয়া কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া বারকয়েক ঘন ঘন হুঁকায় টান দিয়া বলিলেন, সে টাকা ত তার অসুখের দেনা শুধতেই চলে গেছে, আর যাও কিছু ছিল তোমায় মানুষ করতেই সব খরচা হয়ে গেছে। তোমার খাওয়া পরা, জামা কাপড়, লেখাপড়া শেখা—এ সবে ত কম টাকা খরচ হয়নি। আমার কাছে সব হিসেব লেখা আছে। ওঃ, একটা ছেলেকে এই বাজারে মানুষ করা কি সহজ কথা ! তুই এখন বড় হয়েছিস, সবই ত বুঝতে পারছিস্ ! এই বলিয়া আবার ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

রাগে আমার সব শরীর তখন জ্বলিতেছিল। তাই সে কথার উত্তর জ্যাঠা-মশায়কে কী ভাষায় দিব তাহাই বোধ করি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ জ্যাঠাইমা পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন, ওমা আলোক যে, কখন্ এলি বাবা ?

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিলাম, এই ঘণ্টাখানেক হলো।

তিনি তখন জ্যাঠামশায়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁগা, তা তুমি আমায় একটু ডাকতে পারোনি, আমি ত মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলুম তুমি জানো—ভাগ্যিস্ ভোদোর মা বললে তাই ত দৌড়তে দৌড়তে আস্‌ছি।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা জামাটামা খোল্, মুখে হাতে জল দে—কিছু জল খা—তা নয় এখনো এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

তেমনি সংক্ষেপে আমি আবার বলিলাম, আমায় এখুনি ফিরে যেতে হবে।

সে কি রে ! তা কখনো হয় ! এই এতদিন পরে এলি, না খেয়েদেয়ে চলে

যাবি, তা কি হয়? আমি আজ কিছুতেই তোকে যেতে দেবো না। কি ছেলে বাবা—জ্যাঠা, জ্যেঠীর কথা কি একবারও মনে হয় না। আয় দেখি এ ঘরে, জামাটামাগুলো খুলে—হাতে মুখে জল দে!

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম, না জ্যাঠাইমা, আমি এখন কিছু খাবো না—আমার ক্ষিদে নেই। এখুনি আমায় যেতে হবে—বিশেষ প্রয়োজন।

কি এমন বিশেষ প্রয়োজন, শুনি?

আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু চুপ করিয়া রহিলাম।

জ্যাঠাইমা তখন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দ্যাখ্ আলো, আমার কাছে লুকোসনি, কি হয়েছে সত্যি করে বল্ লক্ষ্মী ছেলে!

ইহার উত্তর আমাকে আর দিতে হইল না, জ্যাঠামশায় দিলেন। তিনি এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, ওগো শুনেছ, ও এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে তাই একশো টাকা ধার চাইতে এসেছে—আমার কাছে এখন টাকা কোথায়? দিতে পারবো না বলেছি, তাই ওর রাগ হয়েছে। জানো, ও বলে কিনা আমার বাবার অফিস থেকে যে টাকা পেয়েছিলেন, অন্তত তা থেকেও কিছু দিন্।

তা ঠিকই বলেছে। ও এখন বড় হয়েছে, ও কি কিছু বোঝে না? তোমার যেমন কথা তার উপযুক্ত জবাবই দিয়েছে! আয় ত বাবা এদিকে। এই বলিয়া তিনি আর-একবার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া নথটা নাড়িয়া আমায় বলিলেন, তুইও যেমন—কেন ওঁর কাছে বলে মুখ নষ্ট করতে গেলি? বলি আমি ত এখনো মরিনি—আমি দেবো! ইহার পর একটু থামিয়া আবার নিজেই শুরু করিলেন, তা বলে টাকার অভাবে ছেলেটার বি. এ. পাশ দেওয়া হবে না, এ আমি বেঁচে থেকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

জ্যাঠাইমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, তবে কি জ্যাঠাইমাকে আমি এতদিন ভুল বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছি!

জ্যাঠামশায় আবার বলিলেন, কিন্তু এত টাকা আমি কোথায় পাবো? ঘরে কি টাকার জালা বসানো আছে? জ্যাঠাইমার এইরূপ ঔদার্য্য দেখিয়া জ্যাঠামশায় পর্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। আবার জ্যাঠাইমা মুখনাড়া দিয়া বলিলেন, জালা আছে কি কলসী আছে তা জেনে ওর লাভ কি? তোমাকে ত দিতে বলিনি! বলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রেও লোকে একটা ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারে না, আর টাকার অভাবে ওর পাশের পড়াটা নষ্ট হবে! ঘর থেকে খরচ না করলে কি ঘরে টাকা তোলা যায়! আলোর আমার ভাবনা কি? বি. এ-টা পাশ করুক, দেখবে ওর বিয়ে দিয়ে বিশগুণ টাকা ঘরে তুলতে না পারি ত আমি বাপের বেটী নয়। শুধু পাশের খবরটা বেরুতে দাও—তারপর দেখো আমি কি করি, বলিতে বলিতে তিনি এক রকম জোর করিয়া আমায় তাঁহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন।

জ্যাঠাইমার নিকট হইতে কোন দিন আমি যে এইরূপ ব্যবহার পাইব তাঁহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। বাস্তবিক সেদিন তাঁহাকে যেন আমার নতুন মানুষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একই ব্যক্তির চরিত্রে কেমন করিয়া, মাত্র এই কয় বছরের মধ্যে এইরূপ অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা তখন আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

যাহা হউক, পরদিন সকালের ট্রেনে, খাইয়া দাইয়া জ্যাঠাইমার নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং স্টেশন হইতে একেবারে সোজা ইউনিভারসিটীতে গিয়া আগে পরীক্ষার 'ফি' জমা দিলাম। বুক হইতে তখন যেন একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। আমি মনে মনে সেখান হইতে বার বার জ্যাঠাইমার চরণে প্রণাম করিলাম।

তিন মাস পরে পরীক্ষা। যেমন করিয়া হউক পাশ করিবই মনে মনে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তখন হইতে আমি রীতিমত পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলাম। রাত্রিটাই ছিল আমার পড়িবার সময়—আর সমস্ত দিন চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু দেড় মাস কাটিয়া যাইবার পরও যখন কোন চাকরি জোগাড় করিতে পারিলাম না, তখন ভাবনায় আমার চোখে একবিন্দু ঘুম আসিত না। কি করিয়া মেসের খরচা চালাইব! একটি টাকাও তখন আমার কাছে আর ছিল না। শেষে মেসের এক ভদ্রলোকের কৃপায় কয়েক দিন পরে একটা চাকরি জুটিল তিরিশ টাকা মাহিনায়। দমদমের কাছে একটি চটকলে প্রতিদিন রাত্রে কাজ করিতে হইবে। তখন পরীক্ষার আর মাত্র দেড় মাস বাকি, কাজেই চাকরির ভালমন্দ বাছবিচার করিবার মতো অবস্থা ছিল না। তদুপরি মেসের খরচা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে কিছুতে পড়ায় মন বসাইতে পারিতেছিলাম না। সেই চাকরিটির উপরেই যেন তখন আমার জীবনের উত্থান-পতন নির্ভর করিতেছিল।

তখন হইতে আমি সারারাত্রি কলে কাজ করিয়া আসিয়া দিনের বেলা ঘণ্টা চারেক ঘুমাইতাম আর বাকি সময়টা লেখাপড়ায় ব্যয় করিতাম। এই ভাবে আমার দিন একপ্রকার কাটিতে লাগিল। কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকদিন রাত্রি জাগরণের ফলে আমার শরীর ভিতরে ভিতরে দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। একে নতুন চাকরি তায় সামনে পরীক্ষা, তাই কাজে কামাই না করিয়াও কলে আমি নিয়মিত বাহির হইতাম। সেখানে কঠিন পরিশ্রম হইত, তাহার উপর আবার লেখাপড়ার শ্রম—একসঙ্গে এতটা আমার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে ঠিক পরীক্ষার দুই দিন আগে আমি ভীষণ অসুখে পড়িলাম। একশো তিন ডিগ্রী জ্বর। এই জ্বর লইয়াও দুইদিন পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু তৃতীয় দিন আর পারিলাম না। দাঁড়াইতে কিংবা বসিতে গেলেই বমি পায় মাথা ঘুরিতে থাকে, চোখে অন্ধকার দেখি। ডাক্তার বিছানা হইতে উঠিতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা পরীক্ষা দেওয়া আর হইল না।

দিন পনেরো পরে সুস্থ হইয়া উঠিয়া আবার নিয়মিত কলে চাকরি করিতে

লাগিলাম।

আরো দুই মাস এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ একদিন জ্যাঠাইমার নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইলাম। তিনি আমাকে সামনের রবিবার দেশে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। জ্যাঠাইমার আদেশ তখন আমার কাছে ছিল বেদবাক্য !

কাজেই রবিবার যথাসময়ে আমি দেশে গিয়া হাজির হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। অসুখের জন্য যে পরীক্ষা এবার দিতে পারি নাই তাহা তিনি জানিতেন। তবুও আমাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবার সময় তিনি বলিলেন, দেখ আলোক, আমি তোর বিয়ের সব ঠিক করেছি—যেমন সুন্দর মেয়ে তেমনি দেবে থোবেও অনেক। আমি বলেছিলুম যে বি. এ. পাশটা করলে তারপর কথা কইবো, কিন্তু তাদের আর দেরি সইছে না। বলে বি. এ. পাশ নাই বা হলো —বিয়েটাত আগে হয়ে যাক্।

আমি প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিলাম, তা হতেই পারে না।

কিন্তু আমার কথায় তিনি কান দিলেন না। বলিলেন, আমার পিসতুতো ভায়ের বড় শালীর মেয়ে, তারা দিল্লীতে থাকে ; কলকাতায় এসেছে ছুটিতে, তাই বিয়েটা দিয়ে যেতে চায় এর ভেতরে। আমি যখন তাদের কথা দিয়ে ফেলেছি তখন তোকে আমার মান রাখতেই হবে বাবা ! এই বলিয়া তিনি এমনভাবে আমায় অনুরোধ করিলেন যে আমার সমস্ত ওজর-আপত্তি তাহার কাছে ভাসিয়া গেল। তবু আমি একটি শর্ত করিয়া লইলাম যে, মেয়েটিকে একবার নিজের চোখে না দেখিয়া কিছু বলিতে পারিব না।

ইহা শুনিয়া জ্যাঠাইমার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই। আমি আজই তাদের চিঠি লিখে দিচ্ছি—তারা কেউ তোকে মেস থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়ে দেখিয়ে দেবে। বলিতে বলিতে তিনি গর্বোজ্জ্বল মুখে একবার আমার দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন, আমার ভায়ের মুখে শুনেছি মেয়ে নাকি পরমাসুন্দরী !

৩৩

পরের শনিবার অপরাহ্নে আমি অফিসের একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া বাদুড়বাগানের একটি বিরাট ফটকওয়ালা বাড়ির মধ্যে গিয়া ঢুকিলাম মেয়ে দেখিবার জন্য। এই বাড়িটি পাত্রীপক্ষের নিজস্ব নয়. দূরসম্পর্কীয় কোন এক আত্মীয়ের। যাহা হউক ধনীর গৃহে, ধনীর মতই আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া আমরা মেয়েটিকে দেখিলাম। মোটের উপর মেয়েটি অপছন্দের নয়। আমার চোখে ভালই লাগিল। চোখ-মুখের গঠন সুন্দর এবং গায়ের রঙ্ গৌর। আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি দেখিতে গিয়াছিল সে ত দেখিয়াই একরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; চুপি চুপি আমার

কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, তাহ'লে পাকা কথা দিয়ে যাই, কি বলেন আলোকবাবু ?

আমি তাহার গায়ে একটা চিমটি কাটিয়া বলিলাম, চুপ, ও সব জ্যাঠাইমাই বলবেন।

ইহার পর মামুলিপ্রথায় নমস্কারাদি বিনিময়ের পর আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেই হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে একজন চাকর আসিয়া আমায় বলিল, আপনাকে একবার বাড়ির মধ্যে ডাকছেন।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, আমায় !

সে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে।

বন্ধুকে এক মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম এখানে আবার কে আমায় ডাকিতে পারে ! কাহারো কথা মনে পড়িল না। আমার আত্মীয়স্বজন কেহই ত এত বড়লোক নয় ! তবে আর কে ডাকিতে পারে ! সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে চাকরটির অনুসরণ করিলাম। সে আমাকে লইয়া গিয়া ঠিক সিঁড়ির নীচের ঘরটিতে ঢুকিল। দরজাটি বন্ধ ছিল। খুলিতেই দেখি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন মাসিমা। অপূর্ব তাঁহার বেষভূষা, মুখ চোখে তাঁহার সেই সুমিষ্ট হাসি। তাঁহার চেহারা যেন আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর হইয়াছে। আমি অপলক নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মাসিমা হাসি মুখে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, আমায় চিনতে পারছো না আলোক ?

শুনিয়া, আমার যেন সহসা ধ্যানভঙ্গ হইল। সবিস্ময়ে বলিলাম, মাসিমা, আপনি !

হ্যাঁ বাবা ! আমি। বলিতে বলিতে তিনি একেবারে আমার মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি তখন সকৌতুহলে প্রশ্ন করিলাম, আপনি এখানে কবে এলেন মাসিমা ?

তিনি এইবার ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বা-রে—ও যে আমার মেয়ে—যাকে তুমি এইমাত্র দেখে এলে !

সঙ্গে সঙ্গে শুধু দুইটি কথা অস্ফুটস্বরে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল —আপনার মেয়ে !

হাঁ। ও আমার মেয়ে তুমি কি তা জানতে না ?

আমি হাঁ বা না কিছু জবাব দিবার পূর্বেই তিনি আবার বলিলেন, আলোক, তোমার কি পছন্দ হয়েছে আমার মেয়েকে ?

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম। এইবার ঘাড় হেঁট করিলাম।

তিনি বলিলেন, লজ্জা কি আমার কাছে ?

তবুও আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মাসিমা কি ভাবিলেন জানি না, শুধু হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, ও বুঝেছি—থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না—ওঃ, ছেলের লজ্জা দেখ না! এই বলিয়া আবার সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর সেই হাসির বেগ চাপিতে চাপিতে বলিলেন, তাহ'লে এই মাসেই দিন ঠিক করি, কেমন?

এইবারে আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, জ্যাঠাইমা জানেন।

বলি, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না সত্যি করে বলো দেখি আগে—তারপর জ্যাঠাইমা! ইহার উত্তর কি দিব ভাবিতেছিলাম এমন সময় তিনি আবার বলিলেন, আমার মেয়ে কি সুন্দর নয়—কৈ তোমাদের কলকাতা শহরে ক'টা মেয়ে ওর মতো আছে বার কর দেখি? রাস্তাঘাটে অনবরত যাদের দেখি তাদের দিকে ত চাইতে ঘেন্না করে—ম্যাগো কি ছিরি!

আমি এইবার বলিলাম, তাহ'লে এখন যাই মাসিমা!

কিন্তু আগে আমার কথার জবাব দিয়ে যাও, তা না হ'লে আমি তোমায় ছাড়বো না। হাসি-হাসি মুখে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বলো আগে আমার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে কি না!

মাসিমার এই কথার উত্তরে কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া আমি ঘাড় হেঁট করিয়া শুধু বলিলাম, অপছন্দের কি আছে!

মাসিমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তা জানি। কিন্তু তোমার সেই আগের মতো লজ্জা এখনো আছে দেখছি!

আমি তখন আর একমিনিটও অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। মনে পড়ে সেদিন আমার সঙ্গী—অফিসের বন্ধুটি—সারা পথ কেবল সেই মেয়েটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথায় কি বিশেষত্ব তাহার বর্ণনা দিতে দিতে আমার কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল। আরো মনে পড়ে যে, সে যখন সেই মেয়েটির সম্বন্ধে বলিতে বলিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছিল তখন আমি কিন্তু চিন্তা করিতে-ছিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত কথা—সেই মেয়েটির মায়ের কথা, অর্থাৎ মাসিমার কথা! ছয় বৎসর আগেকার কত সব স্মৃতি-বিজড়িত কাহিনী তখন একে একে আমার মানসলোকে উদিত হইয়া যেন আমায় বর্তমান জগৎ হইতে কোন এক স্বতন্ত্রলোকে লইয়া যাইতেছিল। মেসে ফিরিয়াও কিন্তু সে চিন্তা আমার মন হইতে দূর হইল না; তাহা যেন আমার দেহের অণুতে পরমাণুতে কোন এক গোপন কথা বহন করিয়া ফিরিতে লাগিল। লজ্জায় কাহারও কাছে তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। শুধু পরদিন সকালে আমি জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়া-ছিলাম যে, ও মেয়েটি আমার পছন্দ হয় নাই।

জ্যাঠাইমা আমার চিঠি পাইয়া বোধ হয় অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুতেই ভাবিয়া পান নাই এমন সুন্দরী মেয়েকে কেন আমার পছন্দ হইল না! তাঁহার বহু আশা যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

ইহার ঠিক সপ্তাহ খানেক পরে হঠাৎ এক কাণ্ড হইল। একটি মোটরে করিয়া

মাসিমা একদিন দুপুরবেলা আমার মেসে আসিয়া হাজির হইলেন। তখন আমাদের মেসে ঠাকুর চাকর ছাড়া অন্য কোন লোক ছিল না। আমি দিবানিদ্রা যাইতেছিলাম, সহসা ঠাকুরের ডাকাডাকিতে দরজার খিল খুলিয়া দিতেই দেখি সামনে দাঁড়াইয়া মাসিমা—আজ তাঁহার বেশভূষা যেন রাজেন্দ্রাণীর মতো। সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিয়া আমি তাঁহাকে ঘরের ভিতরে আহ্বান করিলাম। তিনিও কোন কথা না বলিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া আমার বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে বাড়ির দারোয়ান ও চাকর আসিয়াছিল। তাহারা তখন আমার ঘরের বাহিরে বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মাসিমা আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, তোমার জ্যাঠাইমা খবর দিয়েছেন যে তোমার নাকি পছন্দ হয়নি—এ কথা কি সত্যি?

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, জানো, যেদিন শুনেছি যে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে সেই দিন থেকে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জামাই বলে চিন্তা করতে পারিনি। কত লোক কত ভাল সম্বন্ধ এনেছে, আমি তা ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়েছি নানা রকম মিথ্যে ওজর দেখিয়ে—সে শুধু তোমার জন্যে। এই বলিয়া তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আমাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া নিজেই আবার শুরু করিলেন, আলোক, বলো সত্যিসত্যি তোমার সম্মতি আছে কিনা। উত্তেজনায় এইবার তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ও অবিচলিত কণ্ঠে শুধু একটি কথা বলিলাম, না। আপনার জামাই হবার অযোগ্য আমি। কারখানায় সামান্য মাইনের চাকরি করি। আমায় মাপ করুন।

না! কেন, আমাকে বলতে হবে। এই বলিয়া তিনি যেন তখন প্রাণপণে একটা প্রবল আবেগ ভিতরে ভিতরে দমন করিয়া লইলেন। তারপর ধীর অথচ মৃদু স্বরে বলিলেন, আলোক, তুমি কি জানো না যে, তোমার জন্যে আমি কত করেছি—তবে কেন আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ! তোমাকে আমার কাছে রাখবো, যত্ন করবো, আদর করবো, ভাল করে খাওয়াবো—এ যে আমার কত দিনের সাধ! তুমি ত সবই জানো?

আমি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আবার উত্তর করিলাম, সবই জানি। তবু আপনার সাধ মেটাবার সাধ্য আমার নেই।

আমায় ঘাড় নীচু করিয়া মৌন থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, কেন! কেন? উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। তোমাকে যে আমি কত ভালবাসতুম, তুমি সব কি ভুলে গেলে! আমি তো এখনো কিছু ভুলতে পারিনি।

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এবার আমি আস্তে আস্তে জবাব দিলাম, যদি সে সব ভুলতে পারতুম, তাহলে হয়ত না বলতে পারতুম না। আশা করি এরপর আর কিছু আমায় জিজ্ঞেস করবেন না।

তিনি ইহা হইতে কী বুঝিলেন বলিতে পারিব না, তবে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি নীরব নিশ্চল মূর্তিতে তেমনিভাবে বসিয়া রহিলাম। তাঁহার মোটরের শব্দ আমাদের নির্জন মেসের গলিটাকে প্রকম্পিত করিতে করিতে কলিকাতা মহানগরীর অনন্ত কোলাহলের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

৩৪

ইহার পরের ইতিহাস না লেখাই ভাল, কেননা তাহা শুধু আমার নিষ্ফল জীবনেরই পুনরাবৃত্তি। ঘটনায় হয়ত কিছু বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু পরিণতি সেই একই—আমার নিষ্ঠুর ভাগ্যনিয়ন্তার নির্মম বিধান! এই বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে জ্যাঠাইমা মনে মনে আমার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। কেবল যে এমন সুন্দরী মেয়েটি হাতছাড়া হইল সেজন্য নহে, শোকটা তাঁহার সবচেয়ে বেশি লাগিয়াছিল বোধ করি ইহার উপরে যে দুই হাজার টাকা পাওয়া যাইত তাহার জন্য। তবুও কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নাই। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আমায় পত্রাঘাত করিতেন। আমি কিন্তু তাহার কোনটারই উত্তর দিতাম না। বিবাহ আর করিব না, মনে মনে তখন এই দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলাম—অন্তত যতদিন না আমার জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয়। বি. এ. পাশ আমাকে যেমন করিয়া হউক করিতেই হইবে, তাহার পর এম. এ. এবং প্রফেসারি! দরিদ্রের পক্ষে চেটাইয়ে শয়ন করিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিবার মতো কথাটা শুনাইলেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করিতাম যে মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। সত্যকারের যত্ন ও আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষকে তাহার গন্তব্য পথ হইতে এতটুকু টলাইতে পারে। তাই এত প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও আমি কিন্তু আমার জীবনের আদর্শকে কখনো ভুলি নাই বা ছাড়ি নাই। আমার মধ্যে যে বিরাট একটা কিছু করিবার শক্তি আছে তাহা আমি সকল সময়ই অনুভব করিতাম—বিশেষ করিয়া যখন মনে পড়িত, কমল, মধু ও ভূতোর কথা! তাহারা সকলেই জীবনে উন্নতি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইল আর আমি তখনো পথহারা নাবিকের মত অকূল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া আছি!

দেরি হইলেও একদিন যে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব ইহা ভাবিয়া তখন মনকে প্রবোধ দিতাম।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা বোধ করি অন্যরূপ ছিল, তাই আবার আমার ভাগ্যের আকাশে সহসা মেঘ দেখা দিল। কলের অস্থায়ী চাকুরি অকস্মাৎ টলমল করিয়া উঠিল। কলে কাজের অভাবে লোকজন কিছু ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, কিন্তু এতদিনে খবর পাইলাম যে তাহার একটা পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমার নাম প্রথম কুড়িজন হতভাগ্যের মধ্যেই আছে।

বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তখন নির্ভর করিতেছিল মাসের শেষের সেই তিরিশটি টাকার উপর। এই চাকরিটি গেলে কেবল যে থাকা ও খাওয়ার অসুবিধা হইবে এবং আমি বেকার হইয়া পড়িব তাহাই নহে ; এবারও যে বি. এ. পরীক্ষাটা দেওয়া হইবে না সেই চিন্তাই তখন আমার কাছে সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিল। জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়িল। তিনি টাকা একবার দিয়াছেন বলিয়া নহে, পুনরায় তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবার আমার আর মুখ ছিল না ; সে সুযোগ আমি নিজেই নষ্ট করিয়াছি। পৃথিবীতে আমার এমন আর কেহ ছিল না যাহার নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইতে পারি। সকল কেরানীর মতই চাকরিটি ছিল যেন আমার একমাত্র ভরসা। তাই, কি করিয়া উহাকে বাঁচাইতে পারি সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং তিন চার দিন আমার চোখে একেবারে ঘুম আসিল না। বেকার জীবনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নহে, তবে অমুক দিন অমুক সময়ে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইতে আমি বিচ্যুত হইব এ চিন্তা যেন আরো ভয়ংকর—সজ্ঞানে মৃত্যুকে বরণ করিবার মতো—ইহার সঙ্গে আমার পরিচয় ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই।

অনন্যোপায় হইয়া শেষে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের যিনি বড়বাবু তাঁর বাড়িতে গিয়া একদিন সকালে হাজির হইলাম এবং আমার অবস্থার কথা সমস্তই তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিলাম। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, এইখানে একুশ বৎসর চাকরি করিতেছেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি মিনিট কয়েক চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি তাঁহার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইল ; তারপর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, কিছু খরচ করতে পারবে ?

অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আলোক রশ্মি দেখিতে পাইয়া আমার হৃদয়ে যেন খানিকটা বল ফিরিয়া আসিল। তবু সভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কত টাকা আন্দাজ খরচ করতে হবে।

তিনি চোখ বুজিয়া আবার মনে মনে কি একটা হিসাব করিলেন। তারপর বলিলেন, ধরো, শ'খানেক টাকা।

একশো টাকা! আমার বুকের ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল পরীক্ষার 'ফি'র জন্য এবার প্রতি মাসে কিছু কিছু জমাইয়া একশোটি টাকা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছিলাম পোস্ট অফিসে। ওই টাকা খরচ করিলে এবছর পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু ইহা ছাড়া টাকাই বা আমার আর কোথায়, আর কেই বা দিবে। মনের মধ্যে ইহা লইয়া তোলাপাড়া করিতে করিতে এক সময় স্থির করিয়া ফেলিলাম উহাই দিব—চাকরি আগে—চাকরি বাঁচিলে পরের বছরও পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাই তাঁহাকে উহা দিতে স্বীকৃত হইলাম।

তিন চার দিন পরে তিনি এই টাকাটা আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন এবং মাসের শেষে যখন সেই সৌভাগ্যবঞ্চিত হতভাগ্যদের নামের তালিকা বাহির হইল তখন দেখিলাম আমার নাম ত নাই-ই অধিকন্তু আমি এমন এক ডিপার্টমেণ্টে

বদ্‌লী হইয়া গিয়াছি যেখানে কাজ কম এবং 'নাইট ডিউটি' একেবারেই নাই। ইহার জন্য মনে মনে বড়-বাবুকে সহস্র ধন্যবাদ জানাইলাম!

সে বছর পরীক্ষা দিতে পারিলাম না বলিয়া মনটা প্রথম প্রথম খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রথম হইতেই নতুন বড়বাবুর সুনজরে পড়িয়াছিলাম বলিয়া সে দুঃখ ভুলিতে বেশি দেরি হয় নাই। সেই বড়বাবুটি কেন যে আমার উপর প্রথম দিন হইতে এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন জানি না। তিনি আমায় বেশি কাজ করিতে দিতেন না এবং ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া যাইবার পর অন্য কর্মচারীরা যখন কাগজ কলম লইয়া মাথা ঘামাইত তখন তিনি আমায় বাড়ি যাইতে বলিতেন। ইহা ছাড়া এক-আধ দিন ছুটির দরকার হইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা মঞ্জুর করিয়া দিতেন এবং অফিসে আসিতে কোনদিন 'লেট' হইলেও আমায় কিছু বলিতেন না। আমার প্রতি বড়বাবুর এই অহেতুক স্নেহ লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য কর্মচারীরা রীতিমত ঈর্ষিত হইয়া উঠিল। তাহাদের সকলের মনে কেমন করিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিশ্চয় আমি বড়বাবুর কোন আত্মীয়। ইহা লইয়া তাহাদের নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা হইতে শুনিয়াছি। অবশ্য আমি কোনদিন তাহাদের সে ভুল ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করি নাই। বরঞ্চ ইহার জন্য সবাই আমাকে বেশ সম্ভ্রম করিত দেখিয়া আমি মনে মনে শুধু হাসিতাম।

এইভাবে মাস দুই-তিন কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ একদিন ছুটির পর বৃদ্ধ নীলকণ্ঠবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন, ভায়া, বড়বাবু বলছিলেন তাঁর ছোট মেয়েটির সঙ্গে তোমায় চমৎকার মানাবে—যদি তোমার কোন অমত না থাকে ত একদিন তুমি মেয়েটিকে দেখতে গেলে ভাল হয়!

এই নীলকণ্ঠবাবু বড়বাবুর সহকারী, তাঁহারই পাশে একই টেবিলে বসিয়া কাজ করেন। তাহা ছাড়া, একে বড়বাবুর মেয়ে, তায় তিনি নিজে এই কথা বলিয়াছেন শুনিয়া আমি যেন প্রথমটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তারপর সে অবস্থাটা কাটাইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি বলিব!

নীলকণ্ঠবাবু বোধ করি আমার মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি বলিলেন, এতে চিন্তার কি আছে ভায়া! চাকরি-বাকরি করছো, বিয়ের বয়েসও হয়েছে, তার ওপর বড়বাবুর মেয়েটি দেখতে-শুনতেও খারাপ নয়—

তখন আমি বলিলাম, সবই ঠিক, তবে কি জানেন, আমি যা মাইনে পাই তা ত আপনার অজানা নেই—তাতে ক'রে নিজের পেটই কোন রকমে চলে—তাই বিয়ে এখন করবো না বলেই স্থির করেছি।

নীলকণ্ঠবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় কি হে ভায়া—বড়বাবুর যারপরনাই সুনজরে পড়ে গেছো তুমি—এ তো তোমার সৌভাগ্য! আর উন্নতির কথা যদি বললে, উনি ইচ্ছে করলে কী না করতে পারেন। উনিই ত আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—উনি প্রসন্ন থাকলে চাই কী তোমাকে ও'র নিজের চেয়ারে পর্যন্ত বসিয়ে

দিতে পারেন। এই বলিয়া একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ'লে বড়বাবুকে কী বলবো—তিনি কাল সকালে অফিসে এসেই ত জিজ্ঞাসা করবেন ?

এইবার আমি মহা সংকটে পড়িলাম। এক দিকে বড়বাবু—যাঁর হাতে আমার চাকরি—আর-এক দিকে আমার ভবিষ্যতের কল্পনা, উচ্চাশা, আরো কত কি! একবার মনে হইল তাঁহার মুখের উপর বলিয়া দিই যে বিবাহ এখন আমি করিবই না—আবার ভাবিলাম যদি বড়বাবু ইহাতে অসন্তুষ্ট হন! এইভাবে মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করিয়া শেষে নীলকণ্ঠবাবুর প্রস্তাবেই রাজী হইলাম। কথা রহিল শনিবার বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় আমি বড়বাবুর বাড়ি যাইব।

ভাবিয়াছিলাম যদি বড়বাবুর মেয়েটি দেখিতে খারাপ হয় ত এক কথায় নাকচ করিয়া দিব—তবু একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দিতে পারিব। কিন্তু তাহাতেও ভগবান যেন বাদ সাধিলেন। বড়বাবুর মেয়েটি দেখিতে সত্যই ভাল! তখন পড়িলাম আরো বিপদে। নীলকণ্ঠবাবু একেবারে চাপিয়া ধরিলেন সামনের বৈশাখেই শুভকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম এবং নানা ওজর তুলিয়া দিন একেবারে তিন-চার মাস পিছাইয়া দিলাম। কথা রহিল, শ্রাবণ মাসের শেষে বিবাহ হইবে।

স্বার্থের খাতিরে এইভাবে জীবনের আদর্শকে ব্যাহত করিতে হইল বলিয়া প্রথমটা আমার মন খুব খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু বড়বাবুর অনুগ্রহে পরের মাস হইতে এমন এক জায়গায় আমি বদলী হইলাম যেখান হইতে প্রতিদিন আমার দুই তিন টাকা 'উপরি' রোজগার হইতে লাগিল। মাহিনা ছাড়া এইভাবে কাঁচা টাকা প্রত্যহ হাতে আসাতে আমার মন এরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে বড়বাবুকে মনে মনে দেবতাজ্ঞানে আমি পূজা করিতে লাগিলাম! আশ্চর্য! উপার্জন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীও যেন বদলাইয়া গেল। আমি মেস ছাড়িয়া দিয়া তখন একটি স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করিলাম। দুইখানি ছোট ঘর—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ও আলো বাতাস পূর্ণ। ইহারই মধ্যে নীড় বাঁধিবার বাসনা ধীরে ধীরে যেন বিকশিত হইয়া উঠিল। একটি-দুইটি করিয়া তখন জিনিস কিনিয়া আনিয়া আমি মনের মতো করিয়া ঘর সাজাইতে লাগিলাম। শ্রাবণ মাসের সেই শুভ দিনটির কথা স্মরণ করিয়া দেহে মনে বার বার এক অভিনব পুলক-শিহরণ অনুভব করিতে লাগিলাম। পুরুষের মনের সেই চিরন্তন তৃষ্ণা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল আমার অন্তরে—আমার সর্ব দেহে। স্ত্রীকে লইয়া ঘরসংসার পাতিবার জন্য আমার মন এমন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল যে সেই সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে চাহিয়া চাহিয়া কেবলি মনে হইত, সবই আছে, অথচ কী যেন নাই। একের অভাবে যেন সব প্রাণহীন! আবার এক একদিন ভাবিতাম, সত্যই নারীর স্পর্শ ছাড়া সংসার সুন্দর হইতে পারে না। তাহাদের দেহে, তাহাদের মনে, তাহাদের চাহনীতে যেন কি সুধা আছে, কি জাদু আছে, যাহার ফলে সংসার-মরুভূমিতে ফুল ফোটে, ফল ধরে, পুরুষের জীবনে আসে পূর্ণতা। সঙ্গে সঙ্গে

আমার ভাবী জীবনসঙ্গিনীর জন্য মনে এক অনির্বচনীয় শূন্যতা অনুভব করিতাম। এক একদিন আবার এমন মনে হইত যে, নিজের বোকামির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতাম। মনে হইত, কেন বলিলাম শ্রাবণ মাসে? যদি জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ় বলিতাম তাহা হইলে ত জীবনের এই দিনগুলি এমন করিয়া ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইত না! এমনি করিয়া যত বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইত ততই একটি সুন্দরী ষোড়শী তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া আমার মন যেন প্রজাপতির মতো নিত্য নূতন কল্পনার আকাশে রঙীন ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইত! ইহারই মধ্যে আবার পরীক্ষা দিবার কথা মনে পড়িলে আরো উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। মনে হইত আমার বই খাতা সে গুছাইয়া রাখিবে, আমায় রাত জাগিয়া পড়িতে দেখিলে সে তিরস্কার করিবে। কখনো বা শরীর খারাপ হইবে বলিয়া মুখে আশঙ্কা প্রকাশ করিবে এবং তাহাতেও আমার পড়া বন্ধ করিতে না পারিলে, শেষে বই কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া যাইবে।

একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিয়া এমনি সব কত কী কথা চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময় আমার সদর দরজায় একখানা থার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়িটির মাথায় দুইটি বড় বড় ট্রাংক, দুইটি চামড়ার সুটকেস ও একটি বড় বিছানা। কে এই সব লইয়া এমন অসময়ে আসিল দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতেই দেখি, সামনে দাঁড়াইয়া শান্তি! তাহার বিধবার বেশ—পরনে শুভ্র থান, দুই হাতে দুগাছি সরু সোনার চুড়ি এবং গলায় আরো সরু একটি সোনার হার চিকচিক করিতেছে!

শান্তিকে এই মূর্তিতে দেখিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইল না, তারপর অতিকষ্টে শুধু দুইটি কথা বলিলাম, শান্তি, তুমি!

হ্যাঁ আলোকদা, আমি। অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে সে যেন সেই কথাটি তখন উচ্চারণ করিল।

মালপত্র সব ঘরে তুলিয়া আমি তখন শান্তিকে আমার ঘরে লইয়া গিয়া বিছানার উপর বসাইলাম, তারপর যেন সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, শান্তি, কিন্তু এ অবস্থা তোমার কবে হ'লো?

সে তেমনি ভাবে উত্তর দিল, ছ'মাস হয়েছে, আলোকদা।

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু এই অবস্থায় তুমি একলা সেখানে এতদিন কেমন করে ছিলে?

সে বলিল, এতদিন একরকম করে ছিলুম, কিন্তু আর যখন পারলুম না তখন সব বেচে দিয়ে সেখানকার সম্পর্ক একেবারে তুলে দিয়ে তোমার কাছে চলে এলুম।

আমার কাছে! কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আমি যেন সচকিত হইয়া উঠিলাম। আমার নিজের কণ্ঠস্বরটাই তখন আমার কানে খারাপ শুনাইল।

ইহার মধ্যে যে কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন জ্বালা ছিল তাহা বোধ করি শান্তিরও

বুঝিতে দেরি হয় নাই। তাই সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোমারি কাছে আলোকদা! কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিলাম, বিশ্বাস হয়ত হ'তো যদি তুমি নিজে হাতে তা একদিন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে না দিতে।

শান্তি যেন গোপনে একবার শিহরিয়া উঠিল। তারপর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আলোকদা, সেদিন কি আমি খুব অন্যায় করেছিলুম—স্বামীর কাছে, শ্বশুরের ভিটেয়, নিজের বাড়িতে চলে গিয়ে? বলো—চুপ করে থেকো না? এই বলিয়া আমার চোখের উপর তাহার বিস্ফারিত চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিল।

বলিলাম, তাই যদি জানতে, তবে আবার ন্যাকামি ক'রে আমার সঙ্গে চলে আসবার কী দরকার ছিল?

বিশ্বাস করো আলোকদা, সেটা আমি আগে জানতে পারিনি, কিন্তু তোমার কাছে এসে তবে বুঝতে পারলুম কতটা অন্যায় করেছি।

বলিলাম, এখনো ত আবার সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না, আর সে উঠবে না।

বলিলাম, কেন?

সে বলিল, কারণ সে শান্তি আর নেই, সে মরে গেছে। এখন যাকে দেখছো সে আর-এক শান্তি!

কিন্তু আমি ত মরিনি! সেই পুরনো আলোকচন্দ্র এখ্‌নো তেমনি বেঁচে আছে। এই বলিয়া ছোট একটু হাসি চাপিয়া লইয়া কহিলাম, তোমার ভয়ের কারণ বরং আগেকার চেয়ে এখনই ত আরো বেশি।

আমার এই রহস্যের অন্তরালে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা বোধ করি শান্তি ধরিতে পারিয়াছিল, তাই একটুখানি হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া লইয়া বলিল, বরং তুমি যা বললে তার বিপরীত।

মানে?

মানে তখন ছিলাম পরস্ত্রী আর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন!

অর্থাৎ তখন যার স্ত্রী ছিলে তার প্রতি তোমার সতীধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখানো শেষ হয়েছে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই—এই ত?

ঠিক বলেছো। এই বলিয়া শান্তি মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, দেখ শান্তি, তোমার কথা শুনে আমার সেই মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ছে—

বেশ ত, তাতে ক্ষতি কি। সেই দ্রৌপদীই ত আমাদের দেশের আদর্শ সতী—সকালবেলা উঠে তাঁর নাম স্মরণ করলে সমস্ত দিন ভাল যায়!

আমি বলিলাম, কিন্তু আমার তাতে আপত্তি আছে।

আপত্তি!

ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম, হ্যাঁ। পুরুষ কি মেয়েদের হাতের পুতুল যে যেমন ভাবে নাচাবে তেমনি ভাবে সে নাচবে? তোমার জন্যে আমার অনেক গেছে কিন্তু আর নয়—আর কিছু আমি হারাতে প্রস্তুত নই।

কণ্ঠে স্নিগ্ধতা ঢালিয়া সে বলিল, কি সব পাগলের মতো তুমি বলছো আলোকদা?

বলছি এই যে, তোমার এখানে থাকা হতে পারে না।

কেন? সে কথা স্পষ্ট করে তোমায় বলতে হবে, এই বলিয়া শান্তি ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, তুমি তা বুঝতে পারবে না, শান্তি। তুমি যদি জানতে আমার মনে কত আশা কত আকাঙ্কা—তা হলে হয়ত ও-কথা আমায় জিজ্ঞেস করতে পারতে না। এই বলিয়া চুপ করিতেই শান্তি আমার ডান হাতখানি ধীরে ধীরে তাহার হাতের মুঠির মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, আলোকদা, আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি!

তাই যদি সত্যি হয়, তবে আমার কাছে তুমি থাকতে চেয়ো না। আমি অনেক আশা করে সংসার পেতেছি, তাতে তুমি আগুন জেবলে দিও না।

শুনিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শান্তি বলিল, শুধু দাসীর মতো তোমার সংসারে থেকে তোমার সেবা করতে এসেছি—আর আমি কিছুই চাই না অলোকদা!

বলিলাম, শান্তি, তুমি জানো না আজ আমার মত দুঃখী সংসারে কেউ নেই। তাই তোমার কাছে হাত জোড় করছি—আমায় ক্ষমা করো, আমায় বাঁচতে দ্যাও। আরো দশজনের মতো আমি সংসার পাততে চাই, সুখী হতে চাই, আমি সমাজের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

তখন শান্তি কতকটা আপন মনেই বলিল, ও বুঝেছি, আমি তোমার কাছে থাকলে লোকে তোমায় বদনাম দেবে—সমাজে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে, তাই তোমার এত ভয়! তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত জানো, তুমি ছাড়া আমার এমন আর কেউ নেই যার কাছে নির্ভয়ে এই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি! মা মারা গেছেন বিয়ের এক বছর পরেই। আর মামা? তিনি চাকরি নিয়ে কখন কোন্ দেশে থাকেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই! তবে এখন আমি কোথায় যাবো তুমিই বলে দাও?

না না, আমি তা বলতে পারবো না—তোমার যেখানে খুশি চলে যাও। আমি আর তোমার জন্যে সব হারাতে পারবো না—আমার অনেক গেছে—এবার আমায় রেহাই দাও।

শান্তি এবার আমার মুখের দিকে তাহার অশ্রুভারানত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আলোকদা, আমার জন্যে তুমি যা হারিয়েছো তা কি আর কোন রকমে ফিরিয়ে আনা যায় না?

তাহার চোখের কোণে জল দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে কী যেন উদ্বেল হইয়া

উঠিতেছিল, আমি প্রাণপণে তাহা দমন করিতে করিতে বলিলাম, কেমন করে তা হয় শান্তি ?

সে লজ্জাবিজড়িত স্বরে বলিল, একদিন তুমি আমায় ভালবাসতে, তাই আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, আমায় নিয়ে চোরের মত তোমার বাসায় চলে এসেছিলে। সেদিন শত অপমানের বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিতে তুমি একটুও ভয় পাওনি ! তবে আজ, চরম দুরাবস্থায় পড়ে, যখন আমি নিজে তোমার ঘরে এসে উঠেছি তখন কেন আমাকে এমন করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ ?

বলিলাম, শান্তি, পুরানো দিনের কথা থাক্—

দৃপ্তকণ্ঠে শান্তি বলিল, না থাকবে না—আগুনকে ছাই দিয়ে কতক্ষণ চেপে রাখা যায় ? আমি আজ এর একটা স্পষ্ট জবাব তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবার কহিল, আলোকদা, শুধু কি সমাজের ভয়ে তুমি আমায় আজ এইভাবে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছো—আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি করে বলো, আজ আমার সমস্ত আশা ভরসা এই তোমার মুখের কথার ওপর নির্ভর করছে !

ইহার উত্তরে শান্তিকে কি বলিব ভাবিতে লাগিলাম। সে তখন মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল, চুপ করে থেকো না—উত্তর দাও লক্ষ্মীটি !

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিলাম, যদি বলি, তাই।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, তা হ'লে আমি বলবো সমাজে ত বিধবা-বিবাহ আর দোষের নয়। বিদ্যাসাগর মশায়, রবি ঠাকুর, আশু মুখুজ্জের মতো দেশ-পূজ্য লোকেরা নিজেদের পরিবারের মধ্যে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার জন্যে ত কেউ তাঁদের সমাজে একঘরে করেনি ! এই বলিয়া একটু থামিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে সে আবার বলিল, একদিন বকুলফুলের মালা নিয়ে ছেলেখেলা করতে গিয়ে যার গলায় সত্যিকারের মালা পরিয়েছিলুম আজ যদি তাকে সকলের সামনে স্বীকার করি তাতে দোষ কি আলোকদা ? ভালবাসা কি কখনো মরে ? তুমি শিক্ষিত, অনেক লেখাপড়া করেছো—তোমাকে আর বেশি কি বলবো !

শান্তির মুখ হইতে এই সব কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমাকে তখনো নীরব থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, তবে যদি অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে আমি তোমার পথে বাধা হতে চাই না। তুমি যাতে সুখী হও আমি তাই করবো। এই বলিয়া সে চুপ করিল।

মনে হইল এইবার আমার বিবাহের কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিই কিন্তু কি জানি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। উপরন্তু সেদিন সারারাত আমার চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসিল না। শান্তির সেই কথা-গুলি যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই যেন মনে হইল সে সত্য কথাই বলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রূপ, শান্তির গুণ, তাহার বাল্যকালের সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে সে যেন অপরূপ হইয়া উঠিল আমার চোখের সম্মুখে।

সঙ্গোপনে অন্তরের অন্তস্তলে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আরো বিস্মিত হইলাম। শান্তির সহস্র স্মৃতি যেন একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল আমার অণুতে পরমাণুতে, দেহের শিরায় উপশিরায় ও প্রতি শোণিতবিন্দুতে। সমস্ত মন তখন শান্তির জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল। আমার অন্তর যেন বলিতে লাগিল শান্তিকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহাকে আমি ভালবাসিয়াছি। সেই কিশোর-হৃদয়ের প্রথম অর্ঘ্য দিয়া তাহাকে যে একদিন চুপি চুপি বরণ করিয়া লইয়াছিলাম—কে জানিত যে আজও ফল্গুর মতো আমার অন্তরে সে ভালবাসা চিরপ্রবহমাণ। তাই মনে হইল, সত্যই ত, আমি যদি বিধবা বিবাহ করি ত ক্ষতি কি—বরং তাতে সমাজের কল্যাণ হইবে। শান্তিও একটা আশ্রয় পাইবে আর আমিও তাহাকে পাইব! —বড়বাবুর কন্যা তখন শান্তির কাছে মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল।

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মনে পড়িল চাকরির কথা। বড়বাবুর কন্যাকে বিবাহ না করিলে নিমকহারামী করা হইবে। তাঁহারই অনুগ্রহে আজ আমার অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে—ভবিষ্যতে আরো উন্নতি হইবে, আমার উচ্চাশাও পূর্ণ হইবে। এমন সম্ভাবনাও আছে যে একদিন আমি হয়ত যথার্থ বিদ্বান ও যশস্বী হইতে পারিব—মধু, কমল ও ভুতোকে ছাড়াইয়া যাইব। তাহা ছাড়া বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর খুব অল্প দিনই বাকি। এখন কোন্ মুখেই বা বড়বাবুকে বলিব, আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি দ্বিধায় পড়িলাম। ভাবিলাম, কোন্ পথে যাই কে বলিয়া দিবে? একদিকে ভাল চাকরি, অর্থ, যশ, উচ্চাশা—আর একদিকে মনের মানুষ, আমার কৈশোর ও যৌবনের স্বপ্নসহচরী! কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে রাখিব! এই সব লইয়া ভাবিতে ভাবিতে যখন ভোর হইয়া গেল তখন আমার সংকল্প স্থির,—বুঝিয়াছি শান্তিকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে! অগত্যা সেইদিনই অফিসে গিয়া আমি নীলকণ্ঠবাবুর মারফৎ বড়বাবুকে জানাইয়া দিলাম যে তাঁহার কন্যাকে আমি বিবাহ করিতে অক্ষম।

নীলকণ্ঠবাবু ইহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তারপর প্রথমটা আমার হাত ধরিয়া অনেক বুঝাইলেন এবং পরে কাণ্ডজ্ঞানহীন বখাটে ছোকরা প্রভৃতি বলিয়া আমায় তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তবুও আমাকে এই দৃঢ় সংকল্প হইতে কিছুতেই টলাইতে পারিলেন না।

অফিসে বাহির হইবার সময় আমি শান্তিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। বৈকালে বাসায় ফিরিয়া বেশ একটু মধুর করিয়া সংবাদটি তাহাকে জানাইয়া সহসা স্তম্ভিত করিয়া দিব ভাবিয়াছিলাম। এবং সেজন্য সমস্ত দিন অফিসে কাজ করিতে করিতে মনে মনে ফুলের মালা গাঁথিবার মতোই একটির পর একটি অনেক কথা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম।

অফিসের ছুটির পর সেদিন ট্যাক্সি করিয়া বাসায় ফিরিলাম—শান্তিকে সেই

কথাটি জানাইবার জন্য তখন সমস্ত মন উৎসুক, অধীর। কিন্তু বাসায় ফিরিয়া দেখি—শান্তি নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আর তাহার জিনিসপত্রগুলি যেমন ছিল তেমনি আমার ঘরে পড়িয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি চাকরটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম সে কোথায়। এই চাকরটি আমার খুব বিশ্বাসী। সে আসিয়া বলিল আমি অফিসে যাইবার পরই শান্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে জানে না আর যাইবার সময় সে একখানি চিঠি দিয়া গিয়াছে আমাকে দিবার জন্য।

এই বলিয়া চাকরটি চিঠিখানি আমার বিছানার তলা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতিনিলয়েষু—

আলোকদা, কাল উত্তেজনার বশে আমার মাথার কিছু ঠিক ছিল না, তাই তোমাকে যা বলেছি তার জন্যে আমায় ক্ষমা করো। আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। অনেক ভাবলুম, দেখলুম যে, তোমার কথাই ঠিক। তোমার জীবনের পথে এসে বাধা হয়ে দাঁড়ানো আমার উচিত হয় নি। তোমার মনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—তুমি সমাজে কত বড় হবে! তাই তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি তোমায় না বলে চলে যাচ্ছি বহু দূরে। তুমি আমায় খুঁজতে চেষ্টা ক'রো না লক্ষ্মীটি! তবে যেখানেই থাকি, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো তোমার জীবনের সাধ যেন পূর্ণ হয়।

হ্যাঁ, যাবার আগে তোমার কাছে একটা শেষ অনুরোধ করছি—তোমায় রাখতেই হবে কিন্তু। আমার জিনিসপত্রগুলো আমি সব তোমাকেই উপহার দিলুম। বড় ট্রাংকটার মধ্যে একটা লাল রুমালে বাঁধা তিন হাজার টাকা আছে—ওটা তোমার বিয়েতে যৌতুক দিলুম মনে করে গ্রহণ ক'রো। আর ওই টাকার নীচে একজোড়া কংকন রইল—ওটা তোমার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দিয়ে মুখ দেখবো ভেবেছিলুম—তুমি আমার হয়ে ওটা তাকে দিয়ো, ওতে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। আমায় খোঁজবার চেষ্টা করো না—এই আমার শেষ মিনতি। তুমি সুখী হও।

ইতি—সেবিকা—শান্তি

চিঠিটা পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি করিব, কি না করিব ভাবিতে গিয়া যেন হাত-পা কাঁপিতে লাগিল।

তারপর দিনরাত পথে পথে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এক দিন দুই দিন, করিয়া যখন এক মাস কাটিয়া গেল তখন আর আমি কলিকাতায় থাকিতে পারিলাম না—শান্তিরই দেওয়া টাকাগুলিকে পাথেয় করিয়া পশ্চিমের দিকে রওনা হইলাম। চাকরি, পরীক্ষা, উচ্চাশা, সমস্ত তখন কোথায় ভাসিয়া গেল। আমায় যেমন করিয়াই হউক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে!

মহানদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

ন'বছর পরে শঙ্কর দেশে ফিরেছে !

মাত্র চার দিন হ'লো সে মুক্তি পেয়েছে পাঞ্জাবের সেই কুখ্যাত বোরেষ্টল জেল থেকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সন্দেহে বিরাট এক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সে, এতদিন ইংরেজেরই সুদূর কারাকক্ষে বিনা বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে। তিনদিন ধরে ক্রমাগত বড় বড় ট্রেণ বদল করতে করতে এখন সে দেশের গাড়ীতে উঠেছে। এই তার শেষ ট্রেণ যাত্রা।

মার্টিন্ কোম্পানীর ছোট গাড়ীটি বাঁশী বাজিয়ে দেশের ষ্টেশনে পেঁছিবার আগে থেকেই সে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। কতক্ষণে আসবে তার দেশ, কতক্ষণে দেখবে সে তার জন্মভূমি ! শঙ্করের প্রাণ ছটফট করতে থাকে। গাড়ী যেন আর এগোয় না—তার মনে হচ্ছিল লাফ দিয়ে কামরা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জানলা দিয়ে সে তাকিয়েছিল দূরে, যেদিকে তার গ্রাম। ষ্টেশন থেকে গ্রামটির দূরত্ব ক্রোশ দুই হলেও বড় মাঠটার বাঁক ফিরলেই গাড়ী থেকে গ্রামের আভাস পাওয়া যায়। শঙ্করের বুক ধড়াশ ক'রে ওঠে। ওই ত সেই বুড়ো শিবতলার উঁচু তালগাছটার মাথা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের শিরায় উপশিরায় যেন রক্তের প্রবাহ দ্রুত হয়ে উঠলো। ওইখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একদল পুলিশ। ওর পাশেই ছিল তাদের কংগ্রেস অফিস আর তাঁত-ঘর সেখানে বসে সে তখন চরকা কাটছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে যেন কত কি চিন্তা করে। সেদিন তার মনে ছিল কত স্বপ্ন !

গাছপালার ফাঁক দিয়ে হালদারদের সেই পুরনো তিনতলা বাড়ীটার চিলকুঠরী চোখে পড়তেই সে আবার চমকে উঠলো। সেখান থেকে আর কয়েকটা বাড়ীর পরেই ত তার বাড়ী ! বাড়ীর কথা মনে হতেই তার সর্ব্বপ্রথম মনে পড়লো বৃদ্ধা মাকে, ছোট ছোট দু'টি ভাই বোনকে এবং নববিবাহিতা এক ভগ্নিকে। এই ছোট ভাই বোন দু'টি ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়—এখন তাদের কেমন দেখতে হয়েছে, তারা কত বড় হয়েছে কে জানে ! সে বাড়ীতে গেলে তারা কিভাবে তাকে অভ্যর্থনা করবে সেই কথা ভাবতে লাগল ! দেশ থেকে সে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল কবে—যেন কত যুগের কথা ! কিন্তু সেই শিশুদের মুখগুলি তার বুকের মধ্যে আজো তেমনি আঁকা আছে !

ট্রেণ ষ্টেশনের লম্বা প্ল্যাটফর্মটা ছুঁতেই শঙ্করের বুক কেঁপে উঠলো। অনেকগুলি লোক একজায়গায় দাঁড়িয়ে যেন কার প্রতীক্ষা করছে আগ্রহে। ট্রেণের

কামরার দিকে তাদের সকলের দৃষ্টি! তবে কি গ্রামের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে? একবার মনে হলো, তা কি ক'রে সম্ভব! আবার মনে হলো হয়ত কোন রকমে খবর পেয়েছে! খবরের কাগজে কি তবে তার মুক্তির সংবাদ বেরিয়েছে? কে জানে! আনন্দে উৎসাহে শঙ্করের বুকটা যেন ফুলে উঠলো। জানলার মধ্যে দিয়ে সে মুখটা তখন এমনভাবে বার ক'রে দিলে যাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে তার ওপরে। কিন্তু হায়! তার কামরাটা দেখতে পাবার আগেই তারা 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। আর অপর একটা কামরা লক্ষ্য করে সকলে ছুটতে লাগল।

ট্রেণটা তখনো চলছিল, সম্পূর্ণ থামেনি। শঙ্কর ছিল আগের দিকে, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়, তাই সকলকে মাঝামাঝি একটা কামরার কাছে গিয়ে জটলা ক'রতে দেখে নিমেষে শঙ্করের সমস্ত আগ্রহ যেন নিভে গেল!

গাড়ী থামবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখলে একটি লোক প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে যেই নামল অমনি তার গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তারা 'বন্দেমাতরম্' বলে নানারকম স্বদেশী জয়ধ্বনি করে উঠলো। তারপরে বাইরে যে মোটর গাড়ীটা অপেক্ষা করছিল ফুলে, লতাপাতায় সুসজ্জিত হয়ে, তাতে তাঁকে উঠিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে সকলে গ্রামের দিকে চলে গেল।

শঙ্কর দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করলে। ভীড়ের মধ্যে যেসব গ্রামবাসী ছিল তাদের অনেককেই সে চিনতে পারলে। এরাই একদিন তাকে এমনিভাবে জয়ধ্বনির সঙ্গে বিদায় দিতে এই ষ্টেশনে এসেছিল। সেদিনের সে দৃশ্য সহসা যেন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটি সেদিন সকল শ্রেণীর বালক বৃদ্ধ যুবক-যুবতী জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একেবারে ভরে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে, রেলিংঙের বাহিরে, পাশের বড় বড় গাছগুলোর ওপরে—এতটুকু স্থান ছিল না। লোকে-লোকারণ্য, কেবল মানুষের মাথা, সমস্ত গ্রামটা যেন ভেঙে পড়েছিল তাকে বিদায় দিতে।

তারপর গাড়ী যখন ছাড়লো তখন ওই অসংখ্য নরনারী সকলের চোখে দেখেছিল জল—সবাই কাঁদছে তার জন্যে!

শঙ্কর আর ভাবতে পারলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো।

ষ্টেশনমাষ্টারটি নতুন, তাকে চিনতে পারলে না। তখন সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না। পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য শঙ্কর মেঠো পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলে। আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে ক্রমশ পল্লীর পথ ঘাট সব নির্জ্জন হয়ে এলো। এঁকে বেঁকে অতি-পরিচিত বন-জঙ্গল, মাঠ, পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে কত কথা তার মনে পড়তে লাগল!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর শঙ্কর গিয়ে বুড়ো শিবতলায় হাজির হলো।

ওই ত তার পাশেই রয়েছে সেই ঘরটি যেখানে ছিল কংগ্রেস অফিস! শঙ্কর এগিয়ে গেল সেদিকে। কিন্তু দরজার কাছে যেতেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! দেখলে সে কংগ্রেস অফিস আর নেই—তার দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে তাতে লেখা "ইয়ংমেন্‌স ড্রামাটিক ক্লাব"। এই ঘরটা ছিল তার কাছে পবিত্র মন্দিরের মত! যারা এর পবিত্রতা নষ্ট করেছে তাদের দেশদ্রোহী নাস্তিক বলে তার মনে হলো। একটা অসহ্য জ্বালা বুকের মধ্যে সে অনুভব করলে। তবু অন্ধকারে আরো একটু এগিয়ে গেল জাতীয় বিদ্যালয়টা এখনো আছে কিনা দেখতে। ঠিক সেই সময় রাস্তার পাশ দিয়ে একজন লোক একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে যাচ্ছিল, তার আলো স্কুলের দরজায় গিয়ে পড়তে শঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল, দেখলে সেটা স্কুল বটে তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের বদলে নাচের স্কুল—ভদ্দরলোকের মেয়েদের সেখানে 'ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স' শেখানো হয়।

শঙ্কর ছুটে গিয়ে সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা এখান থেকে কংগ্রেস অফিস আর জাতীয় স্কুলটা কোথায় উঠে গেছে বলতে পারেন? লোকটা মুখে একটা কুৎসিত শব্দ করে বলে উঠলো, যমের বাড়ী! তারপর আরো একটু এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনের পলতেটা কমিয়ে দিতে দিতে বললে, তুমি বুঝি বিদেশী লোক? সে সব ঘুচে গেছে কোন কালে—বোধহয় আট ন'বছর হলো!

শঙ্করের চোখ ফেটে জল এলো! সে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলে না। থরথর করে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল! তার হাতে গড়া বড় সাধের এই প্রতিষ্ঠান। এর জন্মকাহিনী তখন মনে প'ড়লো। লোকের কাছ থেকে একটা একটা ক'রে পয়সা ভিক্ষা করে এনে সে এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ১৯৩০ সালটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। গান্ধীজীর ডাণ্ডিযাত্রা! লবণ আইন ভঙ্গ—দেখতে দেখতে ভারতের কারাগার হলো তীর্থ। শুধু নেতাদের চরণধূলিতে নয়—জনসাধারণের পায়ের ধুলোর প্রাত্যহিক স্পর্শে! স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় সেই দিনগুলি! ঘরে ঘরে চরকা তকলীর উঠলো গুঞ্জন। গ্রামের ছোট বড় সবাই বর্জ্জন করলে বিলেতী বস্ত্র, বিদেশী জিনিস! সিগ্রেট খাওয়া পাপ, শাসকদের রং সাদা আর তাদের স্পর্শে চিনির রং সাদা হয়েছে বলে অনেকে তাও ত্যাগ ক'রে গুড় খাওয়া ধরলে। আসমুদ্র হিমাচল মুখরিত হয়ে ওঠে। বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে। সেদিন তারা কত স্বপ্ন দেখলো এক নতুন জীবনের, স্বাধীন ভারতবর্ষের!

শঙ্করের মনে পড়লো সেদিন সেই মহাহ্বানের বাণী সে-ইত প্রথম শুনিয়েছিল তার এই গ্রামবাসীদের! সেই প্রথম উদ্বোধন করেছিল সেখানে স্বদেশী আন্দোলন। কত ছেলেকে সে দিয়েছে মন্ত্র, কত বালক বৃদ্ধ নরনারীর মনে সে জাগিয়েছে দেশাত্মবোধের চেতনা। দলে দলে লোক তার সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, জাতীয় পতাকার তলে এসে মিলিত হয়েছে। ইংরেজ শাসকদের হাতে তাদের কত লাঞ্ছনা হয়েছে। এই ত সেদিনের কথা। তবু শাসকদের রক্তচক্ষু ও দুর্ব্যবহারের শত

লাঞ্ছনার দাগ দেহে নিয়ে মুখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি! কুড়িখানা তাঁত দিনরাত ঠকাঠক করে চলতো, দু'শো চরকা গুঞ্জন তুলে তার সুরে সুর মেলাতো!

আর ভাবতে পারলে না শঙ্কর! যাদের হাতে সেদিন সে এর ভার তুলে দিয়ে গিয়েছিল তারা কোথায় এখন?

সহসা শঙ্করের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো! তার চোখের সামনে আবার ফুটে উঠলো সেই বিদায় দৃশ্য! ট্রেণ ছাড়তে অশ্রু ছলছল চোখে সবাই হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বিদায় জানালো! সেদিন তাদের সেই হাত নাড়ার মধ্যে শঙ্কর যে পেয়েছিল এই প্রতিশ্রুতি—"আমরা ত রইলুম, ভয় কি, তোমার উদ্দেশ্য সফল করবোই আমরা প্রাণ দিয়ে। তাই ত তার কারাবাস সেদিন স্বর্গবাস মনে হয়েছিল, দেশ সেবা সার্থক মনে হয়েছিল! জমিতে বীজ বপন ক'রে চাষী যেমন ফসলের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তেমনি মনের আশা নিয়ে সে দেশে ফিরছিল!

শঙ্কর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। তার বুকের মধ্যে থেকে কি যেন একটা ঠেলে উঠে তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে লাগল। মায়ের মৃত্যুর বহুদিন পরে হঠাৎ সেই শ্মশানে এসে পড়লে যেমন মনের ভাব হয় শঙ্করের মনে হতে লাগল তেমনি একটা অনুভূতি! সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে সেগুলো দেখতে পারলে না। তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের পথঘাট জনশূন্য। একলা বহু-পরিচিত পথে অজ্ঞাত বিদেশীর মত ভারাক্রান্ত মনে শঙ্কর হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর গিয়ে রায়পাড়ার মোড়ে এসে সে থমকে দাঁড়ালো। সেখানে একটা মাঠ বহুদিন পর্য্যন্ত জঙ্গল হ'য়ে পড়েছিল, তার ওপর কে এমন বাড়ী করলে? প্রাসাদোপম অট্টালিকা? ফটকের ওপরে একটা বড় তেলের আলো জ্বলছিল। তারই আভায় শঙ্কর দেখলে একটি প্রস্তরফলকে লেখা—'নরেন্দ্র-ভবন'।

আরো একটু এগিয়ে তার চোখে পড়লো রাস্তার ওপর একটানা লম্বা ঘর। তার সামনে প্রকাণ্ড একখানা সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা 'নরেন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়'। এ ছাড়া একটু এগিয়ে যেতে দেখল কাছাকাছি দুটো বড় বাড়ী তার একটায় লেখা 'নরেন্দ্র হাই স্কুল', আর একটায় 'হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়'।

এইবার শঙ্করের বুঝতে বাকী রইল না যে কোন এক ধনী ব্যক্তির কীর্ত্তি এই সব! কিন্তু কে এই ব্যক্তিটি, আর কে এই নরেন্দ্র—মনে মনে অনেক তোলপাড় ক'রেও সে বুঝতে পারলে না। যতদূর তার মনে পড়ে তাদের গ্রামে এমন ধনী ও উদারহৃদয় কোন মহাপুরুষ ছিল বলে তার স্মরণ হলো না!

এতক্ষণে শঙ্করের মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। সত্যি হাই স্কুলের জন্যে আগে গ্রামের ছেলেদের কি দুর্দ্দশাই না ভোগ করতে হয়েছে। দু' ক্রোশ পথ হেঁটে পাশের গাঁয়ে পড়তে যেতে হতো। আর মেয়েদের বিদ্যার দৌড় ছিল দ্বিজেন পণ্ডিতের পাঠশালা পর্য্যন্ত—আপার প্রাইমারী স্কুল, তাও তার শেষ

পরীক্ষাটা দেওয়া সব মেয়েদের জীবনে ঘটে উঠতো না !

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় শঙ্কর একেবারে তার বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলো। বহুদিনের পুরণো একতালা বাড়ী, তার চারিদিকে লোনাধরা ইঁটের দেওয়াল, তাতে ভাঙা একটা দরজা। ভিতরে পা দিয়েই শঙ্কর ডাক্‌লো, মা, মা।

তার মা তখন রান্নাঘরে কি করছিলেন। বহুকাল পরে ছেলের কণ্ঠস্বর কানে গেলেও তিনি যেন তাঁর এতবড় সৌভাগ্যের কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আশা আশঙ্কায় কম্পমান বক্ষে তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কিন্তু সত্যি-সত্যি শঙ্করকে সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন —বড়খোকা তুই !

হ্যাঁ মা, আমি ! ছুটে গিয়ে শঙ্কর যেমন তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো অমনি তিনি মূর্চ্ছা গেলেন !

বারকতক ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে শঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে তখন ছোট ভাই ও বোনের নাম ধরে ডাকতে লাগল, ওরে বীরু, ওরে কল্যাণী তোরা কোথায় শীগ্‌গির আয়।

কোথায় বীরু, আর কোথায় কল্যাণী ? তারা কবে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে সে খবর শঙ্কর জানতো না। একটি চার বছরের ও আর একটিকে ছ' বছরের রেখে শঙ্খর জেলে যায়। ওরা দু'টি ছিল যেন তার গলার হার—এক-মুহূর্ত্ত তাদের চোখের আড়াল করতে গেলে তার বুক ভেঙে যেতো। তার স্নেহের ভাই বোন দুটি যে সে বাড়ী থেকে চলে যাবার দু'বছর পরেই মারা যায়, একথা জেলে থাকতে কেউ তাকে জানায় নি। এরা এখন কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে, দাদাকে তাদের এখনো মনে আছে কিনা—প্রথম তাকে দেখে তার মুখের দিকে তারা কি ভাবে তাকিয়ে থাকবে—এইসব নানা কথা সে সারাপথ চিন্তা করতে করতে এসেছে।

তাদের নাম ধরে ডাকতে যখন তার বিধবা বড় বোনটি ঘর থেকে একটা পাখা ও এক ঘটি জল নিয়ে সেখানে ছুটে এলো, হৈমন্তীকে দেখে শঙ্কর চমকে উঠলো। ভগ্নিপতির মৃত্যুর সংবাদটাও যে তাকে গোপন করা হয়েছে, একথা বুঝতে তার এতটুকু বিলম্ব হলো না। তার বড় স্নেহের বোন, বড় আদরের বোন ছিল হৈমন্তী। তার এই দুর্ভাগ্য দেখে শঙ্কর বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ ভগ্নির মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হিমিরও যেন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দাদাকে কি বলবে ভেবে না পেয়ে উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে সংবরণ করতে করতে শুধু বললে, দাদা, তুমি ওরকম করে চেয়ে আছো কেন ভাই ?

কথাটা যেন শঙ্করের কানে ঢোকেই নি। সে তেমনিভাবে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

হৈমন্তী আরো বারকতক 'দাদা দাদা' বলে ডাকতে তার হুঁস হলো। সহসা স্বপ্নভঙ্গ হলে যেমন মুখের ভাব হয় তেমনিভাবে শঙ্কর তখন বলে উঠলো, কে হিমি? ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তারা কোথায় গেলরে বীরু, কল্যাণী? কৈ চুপ করে রইলি কেন, বল?

হৈমন্তী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন প্রাণ-পণে বুকের মধ্যে চেপে নিলে। তারপর ভাইকে মায়ের শারীরিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বললে, তুমি যাওয়ার পর থেকেই দাদা মায়ের এই রোগটা দেখা দিয়েছে। তোমার কথা বলতে গেলেই প্রায় এমনিভাবে মুর্চ্ছা যায়। বলতে বলতে মুখে চোখে বারকতক জলের ঝাপটা দিয়ে মায়ের মাথায় পাখার বাতাস করতে লাগল। শঙ্কর মায়ের অচৈতন্য দেহটিকে বুকের ওপর ধরে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরেই মা চোখ মেলতেই শঙ্কর ডাকলে মা, মাগো?

খোকা? আমার শঙ্কু?

হ্যাঁ, মা, এই ত আমি?

কৈ—কৈ—তুই—আয় আমার বুকে আয়রে। বলতে বলতে উঠে বসেই আবার মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন শঙ্করের বুকে।

অনেকক্ষণ পরে তারা ভাই বোনে আবার মাকে সুস্থ করে তুললে। এইবার তার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরে এলো। তিনি ছেলের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

শঙ্কর বললে, মা বীরু কল্যাণী—তাদের ত দেখতে পাচ্ছি না, তারা কোথায়?

মা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন—ওরে বীরু, ওরে কল্যাণী তোরা কোথায় গেলিরে, ওরে তোদের দাদা যে ফিরে এসেছে রে।

ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না পারলেও আশঙ্কায় শঙ্করের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। সে তাড়াতাড়ি হৈমন্তীর মুখের দিকে চাইলে। অমনি কান্না চাপতে চাপতে হৈমন্তী বললে, দাদা তাদের ভগবান কেড়ে নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে—তারা আর বেঁচে নেই!

বেঁচে নেই! শঙ্কর দু' হাতে তার নিজের মাথার চুল মুঠি করে ধরল। তার মনে হলো যেন ভূমিকম্পে চারিদিক কাঁপছে, আকাশ, বাতাস, মাটি যেদিকে চায় সব অন্ধকার, কিছু দেখতে পায় না!

হৈমন্তী বললে, দাদা তারা ভাগ্যবান, তাই এই অভিশপ্ত পৃথিবী থেকে তাড়া-তাড়ি চলে গেছে—আমাদের মুক্তি দিয়ে।

শঙ্করের চোখ দুটো সহসা যেন জ্বলে উঠলো! সে বললে, ভুল। তারা আমাদের মুক্তি দেয়নি, দিয়েছে মৃত্যু! তাদের এই অকালমৃত্যু যে আমাদের জাতির অকালমৃত্যু! আজকে দেশের কাজে যে তাদেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী! আমি যে বড় আশা করে তাদের মুখের দিকে চেয়েছিলুম। তারাই যে আমাদের

একমাত্র আশা ভরসা।

হৈমন্তী আবার বললে, দাদা তুমি যদি দেখতে কেমন করে অনাহারে, অচিকিৎসায় তারা মরেছে—ওষুধ নেই, পথ্য নেই, পয়সা নেই—তা হ'লে হয়ত ওকথা মুখে উচ্চারণ করতে না?

শঙ্কর উন্মাদের মত আপন মনেই যেন বললে, বাঃ-বাঃ-বাঃ—এমনি ক'রে মরেছে? সত্যি সত্যি বলছিস তুই?

উদ্গত অশ্রু দমন করতে করতে সে বললে, হ্যাঁ—দাদা—আমি তোমায় মিথ্যে বলছি!

হ্যাঁরে, দেশের লোকেরা দেখেছে ত সব—তারা জেনেছে ত যে কিভাবে ওরা মরেছে—না খেতে পেয়ে—বিনা চিকিৎসায়—আর কাদের জন্যে?

হৈমন্তী বললে, দেশের লোকেরা দেখেছে তাদের মরতে—তবে কাদের জন্যে মরেছে তা তারা জানে কিনা বলতে পারি নে।

ক্ষিপ্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠলো, জানে না কেন?

কেমন করে জানবে, দাদা? তারা জানে যে আমরা গরীব, আমাদের অভাব, আমাদের কিছু নেই তাই তারা মরেছে।

কিন্তু কেন আমাদের অভাব? কেন আমাদের কিছু নেই?

হ্যাঁ, তা জানে, দাদা। তুমি জেলে, ওদের খাওয়াবে কে? তাই তাদের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে।

কেন আমি জেলে রইলুম? কাদের জন্যে? তা কি তারা বোঝে না?

কম্পিত স্বরে হৈমন্তী বললে, তা যদি বুঝতো কেউ দাদা, তাহলে কি আজ আমাদের এই অবস্থা হয়? বলতে বলতে কান্নায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তারপর আবার চোখের জল সংবরণ করতে করতে বললো, এদেশে কি মানুষ আছে দাদা?

ছিঃ, ছিঃ, ওকথা বলিসনি, তা'হলে পাপ হবে রে! মানুষ যদি না থাকে ত কাদের জন্যে আমরা জেলে গিয়েছিলুম? আজ হাজার হাজার দেশবাসী কাদের জন্যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে অন্ধকার কারাগারের মধ্যে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটাচ্ছে? খবরের কাগজে তাদের নির্য্যাতনের কত কাহিনী বার হচ্ছে দেখেছিস ত? মখমলের শয্যায় শুয়ে আরামের সহস্র সুখ যার ভোগ করার কথা, সে লোহার গারদের সঙ্গে শিকলে বাঁধা—ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—রাত নেই দিন নেই! আর যম দূতের মত প্রহরীরা লৌহশলাকা হাতে নিয়ে তার চারিপাশে তাড়না করছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার শুরু করলে, ভাবতে পারিস মাসে হাজার হাজার টাকা যে রোজগার করতো সে খাচ্ছে এমন খাদ্য যা কুকুরেও ছোঁয় না? আলো নেই, বাতাস নেই, এমন অন্ধকার ঠাণ্ডা 'সেল'-এ শুধু মেঝেতে কম্বলের ওপর পড়ে বছরের পর বছর কাটাচ্ছে? ভাবতে পারিস রাজপুত্রের মত চেহারা

কত সব ধনীর সন্তান তিলে তিলে শুকিয়ে গেল চোখের সামনে। কেন? কিসের আশায় তারা এই নির্যাতন সহ্য করছে? সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সে বললে, দেশে মানুষ নেই একথা বলিসনি—তাহ'লে যে এ ত্যাগ মিথ্যা হয়ে যাবে, এ ব্রত ব্যর্থ হবে রে?

হৈমন্তী বললে, কিন্তু দাদা তা যদি না হতো ত তুমি চলে যাবার পর আমাদেয় এভাবে দিন কাটাতে হলো কেন? কেন সেই উদ্দীপনা সেই স্বদেশপ্রেম তোমার যাবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁ থেকে মুছে গেল? পুলিস ধরপাকড়, মারধোর চরমে উঠলো। যেখানে এতটুকু স্বদেশীর গন্ধ, সেখানে ছুটে গিয়ে ঘরদোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর দিতে লাগল। ভয়ে আর কেউ মুখে বন্দেমাতরম উচ্চারণ করলো না। জানো দাদা, যারা তোমার সঙ্গে একদিন ছায়ার মত ঘুরতো তারা আমাদের দেখলে চিনতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়—যেন আমরা তাদের শত্রু! তুমি স্বদেশী ক'রে জেলে গেছ আর আমরা তোমার মা, বোন, ভাই এই নাকি আমাদের অপরাধ! তাই যারা আমাদের সাহায্য করে তারাও নাকি তোমারই মত অপরাধী। দেশে যদি মানুষ থাকতো তাহ'লে এ কখনো সম্ভব হতো? মধুদা, বিণ্টু, প্রতাপ, তারা আসতো আমাদের দেখাশুনা করতো, কিন্তু হঠাৎ একদিন শোনা গেল তাদের নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে—তাদের কাছে কোন কিছু পাওয়া যায়নি, তারা প্রকাশ্যে নাকি কোন কিছু করে না তবে গোপনে এই বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাকি আলগা করে দেবার চেষ্টা করে! মাধব ঘোষাল বেচারা তিন ক্রোশ দূর থেকে তার ক্ষেতের চাল, কলাই, তরকারী দিয়ে যেতো—শুনলাম কারা তার বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে—

একটু চুপ ক'রে থেকে হৈমন্তী আবার বললে, এমনিই আমাদের ভাগ্য যে—যে কেউ নাকি আমাদের সাহায্য করতে আসে তারই কোন না কোন অনিষ্ট হয়। কে করে—কারা করে—কেন করে—তা আজও বুঝতে পারলুম না। লোকের বাড়ী গিয়ে জানিয়েছি কোন প্রতিকার হয়নি, উল্টে দেখেছি ক্রমশ আমরা একেবারে যেন একঘরে হয়ে গিয়েছি।

হৈমন্তী চুপ করতেই দেখলে তার দাদা স্তব্ধ হ'য়ে কি ভাবছে!

একটু পরে শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁরে হিমি, তিনুর খবর কি?

হিমি বললে, কি ক'রে জানবো দাদা, সে ত আর আমাদের বাড়ী আসে না!

আসে না, সে কিরে?

হ্যাঁ দাদা, তার বড় ভাই নাকি কোন সরকারী অফিসে চাকরী করে তাই পাছে আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করলে তার দাদার চাকরী যায়, সেইজন্যে তিনুদার বাবা তাকে আমাদের বাড়ীতে আসতে নিষেধ করেছেন। সেও আর আসে না!

বিস্মিতকণ্ঠে শঙ্কর শুধু বললে, বলিস কি রে—এ যে বিশ্বাস হয় না?

হৈমন্তী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, হঁ্যা দাদা, শুধু ওইখানেই শেষ নয়—আরো আছে—তোমার তিনু নিজে এখন মিলিটারী কনট্রাক্ট নিয়েছে। এ অঞ্চল থেকে তরী-তরকারী, চাল-ডাল, দুধ, ঘি নিয়ে গিয়ে আমতায় চালান দেয়। সেখানে একদল গোরা সৈনিকের নাকি ক্যাম্প পড়েছে!

অসম্ভব! বলে শঙ্কর উত্তেজিত হয়ে দাঁড়ালো।

হৈমন্তী ম্লান হেসে বললে, এদেশে কিছুই অসম্ভব নয় দাদা। এ মাটির গুণ! ভুলে যেয়ো না যে এখানে এই বাংলার মাটিতে একদিন মিরজাফর, উমিচাঁদও জন্মেছিল!

শঙ্করের বাল্যবন্ধু ছিল তিনু। দেশে স্বদেশী আন্দোলন চালাতে গিয়ে তারা দু'জনে একসঙ্গে কত কাণ্ড করেছে! এই তিনু একদিন মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়েছিল—একটা লোক তার পা-ধরে রাস্তার ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে যখন একটা কালো ঢাকা গাড়ীতে তাকে তুলেছিল তখন তার পিঠের ছালগুটিয়ে গিয়ে রক্ত ঝরছিল। সে দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। তারপর তাদের দু'জনেরই ছ'মাস ক'রে জেল হয়েছিল। আরো কত লাঞ্ছনা! শঙ্কর অতীতের সে সব কাহিনী আর ভাবতে পারলে না। তার দেহের সমস্ত রক্ত তখন ফুটছে টগবগ ক'রে। সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। একবার তিনুর সঙ্গে দেখা করবে সে।

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বললে, আজ থাক না দাদা কাল হবেখন—তুমি এইমাত্র এলে, একটু বিশ্রাম করো—জলটল খাও।

তুই সব জোগাড় কর—আমি এখনি আসছি। কতদিন দেখিনি তিনুকে—

এর ওপর আর হৈমন্তী কথা বলতে পারলে না। সে জানতো যে তার দাদা একদিন কি ভালবাসতো এই তিনুকে। দাদা তিনুর কাছ থেকে হয়ত এখুনি মনে কত আঘাত পাবে—এই মনে করে গোপনে সে চোখের জল মুছলে!

তিনুদের বাড়ী বেশী দূর নয়। এপাড়া ওপাড়া। শঙ্কর বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখলে তাদের ঘরের সব জানলা দরজা বন্ধ! বাইরে থেকে বারকতক তিনুর নাম ধরে ডাকবার পর ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ ভারী গলায় উত্তর দিলে, বাড়ী নেই।

শঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে, কোথায় গেছে?

তখন তিনি বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, কোথায় নাকি ছাইপাঁশের থিয়েটার হচ্ছে তাই শুনতে গেছে।

রাস্তায় দু'চারজন লোককে সে ছুটতে ছুটতে যেতে দেখেছে বারোয়ারীতলার দিকে এবং তাদের মুখে থিয়েটারের কথাও শুনেছে। তবে তখন তার মন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত ছিল বলে ভাল করে সেদিকে মন দেয় নি।

তিনু থিয়েটার শুনতে গেছে শুনে শঙ্কর ফিরে যাচ্ছিল। দু'এক পা অগ্রসরও হয়েছিল কিন্তু সহসা তার মনে হলো যখন এতটা দূর এলুম তখন আর একটু গেলেই ত বারোয়ারীতলা! শুধু তিনু কেন সেখানে গেলে হয়ত পুরণো

বন্ধুবান্ধব ও গ্রামের আরো অনেক লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে! এতদিন পরে দেশে ফিরে তার যেন গ্রামের সব লোককে তখনি চোখে দেখবার জন্য মনের মধ্যেটা কেমন আকুলিবিকুলি করে উঠছিল!

বারোয়ারী তলায় গিয়ে শঙ্কর দেখলে এক বিরাট কাণ্ড! একটি সুসজ্জিত স্টেজের ওপর কতকগুলি কুমারী মেয়ে নাচছে—কি নির্লজ্জ তাদের অঙ্গভঙ্গি! মিনিট খানেকের মধ্যেই নাচ শেষ হয়ে গিয়ে আবার সুরু হলো গান। একি, এ যে বাইজী! মুখে রংমাখা, সর্ব্বাঙ্গে গহনার বোঝা! মুসলমান সারেঙ্গী, তবলচী, হারমোনিয়ম-বাদক তার গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে। মুহূর্ত্তে শঙ্কর ফিরে দাঁড়ালো। তিনুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা তখন তার মন থেকে দূর হয়ে গেল কিন্তু যেমন দু'এক পা এগিয়েছে অমনি ঘণ্টা একেবারে পিছন থেকে তার জামাটা টেনে ধরলে। ছেলেবেলায় তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়তো। শঙ্করকে দেখে সে আনন্দে আত্মহারা, একেবারে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, কবে এলিরে?

এই ত আজই এসেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা হ'লো, শঙ্কর বললে।

ঘণ্টা অল্প কথায় কুশল প্রশ্ন করেই বলে, ওঃ আজ ভয়ানক একটা ভাল দিনে তোকে পেয়েছি।

শঙ্কর কৌতুহলী হয়ে উঠলো। জিগ্যেস করলে, কেন, আজ কি?

ঘণ্টা সগর্ব্বে উত্তর দিলে, আজ আমাদের 'ড্রামাটিক্ ক্লাবের এনিভারসারী'—ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব! সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতর স্বরে বললে, আজকের এখানকার যাবতীয় খরচা দিয়েছেন আমাদের সভাপতি মশায়—ওঃ ভারী ভালো লোক—কি দিলদরিয়া মেজাজ!

শঙ্কর জিগ্যেস করলে, কিন্তু কে এই সভাপতি মশায়?

তিনু বললে, শিবনাথবাবু, এই গ্রামেরই ছেলে—ছেলেবেলা থেকে দেশত্যাগী হয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—তারপর এই যুদ্ধ লাগতে হঠাৎ একেবারে লালে লাল! যাকে বলে লক্ষপতি! এখন ঘরের ছেলে ফিরে এসেছেন। বিরাট ঘরবাড়ী, জমিজমা কত কি। আমাদের গ্রামে এখন ইনিই সবচেয়ে ধনী! এখানে স্কুল, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী সব হয়েছে—তাঁরই অনুগ্রহে। বিস্তর দানধ্যান!

শঙ্কর বললে, তা এই খরচের বহর দেখেই বুঝতে পারছি।

ঘণ্টা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, খরচের কি তুই এখান থেকে দেখ্‌ছিস—ভেতরে চল, বুঝতে পারবি। কলকাতা থেকে ভাল ভাল পোষাক এসেছে থিয়েটারের জন্যে—তাছাড়া দুজন নামকরা বাইজী এসেছে। বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন রসসিক্ত হয়ে উঠলো, বললে, আমাদের এই পল্লীগ্রামে এর আগে কেউ কোনদিন বাইজীর নাম শুনেছে? এর ওপর আবার লুচি, মাংস যে যত পারো খাও—প্রায় দেড়শো মেম্বারের জন্যে ব্যবস্থা!

শঙ্কর এর উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঘণ্টা তার মুখের কথাটা কেড়ে

নিয়ে বললে, ভাই তুই যখন এসেছিস তখন সভাপতি মশায়কে ধন্যবাদটা আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে দিয়ে দে।

ঘণ্টা একেবারে নাছোড়বান্দা। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোক এসে তাকে এমনভাবে অনুরোধ করলে যে শঙ্কর কিছুতেই তাদের হাত থেকে রেহাই পেলো না। তারা বললে, এও একটা দেশের কাজ! এই রকম একটা মহাপ্রাণ ব্যক্তি কি সহজে দেখা যায়! টাকা উপার্জন করে অনেকে কিন্তু এমন মুক্তহস্তে ক'জন পারে তা দেশের মানুষের জন্যে খরচ করতে!

অবশেষে শঙ্করকে যেতে হলো।

কিন্তু ধন্যবাদ দিতে গিয়ে প্রথমেই শঙ্কর ওজস্বিনী ভাষায় সুরু করলে, দেশের এই দুর্দ্দিনে একরাত্রির তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের জন্য এতগুলো টাকা এইভাবে নষ্ট হতে দেখে আমি মর্মান্তিক দুঃখ বোধ করছি। পঞ্চাশের মন্বন্তর এখনো শেষ হয়নি, তার চিতার আগুন এখনো নেভেনি—অভাব, অনটন, অনাচার, অকালমৃত্যু, ব্যাধি এখনো দেশের আকাশ বাতাসকে অশ্রুভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। এরই মধ্যে এই নৃত্যগীতের আসর মনে হয় যেন বিদ্রূপ করছে আজ সমগ্র দেশকে। আমার গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে যুবকদের প্রতি নিবেদন, তারা যেন একবার ভেবে দেখে যে আজ তারা কি করছে! যারা দেশের ভবিষ্যত, যাদের হাতে সমস্ত জাতির আশা-ভরসা, তাদের কি এখন এমনি করে শ্মশানের ওপর বাঁশী বাজাবার আয়োজন করা ঠিক হয়েছে? তবে কার মুখ চেয়ে লোকে সান্ত্বনা লাভ করবে, কার চোখের আগুন দেখে সর্ব্বহারা ভারত ধৈর্য্য ধরবে! একটি রাত্রির তামাসায় এই যে বিপুল অর্থ ব্যয় হলো তা দিয়ে এই দেশের-ই, এই গ্রামের-ই কত অভুক্তকে, কত নিরন্নকে বাঁচানো যেতো—একবারও কি সেকথা কারো মনে পড়েনি? আজকের দিনে যদি তাও না মনে পড়ে থাকে তবে ধিক্ লেখাপড়া শেখার, আর ধিক্ মনুষ্যত্বের!

সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' 'গান্ধীজী কি জয়' বলে এক কোণ থেকে কয়েকজন যুবক চেঁচিয়ে উঠলো।

এইবার শঙ্করের চোখ মুখ আরো যেন উদ্ভাসিত হলো, কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর করে সে বললে, আজ আমাদের চারিদিকে কত সমস্যা! আহার নেই, বস্ত্র নেই, ওষুধ নেই, শাসনের নামে চলেছে দুর্নীতি! ঘরে বাইরে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি পদে পদে আর আমাদের-ই মধ্যে নির্য্যাতিত একদল লোক সেই সুযোগ গ্রহণ করে শকুনির মত এখনো শ্মশান থেকে অর্থ শোষণ করে চলেছে! যারা এইভাবে দেশের লোককে ঠকিয়ে, বঞ্চিত ক'রে তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে গিয়ে শত্রুদের রসদ জোগান দিচ্ছে টাকার লোভে, আজকের দিনে তাদের আমি দেশদ্রোহী মনে করি। এই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অকালমৃত্যুর জন্য যেদিন ভারত স্বাধীন হবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে একদিন তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে! এই যুদ্ধে ইংরেজ হারুক এই আমরা চাই। ইংরেজ

আমাদের শত্রু আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্যে কি অত্যাচার, নির্য্যাতন এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার দেশবাসী আজ ইংরেজদের জেলে পচে মরছে।

সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ্' 'ভারত মাতা কি জয়!'

একটু দম নিয়ে শঙ্কর আবার সুরু করলে, বহুকাল পরে আজ প্রথম দেশে ফিরে আমার দেশবাসীদের সামনে দাঁড়িয়ে এই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হলো বলে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছি! তাদের আনন্দ উৎসবে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে আমি এখানে এসেছি—একথা মনে ক'রে কেউ যেন না আমায় ভুল বোঝেন! আমি শুধু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা একবার চোখ চেয়ে দেখুন দেশের দিকে!

ভারতবর্ষের যাঁরা বড় বড় নেতা, যাঁরা সারা পৃথিবীর চোখে বরণীয়, পূজনীয় তাঁরা আজ বিনা-বিচারে অন্ধ-কারাকক্ষে বন্দী হয়ে রয়েছেন কেন? দেশের প্রত্যেক লোককে আজ সেই কথা চিন্তা ক'রে দেখতে হবে—আজ সেই পরমক্ষণটি উপস্থিত! তাই আমি আর একবার আমার দেশবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এখন আনন্দ-উৎসব করার সময় নয়। আলোর নীচে যেমন অন্ধকার তেমনি এই আনন্দের পেছনে যে মর্ম্মান্তিক বেদনার ইতিহাস রয়েছে তাকে এখন বিচার করতে হবে—আমাদের প্রত্যেককে, নিজের হাতে।

হুড়মুড় করে এইবার কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে আসর থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং মুখে 'বন্দেমাতরম্', 'গান্ধীজী কি জয়' প্রভৃতি ধ্বনি করতে করতে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলো।

তিনু কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে তার দলের লোকদের গালাগাল দিতে সুরু করলে। বললে, তোদের যেমন মাথা খারাপ, আর লোক পেলি না, শঙ্করকে গেলি ধন্যবাদ দেবার জন্যে বলতে। জেলে গেলেই দেশের কাজ করা হয় না! এত টাকা-পয়সা খরচ ক'রে যে লোকটা আমাদের জন্যে দেশে স্কুল, চ্যারিটেব্ল্ ডিসপেন্সারী ক'রে দিলে সে কিছু নয়, আর তুমি জেলে গিয়েছো বলে মাথা কিনেছো—যাকে যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াবে? ভেবেছো দেশের লোক তাই মুখ বুজে সহ্য করবে? কখন-ই না। বলতে বলতে সে রীতিমত চটে উঠলো।

শঙ্কর প্রশান্তকণ্ঠে তিনুকে বললে, আমি ত কাউকে অপমান করিনি!

তিনু গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললে, আবার কি ক'রে করবে? আমরা বুঝি ঘাস খাই, কিছু বুঝি না ভেবেছিস?

সঙ্গে সঙ্গে একদল ছোকরা বলে উঠলো, তুমি চটছো কেন তিনুদা, শঙ্করদা ত কিছু অন্যায় বলেন নি! আজকের দিনে গ্রামের মধ্যে বাইজী এনে, তাদের সঙ্গে একই ষ্টেজে ভদ্দরলোকের মেয়েদের নাচানোটা কি খুব শোভন হয়েছে?

মুখে একটা কুৎসিত ভঙ্গী ক'রে তিনু বললে, ওঃ ভারী আমার সমাজ কর্ত্তা এলেন রে। বলি এতক্ষণ ত দিব্যি বসে বসে সব নাচগান শুনছিলে আর হুইসিল মারছিলে মুখে—তাতে বুঝি শোভনতার কোন হানি হয়নি ?

তাদের মধ্যে শশাঙ্ক ছিল খুব স্পষ্টবাদী। সে ফট্ ক'রে বলে উঠলো, তোমাদের আজকাল কাঁচা পয়সা হয়েছে, তোমরা দেশের মাথা হয়েছো—তাই তোমাদের কীর্ত্তি কতদূর যায় দেখতে এসেছিলুম।

বাদানুবাদ ও তর্কাতর্কি থেকে তখনি রীতিমত একটা হৈ চৈ শুরু হলো এবং দেখতে দেখতে দু'টো দল হয়ে গেল।

শঙ্কর ভাবতেই পারেনি যে যারা এতক্ষণ ওই দলে মিলেমিশে নৃত্যগীতে উন্মত্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা এইভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। সে অবাক হয়ে গেল যখন দেখলে সত্যিসত্যি গ্রামের বহুলোক—নরনারী নির্বিশেষে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শঙ্কর হাতজোড় করে সকলকে চুপ করবার জন্য মিনতি জানাতেই গোলমালটা থেমে গেল। কিন্তু সেই সময় একটি লোক ঝড়ের বেগে ছুটে সেখানে এসে তিনুকে বললে, তিনুদা, সর্বনাশ হয়েছে। শিবনাথ বাবু চলে যাচ্ছেন।

এ্যাঁ, সে কি! শিগ্গির গিয়ে তোরা সবাই মিলে হাতে পায়ে ধরে যেমন করে হোক তাঁকে বসা—আমি এখনি যাচ্ছি।

লোকটি বললে, আমরা অনেক বললুম কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকলেন না, বললেন, আমায় এভাবে ডেকে এনে অপমান করার কি দরকার ছিল ?

তিনু মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, আমি এখন কি বলে তাঁকে বোঝাই, তিনি ত ছেলেমানুষ, নন্? একটা লোক গ্রামের কাজ করছিল তাও গেল। আমারই অনুরোধে তিনি 'প্রিসাইড্' করতে রাজী হয়েছিলেন—

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন টপ্ করে টিপ্পনি কাটলে, তাত হবেই, আপনার মোটা আয়ের পথটা ত তিনিই ক'রে দিয়েছেন—

অমনি আরো অনেকে তাকে সমর্থন ক'রে এমনভাবে হেসে উঠলো যে লজ্জায় তিনুর মুখ চোখ লাল হয়ে গেল।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে শঙ্করকে নমস্কার করে তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখলে। তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিয়ে শঙ্কর অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমায় চিনতে পারছেন না ?

সেই বীণানিন্দিত স্বর যেন বহুদিন পূর্ব্বে শোনা কোন এক বিস্মৃত রাগিণীর কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। শঙ্কর সহসা যেন কোন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। একটু ভেবে তারপর বললে ও, লাবণ্য ?

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমুখীর মত ঈষৎ অবনত ও আরক্তমুখে মেয়েটি উত্তর দিল, হ্যাঁ, শঙ্করদা।

শঙ্কর তাকে কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা ছোকরা বলে উঠলো উনি এখানকার গার্লস্কুলে মাষ্টারী করেন—ও'র জন্যেই আজ স্কুলটা দাঁড়িয়ে গেছে।

শঙ্কর সহাস্যমুখে বললে, বেশ, বেশ, ভারী খুশি হলুম!

সেদিকে চেয়ে তিনুর চোখ দুটো যেন তীব্র হ'য়ে উঠলো। সে বললে, লাবণ্য, তোমার এখনো বিদায় সঙ্গীত রয়েছে—ষ্টেজের ভেতরে শিগ্‌গির যাও!

লাবণ্য বললে, না। আমি আর গাইব না। বলতে বলতে শঙ্কর প্রভৃতির দলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তখন তার দিকে একটা তীক্ষ্ম কটাক্ষ হেনে তিনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অর্থপূর্ণস্বরে বললে, ওঃ বুঝেছি—'দ্যাট্ ওল্ড ফায়ার' তাহ'লে এখনো নেভেনি। ভেতরে তার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে—

তার দলের আরো যারা যারা শঙ্করের সঙ্গে ভীড় করে বেরিয়ে যাচ্ছিল তাদের সকলকে তিনু ডাকলে ফিরে আসবার জন্যে, কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলে না, সকলেই চলে গেল। তখন তিনু চুপিচুপি একজনকে বললে এই শিগ্‌গির ভেতরে গিয়ে নারাণদাকে বল মেয়েদের একটা নাচ দিতে—তাহ'লে এখনি আসর চুপ হয়ে যাবে।

যে ছোকরাটিকে তিনু এই কথা বললে সে একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, গীতা, রেবা, ছায়া, শান্তি, প্রমীলা, সবাই চলে গেছে, একমাত্র বাণী আছে। নারাণদা বললে, একলা তাকে দিয়ে নাচ চলবে না।

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হলো। তিনু গলার পর্দ্দা চড়িয়ে বললে, আচ্ছা দেখে নেবো লাবণ্যকে—তুই যাচ্ছিস্ মরগে যা, আবার সমস্ত দলটাকে ফুসলিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো? আমাদের জব্দ করা? বলতে বলতে সে তৎক্ষণাৎ ছুটলো শিবনাথবাবুকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে।

কিন্তু হায়, কোথায় শিবনাথবাবু? তিনি অনেক আগেই বাড়ী চলে গিয়েছেন! তিনু সেই খবর শুনে একেবারে রাগে জ্বলে উঠলো। বললে, তোমরা কেউ তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলে না? যে কাজটা আমি না দেখবো সেটা আর হবার উপায় নেই! বলতে বলতে বিরক্তপূর্ণ মনে সে আবার ষ্টেজের দিকে চললো।

তিনু থিয়েটার ক্লাবের একজন প্রধান পাণ্ডা! সকলের চেয়ে বেশী চাঁদা দিত বলে কেউ তার মুখের ওপর কোন কথা বলতো না, তবে তার এই সর্দ্দারী দেখে সবাই আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসতো। সে ছিল শিবনাথবাবুর চামচা।

বাড়ীতে ফিরে গিয়ে শিবনাথ চুপ করে বসেছিল। তার চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের শিখা বেরুচ্ছে! নেমন্তন্য ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে যারা এইভাবে অপমান করল তাদের কথা সে চিন্তা করছিল।

এমন সময় সেখানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তিনকড়ি এসে হাজির হলো। শিবনাথের মুখের দিকে চেয়েই সে ব্যাপারটা বুঝি অনুমান করতে পেরেছিল। তাই প্রথম

কথা সে আরম্ভ করলে এইভাবে—এক পয়সা আর এদের জন্যে খরচ করবেন না—দেখি শঙ্কর বাড়ুয্যে কার ঘরে ক'খানা চাল তুলে দেয়।

এই পর্য্যন্ত বলে সে একটু থামলো। সে ভেবেছিল বুঝি শিবনাথ এর উত্তরে কোন কঠিন মন্তব্য করবে কিন্তু সে যখন তেমনি নীরব রইল ও হ্যাঁ বা না কোন কিছুই বললে না, তখন তিনু আর এক পর্দ্দা গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, কংগ্রেসের হয়ে জেল খেটেছে বলে ও দেশের মাথা হয়ে গেল! আর যিনি এত পয়সা খরচ করছেন দেশের জন্যে তিনি কিছুই নন? আচ্ছা, দেখে নেবো সকলকে। তিনকড়ি চাটুজ্জ্যেও সহজ পাত্র নয়! ওই লাবণ্যর দম্ভ চুর্ণ ক'রে তবে আমি জলগ্রহণ করবো। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি মতলব সব ঠিক ক'রে ফেলেছি—কালই ওকে স্কুল থেকে জবাব দিন। দেখুন পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে কিনা—খাবে কি, সংসার ত চলে ওরই রোজগারে! বুড়ো বাপ-মা আর ছোট ভাই আছে, আমি ওদের হাঁড়ির খবর রাখি! বলতে বলতে একটা কুটিল হাসিতে তার মুখ চোখ বীভৎস হয়ে উঠলো। সে বললে, যার দয়ায় তুই করে খাচ্ছিস্ তার-ই সঙ্গে বেইমানি!

শিবনাথ এতক্ষণ পরে নীচুসুরে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, এতদিন এই শঙ্কর কোথায় ছিল, ওর নাম ত কারুর মুখে শুনিনি?

শুনবেন কি! কংগ্রেস বলে কি দেশে কিছু ছিল! যতসব বেকারের দল এখন গিয়ে জুটেছে! তারা দেখেছে এমন সহজে নাম কেনার জায়গা আর নেই—রাতারাতি একেবারে দেশসেবক। দেখলেন না যতসব ছোঁড়ারদল, যারা বিড়ি খেয়ে, থিয়েটার ক'রে আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াতো তারাই এখন 'বন্দেমাতরম্' বুলি বেশী ক'রে আওড়াচ্ছে! বলতে বলতে একটু থেমে আবার সে শুরু করলে, ওসব দু'দিনের। কিচ্ছু ভাববেন না! আমি ঢের দেখেছি। আমি নিজেই ভুক্তভোগী। এখন ওরা মনে করছে বুঝি শঙ্কর ওদের হাতে স্বর্গই এনে দেবে! কিন্তু রসদ না পেলে আপনিই রস গুটিয়ে আসবে—তখন শুড় শুড় ক'রে সবাই আবার ফিরে আসবে! দেখে নেবেন—আমি এই বয়সে ঢের দেখলুম! আর বুড়োগুলোর কথা ছেড়ে দিন—ওরা দু'মুখো সাপ, ওরা এদিকেও আছে—ওদিকেও আছে! আর লাবণ্যর কথা কে না জানে! বোধহয় আপনিও বুঝতে পেরেছেন? ছেলেবেলায় দু'জনের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল তাই এতদিন বিয়ে-থা না ক'রে স্কুল মাষ্টারী করছিল! ওর বাপের অবশ্য মেয়ের বিয়ে দেবার মত সঙ্গতি কোন কালেই ছিল না তবু একজন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনাপয়সায় বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল কিন্তু লাবণ্য সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল পাত্র লেখাপড়া জানে না বলে।

শিবনাথের চোখ দু'টো নিমেষে জ্বলে উঠলো। বললে, এতদূর?

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে তিনু বললে, কোন চিন্তা করবেন না—সব আমি ঠিক করে দেবো। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয়! একটা ভোজের ব্যবস্থা করুন, দেখবেন ঘিয়ের গন্ধ পেয়ে পিলপিল ক'রে লোক কুকুরের মত এসে জুটবে আপনার

দরজায় ! আমার গ্রামের লোকদের আমি চিনি না ? আরে লুচি ত দূরের কথা, ভাল খাবারের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে তারা—

ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করলে শঙ্কর। তিনুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বললে, হ্যাঁ তিনু, আর গ্রামের লোকদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী সবচেয়ে বেশী তোমরা। তারা ঘি খায়নি, তারা ভাল খাবারের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে কাদের জন্যে সে তোমরাই ভাল করে জানো। যাদের গরুর বাঁটে ঘি দুধ ধরতো না—তাদের আজ এই অবস্থা কে করেছে ? লজ্জা করে না দেশের লোকদের কুকুর বলতে ? তুই না একদিন কংগ্রেসের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলি ? ছি, সেকথা ভাবতে গেলেও আজ ঘৃণা হয় ! সেই তুই, এখন 'মিলিটারী কনট্রাক্টর'—দেশের লোকের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে—তুলে দিয়ে আসছিস অপরকে। আর কেউ একাজ করলে আমি এতটা বিস্মিত হতুম না —কিন্তু তোর মত যে একদিন কংগ্রেসকর্মী ছিল তার হাত দিয়ে দেশবাসীর এ লাঞ্ছনা কোনদিন যে দেখতে হবে, স্বপ্নেও তা ভাবিনি !

এই বলে একটু চুপ ক'রে থেকে সে শিবনাথবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃদু হেসে বললে, শুনলুম আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আমি আপনাকে অপমান করেছি ভেবে। সত্যি যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকি ত তার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন। এই বলে যেমনভাবে হঠাৎ এসেছিল তেমনিভাবে আবার ফিরে গেল।

শুধু শিবনাথ সেই নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তিনুও তখনি সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না। কেবল সে চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে বললে, দেখলেন ত কি শয়তান, ঘরে এসে কি ভাবে আমাদের অপমান ক'রে গেল ! আচ্ছা দেখে নেবো একদিন—শুধু আমি যা বলি আপনি সেই মত কাজ করে যান। কিছু ভাববেন না। বলতে বলতে সে তখন বিদায় নিল।

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। শিবনাথ তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পরের দিন দুপুরের গাড়ীতে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা। খাওয়া দাওয়ার পর, শিবনাথ বৈঠকখানায় বসে বিশ্রাম করছে—এমন সময় লাবণ্য এসে ঘরে ঢুকলো।

লাবণ্যকে আসন গ্রহণ করতে বলে শিবনাথ প্রশ্ন করলে, বলুন আপনার কি চাই ?

লাবণ্য বললে, আপনি আমায় চাকরীতে জবাব দিয়েছেন কেন ?

শিবনাথ বললে, প্রয়োজন হয়েছে বলেই দিয়েছি—তার জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে আমি প্রস্তুত নই।

কিন্তু আমার কি অপরাধ, তা কি আমি জানতে পারবো না ?

ঈষৎ হেসে শিবনাথ জবাব দিলে অপরাধ ! অপরাধ আপনার কিছু নেই—

তাহ'লে এখন আমি কি করি বলুন ত ? সেলাই শিখিয়ে, গান শিখিয়ে একটি মেয়ে নিজের পরিশ্রমের দ্বারা তার জীবিকা অর্জ্জন করছিল, তাকে দিলেন তাড়িয়ে বিনা অপরাধে !

কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এনে শিবনাথ বললে, কেন আপনার কংগ্রেস রয়েছে ভাবনা কি ?

লাবণ্য কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে উত্তর দিলে, তা যদি থাকতো—এতদিন যদি সত্যি তাতে মন দিতুম, তাহ'লে আজ এইভাবে আপনার সামনে এসে দাঁড়াতুম না —এটা নিশ্চিত জানবেন !

শিবনাথ এর উত্তরে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে মুখ খোলবার আগেই লাবণ্য হঠাৎ বলে উঠলো, আচ্ছা আপনাকে লোকে দাতা বলে, মহৎ অন্তঃকরণ বলে, কেন বলতে পারেন ?

শিবনাথ একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলে, আমায় প্রশ্ন না ক'রে সেকথা গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞেস করবেন !

উদ্ধত ও দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘাড় ঘুরিয়ে তার চোখের ওপর একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে লাবণ্য বললে, কথাটা আজ আমি স্পষ্ট ক'রে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই ! বাহিরের লোকেরা ত আপনার মুখোসটা দেখে, আসল মানুষটাকে ত তারা দেখতে পায় না ?

তার মানে ?

লাবণ্য তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলে, তার মানে পয়সা ছড়িয়ে, বাপ-মায়ের নামে স্কুল ক'রে দিলে, দাতব্য চিকিৎসালয় ক'রে দিলে লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায় বটে কিন্তু নিজের চরিত্রকে ধামা চাপা দেওয়া যায় না।

শিবনাথের চোখ দুটো দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে কংগ্রেসের কাজ করছি বললেও কিন্তু চরিত্রকে ধামা চাপা দেওয়া যায় না।

থাক কংগ্রেসের পবিত্র নামটা আর আপনি ও-মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না !

এইবার অন্তরের সমস্ত বিষ যেন শিবনাথের কণ্ঠে ফেটে পড়ল। বললে, কেন ওর পবিত্রতা রক্ষা করার ভার বুঝি শুধু শঙ্করদা আর আপনার ওপর ? বলেই আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপাস্বরে আরম্ভ করলে দেশে না থাকলেও আপনাদের খবর কিছু কিছু জানি ! সত্যিকথা বলছি বলে রাগ করবেন না যেন ? অমন হয়েই থাকে—নর ও নারীর আকর্ষণ, তাছাড়া শঙ্করবাবু অতি সুপুরুষ—

চুপ্ করুন, বলে সে গর্জ্জন করে উঠলো। তারপর মনের মধ্যে সমস্ত ক্রোধটাকে চেপে সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, শঙ্করদা দেবতা, আপনার মত লম্পট নয়। চাঁপাদির কথা কে না জানে ?

শিবনাথ এইবারে সমস্ত শোভনতার বাইরে চলে গেল ! মুহূর্ত্তে যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। চীৎকার ক'রে বললে, বেরিয়ে যান শিগগির বাড়ী থেকে ! আমার

সামনে দাঁড়িয়ে আমায় অপমান! এত বড় স্পর্ধা! মেয়েমানুষ বলে বড্ড পার পেয়ে গেলেন, অন্য কেউ হলে তাকে খুন করে ফেলতুম। শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে জীবনের পরোয়া করে না।

তার চীৎকার শুনে চাকর-বাকর লোকজন সব ছুটে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো দরজার পাশে।

অপমানে লজ্জায় লাবণ্যের মুখ কালো হয়ে উঠলো। সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল; মুখে একটি কথা না বলে।

ওই জায়গাটায় বুঝি শিবনাথের মনে ছিল সবচেয়ে বড় ক্ষত। বাল্যকালের সে সব পুরাণো কাহিনী এতদিনে লোক ভুলে গেছে এই ছিল তার ধারণা, তাই লাবণ্য চলে যাবার পর শিবনাথ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কি করবে কিছু স্থির করতে পারল না। শুধু আহত সিংহের মত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আপন মনে বলে উঠলো, পুরুষের আবার দুর্ণাম! কোন বড়লোকটার দুর্ণাম নেই? ওসব কিছু নয়। যার পয়সা আছে তার চরিত্র চিরকালই মহান! এই বলে সে আপন মনে হো-হো করে হেসে উঠে আবার পায়চারি শুরু করল।

২

তিনুর দল শিবনাথকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল। গাড়ী ছেড়ে দিতে শিবনাথ জানলার ধারে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো। সহসা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো অতীত জীবনের কাহিনী! ট্রেন যত এগিয়ে যায় ততই যেন তার মনের পর্দ্দার সেই সব বায়োস্কোপের ছবির মত দ্রুত সরে যায় আর সে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে তাই দেখে—

এক বিধবার ছেলে, খুড়োর সংসারে সকলের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, ছোট ছেলেমেয়েদের চাকরের মত কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, হাট-বাজার করে দিয়ে, মাঠে গরু ছাগল চরিয়ে যেটুকু সময় পেতো লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতো, ফলে অধিকাংশ দিনই তার পড়া হতো না—স্কুলে পণ্ডিতের কাছে বেত খেতো—হাতে থান ইঁট নিয়ে একপায়ে ক্লাশে দাঁড়িয়ে থাকতো! তার ওপর ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল একটু দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির। কারুর বই ছিঁড়ে দিতো, কারুর পেন্সিল কেড়ে নিতো, লোকের বাগানে আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি ফলমূল থাকবার উপায় ছিল না। সন্ধান যে সে কেমন করে পায় তাই ভেবে লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকতো না। যেমন করে হোক তার চাই-ই! এর জন্যে ঘরে বাইরে তার লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। স্কুলে শিক্ষকরা কত মারধোর করেছেন, বাড়ীতে খুড়োখুড়ী ভাত বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। মা কাঁদতে কাঁদতে তাকে কত বোঝাতেন!

তার উত্তরে সে বলতো, আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না? তোমরা আমায় কি খেতে দাও? স্কুলে সব ছেলেরা টিফিনে কত কি খায়। এই বলে একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বলতো, তার খুড়তুতো ভাইয়েরা তারই সঙ্গে স্কুলে যায় অথচ তারা দু পয়সা করে জলখাবার খায় টিফিনে, সে পায় না কেন?

মা এর উত্তরে ছেলেকে কি বলবেন ভেবে পান না। শুধু তাঁর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল টলটল করে ওঠে। তিনি নিজে যেখানে ঝি চাকরাণীর অধম হয়ে দিন কাটান, যেখানে উঠতে বসতে জা'য়ের মুখ থেকে শুনতে হয় খাওয়ার খোঁটা—'রাক্ষসের মত খোরাক—যেমন মা তেমনি ছেলে, কোথা থেকে এত জোগাবো'—সেখানে তিনি কি করবেন বুঝতে না পেরে শুধু ছেলেকে মিষ্টি কথায় বলতেন, ছিঃ বাবা, তা বলে কি চুরি করতে আছে? লোকে যে তোমার নিন্দে করবে!

ছেলে বলে, করুক নিন্দে! ক্ষিদে পেলে যারা খেতে দেয় না, তারা নিন্দে করে ত বয়ে গেল!

এমনি ক'রে দেখতে দেখতে তার চোর, বদমায়েস্, মুর্খ নাম রটে গেল। সবাই তাকে দূর দূর করে সরিয়ে দেয়! ভদ্রসমাজে একেবারে সে অচল। ফোর্থ ক্লাশে দুবার ফেল করাতে স্কুলও তার বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মত।

এইবার তার দৌরাত্ম যেন আরো বাড়'লো! তার ক্ষিদে আছে, তার লোভ আছে, তার স্বাস্থ্য আছে! লোককে ঠেঙিয়ে, মেরেধরে, কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসে যেখানে যা পায়। বন্ধুবান্ধবও জুটলো সেই রকম। মানুষ বাঁচবে কি ক'রে। তাই নিজের সমাজ থেকে বিতারিত হলে ওই রকম একটা সমাজে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সঙ্গ দোষ যাবে কোথায়? চোদ্দ বছর বয়সে সে ধরলে বিড়ি খাওয়া, তাড়ি খাওয়া ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক নেশা! সে জাত মানে না, ধর্ম মানে না—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে চাঁড়াল কৈবর্ত্তের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা করে! তাদের সঙ্গে করে যাত্রা—হয়ত সাতদিন বাড়ীতেই আসে না! কবে কোথায় কিভাবে রাত কাটায় ঠিক নেই, আর তা নিয়ে কারুর কোন দুশ্চিন্তাও হয় না। শুধু সেই বিধবা মা, যিনি এই রত্নটি গর্ভে ধারণ করেছেন তাঁর চোখে বুঝি ঘুম আসে না, ছেলের মঙ্গল কামনা করে ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়েন, আর পুজো মানত করেন!

এদিকে খুড়োখুড়ীর আপদ গেছে, ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে! তারা মুখে দরদ দেখিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট সন্তানের জননীকে গিয়ে বলে, অমন কুলাঙ্গারের জন্যে আবার মানুষ ভাবনা চিন্তা করে—ওসব যমের অরুচি, এত লোক ওলাউঠা মহামারীতে মরে কিন্তু ওরা ঠিক বেঁচে থাকে বাপ খুড়োর মুখে কালি দেবার জন্যে। ও ছেলে যদি মরে ত তোমার খুব ভাগ্যি জেনো।

তবুও কিন্তু ছেলে মরে না আস্তাকুড়ের গাছের মত সে বেড়ে ওঠে দুর্জয় কামনায়, বেড়ে ওঠে দুরন্ত বিক্রমে! তাকে পাড়ায় ঢুকতে দেখ'লে সকলের বুক কাঁপে ভয়ে। সে যেন মূর্ত্তিমান আতঙ্ক, সমস্ত ভদ্র সমাজের কলঙ্ক! সে বুঝতো

কিন্তু গ্রাহ্য করতো না কাউকে! কেউ যখন তাকে চায় না, তখন কেন সে তাদের মুখ চাইবে?

তবু এক একদিন কেমন যেন সে গম্ভীর হয়ে পড়তো! তার মধ্যে বুঝি আত্মচেতনার উদয় হতো। সকলের সামনে সে মাথা উঁচু ক'রে পারতো না চলতে। নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হতো! দিনের আলোয় তার সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। গভীর রাত্রে নিশাচরের মত সে ঘুরে বেড়ায় হাটে মাঠে ঘাটে! ইদানিং সব চেয়ে সে মনে বেশী আঘাত পায় যখন দেখে পাড়ার কারো বাড়ী কোন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষ্যে গ্রামশুদ্ধ সকলে নিমন্ত্রিত হয় শুধু সে ছাড়া! কিংবা বারোয়ারী উপলক্ষ্যে যাত্রা থিয়েটার দেখতে গেলে যখন সে অনুভব করে কোন ভদ্দরলোক তার পাশে বসতে চায় না, সে যেখানে থাকে সেখান থেকে সবাই দূরে সরে যেতে চায়!—যেন সে অস্পৃশ্য! সে ব্রাহ্মণ সন্তান, তার দেহে পিতা পিতামহের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার রক্তকণা রয়েছে—তারাই বুঝি এক একদিন এমনি সব গণ্ডগোল পাকায় তার মনে—সে বুঝতে পারে না কিছু! তবু ভাবে এর জন্যে কি সে দায়ী? না যে সমাজে সে মানুষ তাদের অবহেলা দায়ী?

এইসময় হঠাৎ তার মায়ের ওলাউঠায় মৃত্যু হওয়াতে তার মনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটলো। কেন ঘটলো তা সে জানে না। তবে তার মনে পড়ে সে যে-সব সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতো তাদের আর ভাল লাগত না। খুড়োর ভাঙ্গা বৈঠক-খানায় ভিখারির মত পড়ে থাকতো। শুধু দু'বেলা খাবার সময় বাড়ীর মধ্যে একবার ঢুকতো, তাছাড়া সব সময় একলা শুয়ে থাকতো একটা ছেঁড়া বিছানায়। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে মনে এখন থেকে ভাল হ'য়ে চলবে, অন্য সকলের মত। খুড়ীকে ডেকে সেকথা সে একদিন জানিয়েও দিলে। কিন্তু হায় মানুষের মন এমনি যে, যে খারাপ সে যে আবার ভাল হতে পারে, একথা কেউ সহজে বিশ্বাসই করতে চায় না। সন্দেহ মনে সর্বদা জেগেই থাকে!

তাই কিছুদিন এমনিভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ পাড়ার একটি ছোট মেয়ে তার খুড়োর বাড়ী খেলতে এসে যখন কানের ছোট দু'টো সোনার দুল হারালে তখন সবাই একবাক্যে রায় দিলে, এ ওই হতভাগার কাজ! ইতিপূর্বে বিড়ি ও নেশার পয়সার জন্যে সে দু'একবার এমনি চুরি আত্মীয় ও পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ী থেকে করেছিল, তাই সে খুড়ীর পা ছুঁয়ে শত দিব্যি করলেও কেউ সেকথা বিশ্বাস করলে না।

এর ক'দিন পরে আবার এক কাণ্ড ঘটলো। মুখুজ্যেদের পদ্মা নদী থেকে গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে মাটির কলসীতে জল নিয়ে কাঁখে ক'রে উঠে আসছিল। ছলাৎ ছলাৎ ক'রে জল চলকে উঠে তার বক্ষ বেয়ে কোমর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। নদীর ধারে জঙ্গল থেকে দু'টো পাকা নোনা হাতে ক'রে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই পদ্মা তার মুখটা চট্ করে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে! বহুদিন পরে চাঁপাকে সামনে পেয়ে সে থমকে দাঁড়ালো, তারপর চারিদিকে তাকিয়ে যখন দেখলে

কেউ কোথাও নেই, তখন সে হন হন করে চাঁপার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, এই চাঁপা, তুই আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলি যে ? চাঁপাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সে আবার বললে, কথা বলছিস না কেন রে—আমি তোর কি করেছি ?

চাঁপা ঝাঁজালো কণ্ঠে উত্তর দিল, কি আবার করবে ! তোমার মত বদমায়েস চোরের সঙ্গে আবার মানুষে কথা বলে ?

সে বললে, কিন্তু তুই যে সত্য, পচা, কালার সঙ্গে খেলা করিস ওরা কি কেউ কোনদিন কিছু চুরি করেনি ?

চাঁপা এইবার মুখটা বেঁকিয়ে বললে, তোমার মত ওরা গয়না চুরি করে না— —তোমার মত তারা ছোট লোক অভদ্দর নয়। তুমি দূর হয়ে যাও শিগগির আমার সামনে থেকে।

বরাবর চাঁপা একটু তেজী ধরণের মেয়ে। দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি, গাছে চড়া প্রভৃতিতে সে ওস্তাদ। ছেলেবেলায় এই মেয়েটি ছিল তার খেলার সাথী। কতদিন একসঙ্গে তারা দু'জন গাছে উঠেছে, একসঙ্গে নদী পেরিয়ে ওপার থেকে শশা চুরি ক'রে এনেছে ! অথচ এতদিন পরে যখন তার সঙ্গে দেখা হলো তখন এই রকম সম্ভাষণ শুনে তার মনে বড় আঘাত লাগল। সে তাই নোনা দুটো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আমায় ক্ষমা কর চাঁপা, আমি আর কখনো কিছু করবো না —আমি তোকে ভালবাসি—

মুখে আগুন তোমার—তোমার মুখে আমি বাঁ পায়ের লাথি মারি ! বলে যেমন সে দু'পা এগিয়েছে অমনি খপ্ ক'রে তার একটা হাত ধরে সে বললে, চাঁপা আমায় ক্ষমা কর তুই, যদি আমার সঙ্গে কথা না বলিস ত আমি মরে যাবো ? আমার আর পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই !

যেই চাঁপার হাত ধরা অমনি তার কাঁকাল থেকে ধপ্ করে কলসিটা মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো, মুখপোড়া আমার গায়ে হাত দেওয়া ! আর যায় কোথায় ! দেখতে দেখতে পাড়ার লোকজন সেখানে জড় হয়ে গেল। এবং বেশ করে ঘা কতক মার দিয়ে তাকে তার খুড়োর কাছে ঠেনে নিয়ে গেল।

লোকের মুখে মুখে কথাটা রটে গেল যে নদীর ধারে একলা পেয়ে সে চরম অপমান করেছে।

পরের দিন পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর এসে তাকে সকলের সামনে নাকখত দিয়ে কান ধরে ওঠ্‌বোস্ করিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে। বললে ফের যদি কোনদিন এখানে দেখি ত মাথা নেড়া ক'রে ঘোল ঢেলে তাড়াবো, মনে থাকে যেন !

এতদূর পর্যন্ত এসে এইবার শিবনাথের নাক দিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়ল। সে নিজেই যেন সচকিত হয়ে উঠলো তার শব্দে। তখন পিছন ফিরে শূন্য কামরাটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে আবার তেমনি ভাবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের দিকে। অনন্ত উদার নীল আকাশের

বুকে পেঁজা তুলোর মত কতগুলো খণ্ডমেঘ উড়ে যাচ্ছিল। তার পানে চেয়ে শিবনাথের মন আবার ভেসে গেল কোন সুদূর অতীতে—কুড়ি বছর আগে।

সে দিনের সেই অপমানের পর সে আর দেশে ফেরেনি। দেশ বলে যে একটা স্থান আছে সেকথাটা পর্য্যন্ত সে ভুলে গিয়েছিল। তারপর সুরু হলো তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। দেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে, সকলের ঘৃণা মাথায় নিয়ে সে যখন শহরে এসে হাজির হলো তখন দেখলে তার কেউ নেই পৃথিবীতে—সে সত্যি সত্যি একা! সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! সেকথা ভাবলে আজও তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটা মানুষের পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে সে আপন বলে মনে করতে পারে?

প্রথম দিনটা কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে কাটালো। সতেরো বছরের ছেলে, পেটে না আছে একফোঁটা বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, কাজেই জীবিকা অর্জনের জন্য কত জায়গায় কত কাজ করলে। লোহার কারখানা, ট্রামের কণ্ডাক্টর, খিদির-পুরের ডক, ফেরিওয়ালা, থিয়েটারের গেট-কিপার, চায়ের দোকান, জুটমিল্, পাটের দালালী, বোম্বে, মাদ্রাজ, করাচী···ভারতবর্ষের কত জায়গায় কত কাজে ঘুরলে। আর সে ভাবতে পারে না। তার চোখের সামনে সব যেন একসঙ্গে বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে থাকে। সে ভাবে, তার জীবনে কোথাও স্থিতি নেই। শুধু উল্কার মত, সে ছুটে চলেছে আপন গতিবেগে! যার গন্তব্য স্থানের ঠিকানা নেই, তার যাত্রার বুঝি শেষ নেই!

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে শিবনাথ! তারপর? আর যেন সে ভাবতে পারে না। তারপর এলো এই যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাসমর। কত লোক প্রাণ হারালো, কত দেশ শ্মশানে পরিণত হলো, কে তার খবর রাখে? কিন্তু শিবনাথের কাছে এ যুদ্ধ নিয়ে এলো একটা সোণার স্বপ্ন। মিলিটারী কনট্রাক্ট পেয়ে সে টাকার লোভ সামলাতে পারলে না। আসাম অঞ্চলে তখন জাপানীদের বোমা পড়তে শুরু হয়েছে। বড় বড় রাস্তা বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করলে শিবনাথ। বহুদিনের উপবাসী বাঘ যেমন রক্তের আস্বাদ পেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে, তেমনি হলো তার অবস্থা! গোপনে তখন শুরু করলে চোরা কারবার—চাল, কাপড়, ওষুধ এক টাকার জিনিস দশ টাকায় বিক্রী। তাছাড়া আরো কত ব্যবসা। কত কোম্পানী। কত শেয়ার মার্কেট। দেখতে দেখতে সে একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠলো। ফকির যেন রাতারাতি আমির বনে গেল।

আবার শুরু হলো তার জীবনের এক নূতন অধ্যায়! এর মধ্যে তার দেশের সম্বন্ধে কোন চিন্তা কোনদিন মনে আসেনি। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তার স্মৃতি একেবারে মন থেকে ধুয়ে মুছে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম এক একবার তার দেশের কথা মনে পড়তো, কিন্তু এক দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা পরমুহূর্তেই তাকে বাধ্য করতো সেকথা ভুলে যাবার জন্যে। সে অপমান, সে হতশ্রদ্ধা, সে অবহেলা ভুলে যাবার জন্যে তখন সে প্রাণপণ চেষ্টা করতো। এমনি ক'রে বিস্মৃতির কালো

যবনিকার অন্তরালে একদিন তার দেশের সমস্ত কথা ডুবে যায়।

ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ মধ্যপথে থেমে যেতেই শিবনাথের চিন্তায় বাধা পড়লো! বার কতক সিগারেটটা একসঙ্গে টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবলে, আর দেশের কথা চিন্তা সে করবে না। থাক্‌গে। কিন্তু বাইরের দিকে চাইতেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবার ভেসে উঠলো লাবণ্যর সেই ভ্রূকুটি। সঙ্গে সঙ্গে আবার চাঁপার কথা মনে পড়ে গেল! তখন কেমন ক'রে দেশের সঙ্গে আবার তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল সেই কথাটা মনে পড়ে হাসি পেলো।

গাড়ী ছাড়তেই তার মনে হলো, এই-ত সেদিনের কথা! শেয়ার মার্কেট থেকে সে ফিরছিল এমন সময় হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শিবনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জহরের। জহর তার খুড়তুতো ভাই। শিবনাথের মোটরটা পুলিশের হাত তোলার জন্যে অপেক্ষা করছিল এসপ্ল্যানেডের কাছে। অফিসের তখন সবে ছুটি হয়েছে। একটা রেশন ব্যাগ হাতে ক'রে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে সেও থমকে দাঁড়িয়েছিল এক জায়গায়। তার পিছনে আবার দু'তিনটে গাড়ী এসে 'পোঁ' পোঁ' ক'রে আওয়াজ করতেই সে ঠিক কোনখানে গিয়ে দাঁড়াবে স্থির করতে না পেরে ইতস্তত করছে এমন সময় সহসা শিবনাথের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার চোখ দুটো যেন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। একপা, দু'পা করে তার গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে সে তখন প্রশ্ন করলে, শিবু না?

শিবনাথ প্রথমটা চিনতে পারেনি। তারপর গলার আওয়াজ পেয়ে তার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললে, জহরদা?

হ্যাঁরে শিবু, তুই তাহ'লে চিনতে পেরেছিস?

গাড়ীর দরজাটা খুলে শিবনাথ বললে, ভেতরে উঠে এসো আগে তারপর বলছি। জহর গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতও নেমে গেল এবং সারিবন্ধ মোটরগুলো আবার চলতে শুরু করলে। প্রায় চোদ্দ বছর পরে দুই ভায়ে হলো দেখা। এর বছর আষ্টেক আগে শিবনাথের সঙ্গে আর একবার জহরের দেখা হয়েছিল কিন্তু তখন সে তাকে চিনতে পারেনি—ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া জামা গায়ে দেখে অপর ফুটপাত দিয়ে চলে গিয়েছিল। তাই সেই বিরাট মোটর গাড়ীটার মধ্যে উঠে এবং শিবনাথের পরণে মূল্যবান স্যুট দেখে জহর প্রথমে নানারকম কুশল প্রশ্নাদি ক'রে তারপর হঠাৎ এক সময় জিগ্যেস করলে, এ গাড়ী কি তোমার নাকি শিবু?

শিবনাথ বিনীতকণ্ঠে শুধু বললে, হ্যাঁ দাদা।

কিছুক্ষণের জন্য আর জহরের মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুতে চাইল না। তাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শিবনাথ বললে, তুমি এখন কোথা থেকে আসছো জহরদা?

সে বললে, অফিস থেকে রেশন নিয়ে ফিরছি—কাল দেশে নিয়ে যেতে হবে কিনা?

এই জহর বি. এ. পাশ ক'রে সরকারী অফিসে চাকরী করতো সে খবর সে পেয়েছিল। তাই শিবনাথ বললে তোমার এখন কোথায় যেতে হবে ?

জহর বললে, মেসে মির্জাপুর স্ট্রীটে !

শিবনাথ বললে, এখন আর মেসে নাইবা গেলে, আজ আমার ওখানে খাওয়া দাওয়া ক'রে রাত্তিরে বাসায় ফিরো।

জহর বার দু'ই ঢোক গিলে বললে, তোর বাসা কোনখানে ?

শিবনাথ বললে, লেকের কাছে একটা বাড়ী করেছি।

বাড়ী করেছিস। বেশ বেশ শুনে ভারী সুখী হলুম। বলতে বলতে সে আবার প্রশ্ন করলে, তুই এখন কোথায় চাকরী করছিস ?

চাকরী করি না জহরদা—ব্যবসা। মিলিটারী কনট্রাক্ট আসাম অঞ্চলে অনেকগুলো রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি—তাছাড়া চাল সরবরাহ করি গভর্নমেন্টকে।

ওঃ চালের যা কষ্ট হয়েছে দেশে। বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জহর আবার বললে, না খেতে পেয়ে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক সাবাড় হয়ে গেল।

জহরের কথা শেষ হতে না হতেই তার গাড়ীটা এসে একটা বিরাট ফটকওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। এতবড় বাড়ী শিবনাথের! জহর যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না তার চোখকে। তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে সে যখন একটার পর একটা শিবনাথের ঐশ্বর্য্য দেখতে লাগল তখন তার মনে হচ্ছিল কেবল-ই শিবনাথের বাল্যকালের কথা। বয়াটে, লম্পট, দুশ্চরিত্র বলে একদিন গ্রাম থেকে সকলে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই শিবুর আজ এই পরিণতি। এ যেন আরব্য রজনীর উপকথার মত। অথচ লেখাপড়া শিখে, দু'তিনটে পাশ ক'রে সরকারী চাকরী করে সে কি করেছে—এতদিনে তার কত টাকা মাইনে হয়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে পরতেই কুলোয় না। জহরের মাথার মধ্যে সব যেন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

শিবনাথ তার মনের অবস্থাটা বোধহয় বাইরে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল —তাই আরো বেশী ক'রে আদর আপ্যায়ন ক'রে তাকে তার ঐশ্বর্য্য দেখাতে লাগল। আশ্চর্য্য, এর মধ্যে দিয়ে একটা অদ্ভুত হিংস্র প্রবৃত্তি যেন শিবনাথের মনে জেগে ওঠে। যে দেশের কথা সে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিল জহরকে দেখে আগাগোড়া সব আবার তার মনে পড়ে গেল, এবং তার সব অপমান, সব হতশ্রদ্ধার সাক্ষী যে তাকে হাতে পেয়ে সে যেন তার মন প্রতিহিংসা নিতে চাইলে। তাই জহর যত তার ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হয় সে তত মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সেখানে আর জীবনে কোনদিন যাবে না সে স্থির জানতো। শুধু বদনাম, শুধু কেলেঙ্কারী, শুধু অপমান ও হতশ্রদ্ধার সহস্র কাহিনী যেখানে সেখানে কি করতে যাবে ? দেশ বলতে ত শুধু তার মাটিকে বোঝায় না! দেশের আকর্ষণ ত শুধু তার মাটির আকর্ষণ নয়। সেখানকার যে সব মানুষ তাদের মনে ছোটবড় কত মধুর স্মৃতি থাকে বলেই ত দেশকে মধুর লাগে! তবেইত দেশের সঙ্গে মানুষ তার নাড়ীর যোগ অনুভব করে!

খাওয়া-দাওয়ার পর শিবনাথ নিজে জহরকে মোটরে ক'রে মেসে পৌঁছে দিতে উদ্যত হলে জহর কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। সে শিবনাথকে বললে আমি নিজেই যেতে পারবো তুই আর কেন এত পরিশ্রম করবি! শিবনাথ কিন্তু তাতে রাজী হলো না। কি রকম অবস্থায় তার শিক্ষিত লেখাপড়া-জানা দাদা থাকে তাই—একবার চোখে দেখে শেষ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার লোভটুকু কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। কি জানি, জহরও বোধহয় সেটা অনুমান করতে পেরে-ছিল তাই সেও তাকে এড়াতে চাইছিল।

মির্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে একটা অন্ধকার সরু গলির মধ্যে ঢুকে তার সবশেষে যে পুরনো দোতলা বাড়ী তারি এক কোণের ঘরে আরো দু'জন 'রুম মেটের' সঙ্গে জহর থাকতো। জারুল কাঠের লালবর্ণ ছোট একটা তক্তপোষের ওপর খানিকটা ছেঁড়া একটা বিবর্ণ ছাপা মাদুর পাতা ছিল আর মাথার দিকে গোটানো ছিল ছোট্ট একটা বিছানা। শিবনাথ গিয়ে মিনিট পাঁচেক সেখানে বসে মনে মনে একটু হাসলো তারপর বললে, আচ্ছা জহরদা তাহ'লে আসি। তুমি ত আমার বাড়ী দেখে এলে এখন মধ্যে মধ্যে ত আসতে পারো। এই বলে যেন শেষ চাবুক মেরে সে বেরিয়ে এলো।

জহরের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন কেমন একটা আগুনের ঝাঁজ বেরুতে লাগল ঈর্ষায় কি বেদনায়, কে জানে। গ্রামের মধ্যে ভালছেলে বলতে তাকে বোঝাতো—লেখায়-পড়ায় স্বভাব চরিত্রে সে ছিল অদ্বিতীয়, অথচ ঠিক তার বিপরীত ছিল এই শিবনাথ।

জহর এর কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সে চাহনীর কি অর্থ তা সেদিন শিবনাথ বুঝতে পারেনি। তবে তার কিছুদিন পরে যখন দেশের লোক একে একে দুয়ে দুয়ে তার বাড়ীতে এসে হাজির হ'য়ে কেউ-বা অর্থ-সাহায্য চাইলে, কেউ-বা ছেলের চাকরীর জন্যে এসে মিনতি জানালে তখন তার বুঝতে বাকী রইল না যে এ জহরের কাজ। জহরের ওপর সে ভীষণ চটে গেল। তার ইচ্ছা হ'লো তখনি কুকুরের মত দেশের সেই লোকগুলোকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো হয়ত জহর বিশ্বাস করতে পারেনি যে সত্যি সত্যি সে এত ঐশ্বর্য্যের মালিক, তাই যাচাই করার জন্যে এদের পাঠিয়ে দিয়েছে গোপনে। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা পূর্ণ করে।

তারপর মধুর সন্ধান পেলে যেমন মৌমাছির দল ছুটে আসে তেমনি করে দলে দলে ভিখারীর মত দেশের লোক রোজই নানা প্রার্থনা নিয়ে তার কাছে আসতে লাগল। সে কত লোককে কত টাকা দান করলে, কত ছেলের চাকরী করে দিলে। রোজ ভাবে এই শেষ কিন্তু কাউকে সে বিমুখ করতে পারে না। সে যেন এর-ই মধ্যে দিয়ে দেশের প্রত্যেক লোকের কাছে এই সংবাদটা পৌঁছে দিতে চায় যে যাকে তোমরা সকলে একদিন অপমান লাঞ্ছনা করেছিলে আজ সে তোমাদের মাথার

ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তার চরণামৃত পান করার জন্যে নিত্য দেশের লোক ছুটে আসে। কৈ গো রাজাবাপ্, দানীবাপ গরীবের মা-বাপ কৈ? বলে তারা এসে হাত পাতে।

শিবনাথ যত তাদের দেয় তত তারা বলে, আহা ভগবান তোমার ভাল করুক, দেশের মধ্যে এমন মানুষ আর নেই। কেউবা বলে 'মানুষ নয় যেন দেবতা!'

শিবনাথ যেন দানছত্র খুলে দিলে! এই দানের মধ্যে দিয়ে সে যে মনে মনে তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তা বুঝতে পারে না কেউ, এমন কি শিবনাথের স্ত্রীও না! তাই স্বামীকে সে নিষেধ করে ওই কতকগুলো পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকের জন্যে এত টাকা খরচ করতে।

শিবনাথের স্ত্রী জ্যোৎস্না তার বাল্যকালের কোন কথাই জানতো না। তার কাছে শিবনাথ বরাবর গোপন করেছে! সে সকল ত গৌরবের কথা নয় যে স্ত্রীকে বলবে? বরং পাছে সেকথা জানালে স্ত্রীর মনে তার সম্বন্ধে নীচু ধারণা হয় এই জন্যে সে সর্বদা তাকে এড়িয়ে চলতো!

এমনি করে যত দিন যেতে লাগল তত দেশের লোকের মুখে নিজের জয়গান শুনতে শুনতে শিবনাথের একদিন মনে হলো হয়ত এখন দেশের লোকেরা সব ভুলে গেছে তার পূর্ব কাহিনী। ব্যাপারটাকে আরো কায়েমী করার জন্যে ক্রমশঃ সে দেশে স্কুল, চেরিটেবল ডিসপেন্সারী প্রভৃতি করে দিলে। তারপর বর্তমান তরুণ যুবকদের হাত করার জন্যে তাদের থিয়েটার ক্লাবে মোটা মোটা টাকা চাঁদা দিতে লাগল।

এইভাবে পয়সা ছড়িয়ে সে দেশের হাওয়া একেবারে বদলে দিলে। যুদ্ধের দরুণ দেশের তখন চরম দুরবস্থা! লোকে তাই হরিলুঠ কুড়তে কুড়তে যেমন মুখে হরিধ্বনি করে ওঠে তেমনিভাবে শিবনাথের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠলো! এই সূত্রে যখন তিনকড়ি সেদিন ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করার জন্যে তাকে ডেকেছিল সে সগর্বে তা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই কি তার পরিণাম?

গাড়ীটা এসে আবার একটা স্টেশনে থামতেই যেন তার চমক ভাঙলো। এইবার আর একটা নতুন সিগারেট ধরাতেই তার চোখের দৃষ্টি যেন ক্রুর হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যর মুখ মনে পড়লো। তারপর সঙ্গে শঙ্কর ও তাদের দলের কথা মনে পড়তে সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

৩

কলকাতার বাড়ীতে যখন শিবনাথ ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই দেখলে তার স্ত্রী জ্যোৎস্না বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে। তার মাথার কাছে একটা স্নিগ্ধ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে রেশমী ঝালরের মধ্যে। স্ত্রীকে বই পড়তে দেখলে শিবনাথের মনটা কেমন যেন খারাপ

হয়ে যায়। সে যে লেখাপড়া জানে না এই কথাই তখন বারবার তার মনে পড়ে। তাই স্বামীর পায়ের আওয়াজ পেয়েই জ্যোৎস্না যখন জিজ্ঞেস করলে, কাল কেমন সভা করলে তখন সে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে কাল খবরের কাগজে তা দেখতে পাবে।

জ্যোৎস্না বললে, তোমাদের ওই পাড়াগাঁয়ের খবরও সংবাদপত্রে বেরুবে? বলে বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

শিবনাথ সগর্ব্বে উত্তর দিলে, তোমার ·স্বামীকে কি যা তা লোক ভাবো? শিবনাথ মুর্খ, লেখাপড়া শেখেনি, বলে সর্ব্বদা স্ত্রীর কাছে নিজেকে এমনিভাবে জাহির করতো, অবশ্য এর জন্যে তার অর্থব্যয় হ'তো প্রচুর। খবরের কাগজের যাঁরা হর্ত্তাকর্ত্তা তাঁদের ঘুষ দিয়ে সে হাত ক'রে রেখেছিল। তাঁরা তাই কখন কোথায় শিবনাথ কি করেন সব সময় তাঁদের কাগজে ছাপিয়ে দিতেন।

স্বামীর নাম খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখে জ্যোৎস্নার বুক দশ হাত হয়ে উঠতো। সে মনে মনে ভাবতো যে সত্যিই তার বাপ মা তাকে একজন যা-তা লোকের সঙ্গে বিয়ে দেননি। স্বামী সম্বন্ধে বরাবরই জ্যোৎস্নার মনে এই রকম একটা কল্পনা ছিল! জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যান হবে তার স্বামী—দশজন তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। শিবনাথ একথা জানতো তাই সব সময় স্ত্রীর কাছে নিজের পাণ্ডিত্যের বড়াই করতো। ক্লাশ সেভেন্ পর্য্যন্ত যার বিদ্যা সে কথায় কথায় জ্যোৎস্নাকে শুনিয়ে বলতো, যখন কলেজে পড়তুম তখন আমি এটা করেছি, ওটা করেছি ইত্যাদি। শ্বশুরবাড়ী গিয়েও সে মধ্যে মধ্যে এই রকম চালাতো। হয়ত শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ বাবা তরমুজের সরবত হয়েছে খাবে? উত্তরে সে বলতো, তরমুজের সরবৎ ভারী বিশ্রী জিনিস। সেই কলেজে যখন পড়ি তখন একবার খেয়েছিলুম, কিন্তু মুখে দিতে গিয়ে এমন একটা বুনো গন্ধ লাগল যে সব বমি হয়ে গেল। শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ সভয়ে বলে উঠতেন, থাক বাবা, তবে কাজ নেই খেয়ে, তোমার যখন ও জিনিসে বুনো গন্ধ লাগে, তখন দরকার কি খাবার।

আবার যখন কোন কোন দিন ছোট শালীরা এসে ধরতো জামাইবাবু চলুন আজ আমরা 'বন্দী' ছবিটা দেখে আসি, শুনেছি নাকি খুব ভাল হয়েছে। তখন একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলতো ওসব বাংলাছবি আমি দেখি না—তার চেয়ে বরং চলো মেট্রোয় যাই। বলে শালীদের নিয়ে গিয়ে একটা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য নোংরা ছবি দেখিয়ে তার একবর্ণ বুঝতে না পেরেও মুখে অজস্র প্রশংসা করতে করতে মোটরে গিয়ে উঠতো। তারপর 'ফিরপো'র দরজায় সহসা মোটর বেঁধে শালাশালীদের নিয়ে কিছু বিলেতীখানা খেয়ে এবং বিল দেবার সময় বয়কে সমস্ত খুচরো—আধুলি থেকে পয়সা পর্য্যন্ত বকশিস দিয়ে মুখে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে আসতো। শিবনাথের এই রকম উৎকট সাহেবীয়ানা দেখে তাদের চোখে মুখে ভগ্নিপতির সম্বন্ধে একটা দারুণ বিস্ময় ফুটে ওঠে।

তাই দেখে শুধু শিবনাথ নয়, জ্যোৎস্নাও খুশি হয়। এবং সেই খুশিটাকে আরো ভালো করে বিজ্ঞাপন করার জন্যে সে ভাইবোনদের কাছে বলে, তোদের জামাইবাবুর আবার এমন বদ্ অভ্যেস যে বাঙালীর কোন রেস্তোরাঁতে মরে গেলেও ঢুকবে না—সেখানে খেয়েছে কি অমনি অসুখ?

মোটা মোটা ইংরিজী কেতাব থাকে তার বৈঠকখানায় সাজানো। যাতে ঘরে ঢুকলেই লোক বুঝতে পারে কি রকম শিক্ষিত সে। শালা শালী প্রভৃতিকে ভাল ভাল ইংরেজী বই কিনে সে প্রেজেণ্ট ক'রে কারুকে জন্মদিনে, কারুকে বা সখ ক'রে।

একদিন তার মেজ শালী একখানা শরৎ চাটুয্যের বই চাইতে সে বললে, বাংলা বইয়ের আবার পড়বে কি। এই শালীটি সেণ্টজর্জ্জ কলেজে পড়তো আই, এ। ভগ্নিপতির মুখে এই কথা শুনে বললে, তা ঠিক, আমাদের ইংরেজীর প্রফেসর চ্যাটার্জ্জীও তাই বলেন!

শিবনাথ সগর্ব্বে হেসে বলে, যে কোন শিক্ষিত লোকই ওই কথা বলবে। এর মধ্যে আর নতুনত্ব কি আছে?

আর্ট এক্‌জিবিসন হ'লে সেখানে গিয়ে হঠাৎ এমন কতকগুলো ছবি সবচেয়ে বেশী দাম দিয়ে কিনে বসতো যে জ্যোৎস্না ছবিগুলোর দিকে চেয়ে মুখটা বিকৃত ক'রে বলতো, এসব কি কিনে আনলে বলতো।

শিবনাথ সগর্ব্বে বলে, অত সহজে যদি দেখেই সব বুঝতে পারবে তাহ'লে ছবির মূল্য কি! আজকাল যত দামী ছবি তত বেশী দুর্ব্বোধ্য।

জ্যোৎস্না বলে, তাবলে ঘরে যে সব ছবি টাঙ্গানো থাকবে—দিন রাত তারা যদি চোখকে পীড়া দেয় তাহ'লে কি ভাল লাগে? ছবি হবে সুন্দরের প্রতিকৃতি তা ঘরকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর ক'রে তুলবে—মনকে প্রফুল্ল করবে যখনই তার দিকে চাইবো।

শিবনাথ বলে, ওসব হলো সেকেলে রুচি। আধুনিক সভ্য সমাজে একেবারে অচল।

জ্যোৎস্না চুপ করে যায়। ভাবে সত্যি সে নিজেই হয়তো বোঝে না—তা না হ'লে এত দাম কখনো হতে পারে ছবিগুলোর? তাই শিবনাথের মুখের দিকে সে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এ ছাড়া আজ টেষ্টম্যাচ, কাল গানের জলসা, এ ত আছেই। শিবনাথ বেশী টাকা দিয়ে টিকিট কিনে নিজের রুচির পরিচয় দিতে ছুটতো ইডেন গার্ডেনে। ক্রিকেট খেলার কিছুই বুঝতো না, তবুও আধুনিক সভ্য সমাজের ওইটাই ফ্যাসান ব'লে মাঠে গিয়ে ওষুধ গেলার মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো—পাঁচজনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, গল্প করে, ফ্লাসকে ক'রে নিয়ে যাওয়া চা ও শুকনো চপ্ কাটলেট খেয়ে।

গানের জলসায় গিয়েও তার ভাল লাগত না। ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিখ্যাত

সব ওস্তাদ ও বাঈজীদের গানের সে এক বর্ণও বুঝতো না, তবু বসে বসে হাই তুলে ঝিমিয়ে শেষরাত পর্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ মুখে কাটাতো। আর পাশের সমঝদার শ্রোতারা যখন যার প্রশংসা করতো, তখন সে বেয়াকুবের মত তাদের মুখের দিকে চেয়ে তাই হজম করতো পরে আর পাঁচজনের কাছে তাদের সেই মন্তব্যগুলো আউড়িয়ে নিজের সঙ্গীত সম্বন্ধে পান্ডিত্য জাহির করবার জন্যে।

আপনাকে সভ্য, শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত বলে সমাজ চালু করবার জন্য তাকে দিনরাত এইভাবে নিজের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হতো।

কিন্তু কেন? এক এক সময় শিবনাথ নিজেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তো। আবার পর মুহূর্ত্তে নেশার মত তাকে তা পেয়ে বসতো। সে জানতো না যে সত্যিকারের শিক্ষা কারো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কস্তুরীমৃগের মত আপনার গন্ধ সে আপনি দিকদিগন্তে ছড়িয়ে দেয়। মানুষ হঠাৎ বড়লোক হতে পারে, যখন ইচ্ছা মোটরগাড়ী কিনতে পারে, পয়সার জোরে এখান থেকে একদিনে উড়ে হনলুলু যেতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করলেই শিক্ষিত হতে পারে না। শিবনাথ জানতো না যে ওর জন্য সংস্কৃতির প্রয়োজন। মন তৈরী করতে হয় ধাপে ধাপে—যেমন করে প্রথম ভাগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, কথামালা এবং তারপর ক্রমশঃ বি, এ, এম্ এ প্রভৃতি। সব শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই এক নিয়ম!

কিন্তু শিবনাথ এসব একেবারেই বিশ্বাস করতো না। সে জানতো পয়সার জোরে যেমন সব জিনিসই ইচ্ছামাত্র কেনা যায়, তেমনি লেখাপড়া শিক্ষা সভ্যতা সব কিছুই কেনা যায় এর বিনিময়ে। তাই সর্ব্বদা নিজেকে নিয়ে সে সেইভাবে চলতো। ফলে শ্বশুড়বাড়ী গেলে অন্যান্য পাঁচটা শালা ও ভায়রাভাই যখন মিলে-মিশে খোশগল্প করতে করতে হঠাৎ দর্শন, সাহিত্য, সমাজ বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিতো তখন শিবনাথ পড়তো সব চেয়ে মুস্কিলে। কিন্তু মুখে কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে সে তাদের কথায় দু' চারটে ফোড়ন কাটবার চেষ্টা যে না করতো তা নয়, তবে তাদের সেই জ্ঞানসমুদ্রের গভীর জলে সে যেন তলিয়ে যেতো। সামান্য কথা থেকে যে এত সব বড় বড় আলোচনা উঠতে পারে, তা ছিল শিবনাথের ধারণার একেবারে বাইরে। কত ইকনমিকস্ ও পলিটিক্সের কথা,—কত সোসালিজম, মার্কসিজম, ফ্যাসিজম্ কম্যুনিজম্-এর কাহিনী, কত বার্গসঁ, নিট্সে, রঁলা, শ' প্রভৃতির বাণী, শুনতে শুনতে তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠতো এবং হঠাৎ কোন একটা কাজের অছিলায় সে সেখান থেকে উঠে যেন ভিতরে চলে গিয়ে বাঁচতো। আবার পাছে শালাশালীরা তা বুঝতে পারে, এই ভেবে অন্য কোন গল্প না ফেঁদে কবে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে মোটর পাঠাতে হবে কালীঘাটে গঙ্গাস্নানের জন্যে, কবে শালাশালীদের সমস্ত দিনের জন্য গাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ফিষ্ট করতে যাবে বলে—সেই সব আলোচনা শুরু ক'রে দিতো।

শিবনাথের শ্বশুরবাড়ীর বিদ্যানের বংশ বলে খ্যাতি ছিল খুব, কিন্তু সে

ছাড়া ও বাড়ীর আর সব জামাই ছিল লেখাপড়া জানা। শিবনাথ বেশ বুঝতে পারতো যে ধনী বলে ও বাড়ীর সবাই যেমন তাকে খাতির করে, তেমনি লেখাপড়া জানে না বলেও সকলের মনে তার প্রতি কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাও ছিল।

এটা শিবনাথের কাছে অসহ্য মনে হয়তো। তাই কি ক'রে সে তাদের মন থেকে সেই ভাবটা দূর করবে, সেই ভাবনায় সব সময় যেন সতর্ক হয়ে চলতো। বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ীর লোকদের কাছে। এ জগতে যার অর্থ আছে তার সব আছে। অর্থ মানেই ত 'পাওয়ার'—ক্ষমতা। মনকে সে এমনি ক'রে নানাভাবে বোঝাতো। কিন্তু তবু তার মন যেন বুঝেও বোঝে না—কি যেন সে চায়, কি যেন পায় না। তার নিভৃত অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা তাই অহরহ আপনার মনে আপনি মাথা খুঁড়ে মরতো!

প্রথম দিনের কথা তার মনে আছে। হঠাৎ খবরের কাগজ খুলে শিবনাথ লাফিয়ে উঠল। তার নাম ছাপা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও সব চেয়ে বড় ইংরিজী কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে। তাদের পাড়ায় লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁদের একজন হয়েছিলেন সভাপতি ও একজন প্রধান অতিথি। আর সে মোটা চাঁদা দিয়েছিল বলে ছোকরার দল তাকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করে দিয়েছিল। শিবনাথ প্রথমে রাজী হয়নি, বলেছিল সময় নেই কিন্তু লাইব্রেরীর সেক্রেটারী একেবারে নাছোড়বান্দা! বললে, আপনাকে এর জন্য এতটুকু সময় নষ্ট করতে হবে না—আমরা সব করে রাখবো কেবল আধঘণ্টার জন্যে আপনি গিয়ে আপনার অভিভাষণটা পড়ে দিয়ে আসবেন। অভিভাষণটাও লিখে পাঠিয়ে দেবো আমরা।

তবু মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করে শিবনাথ বলেছিল, তা বরং সম্ভব, কেননা এখন আমি এত ব্যস্ত যে অভিভাষণ-টাষণ লেখবার জন্য এক মুহূর্ত্ত সময়ও দিতে পারবো না।

সেক্রেটারী এইবার বলে উঠলো, তা আমরা জানি বলেই ত বলছি, আপনাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু দয়া করে আধঘণ্টা উপস্থিত থাকবেন।

সমস্ত ব্যাপারটা তখন শিবনাথের ভারী ভালো লাগল। এর পুরস্কার যে এইভাবে সে হাতে হাতে পাবে তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। শুধু খবরের কাগজে নাম তার বেরোয় মধ্যে মধ্যে কিন্তু এইভাবে একেবারে বড় বড় দুই পণ্ডিতের সঙ্গে একত্রে বেরোনো এই প্রথম।

খবরটা দেখেই তাই আনন্দে তার বুকটা নেচে উঠলো। এবং সে তাড়াতাড়ি কাগজটা হাতে নিয়ে জ্যোৎস্নার ঘরে গিয়ে তাকে সেই খবরটা দেখালে।

পড়তে পড়তে জ্যোৎস্নার মুখ চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তার স্বামী যে সত্যিকারের একজন বিদ্বান ও পণ্ডিত লোক সে সম্বন্ধে তার মনে তখন আর কোন সংশয় রইল না। স্বামীর মুখের ওপর উজ্জ্বল চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, বাবা, দাদা, জামাইবাবু এদের সকলের নজরে নিশ্চয়ই

এই খবরটা পড়বে ?

নিশ্চয়ই ! আজ শুধু তাদের কেন, লক্ষ লক্ষ লোকের চোখে পড়বে ? অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে এ ত ছেলেখেলা নয় সারা ভারতবর্ষে যে এর প্রচার। কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই শিবনাথের মনে হলো, যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যায়—এটুকু খবর যদি কারুর নজরে না পড়ে ?

তাই মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করে থেকে সে কি যেন ভাবলে। তারপর মনে মনে স্থির করলে তখনই একেবারে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসবে। কিন্তু শুধু ত আর ওই খবরটা জানবার জন্যে যাওয়া যায় না।—তাই বিকালে শালীদের সিনেমা দেখতে যাবার নেমন্তন্য করবার নাম করে একটু পরেই সেখানে গিয়ে সে হাজির হলো।

বলা বাহুল্য শালীরা সিনেমার খবর শুনে খুবই খুশি হলো এবং শ্বশুর শাশুড়ীরাও তাতে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার জীবনে যে আজ একটা এত বড় ঘটনা ঘটে গেল সে-কথার কেউ কোন উল্লেখ করলে না দেখে তার মনটা খুব দমে গেল।

সে ভাবলে এত বড় একটা ঘটনার কি কোন মূল্য নেই তাদের কাছে ? তার যে নামটা এতবড় কাগজে এই সব বিখ্যাত পন্ডিত লোকদের সঙ্গে ছাপা হয়েছে, এর জন্যে ত তাদেরও মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। শ্বশুর, শালা, বা অন্যান্য জামাইরা সব বিদ্বান হতে পারে—তিন, চারটে পাশ করা হতে পারে কিন্তু তাদের নাম তার মত কোনদিনই তো খবরের কাগজে ছাপা হয় না। তাই শিবনাথ মনে মনে একটা ছুতো খুঁজতে লাগল সেই খবরটা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্যে।

অনেকক্ষণ ধরে আজে বাজে কথা কইতে কইতে হঠাৎ একসময় হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে শিবনাথ যখন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তখন শ্বশুরমশায় তাকে আরো একটু বসতে অনুরোধ করতেই সে মুখে বিরক্তি দেখিয়ে খপ করে বলে উঠলো, এই দেখুন না যত সব বাজে কাজে—পাড়ার ছেলেদের অনুরোধ এড়ানো যায় না—যত বলি বাপু আরো ত ঢের পাড়ায় লোক রয়েছে তাদের কাছে যাও না—

আগ্রহের সঙ্গে এইবার শ্বশুরমশায় প্রশ্ন করলেন, কি কাজ ?

আমাদের লাইব্রেরীতে এখনি একবার যেতে হবে—কি একটা মিটিং আছে—

শ্বশুরমশায় আবার প্রশ্ন করলেন, মিটিং, কোন লাইব্রেরীতে ?

শিবনাথ তখন সগর্ব্বে বলে উঠলো, ওই যে আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী—আজ কাগজে তাদের একটা খবর বেরিয়েছে দেখেন নি ?

কৈ না ? কি খবর বেরিয়েছে ? বলে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বললেন, এখন আর ওসব খবর পড়বার কি সময় আছে। যুদ্ধের যা খবর তাই সব সময় পড়ে ওঠা যায় না।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে শিবনাথও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ঠিক তাই আমারো কি

নজরে পড়েছিল? এই দেখুন না আমি গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় লাইব্রেরীর কতকগুলো ছেলে এসে এই কাগজটা দিয়ে গেল। বলতে বলতে পকেট থেকে বার করে সেটা তাঁর সামনে মেলে ধরলে।

শ্বশুরমশায় সেটা হাতে নিয়ে পড়ে তারপর বললেন, তোমাদের পাড়ার লাই-ব্রেরী বুঝি? তা বেশ। বলে একটু চুপ করে থেকে উপদেশ দিলেন, ওসবের মধ্যে না যাওয়াই ভালো, কেননা একদল লোক আছে তারা কেবল চাঁদা আদায় করার জন্যে এইভাবে ঘোরে।

শিবনাথ কিছু বলবার আগেই তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সে চুপ করে গেল।

শ্বশুরমশাই তাকে সতর্ক করে দিলেও শিবনাথের কানে কিন্তু তা ভাল লাগল না। কেমন যেন একটা নেশা তাকে পেয়ে বসেছিলো। খবরের কাগজে শিক্ষিত বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে তার নাম বেরোয় একথা চিন্তা করতেও যেন তার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে তাই ঐরকম আরও অনেক ক্লাব, লাইব্রেরী স্কুল প্রভৃতিতে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে কারুর সেক্রেটারী, কারুর প্রেসিডেণ্ট কারুর বা কার্য্যকরী সমিতির মেম্বার হতে লাগল। তারপর ধুমধাম করে কারুর বার্ষিক উৎসব, কারুর প্রাইজ, কারুর প্রীতিসম্মিলনী উপলক্ষে বড় বড় কাগজের সম্পাদকদের এনে সভাপতির সঙ্গে নিজের নাম তাদের খবরের কাগজে বার করতো। দৈনিক কাগজের সম্পাদকদের সভাপতি করলে একটা মস্ত সুবিধা—খুব বড় বড় হরপে সভার সম্পূর্ণ বিবরণীটা কাগজে ছাপা হয়, এবং সভার ছোট বড় প্রত্যেকটি বিবরণ বেরোয়।

এমনি করে যেদিন তার নাম কাগজে ছাপা হতো সেদিনই সে মনে মনে কল্পনা করতো তার শিক্ষিত ভায়রাভাইদের মুখগুলি। তাদের পয়সা ছিল না বটে কিন্তু দেমাক ছিল খুব শিক্ষার। শিবনাথের কাছে এটা আবার বড় খারাপ লাগত! কেন? কি অপরাধ সে তাদের কাছে করেছে? দু' চারটে পাশ তারা করেছে আর সে করতে পারেনি এইটুকু ত তফাৎ? তার জন্যে তাকে এতটা তারা দূরে সরিয়ে রাখে কেন?

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা আপনি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে স্থিরভাবে তিনতলার একটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দিকে চেয়ে।

গাঢ় অন্ধকারে নিশীথ রাত্রি থমথম করে। সমস্ত শহরে বুঝি কেবল সে একলা আছে জেগে।

শিবনাথ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, তার যদি বাপ ছেলেবেলায় না মরে যেতো তাকে নিঃস্ব ক'রে রেখে, তাহলে ত সেও লেখাপড়া শিখতে পারতো তাদেরই মত। তাছাড়া তার খুড়ো-খুড়ীরা যদি তাকে তখন লেখাপড়া শেখাতো তাহলে আজ কি হতো?

আর সে ভাবতে পারে না। সমস্ত রাগটা তখন তাদের ওপর গিয়ে পড়ে!

কেন তারা তাকে লেখাপড়া শেখায়নি তার খুড়তুতো ভায়েদের মত। ভায়েরা যখন বই নিয়ে স্কুলে যেতো, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে লেখাপড়া শিখতো, তখন সে যেতো চাকরী করতে হাটে এক মুদীর দোকানে? সে মূর্খ তার নাকি লেখাপড়া হবে না, স্কুলের মাষ্টাররা বলে দিয়েছিল তার খুড়োকে! থার্ড ক্লাসে সে উঠতে পারেনি অনেকগুলো বিষয়ে ফেল হয়েছিল। কিন্তু কেন ফেল হয়েছিল সে খবর কি কেউ রাখতো?

তার মায়ের ওপর যে অত্যাচার হতো—ঝিয়ের মত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও খুড়ীর গালাগাল অবিশ্রান্ত তার ওপর বর্ষণ হতো—আর তার মা কাঁদতো! মায়ের চোখে এত জল দিনরাত ঝরতে দেখলে কোন ছেলের মন ভাল থাকে?

কিন্তু এবার দেশে শিবনাথের সভাপতিত্ব করার সংবাদটা যখন খবরের কাগজে বেরল তখন তার মনে অন্য রকম চিন্তা হতে লাগল। লাবণ্য ও শঙ্করের দলের অপমানটা যেন সেই সঙ্গে আরো বেশী করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে। সারাদিন তার মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে—কোথায় এমন একটা নিদারুণ আঘাত পেয়েছে যার স্মৃতি তার মনটাকে যেন বিরক্ত করে রেখেছে! মনে মনে সে গুমরতে থাকে—অসহ্য প্রদাহে তার মস্তিষ্ক যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। লাবণ্য এতবড় অপমানটা করে গেল। তখনি ভীষণতর একটা কিছু প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। নিঃশব্দে সে ছটফট করে যেন তার গোপন যন্ত্রণায়! সে ভেবেছিল বুঝি দেশের লোকও তার বাল্যকালের সব কথা ভুলে গিয়েছে, অন্তত পয়সা দিয়ে সে সকলের মন থেকে সেটা দূর করতে পেরেছে! তাই যে দেশের লোকের জন্যে দু'হাতে পয়সা ছড়িয়েছে, যাদের অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যে হাজার হাজার টাকা ঢেলে রাস্তাঘাট, স্কুল, ডাক্তারখানা, প্রভৃতি তৈরী করিয়ে দিয়েছে, তাদের হাতে এইভাবে অপমান হওয়াটা কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিল না। কি সে ভাবনা! কি সে দুঃসহ বেদনা। রাত্রে কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে না!

হঠাৎ জ্যোৎস্নার ঘুম ভেঙ্গে যায় বিছানায় শিবনাথকে দেখতে না পেয়ে! ধড়মড় করে সে খাটের উপর উঠে বসে। তারপর মশারীটা এক হাতে তুলে ধরে সে চমকে ওঠে! দেখে পাথরের মূর্ত্তির মত শিবনাথ স্থিরভাবে একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি দূর আকাশের এক কোণে যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ভেদ করে কতকগুলো তারা নিঃশব্দে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে নীরব সাক্ষীর মত।

জ্যোৎস্না কখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা শিবনাথ টের পায়নি। কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নাও সেখানে তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, তোমার কি হয়েছে বলো ত? আজকাল আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি তুমি যেন দিনরাত কি চিন্তা করো।

শিবনাথ সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি নীরব রইল। তখন তার

একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কাঁধে মাথাটা রেখে জ্যোৎস্না বললে, কি হয়েছে তোমার বলনা ? তারপর একটু থেমে আবার বললে, তোমার কিসের অভাব, লক্ষ লক্ষ টাকা—বাড়ী, গাড়ী, লোকজন, খ্যাতি সম্মান—মানুষ যা কামনা করে তার সবই ত পেয়েছো—তবে আরো কি চাও ?

শিবনাথ এইবারে একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে, না কিছু না—চলো শুইগে—

জ্যোৎস্না তার স্ত্রী হলেও অতীত জীবনের কাহিনী সবই সে তাঁর কাছে গোপন রেখেছিল। তাই আর কিছু না বলে জ্যোৎস্নাও তখন নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে শুলো।

৪

'জাগে নব ভারতের জনতা / এক জাতি এক প্রাণ একতা।

এই গানটা গাইতে গাইতে জাতীয় পতাকা হাতে শঙ্করের দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। মধ্যে মধ্যে মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি ওঠে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'গান্ধীজী কি জয়' সুভাষচন্দ্র কি জয়' 'হিন্দু-মুসলমান কি জয়' 'ভারতমাতা কি জয়' প্রভৃতি।

বহুদিন পরে আবার গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা ঘরের মধ্যে যেন চমকে উঠলো ! এ কোন মহাসঙ্গীত, এ কোন মহা আহবান ভেসে এলো ! তারা ছুটে বেরিয়ে যায় দেখতে। মেয়েরা দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে চোখ রেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল রাস্তার দুপাশে দাঁড়ায় শুধু ভীড় ক'রে, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে যায় সেই দলে যোগ দিয়ে যেন নিজেদের ধন্য করতে। এ যেন মহাজীবনের মহাস্রোত চলেছে আর অগণিত নরনারী দেবতার পায়ে নিবেদিত ফুলের মত তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে—কোথায় যেতে হবে কেউ জানে না, শুধু তারা চলে সামনের দিকের আকর্ষণে, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায়। পুরুষের দলের অগ্রভাগে চলে শঙ্কর আর মেয়েদের দিকে লাবণ্য। শোভাযাত্রা চলে গ্রামের ছোট বড় রাস্তা দিয়ে, ঘুরে ফিরে, এঁকে বেঁকে—

শঙ্কর গ্রামে আসার পর এই প্রথম শোভাযাত্রা।

আজ "জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস" !

তিনুর কানে সেই গানের সুর যেতেই সে মুখটা বিকৃত ক'রে আপনমনেই বলে উঠল, যত সব ভণ্ডর দল ! গান গেয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোকের কাছে বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে, এই দেখ আমরা দেশ সেবক, দেশের সেবা করছি ! আরে ওতে 'ভবি ভোলে না' ! আজ পর্য্যন্ত ও ত ঢের হলো তাতে দেশোদ্ধার কে কত করলে ! দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল ! বরং এই সব হামবাগ-গুলোর নাম কেনার প্রতিযোগিতায় পড়ে কতকগুলো নিরীহ লোককে জীবন দিতে

হলো ! তার বাড়ীর কাছাকাছি শোভাযাত্রাটা আসতেই তিনুর ছোট ভাই শম্ভু রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনুও তার পিছনে দৌড়ে গেল এবং তার একটা কান ধরে টানতে টানতে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে বললে, খবরদার এই দলের সঙ্গে যদি মিশেছো ত হাড় একদিকে আর মাস একদিকে করবো !

শম্ভুর চোখে জল এসে পড়েছিল। সে বললে, আমি মিশেছি বুঝি ?

মিশিসনি—তবে যাচ্ছিলি কোথায় ?

আমি ত দেখতে যাচ্ছিলুম।

না, ওর ধারে যদি কোনদিন যাবি ত মেরে ফেলবো ! যা পড়গে যা।

চোখের জল মুছে শম্ভু তখন পড়তে বসলো। সে মুখে পড়তে লাগল বটে কিন্তু তার মনটা সেই দূরে মিলিয়ে যাওয়া গানের সুরের সঙ্গে যেন ঢেউয়ের মত নেচে নেচে কোথায় ভেসে যায়। কি অপূর্ব সুর । 'জাগে নবভারতের জনতার' ! ছোট বড় অসংখ্য জাতীয় পতাকার মধ্যে লালরঙের শালুর কাপড়ে সাদা অক্ষরে লেখা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' কথাটা যেন তার চোখের সামনে তখনো ভাসতে লাগল। ওটা আবার কি ? একবার মনে করলো দাদাকে জিজ্ঞেস করে আবার ভাবলো যদি দাদা তার জন্যে বকে ! তাই কথাটা তখন চেপে গিয়ে আবার পড়তে লাগল। কিন্তু পড়া শেষ হলে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, মা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' কি ?

মা বলেন, কি জানি বাবা, আমি মুখ্যুমানুষ, অতশত জানি না—

এমন সময় সহসা তিনু সেখানে এসে শম্ভুকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, এখানে কি করছিস, এর মধ্যে পড়া হয়ে গেল ?

তার জবাবে মা বলেন, হ্যাঁরে "জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস" কি, খোকা জিজ্ঞেস করছে আমায়, আমি ত জানি না, তুই ওকে বলে দে-ত বাপু—

তিনু মায়ের মুখের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, সে খবরে তোমার দরকার কি। তোমাদের জন্যে দেখছি আর চাকরী করে খেতে হবে না। তোমাদের কতবার বলেছি যে কোন স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে একেবারে আলোচনা করবে না, আমরা গভর্ণমেণ্টের কাজ করি, এখানে গ্রামে আমাদের শত্রুর অভাব নেই, যদি কেউ তাদের কানে তোলে, ত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে ! বলতে বলতে একটু থেমে ছোটভাই এর দিকে চেয়ে সে ধমক দিলে. এই জন্যে বুঝি পড়তে পড়তে উঠে এসেছিস ? যা শিগগির এখান থেকে—আর কোনদিন যদি এসব নিয়ে আলোচনা করতে শুনি ত মজা দেখিয়ে দেবো ! তারপর আপন মনে শঙ্করের মুণ্ডপাত করতে করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং দেশের ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে বলে মনে মনে তার উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিল।

শম্ভুর বয়স বেশী নয়। তেরো কি চোদ্দ। থার্ড ক্লাশে পড়ে। ছিপছিপে একহারা চেহারা কালো রং, বড় বড় টানা চোখ, তাতে গভীর চাহনী। অত্যন্ত সরল ও সচ্চরিত্র। লেখাপড়ায়ও বেশ ভাল। স্কুলের মাষ্টাররা তাকে খুব স্নেহ

করেন। স্কুলে গিয়ে সে প্রথম ঘণ্টায় অঙ্কর মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলে, স্যার 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস'টা কি?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে নিষেধ করে দিয়ে বললেন, আমি বলতে পারবো না ওসব স্কুলের মধ্যে—তাহ'লে আমার চাকরী যাবে।

এতে শম্ভুর মনে কৌতূহল বাড়তে থাকে! কি এমন গুরুতর কথা যে কেউ তা বলতে রাজী হয় না! ছুটির পর সে আবার হেডমাষ্টারের ঘরে ঢুকে তাঁকে সেই প্রশ্ন করলে। হেডমাষ্টারমশায়ও রেগে ওঠে বললেন, ওসব কথার উত্তর আমি দিতে পারবো না। তারপর তোমাদের বাড়ী থেকে গার্ডিয়ানরা চিঠি দেবেন যে স্কুলে হেডমাষ্টারমশায় এইসব ব্যাপার নিয়ে ছেলেদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছেন! ও আমি পারবো না। এই করে আমার একবার চাকরী গিয়েছে—আমি ভুক্তভোগী। যাও ওসব প্রশ্ন বাড়ীর লোকেদের কাছে করো—আমাকে কেন ওর মধ্যে জড়াতে এসেছো বাবা!

তাইত! ব্যাপারটা যেন ক্রমশঃ আরো জটিল হয়ে ওঠে। কথাটা তাই না জানা পর্য্যন্ত সে কিছুতেই যেন সুস্থির হতে পারছিল না। অনেক ভেবে চিন্তে শম্ভু স্থির করলে চুপি চুপি গিয়ে একেবারে শঙ্করদাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পাছে দাদা জানতে পারলে অনর্থ করেন তাই কি করবে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে গেল।

পরদিন স্কুলে আসবার পথে হঠাৎ অঙ্কের শিক্ষক ইশারা করে তাকে ডাকলেন। শম্ভু কাছে আসতে তিনি পকেট থেকে একটা ছোট বই বার করে বললেন, তুই কাল যা প্রশ্ন করেছিলি তার উত্তর এতে লেখা আছে পড়ে দেখিস। কৃতজ্ঞতায় শম্ভুর দু'চোখ ভরে উঠলো।

তার হাতে বইটা দিতে দিতে শিক্ষক মহাশয় বললেন, দেখিস্ আমি যে তোকে এই বই পড়তে দিইছি—কেউ যেন না জানতে পারে। তাহ'লে আমার চাকরী থাকবে না! জানিস্ ত সরকারের হুকুম শুধু ছাত্র নয়, কোন শিক্ষককেও যদি কোনরকম স্বদেশী ব্যাপারে লিপ্ত হতে শোনা যায় তাহ'লে স্কুল থেকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

শম্ভু বললে, না স্যার একথা আর কেউ জানতে পারবে না। আমি লুকিয়ে আজই বইটা নিয়ে কাল আপনাকে ফেরত দেবো।

শম্ভু শুধু লেখাপড়ায় ভাল বলে নয় সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী বলে মাষ্টার-মশায়দের সকলেরই ছিল প্রিয়। তার কথায় বিশ্বাস ক'রে মাষ্টার মশায় তাই চলে গেলেন।

এদিকে বইটা পড়বার জন্যে স্কুলে সারাক্ষণ তার মনটার মধ্যে কেমন করতে লাগল। স্কুলের ছুটির পর বাড়ীতে গিয়ে বই খাতা রেখে কোন রকমে কিছু জলযোগ ক'রে সেদিন আর সে মাঠে খেলতে গেলে না, একটি নির্জ্জন স্থানে বসে বইটা পড়ে ফেললে।…"ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচলুকে ৯ই এপ্রিল

পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরদিন অমৃতশহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই দিন যখন জনগণ সমবেতভাবে রেলষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দুবার গুলি বর্ষণ করে। জনতা এতক্ষণ শান্তই ছিল। তারা অতঃপর ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেয় ও ইংরাজদের উপর চড়াও হয়। ফলে কয়েকজন নিহত হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন হ'ল ও শান্তি রক্ষার ভার জেনারেল ডায়ারের উপর অর্পিত হল। ১২ তারিখে সভাসমিতি বন্ধ করে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণ যথাসময়ে অবগত হতে পারে নি। পূর্ব নির্দেশ মত জনপ্রিয় নেতৃদ্বয়ের মুক্তি দাবী করার জন্য ১৩ই এপ্রিল বিকালে অনূন্য দশ হাজার হিন্দু, মুসলমান ও শিখ জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় সমবেত হ'ল। জেনারেল ডায়ার এই সময়ে সৈন্য ও কামান বন্দুক নিয়ে সভাস্থলে উপনীত হলেন ও বাগের ভিতরকার উচ্চস্থান থেকে জনতাকে গুলি করতে আদেশ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে আগমনির্গমের একটি মাত্র প্রকাণ্ড ফটক। এর প্রায় চারি পার্শ্বেই বড় বড় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ডায়ারের আদেশে সৈন্যগণ ফটক লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ল। কিছুক্ষণ ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্তগঙ্গা বয়ে চলল। সরকারী হিসেবে তিনশ' ঊনআশী জন ও বেসরকারী হিসেবে প্রায় হাজার জন গুলির মুখে আত্মাহুতি দেয়। গুরুতররূপে আহত হয়েছিল সরকারী মতে প্রায় দেড় হাজার। হত্যাকাণ্ডের পর হতাহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করাও ডায়ার উচিত বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি বিজয়ী বীরের মত সদর্পে নিজ ছাউনিতে চলে গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, জনতা সকলেই নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল!…"

পড়া শেষ হবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেইখানে চুপ ক'রে বসে রইল। কিসের একটা চিন্তা তার মর্ম্মমূলে বার বার আঘাত হানতে থাকে। তার কেবলই মনে হতে লাগল, একথাটা কেউ বলতে সাহস করে না কেন? আমাদের দেশের কতকগুলি লোককে জানোয়ারের মত নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো আর আমাদের কাছে সে কথাটা বলা দোষের! আমাদের দেশের লোক কিভাবে মরলো তা আমরা জানতে পারবো না? কেন—কেন?

কিন্তু এই কেনর উত্তর কে বলে দেবে? তরুণ কিশোর হৃদয়ে এমনি করে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়!

ওদিকে মিটিং চলে বকুলতলার মাঠে। শঙ্কর তার গ্রামবাসীদের সামনে দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেয়—যীশুখৃষ্টকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হয় সেইদিনকে যদি ক্রীশ্চানরা অতি পবিত্র বলে মনে করে এবং ওই মৃত্যু তারিখটিকে স্মরণ করবার জন্যে যদি গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি হয়, পূজা অর্চ্চনা বাইবেল পাঠ প্রভৃতি হরেক রকম পুণ্য অনুষ্ঠান হয়, আর তার বিজ্ঞাপন-স্বরূপ ঘটা করে সমস্ত কাজ কারবার আফিস আদালত বন্ধ রাখা হয় সারা

পৃথিবীতে—তাহ'লে এই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' দিবসকে স্মরণ করবার জন্যে আমাদের কি করা উচিত ? এই যে এতগুলি মহাপ্রাণ বিনষ্ট হলো তা কি যীশুর হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বেশী নৃশংস নয় ! আর কে এই যীশুখৃষ্ট—তাকে আমরা চোখে দেখিনি, তার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাও ওদেরই ওই ইংরেজদেরই রটনা। তবু তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি, মানি। কিন্তু যেখানে শুধু একটা যীশুখৃষ্ট নয়, এতগুলো মহাপ্রাণ—নিরস্ত্র ও নিরপরাধকে বিনা দোষে, বিনা বিচারে—অবিশ্রান্ত বন্দুকের গুলিতে জীবন হারাতে চোখে দেখলুম সেখানে কি তাদের জন্যে আমাদের কিছু করার নেই ?

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক 'বন্দেমাতরম্' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

শঙ্কর এই ফাঁকে একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলে—এসো ভাই আজ তবে এই পুণ্য দিনে আমরা সকলে সেই উৎসর্গীকৃত অমর আত্মাদের স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা করি, আজ থেকে প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক বিষয়ে আমরা এই ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগ করে চলবো। তাদের কাজে যারা কোনরকমের সাহায্য করবে তাদের আমরা দেশের শত্রু বলে মনে করবো ! 'বন্দেমাতরম্' বলে সকলে চীৎকার করে ওঠে !

এর পরে হিজলীদিবস, স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী সপ্তাহ, যতীনদাস দিবস প্রভৃতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সহকারে শঙ্কর পালন করতে লাগল। বিশেষতঃ জাতির ভাগ্যের সঙ্গে যে দিনগুলির ইতিহাস জড়িত তাদের সম্পূর্ণভাবে দেশবাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করা সে তার কর্ত্তব্যকর্ম বলে মনে করে। এই দিনগুলিই যে তাদের জাতীয় জীবনের স্তম্ভস্বরূপ তা সে ভাল করেই জানতো। তাই সুযোগ পেলেই শঙ্কর ছোটখাটো মিটিং, শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন ক'রে গ্রামবাসীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতো। তার ফল হাতে হাতে না পেলেও, তার দলকে ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে দেখে শঙ্কর আশান্বিত হয়ে উঠলো।

গ্রামে আবার তাঁতঘর বসলো, আবার চরকার স্কুল খোলা হলো।

লাবণ্যর ওপর মেয়েদের ভার ! স্কুলের চাকরী যাবার পর সে যখন ম্লান মুখে শঙ্করের কাছে গিয়ে সেই খবরটা দেয় তখন শঙ্করের মনে কোথায় যেন বিবেক দংশন করে। তার মনে হয় যেন তার চাকরী যাওয়ার জন্য সে-ই দায়ী, তবু সঙ্গে সঙ্গে মুখে উৎসাহ দেখিয়ে সে বলে ওঠে, খুব ভাল হয়েছে, আমি ঠিক এই রকম একজন কর্মী খুঁজছিলুম।

ঘাড় হেঁট করে লাবণ্য বললে, কিন্তু আমার অবস্থার কথা, আপনি সবই শুনেছেন—

উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে শঙ্কর। তারপর বলে দেশের কাজে বুঝি আস্থা রাখতে পারছো না !

অপ্রস্তুত হয়ে লাবণ্য কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে

শঙ্কর তখন বলে, তোমার দোষ নেই। শুধু তোমার একার নয় আজ সমস্ত জাতের অস্থিতে মজ্জায় এ বিশবাস—যাদের হাতে প্রজাদের খাওয়া পরার ভার তারাই লোকের মনে এটা এনে দিয়েছে। তোমরা কি করবে! বলতে বলতে সহসা শঙ্করের চোখ দুটো হিংস্র হয়ে উঠলো। চাকরীর দিকে এখন আমরা চেয়ে থাকি —তা সে যেমন চাকরীই হোক, আর যত বেতনই হোক—? অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও এই চাকরীকে লোকে অত্যন্ত নীচু চোখে দেখতো! আচ্ছা লাবণ্য, বলতে পারো আমাদের দেশের শতকরা আশীজন কেরানী কত মাইনে পায়? একটু থেমে তার জবাবটা আবার সে নিজেই দিয়ে দিলে। বললে, খুব বেশী হলে এই যুদ্ধের বাজারেও গড়ে পঞ্চাশ টাকা? আর এই পঞ্চাশ টাকায় কি হয়? শহরে ঘর ভাড়া দিয়ে, চাল ডাল তেল নুন কিনে, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে মানুষ সেখানে কেমন করে বাস করছে সহজেই বুঝতে পারো। তাই অর্দ্ধাশনে, অনশনে, অকালমৃত্যুতে আজ আমাদের দেশ সকলের শীর্ষস্থানে। অথচ এই দেশকেই একদিন 'সোনার বাংলাদেশ' 'সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্' বলা হতো। আজ কোথায় গেল সেই সোনার বাংলা? কে হরণ করলে সেই শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির ঐশ্বর্য্য!

তবে লোক এই চাকরী পাবার জন্যে এত সাধনা করে কেন শঙ্কর দা? লাবণ্য বললে।

আর কিছু করার নেই বলে। তারপর আপন মনেই সে গর্জ্জে উঠলো। সমস্ত জাতটাকে পরাধীন, দাসত্বে পরিণত করবার জন্যে ছেলেবেলা থেকে চলেছে ইংরেজ সরকারের ষড়যন্ত্র, স্কুলে তাদের শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে তা ছাড়া তারা আর কিছু চিন্তাই করতে পারে না। লাঠি কেড়ে নিয়ে, অস্ত্র ব্যবহার করতে না দিয়ে, যেমন সমস্ত জাতটাকে নিবীর্য্য করা হয়েছে, তেমনি আবার নানা উপায় উদ্ভাবন করে তাদের জমিজমা চাষ আবাদ নষ্ট করে তাদের চাকর বা চাকুরী-সর্ব্বস্ব করে তুলেছে!

ওঃ কি মহাপতন! কি নৈতিক অবনতি! বলতে বলতে শঙ্করের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। সে বলে, তেরোশো পঞ্চাশ সন তার চরম সাক্ষী! লাখো লাখো লোক খাদ্যের অভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মলো, তবু বিদ্রোহ করলো না, তবু ছিনিয়ে নিলে না, লুঠ করতে এগিয়ে এলো না। তাদের চোখের সামনে রইল গোলাভরা ধান, দোকানে দোকানে খাদ্যসম্ভার, অথচ তারি সামনে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করতে করতে তারা মরে পড়ে রইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত আর কোন দেশ কখনো দেখেনি, বা শোনেনি।

লাবণ্যর চোখ ছলছল করছিল। সে বললে, এটাকে কি আপনি খুব গৌরবের বলে মনে করেন।

নিশ্চয়! যারা তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের এইভাবে বঞ্চিত করলে, তাদের চোখের সামনে মরে পড়ে তাদেরই বিরুদ্ধে তারা জানিয়ে গেল চরম নালিশ। এতবড় আত্মত্যাগ, এতখানি আত্মসম্মানবোধ পৃথিবীর আর কোন দেশে

কোন মানুষের আছে ! ভুলে যেয়ো না যতীনদাসের কথা ! অপমানিতের হাতের অন্ন সে স্পর্শ করলো না—তিলে তিলে অনাহারে শুকিয়ে মলো।

উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে শঙ্কর বললে—চাই সম্মানের অন্ন ! নিজের ঘরে, নিজের দেশে, নিজের অপমান কিছুতেই আমরা আর সহ্য করবো না। ওরা খাবে মাছ, আর আমরা খাবো তার কাঁটা, ওরা চড়বে মোটর আর আমাদের গায়ে লাগবে তার কাদা—এ কিছুতেই সহ্য করবো না ! একজন মাত্র লোক একথা বুঝেছিল অনেক দিন আগে। গোড়া থেকেই তিনি তাই চেঁচাচ্ছেন গ্রামে ফেরো, নিজের ঘরে ফিরে যাও, "চরকা কাটো।" কুটীরশিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তোলো—তবেই পাবে শান্তি তবেই আসবে স্বাধীনতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে আজও এতো কাণ্ডের পর লোকে তাকে ঠাট্টা করে, বলে, মাথা খারাপ—তা নাকি অসম্ভব এই বৈজ্ঞানিক যুগে। এই সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে যে আজো লোকে ভুল বোঝে তারও মূলে রয়েছে সেই শাসকদের গূঢ় চক্রান্ত ! গ্রামকে ধ্বংস করার জন্যে তাই তারা সর্ব্বপ্রথম তার প্রাণ প্রবাহ যে নদী নালা তাকে রুদ্ধ ক'রে, গ্রামের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে দিলে। রেলের পুল তৈরী করে, বড় বড় বাঁধ বেধে, এক দিক দিয়ে যেমন গ্রামের ঐশ্বর্য্যকে তারা দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি নদী মজে গিয়ে, বন্যা, মহামারী, ম্যালেরিয়ায় প্রভৃতি গ্রামকে গ্রাম উৎসন্নে দিচ্ছে। আজ আমরা জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি কেন আমাদের মা অন্নপূর্ণা এখন অন্নরিক্তা।

তাই আজ গ্রামের শত্রুকে নিধন ক'রে গ্রামকে পূর্ব্বগৌরবে ফিরিয়ে আনবার ব্রত দেশের প্রত্যেক লোককে গ্রহণ করতে হবে !

লাবণ্য বললে, কিন্তু এই যে সব স্বদেশী মিল হচ্ছে এরা কি তবে—

কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই শঙ্কর বলে উঠলো, ওসব আমি বিশ্বাস করি না, স্বদেশী মিল মানে টাকাটা বিদেশে না গিয়ে কতকগুলো মাড়োয়ারী বা ভাটিয়ার পকেটে গিয়ে ঢুকলো। কথা একই, জনসাধারণের তাতে কতটুকু সুবিধা ! সেই একদল লোকের পেট দিন দিন মোটা হবে আর একদল লোক শুকিয়ে মরবে। আজো যেমন আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসা তারা একচেটিয়া করে রেখেছে সেদিনও তেমনি রাখবে ! দেশ স্বাধীন হবে যেদিন সেদিন বরং বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকবে না বলে তারা হবে একচ্ছত্র সম্রাট, হাতে মাথা কাটবে ! সেই জন্য গান্ধীজি বলছেন কলকে একেবারে বর্জ্জন করতে হবে আমাদের জীবন থেকে। শান্তিতে এবং সুখে বাস করতে হলে মানুষের দৈহিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হবে। মানুষের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। যার যতটুকু ক্ষমতা সে তেমনি পরিশ্রম করবে ! মিল্ এর সঙ্গে মানুষের হাতের কাজের প্রতিযোগিতাই আজ শুধু আমাদের দেশের নয় পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বনাশের মূল। তাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ লোকের মনকে গ্রাম অভিমুখী, দেশ অভিমুখী করে তোলা।

সন্দিগ্ধকণ্ঠে লাবণ্য জিজ্ঞেস করলে, তা কি আজকালকার দিনে সম্ভব ?

কেন সম্ভব নয় লাবণ্য ? সেটা কি খুব দুঃসাধ্য কাজ ? চাকরীর দিকে যে কারণে তারা ছুটে চলেছে, সেই কারণেই আবার গ্রামের দিকে ফিরবে ? আজ টাটানগর, বাটানগর, বার্ণপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলির মত আমরাও গড়বো আদর্শ গ্রাম—সেই সব গ্রামের নাম হবে গান্ধীগ্রাম, সুভাষপল্লী, দেশবন্ধুপুর, আজাদ-ভূমি, জওহরলাল-চর ! আর এখন যেমন কোম্পানীর সহরে তারা পায় পিচঢালা রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলো, কলের জল, সিনেমা, ডাক্তার, হাসপাতাল, চাকরীর মর্য্যাদা অনুযায়ী ছোটবড় বাড়ী ! তেমনি আবার আমাদের এখানে তারা পাবে গোলাভরা ধান, শস্যপূর্ণ শ্যামলক্ষেত· দুগ্ধবতী গাভী, নদীতে মাছ, পুষ্করিণীতে স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মত জল, সূর্য্যের আলো, অনন্ত নীল আকাশ, নির্ম্মল বায়ু, ফলমূলের গাছ, লতাপাতাঘেরা কুটীর, সিনেমার বদলে যাত্রা, রামায়ণ গান, তরজা, কবিগান ।

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, এ ত কবির কল্পনা ।

কেন কবির কল্পনা লাবণ্য ? কলকারখানায়, অফিস আদালতে সাহেবের দাসত্ব করে লোক যা পায় সে ত তাদেরই পরিশ্রমলব্ধ অর্থের বিনিময়ে অর্থাৎ একদিক দিয়ে যে টাকাটা তারা খাটিয়ে নিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে সেইটাই আবার নানা-ভাবে আদায় করে নিচ্ছে । ডবল ব্যবসা চলেছে । ডবল ক'রে তারা কেরাণীদের রক্ত শুষছে ! তাদের অনুগ্রহ ক'রে যেমন থাকতে দেয়, তেমনি আবার তার ভাড়াও আদায় করে নেয় । ধনীদের এ শুধু ব্যবসায়ের একটা নতুন ফাঁদ সোনার খাঁচায় যেন পাখী পোষা ।

লাবণ্য বললে, তার জন্যেও ত সোনার খাঁচা আগে একজনকে তৈরী করতে হয় ।

শঙ্কর বললে, হ্যাঁ এখন আমাদের সেই কাজই করতে হবে ! শুধু নেতাদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে স্মৃতিমন্দির কিংবা হাসপাতাল তৈরী করে দিলে আজ চলবে না । সেই টাকায় আদর্শ পল্লী গঠন ক'রে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে এই আদর্শ । যাতে তারা চোখে দেখে জিনিসটা বুঝতে পারে । তবে যদি এ দেশের লোকের চৈতন্য হয়, যদি চাকরীর মোহ ঘোচে । একটা গ্রামকে আদর্শ করে যদি আমরা দেখাতে পারি যে সেখানে লোক বৃটিশ সরকারের দাসত্ব না করেও এখন কেমন সুখে শান্তিতে আছে, তাহলে নিশ্চয় লোকের মন ফিরবে । যেমন একটা ব্যবসা থেকে একজনকে লাভ করতে দেখলে আরো অনেকে সেই ব্যবসা করতে ছুটে যায় তখনও সেই রকম হবে বলে আমার ধারণা । তাই এখন আমাদের সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করতে হবে এবং তার জন্য প্রথমেই কর্ত্তব্য চরকা ও তাঁতের প্রবর্ত্তন করা । এখন আমার মনে হয় একাজে সবচেয়ে বেশী আমাকে সাহায্য করতে পারবে তুমি ।

লাবণ্য বললে, এতো সাহায্য নয় শঙ্করদা, নিজেদেরই কাজ ! আমার যতটুকু

সাধ্য নিশ্চয়ই করবো।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লাবণ্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অনেকগুলি মেয়ে জোগাড় করলে! তাদের অধিকাংশই কুমারী মেয়ে ও কয়েকজন বিধবা। অবস্থা সকলেরই অত্যন্ত খারাপ। ওরই মধ্যে যাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল অর্থাৎ দুবেলা খেতে পেতো তারা লাবণ্যর প্রস্তাবে রাজী ত হলোই না উপরন্তু মুখ টিপে একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে বললে, অত সময় নেই আমাদের—সারাদিন চরকা ঘুরিয়ে কতটুকু সুতো হবে—সেই সুতো কতদিন জমালে পরে তবে হবে কাপড়—এ জীবনে বোধহয় তা পরতে হবে না?

লাবণ্য তাদের বোঝাবার কত চেষ্টা করে—কিন্তু কোন ফল হয় না, তারা অবুঝ। সমস্ত দিনটা পান খেয়ে, দিবানিদ্রা দিয়ে, অন্যের বাড়ী গিয়ে পরচর্চা ক'রে কাটানোকেও তারা এর চেয়ে ভাল মনে করে। এছাড়া তিনকড়ির দল ছিল, তারা সর্ব্বদা ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করতো যাতে ওদের সঙ্গে বেশী লোক না মেশে। ও স্বদেশী দল হ'লো ডাকাতের চেয়েও ভীষণ, ওর ছোঁয়াচ লাগলে আর রক্ষা নেই, পুলিশের গোয়েন্দা চারিদিকে ঘুরছে ওদের সন্ধানে—এমনি সব আরো অনেক গল্প—যার মধ্যে হয়ত সত্যের নামগন্ধ নেই—সাড়ম্বরে বাক-বিস্তার ক'রে তারা সন্ধ্যায় আসর জমিয়ে তোলে।

কেউ কেউ আবার তিনকড়িকে প্রশ্ন করে কিন্তু আপনিও ত একদিন ওই দলে ছিলেন!

তিনকড়ির জবাব দেবার এতে আরো সুবিধে হয়। সে বলে, আরে ছিলুম বলেই ত ভেতরের কথা বলছি—এতো আর সাধারণ লোকে বোঝে না। বলতে বলতে সহসা গলার স্বর চেপে বলে, একটা কথা বললে হয়ত তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি জানি যে একটা পয়সা চাঁদা যারা এই কংগ্রেসের নামে দিয়েছে তাদেরও নাম পুলিশের খাতায় টোকা আছে। ঠিক সময়ে তাদের কোমরে দড়ি পড়বে! এ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—এর সঙ্গে চালাকী চলবে না। দু'টো 'বন্দেমাতরম্' বুলি আওড়িয়ে, আর দু'টো মিটিং করলেই যদি স্বরাজ আসত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। বরং আজ যে এই লোকের এত দুঃখ কষ্ট তার জন্যে এরাই দায়ী। যেখানে এরা 'বন্দেমাতরম্' ক'রে গোলমাল করেছে, সেখানেই দেখ লোকেদের দরম দুর্দ্দশা, খেতে পায় না! এই বলে একটু থেমে বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতৃবর্গের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে আবার বলে, অথচ নেতা হয়ে যারা সর্দ্দারী করছে তারা দিব্যি আছে—কেবল দূর থেকে তোমার আমার মত লোকেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা সরে যাচ্ছে, আর বড় বড় বাণী ঝাড়ছে কাগজে কাগজে! আরে বাবা সত্যিকারের তোরা নেতা হবি ত লোকের এত দুঃখকষ্ট চোখে দেখেও কেউ কি কখনো চুপ করে থাকতে পারে! তোদের টাকার অভাব আছে? নিয়ে আয় টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে, যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের খাইয়ে যা, যারা পরতে পাচ্ছে না তাদের কাপড় দিয়ে যা! দেখি কত

বড় বাপের বেটা, কে কত দেশকে ভালবাসিস! এইবার আবার একটু থেমে সকলের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে তিনকড়ি বললে, এই যে দেশের ওপর দিয়ে কত ঝড় ঝাপটা, অভাব অনটন, বন্যা মহামারী বয়ে গেল, কিন্তু কোনদিন কেউ শুনেছ যে অমুক নেতা তার পকেট থেকে এত হাজার টাকা দিয়েছে? কেবল বক্তৃতা আর খবরের কাগজে বাণী দেওয়া—ব্যস্। এদিকে নিজেদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা যার যেমন ব্যাঙ্কে আছে ঠিক রয়ে গেল। তাঁরা কেবল উপদেশ দিচ্ছেন জনসাধারণকে টাকা দিতে! এই বলে একটু থেমে আবার শুরু করলে, হ্যাঁ, দেশকে ভালবাসার কথা যদি বলতে হয় তবে বলবো শিবনাথবাবুর বুকের পাটা আছে। দেশের লোকের জন্যে কম টাকাটা তিনি খরচ করেননি ত! অথচ দেখ তাঁর নাম নেই! দু'টো 'বন্দেমাতরম্' বলে যারা চেঁচাচ্ছে তারা হলো আজ দেশের নেতা! ছি! এদেশে আবার লোক কোন কাজ করে? সেও ত মানুষ! এসব দেখে শুনে তার আবার কিছু এখানে করতে ইচ্ছা হয় তোমরাই বলোনা?

এমনি করে শঙ্করকে এবং দেশের লোক যারা তার সঙ্গে সহযোগীতা করে তাদের গালাগাল দিতে হলে আগেই তিনকড়ি কংগ্রেস ও তার নেতাদের দিয়ে শুরু করতো। কিন্তু এত করেও বিশেষ সুবিধা হয় না। ভগবানের ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ! তাই কিছুদিন যেতে না যেতে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ এমন চরমে উঠলো যে ইতরভদ্র সকলেরই মানসম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হয়ে পড়লো। গরীব দুঃখীরা কাঁথা মুড়ি দিয়ে অনেকে লজ্জা নিবারণ করলে। কৌপীন পরে অনেকে ঘরের মধ্যে বসে রইল। কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকেরা আবার আত্মহত্যা করছে এমন খবরও লোকের মুখে মুখে ছড়ালো।

শঙ্কর সব চেয়ে বেশী খুশি হলো! তাদের দলের কাপড়ের অভাব নেই। তারা সুতো কেটে তাঁতে নিজেদের কাপড় তৈরী ক'রে নেয়।

তাই গ্রামের সকলের মুখে যখন কাপড় ছাড়া অন্য কোন কথা নেই তখন তারা অন্য কথা চিন্তা করে।

যাদের পয়সা আছে তারা ছুটে এলো হাতে বোনা খদ্দর কিনতে। এক একখানা কাপড়ের জন্য তারা দশ টাকা বারো টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে কিন্তু শঙ্কর পয়সা নিয়ে বিক্রী করতে রাজী হলো না। বললে, যারা সুতো কাটছে তাদের ঘরে চাল নেই, কেরোসিন নেই, কয়লা নেই, চিনি নেই—কি খেয়ে তারা কাজ করবে? উপযুক্ত মূল্যের জিনিষ পেলে তবে তারা বদলে কাপড় দিতে পারবে।

প্রথম দল এই প্রস্তাব শুনে ফিরে গেল। বললে, টাকা নাও বরং কিছু বেশী দিতে পারি কিন্তু জিনিষ দিতে পারব না। আমাদের-ই সংসার চলে না।

শঙ্কর বললে, জিনিষ না পেলে বেশী টাকার মূল্য কি?

তারা ফিরে গেল বটে কিন্তু অন্যলোক এসে শঙ্করের দাবী-ই মেনে নিলে। তারা জিনিষ কাপড় নিয়ে গেল। যেখানে প্রয়োজন বেশী সেখানে দাবী না মেনে

উপায় কি? লজ্জা নিবারণ করার মত একটুকরো ন্যাকড়াও আর তাদের ঘরে নেই। স্ত্রী পুরুষ সব অর্দ্ধ উলঙ্গ হয়ে বাস করছে। মানসম্ভ্রম বুঝি ঘরের মধ্যেও রক্ষা হয় না! যুদ্ধের দরুণ অনেক লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয়েছে দেশের লোককে, এতদিন ছিল খাবার কষ্ট জিনিষের অভাব, এবার হলো কাপড়ের! কাজেই এতে আর নতুনত্ব কি! তবে এবার দেশের লোকের কিছু চৈতন্য হলো। তারা কেউ কেউ চরকা তক্‌লী কাটতে শুরু করলে।

এবার শঙ্করের চরকা আর তাঁতের ঘরে দিনরাত কাজ চলতে লাগল। শঙ্কর যেন দেশের লোকেদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে গান্ধীজীর কথা শুনে যদি এতদিন প্রত্যেকেই চরকা কাটতো তা'হলে আজ এভাবে কাপড়ের জন্যে মানসম্ভ্রম হারাতে হতো না।

৫

শঙ্করের প্রভাব ক্রমশই দেশে বাড়ছে দেখে তিনকড়ির মন ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো। সে এ সুযোগটা নষ্ট হতে দিলে না। ছুটে শিবনাথের কাছে গেল। বললে, এই বস্ত্রসঙ্কটের সময় দেশের গরীব লোকেরা সব আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আপনি যদি কিছু কাপড় দান করেন ত তারা চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকবে। এই বলে একটু চুপ করে থেকে, ওরি মধ্যে শঙ্কর কি ভাবে চরকা ও তাঁতের স্কুল করে গরীবদের মধ্যে নাম কিনছে সে কথাটাও জানালে।

শিবনাথ ভেবেছিল আর দেশের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, কিন্তু সকলের সামনে শঙ্করকে ছোট ক'রে দেবার এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়ে সে আর না বলতে পারলে না। শঙ্করের সেদিনের অপমান কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না। যার পয়সা আছে তার সব আছে! সমস্ত দুনিয়াটাকে সে কিনতে পারে শঙ্কর ত কোন ছার! এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দু'টো তাই আবার শিকারীর মত জ্বলে উঠলো।

সাপের হাঁচি যেমন বেদেয় চেনে তেমনি শিবনাথের চোখের দিকে চেয়েই তার মুখের কথাটা বুঝে নিতে তিনকড়ির এতটুকু দেরী হলো না। শিবনাথের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করার মূলে ছিল এই তিনকড়ি, তাই গ্রামে সবাই তাকে খাতির করে চলতো। শিবনাথ থাকে সহরে, কদাচিৎ আসে গ্রামে। তার প্রতিনিধি হিসাবে তিনকড়ি ও আরো কতকগুলি লোক যারা প্রত্যেকে কোন না কোন বিষয়ে শিবনাথের কাছে ঋণী তারাই দেখাশুনা করে স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রভৃতি। তিনকড়ি ছিল এদের মধ্যে অগ্রণী। দল পাকাতে ওস্তাদ! ব্যবসায় উপলক্ষে শিবনাথের কাছে তাকে প্রায়ই দেখা করতে যেতে হতো, সেই সময়ে একসঙ্গে সে দু'কাজ সারতো—দু'টো ভালমন্দ বা সত্যমিথ্যা সাজিয়ে ব'লে। আজকাল গ্রাম সম্বন্ধে জানবার এতটুকু আগ্রহ তার মনে ছিল না কেবল

শঙ্কর ও তার দলের ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সে সর্ব্বদা সুযোগের অপেক্ষা করতো।

তাই হঠাৎ তিনকড়ির দিকে ফিরে সে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলো, কুছ পরোয়া নেহি। আমি কাপড় দেবো, তুমি এখুনি গিয়ে গ্রামের লোকজনদের সে কথা বলে দাও।

বলা বাহুল্য তিনকড়ি গ্রামে ফিরে শুধু সেই খবর জানালে না, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মহিমাকীর্ত্তন ক'রে দেশের নেতাদের আশা মিটিয়ে একচোট গালাগাল দিয়ে নিলে। ঘণ্টা, পাঁচু, ভুণ্ডল, শশী, বিনোদ, চণ্ডী, হরি মাইতী প্রভৃতি তিনকড়ির দলের সব প্রধান প্রধান কর্ম্মীরা তখনি ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। ঢোল পিটিয়ে, ঢ্যাঁটরা দিয়ে, সারা গ্রামে তারা সেই খবর ছড়ালে।

হরি মাইতী বললে, কিন্তু তিনুদা একটা লোক যদি দু'বার নেয় তাহ'লে কি করে ধরবে?

ভুণ্ডল বললে, আমি রয়েছি কি করতে, তার মুণ্ড তখুনি ছিঁড়ে দু'খানা করে ফেলবো না?

ঘণ্টা গম্ভীরমুখে বললে, কথাটা কিন্তু হরি মন্দ বলেনি। জিনিষটা 'ম্যানেজ' করা কঠিন হয়ে পড়বে।

চণ্ডী ও পাঁচু বললে, ঘোড়ার ডিম হবে—শিবনাথ বাবুর বাড়ীর বাইরে অতবড় উঠোন রয়েছে তারমধ্যে লোকগুলোকে ভরে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেবো তারপর একজন যেমন বেরুবে তার হাতে একখানা করে কাপড় দাও—ব্যস্ হয়ে গেল—এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি দরকার।

তিনকড়ি বললে, তাছাড়া শনিবার দিন বিকেলের ব্যাপার ত, আমাদের ক্লাবের সকলকে ডাকলেই হবে। অতগুলো লোকের চোখে কি ধুলো দিয়ে কি কেউ দু'বার নিতে পারবে?

শনিবার বিকেলে শিবনাথের বাইরের উঠোন গরীব দুঃখী নরনারীতে ভরে উঠলো। চেঁচামেচি, গোলমাল, ঝগড়া, ঠেলাঠেলি—সবাই আগে নেবার জন্যে চেষ্টা করে! ঘণ্টা, তিনু, হরি মাইতী একটা করে ছড়ি হাতে করে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে সকলকে সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াতে বললে। তারপর ফটকটা একটু ফাঁক করে তার কাছে কাপড়ের বোঝা নিয়ে আরো দশবারো জন লোক এক একজনকে বিদায় করতে লাগল।

শিবনাথ দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। তার মুখে চোখে একটা অদ্ভুত ভাব। এতগুলো লোক তারি দোরে ভিক্ষুকের মত প্রার্থী। সে ভিক্ষা দিচ্ছে আর তারা নিচ্ছে। যত দেখে, তত আরো যেন তার দেখতে ইচ্ছে করে। এ আত্মতৃপ্তি নয়, অহমিকাও নয়, এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। দেশের লোককে সে কেবল দেখাতে চায় যে সেই শিবনাথ যে একদিন এই গ্রামে লাঞ্ছিত

হয়েছিল, অপমানিত হয়েছিল সকলের কাছে আজ সেই নারীর লজ্জা নিবারণ করছে—এ দান তার। সে করছে। তারা সকলে জানুক, তাদের ঘরে ঘরে সেই সংবাদ পেঁছাক। তাই কাপড় হাতে করে যেতে যেতে তারা শিবনাথের জয়গানে যত উচ্ছ্বসিত হয় তত তার বুকের মধ্যটা যেন ফুলে ফুলে ওঠে।

বিতরণ শেষ হতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কর্মীরা তখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে জলযোগ করতে বসলো। চায়ের সঙ্গে প্রচুর খাবারের আয়োজন। শিবনাথ নিজে অনুরোধ করে সকলকে খাওয়াতে লাগল। 'হরি পেট ভরে খাও' 'লজ্জা করো না' 'আরো খাবার আছে।' তারপর চাকরদের হুকুম করেন, এই আরো দু'টো কাঁচাগোল্লা এইখানে দে।

হঠাৎ বাইরে কার গলা শোনা গেল, তিনকড়ি আছ নাকি হে?

আজ্ঞে হ্যাঁ আছি, ভেতরে আসুন—বলে তিনকড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠলো এবং শিবনাথের একজন চাকরকে বললে, দেখতো কে ডাকে?

চাকরটা ঘর থেকে বেরতে যাচ্ছে এমন সময় একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির হ'লো। তিনকড়ি সানন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে ইন্দুকাকা যে—কি মনে করে—আসুন—আসুন ভেতরে আসুন—

তিনি একবার ভিতরের দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলেন! তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আচ্ছা এখানে থাক, এখানে অনেক লোকের ভীড়—চলুন আমরা পাশের ঘরে যাই। বলেই সে শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে, এই যে শিবনাথবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে এ'র আলাপ করিয়ে দিই—ইনি ইন্দুকাকা—লাবণ্যর বাবা। একটু থেমে, আর ইনি শিবনাথবাবু—

তুমি শিবনাথ! বেশ বেশ বাবা—এই ত চাই, একটা কাজের মত কাজ করলে! তোমার মত এমন দয়ালু লোক গ্রামে থাকলে লোকের দুঃখ কষ্ট থাকবে কেন? ভগবান নিজে হাতে দেন না এমনি করে অন্য মানুষের হাত দিয়ে পাঠান। বড় খুশি হয়েছি বাবা। পয়সা? পয়সা অনেকেরেই আছে কিন্তু এমন দরাজ অন্তঃকরণ ক'টা মানুষের হয়?

শিবনাথ একটু সলজ্জহাসি হেসে বললে, কি যে বলেন—এ আর এমন কি কাজ আমি করেছি—

ইন্দুকাকা বললেন, এই বা ক'টা লোক করে বাবা—! ওকথা বললে আমি শুনবো কেন, তোমরা নাহয় ছেলেমানুষ! আমার এই চুয়ান্ন বছর বয়স হলো—এর মধ্যে ত ঢের দেখলুম। একি সোজা কথা—আজকের দিনে লোকে একখানা কাপড় কিনতে পারে না আর তুমি কিনা এতগুলো লোককে বিনা পয়সায় কাপড় দিলে! এই বলে নিজে নিজেই একবার জোরে হেসে উঠে আবার বলেন, হি-হি-হি তাই ভাবলুম এত লোককে যখন দিচ্ছো তখন আমিও ত গরীব, আমাকেই বা দেবেনা কেন? ছেলেটার একেবারে কাপড় নেই। স্কুলে যাবার সময় আমার কাছে রোজ কান্নাকাটি করে।

তিনকড়ি বললে, কিন্তু কাকা আপনার মেয়ে আজকাল যে রকম স্বদেশী হয়ে উঠেছে তাতে আপনি এ কাপড় নিয়েছেন শুনলে রাগ করবে না !

রাগ করলে ত বয়ে গেল। এই বয়সে ত আর আমি এখন চরকা কেটে ছেলেদের পরবার কাপড় তৈরী করতে পারবো না ! আর ছেলেটা স্কুলে যাবে, পড়াশুনো করবে না এই করবে ! সংসার যে কি করে আমি চালাই তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। আজকালকার মেয়ে দু'পাতা লেখাপড়া শিখে একেবারে মনে করে যেন কি হয়েছি। বললুম পাঁচশোবার যে ইস্কুলের চাকরীটা গেছে তা তিনুর কাছে তুই একবার যা, আর তুই যদি না যেতে পারিস আমি গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরে যেমন ক'রে হোক ব্যবস্থা করে আসি, কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। বললে, ও স্কুলে আর চাকরী করবো না। না করিস্ মরগে যা, তুই-ই ভুগবি—স্বদেশী করে ক'টা লোকের ভাল হয়েছে—তা আমার কথা ত শুনবে না—এই বলে আপন মনেই গজগজ করতে লাগলেন !

তিনকড়ি বললে, তা কাকা ওর একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন না এবার !

খুঁজছি ত বাবা—কিন্তু আমার মত নিঃস্ব লোকের মেয়ে খালি হাতে কেউ নিতে রাজী হয় না যে ! একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে তিনি বললেন, কেউ তোমরা একটা পাত্র দেখে শুনে দাও না বাবা—কত লোকের সঙ্গে ত তোমাদের আলাপ, সহরে তোমরা ঘোরো ! বলতে বলতে একখানা কাপড় হাতে নিয়ে শিবনাথকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

পথে তাঁর বগলে নতুন কাপড় দেখে কিনা কে জানে, একটু পরে একে একে গ্রামের আরো অনেক ভদ্দর লোক, যাদের অবস্থা সত্যই খারাপ তারা এসে হাজির হলো।

তাদের এইভাবে রাত্রির অন্ধকারে এসে কাপড় নিতে দেখে মনে মনে শিবনাথ আরো বেশী খুশি হলো ! তখন তিনকড়ি একটা মতলব ফাঁদলে। অবস্থা ভাল নয় অথচ ভদ্রতায় বাধে বলে গ্রামের আর যে ক'জন তখনো আসতে বাকী ছিল তাদের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দিলে। ঘণ্টা বললে, খবর না দিয়ে একখানা ক'রে ছোট কার্ড তাদের দিয়ে এলেই ভাল হয়—সেখানা দেখালেই কাপড় পাবে। যাদের বেশী চক্ষু লজ্জা তারা তাহ'লে লোক মারফতও নিয়ে যেতে পারবে !

কথাটা শিবনাথের মন্দ লাগল না, তখন সেই ব্যবস্থা করতেই বললে। তিনকড়ি নাম সই ক'রে কয়েকখানা কার্ড গুণে একজনের হাতে দিলে। সে রাত্রিতেই বিতরণ করতে বেরুলো।

কিন্তু সেই লোকটি কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শিবনাথের হাতে কতকগুলো কার্ড ফেরত দিয়ে বললে, যারা নেয়নি তাদের নাম এই সঙ্গে একটা কাগজে লেখা আছে।

শিবনাথ কার্ডগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর ঘরের বড় আলোটার সামনে গিয়ে সেই নামের তালিকাটা পড়ে দেখতে লাগল।

প্রথমেই চাঁপাদেবীর নাম দেখে সে চমকে উঠলো। চাঁপা? তার বুকের মধ্যেটা সহসা যেন কাঁপতে থাকে। তবে কি এ সেই চাঁপা! এবারে তার মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। এই নামটার সঙ্গে তার জীবনের যেন চরম অপমান জড়িত! তাই মুহূর্তকয়েক চুপ করে থেকে সে আবার মনটাকে কঠিন করে নিলে এবং অন্য নামগুলির ওপর আবার চোখ বুলতে লাগল। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, হরিহর পাল, নিধিরাম হালদার, মনোহর রায়, সীতেশ লাহিড়ী প্রভৃতি গ্রামের যে ক'জন লেখাপড়া জানা ও অভিজাত বলে খ্যাত, তারা সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে দেখলে।

আবার তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। চুপ করে সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং আর একবার আলোর নীচে এসে সেই নামগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়লে। তারপর কাগজটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিতে দিতে আপন মনেই বলে উঠলো, অপমান! আমায় অপমান! দু'পাতা লেখাপড়া শিখেছে বলে আমার জিনিষ প্রত্যাখ্যান করা হলো সে কি আমি বুঝতে পারি না! আমি মূর্খ, লম্পট, লেখাপড়া শিখিনি, বলে আমায় ঘৃণা! বলতে বলতে সে ঘরের মেঝেটায় পায়চারী করতে লাগল। শেষে এক সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে আপন মনেই বলে উঠলো, আচ্ছা দেখে নেবো কতদিন থাকে এ অহঙ্কার!

সব চেয়ে বেশী রাগ হলো তার চাঁপার ওপর। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তাই তার চোখ দু'টো যেন হিংস্র হয়ে উঠলো! সারারাত সে ভাল ক'রে ঘুমতে পারলে না। কেবলি সেই কথা মনে করে তার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যাত্যাগ করলে। ঘরের মধ্যে তার আর ভাল লাগছিল না। মেঠো পথ দিয়ে, বোসেদের আমবাগানটা পেরিয়ে বহুকাল পরে সে একেবারে নদীর ধারে এসে পড়লো। তখন পূব আকাশ ভাল করে লাল হয়নি, গাছে গাছে সবে পাখী ডাকতে শুরু করেছে, মাঠে চাষীরাও আসেনি। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে শিবনাথের কতকথা মনে পড়তে লাগল। এখানকার বন-জঙ্গল, পথ-ঘাট প্রত্যেকটির সঙ্গে একদিন ছিল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়! চলতে চলতে তার অজ্ঞাতসারে একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়লো। সেদিনের শিবনাথের সঙ্গে আজকের শিবনাথের কত প্রভেদ! এমনি সব মনে করতে করতে কখন যে সে রায়পাড়ার ঘাটের কাছে এসে পড়েছে হুঁস ছিল না। সহসা জলের শব্দে সচকিত হয়ে মুখ ফেরাতেই সে থমকে দাঁড়ালো। দেখলে ঘাটে চাঁপা! এই ঘাটেই তার সঙ্গে একদিন তার শেষ দেখা হয়েছিল। সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ কি সত্যি? ভাল করে চেয়ে দেখলে হ্যাঁ, এই ত সেই চাঁপা! এবার থরথর করে তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে একটা বাগানের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করলে—লজ্জায় কি ভয়ে, কে জানে!

ঘাট থেকে স্নান ক'রে উঠলো চাঁপা ভিজে কাপড়ে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল

ঝরে পড়ছে—বুকের দুপাশে ভিজে চুল বিভক্ত করা, গেরুয়া রঙের পাতলা একটা শাড়ী বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ দেহের সঙ্গে মিশে রয়েছে, নিরাভরণ দু'টি হাত, কপালে সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই—মাজা চকচকে একটা পিতলের কমণ্ডলু জলে ভরে নিয়ে ধীর ও মন্থর ভঙ্গীতে সে চলে গেল।

অদূরে দাঁড়িয়ে শুধু শিবনাথ চেয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। একবার তার ইচ্ছে হলো তাকে ডেকে কথা কয় কিন্তু কিছুতেই পারলে না। তার সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিরাট ব্যবধান সে অনুভব করলে। তার মনে হলো এ চাঁপা তো সে চাঁপা নয়—যাকে সে জানতো, যাকে সে ভালবাসতো, যাকে চুরি করে ফুল এনে দিতো ও ফল পেড়ে দিতো! এ যেন কোন তপস্বিনী স্নান ক'রে সুচিশুভ্র মনে তপোবনের দিকে এগিয়ে চলেছে! তার সে মূর্তি দেখে সহসা শিবনাথ যেন নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেল!

আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। বেড়াবার ইচ্ছা নিমেষে তার মন থেকে অন্তর্হিত হলো। সে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরে গেল।

সকাল হতে তিনকড়ি যখন এলো কাকে কাকে কাপড় দিতে হবে জিজ্ঞেস করতে তখন সে চাঁপার নামটা তার কাছে চেপে গেল! শুধু মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নামগুলো ক'রে বললে, এরা সবাই প্রত্যাখ্যান করেছে আমার দান—কি হবে?

তিনকড়ি একমুহূর্ত না ভেবে চীৎকার ক'রে উঠলো, কি আবার হবে। আপনি অত চিন্তা করছেন কেন? ওরা হলো চাঁপার চেলাচামুণ্ডা। তার মন্দিরে নিত্য গিয়ে জমে। এসব শঙ্করের কারসাজি, আমি কি বুঝি না। এরাই ত আরো শঙ্করের মাথাটা খাচ্ছে তাকে বাহবা দিয়ে দিয়ে। আজ যে তার এত বুকের পাটা, সে ত ওদেরই জন্যে!

শঙ্করের নাম শুনে শিবনাথের রাগ আরো বেড়ে গেল সত্যি, কিন্তু তিনকড়ি যখন তাকে জব্দ করার মতলব দিতে লাগল তখন সে অন্যকথা চিন্তা করছে। চাঁপা যেন তার মনের মধ্যে কোথায় সব ওলটপালট ক'রে দিয়ে গেছে!

বারবার তাই শিবনাথের মনে হতে লাগল ওরা তার দান গ্রহণ না করলে যে তার যজ্ঞপূর্ণ হবে না, সেকথা সে কেমন ক'রে তিনকড়িকে বোঝাবে, কেমন করে তিনকড়িকে জানাবে যে যেখানে তার সবচেয়ে বড় অপমান, সেইখানেই যে তার সবচেয়ে বড় জয় লুকিয়ে রয়েছে।

রবিবারটাও শিবনাথ দেশে থাকবে ভেবেছিল কিন্তু যত বেলা বাড়তে লাগল তত যেন তার মন সেই গ্রামে হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। তাই দুপুরের গাড়ীতে সে কলকাতার দিকে রওনা হলো। কারো অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্য করলে না। শুধু চাঁপা যেখানে আছে সেখানে থেকে ছুটে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে!

৬

শুধু চরকা কাটা নয়, তুলোর গাছও যাতে প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ীতে অন্তত দু'চারটে লাগায় সেজন্য ভাল তুলোর বীজ আনিয়ে শঙ্কর গ্রামবাসীদের মধ্যে জোর প্রচার চালাতে লাগল। হৈমন্তী, লাবণ্য প্রভৃতির দলকে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সে পাঠিয়ে দিলে। তারা শুধু বক্তৃতা দিয়ে কাজ কর্তব্য পালন করলে না। নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে চোখের সামনে মেয়েদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লে। এ বিষয়ে লাবণ্য ছিল সব চেয়ে বেশী নাছোড়বান্দা! যদি কেউ তার কাছে বলতো, আচ্ছা পরে জমিতে লাগিয়ে দেবো সে তাতে কিছুতেই রাজী হতো না। মেয়েদের মধ্যে বসে তাদের সঙ্গে মিষ্টি কথায় আলাপ জমিয়ে তুলে যতক্ষণ না নিজের উদ্দেশ্য সফল হয় ততক্ষণ সেখান থেকে উঠতো না। এ ছাড়া যারা স্কুলে এসে চরকা কাটতে নারাজ কিংবা যাদের সময়ের অভাব ছিল তারা যাতে ঘরে বসে সুতো কাটার সুবিধা পায় তার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে তারা করতে লাগল।

ওদিকে শঙ্করও আর একটা দল নিয়ে পুরুষদের মধ্যে ঠিক ওই ভাবেই কাজ শুরু করেছিল। একদল স্বেচ্ছাসেবকের ওপর শঙ্কর শুধু এই ভার সে দিয়েছিল যে তারা কেবল তুলোর বীজ ছড়িয়ে যাবে পথে ঘাটে মাঠে—যেখানে এতটুকু জমি শূন্য পড়ে আছে দেখতে পাবে। শঙ্করের অভিমত এই যে যদি জমি জঙ্গল হয়েই পড়ে থাকে, ত তা তুলোর জঙ্গলই যেন হয়। শঙ্কর বলে, যেমন বাড়ীতে লোক ফুলের গাছ পোঁতে দেব-বিগ্রহের পূজার জন্যে তেমনি যেন প্রত্যেক বাড়ীতে তুলো-গাছ থাকে দেশমাতার পূজার জন্যে।

শঙ্করের এই কাজকে অনেকেই পাগলামী মনে ক'রে হাসাহাসি করতো। কেউ কেউ আবার বলতো যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে পাগল, এও তেমনি একরকমের পাগল। যে দেশ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। বাস্তবিক দেশের কথা বলতে গেলে শঙ্করের যেন আর হুঁস থাকে না। ভাবের প্লাবনে ভেসে যায়। বক্তৃতা দিতে গিয়ে সে বলে, আমাদের এই তুলোর সুতো ছেলেখেলার জিনিষ নয়, একদিন এই সুতো দিয়েই আমরা কাটবো বন্দিনী ভারত মাতার সকল বন্ধন।

মূর্খ চাষীরা এসব বোঝে না। কল্পনাপ্রবণ তারা নয়। তারা চোখের সামনে দেখতে যা না পায়, তা বিশ্বাস করে না। কাজেই বক্তৃতায় বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু কাপড়ের দুর্ভিক্ষ যেদিন সমস্ত দেশকে গ্রাস করলে সেদিন আর তাদের মনে কোন সংশয় রহিল না। বাবাঠাকুর বলে একেবারে শঙ্করের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লো। বললে, তুমি দেবতা তুমি আমাদের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচালে।

এইভাবে গভর্ণমেণ্ট গ্রামে যত কঠিন হস্তে কাপড়ের কন্ট্রোল করতে লাগল তত কিন্তু শঙ্করের কাজ দ্রুত এগিয়ে চললো।

এমনি ক'রে চাষীদের মধ্যেও যে শঙ্করের নাম এসে পেঁচেছে তিনকড়ি তা জানতো না। নিজের কাজ নিয়েই সে ইদানীং অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল! হাজার হাজার টাকার মিলিটারী কনট্রাক্ট শিবনাথ তাকে দিয়েছে। নানারকম জিনিষ সরবরাহ করতে হয় বিদেশী সৈন্যদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। তাই একবার সহরে, একবার সদরে, একবার মহকুমায়, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ির তার আর অন্ত নেই।

এইসবের জন্যেই শিবনাথের কাছে তার ঋণের শেষ ছিল না! তাই শিবনাথকে সকল রকমে সে তোষামোদ ক'রে চলতো।

একবার দেশে ফেরবার সাতদিন পরে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এলো তিনকড়ির কাছে, হাঁস মুরগীর চালান দুদিন বন্ধ কেন? দুখানা গ্রাম পরে একটি জায়গা থেকে এইগুলি সরবরাহ হতো। কোন রকমে দুটো ভাত মুখে দিয়েই তিনকড়ি ছুটলো সেখানে। রহমৎ মিয়া নামে একজন ব্যবসায়ের ওপর ছিল এর ভার। তিনকড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো এবং বললে, ব্যাপার কি রহমৎ?

রহমৎ তার কপালটা দেখিয়ে বললে, সবই আমার নসিব বাবু—

কেন কি হয়েছে?

তখন রহমৎ যা বললে তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে পাশের গাঁয়ে কতকগুলো মিলিটারী সাহেব ঢুকে একজন চাষার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছে তাই তার প্রতিবাদের স্বরূপ গাঁয়ের লোকেরা কেউ আর মিলিটারীদের হাঁস মুরগী বেচবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

তিনকড়ি বললে, কোন গ্রামে কি হয়েছে তা তোদের এত মাথাব্যথা কেন?

রহমৎ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, মোদের জাত ভাই যে?

তিনকড়ি তার কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো, ওঃ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সব! বলি এতদিন বুঝি তোরা জাতভাইকে চিনতি পারিসনি! কৈ তোদের কিছু হলে তারা ত কোনদিন কেউ মাথা ঘামায় না?

রহমৎ মিয়ার চোখের দৃষ্টি এবার কঠিন হয়ে উঠলো। সে বললে, যা হয়নি সেকথা ছেড়ে দাও বাবু। দিনকাল কি চিরদিন লোকের এক রকম যায়!

তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে তিনকড়ি আপন মনেই বলে উঠলো, হুঁ বুঝেছি। তারপর আরো মুহূর্তকয়েক নীরব থেকে প্রশ্ন করলে, এসব বড় বড় কথা কখনই তোদের মাথায় যায়নি—ঠিক করে বল দেখি কে শিখিয়েছে?

রহমৎ তেমনি কঠিন স্বরে উত্তর দিলে, জানি না।

তিনকড়ি এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে, এতবড় বুকের পাটা কার? জানিস্ এ কাদের খাবার জিনিষ! এখনি খবর দিয়ে দিলে গোরা পল্টন এসে তোদের ঘর থেকে সব কেড়ে নিয়ে যাবে?

রহমৎ কঠিন স্বরে বললে, তা গেলেও তারা দেবে না বলছে।

তিনকড়ি বললে, তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে এখনি জানাতে হবে। বলতে বলতে সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মোটর সাইকেলে ভট্ ভট্ আওয়াজ করতে করতে জনকয়েক গোরাসৈনিক কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে ছুটে এলো। তাদের দেখেই কিন্তু তারা কেমন ভীত হয়ে পড়লো এবং সুড় সুড় করে সবাই ঘর থেকে যে যার মাল বার ক'রে দিলে।

এদিকে গোপনে একজন মুসলমান চাষীকে তখন ঘুষ খাইয়ে তিনকড়ি থানায় নিয়ে গেল এবং শঙ্করের নামে নালিশ ঠুকে দিলে। সে-ই যে তাদের এই কার্য্যে প্ররোচিত করছে একথা হাকিমের সামনে চাষীটাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিলে।

থানার বড়দারোগা শঙ্করের ওপর এক নোটিশজারী করে তাকে সাবধান করে দিলে।

এর কয়েকদিন পরে শহর থেকে বাড়ী ফিরবার পথে তিনকড়ি একবার হাটে গেল সিগারেট কিনতে। সিগারেট না হলে ইদানীং এক মুহূর্ত তার চলে না। কাছে যা আছে তা এক ঘণ্টায় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু হাটে গিয়ে দেখলে কেবল সিগারেটের দোকানই বন্ধ নয় সব দোকানের দরজায় তালা দেওয়া। তিনকড়ি বেচাকুলকে তার বন্ধ দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় বসে তামাক খেতে দেখে প্রশ্ন করলে, বেচু আজ তোমাদের দোকান বন্ধ কেন হে?

বেচা বললে, আজ্ঞে আজ যে হরতাল জানেন না?

হরতাল! কিসের হরতাল? বলে বিস্মিত মুখে তার দিকে তাকালে।

বেচা তখন ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে তার হাতে দিলে। তাতে লেখা 'আগস্ট আন্দোলন দিবস' প্রতিপালন করুন। তারপর গ্রামবাসীর প্রতি একটা আবেদন—তাতে আগস্ট আন্দোলনের বিবরণী অতিসংক্ষেপে দেওয়া। ছোট্ট কাগজে কালি দিয়ে লেখা দেখে তিনকড়ির বুঝতে বাকী রইল না এ কাদের কাজ! ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়েছে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। বহুবৎসর পরে—বোধহয় শঙ্কর জেলে যাবার পর তাদের গ্রামে আবার হরতাল হলো। তাই তাদের কিছু না বলে চিন্তিত মুখে তিনকড়ি বাড়ীর পথ ধরলে।

বাড়ীতে পা দিয়েই শম্ভুকে দেখে সে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠলো স্কুলে যাসনি কেন?

দাদাকে শম্ভু ভয়ানক ভয় করে। কম্পিত কণ্ঠে বললে, আজ আমাদের স্কুলে 'স্ট্রাইক' হয়েছে!

দপ্ ক'রে তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। বললে, লেখাপড়ার নামে খোঁজ নেই—স্ট্রাইক? কে স্ট্রাইক করতে বলেছে—বল—স্কুলটাকে এইবার উচ্ছন্ন দেবার জন্যে লেগেছে! বলতে বলতে হঠাৎ একটু থেমে তিনকড়ি আবার প্রশ্ন করলে, হেডমাস্টাররা আসেনি?

শম্ভু ভীত মুখে উত্তর দিলে, মাস্টাররা ত সবাই এসেছেন। তাঁরা ত কিছুই

জানেন না। বড় ক্লাশের কতগুলো ছেলে ত স্ট্রাইক করেছে! কাউকে তারা স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না রাস্তার ওপর গড়াগড় শুয়ে আছে, বলছে আমাদের মাড়িয়ে যে যেতে পারে যাক্।

তিনকড়ি বললে, স্কুল তা হ'লে বন্ধ এখন?

শম্ভু বললে, না যারা ভেতরে আগেই ঢুকে গিয়েছিল তাদের নিয়ে ক্লাশ হচ্ছে।

রুক্ষ কণ্ঠে তিনকড়ি বললে, তারা আগে গিয়ে ঢুকেছিল—আর তুই ঢুকতে পারিসনি কেন?

শম্ভুকে নিরুত্তর থাকতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠলো, চালাকী পেয়েছিস আমার সঙ্গে—স্ট্রাইকের নাম ক'রে স্কুলে না যাওয়ার ফন্দী!

শম্ভু ভয়ে ভয়ে বললে, মাকে জিজ্ঞেস করোনা, আমি ত স্কুলে গিয়েছিলুম।

ধমক দিয়ে উঠলো তিনকড়ি। গিয়েছিলি ত চলে এলি কেন—সেই বয়াটে ছেলেগুলোর বুকের পাঁজরগুলো মাড়িয়ে ভেঙে দিয়ে ক্লাশে ঢুকতে পারলিনা?

শম্ভুর চোখ এবার ছলছল ক'রে এলো। সে দাদার কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদুকণ্ঠে বললে, আরো অনেক ছেলেও ত ফিরে এসেছে।

দাঁড়াও ফিরে আসা বার করছি! এই বলে বাড়িতে ঢুকে একটু বিশ্রাম করেই তখনি একেবারে স্কুলের দিকে ছুটলো এবং হেডমাস্টারকে গিয়ে বললে, আপনারা এইরকম করে যদি ছেলেদের প্রশ্রয় দেন তা হ'লে ছেলেরা কেবল স্ট্রাইকই করবে লেখাপড়া করবেনা!

তার কথা শুনে হেডমাস্টার মশায় মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি এই তিনকড়ির মোড়লপণা একেবারে পছন্দ করতেন না। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না, শিবনাথের পরামর্শদাতা বলে! তবু তিনকড়ির কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বলে উঠলেন, ছেলেরা লেখাপড়া না করুক এটা কি আমরা চাই?

তিনকড়ি বললে, তা নাহ'লে ছেলে কটাকে জব্দ করতে পারলেন না।

কি ক'রে করবো? তারা সরকারী রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে—আমাদের ত বলবার কোন অধিকার নেই!

পুলিশ ডাকতে পারলেন না। দেখতুম কত বড় সব বুকের পাটা ছেলেদের। বলে একটু চুপ করে থেকে তিনকড়ি তার কণ্ঠের সমস্ত বিষ ঢেলে দিয়ে আবার বললে, জানি ছেলেদের মাথা কে খাচ্ছে! আচ্ছা, দেখে নেবো কেমন ক'রে জব্দ করতে হয়। বলতে বলতে হঠাৎ সে যেন সচকিত হয়ে উঠলো। এবং শিকারীর মত নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে ক'রে কি শুনতে চেষ্টা করলে। তার মনে হলো যেন বহুকণ্ঠের একটা মিলিত সঙ্গীত সাগরের গর্জ্জনের মত দূর থেকে সেইদিকে এগিয়ে আসছে—

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা তরুণদল

মোদের পায়ের তলায় মুরছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়বাদল।"

আর কালবিলম্ব না করে সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হতেই সহসা সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। দেখলে এক বিরাট শোভাযাত্রা সেই দিকে এগিয়ে আসছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তাতে অত্যন্ত বেশী। লাবণ্যর চেষ্টায় মেয়েস্কুলেও স্ট্রাইক হয়েছিল। বহু মেয়ে বেরিয়ে এসে তাই সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। তাই শঙ্করের পূর্ণ দলের সঙ্গে লাবণ্য ও হৈমন্তী দল এবং তাদের চরকা তাঁতের ক্লাশের বহু কর্ম্মী ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওইভাবে একত্র সারিবন্ধ হয়ে আসতে দেখে প্রথমটা তিনকড়ি কি করবে যেন ভেবে পেলে না। কিন্তু পরক্ষণেই সুদক্ষ শিকারীর মত তার চোখ দু'টো হিংস্র হয়ে উঠলো এবং আক্রমণোদ্যত সিংহের মত দুই হাত তুলে সে গর্জন করে উঠলো, এই থামো!

সঙ্গে সঙ্গে সেই চলমান বিরাট জনশক্তির গতি শুধু একটু মন্থর হয়ে এলো কিন্তু কেউ চলা বন্ধ করলে না, বা কারুর মুখের গান থামলো না, তারা বরং উচ্চ কণ্ঠে গাইতে লাগল—

"চল চল চল
ঊর্ধ্ব গগনে, বাজে মাদল
নিম্নে উতল ধরণীতল
অরুণ পথের তরুণ দল
চল চল চল

তিনকড়ি এইবার শঙ্করের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, এপথ দিয়ে না গিয়ে তোমরা অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যাও।

শঙ্কর বললে, কেন?

তিনকড়ি রুক্ষস্বরে উত্তর দিলে, স্কুলের গা দিয়ে তোমাদের যেতে দেবো না।

শঙ্কর ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, তা সম্ভব নয় আমরা এখান দিয়ে যাব-ই! তোমার সাধ্য থাকে তুমি বাধা দাও।

তিনকড়ি এইবার সারিবন্ধ শোভাযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। তারপর অস্ফুটস্বরে বললে, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো বাধা দেবার সাধ্য আছে কি না। বলে সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেল এবং দলবল জুটিয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে থানার ইন্‌সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলে। তারপর শঙ্করের দলের পাঁচ-সাতজন ছোকরার নাম ক'রে বললে, এদের জ্বালায় ত আর গ্রামে বাস করা যাচ্ছে না মশায়, গোপনে এরা কংগ্রেসের প্রচার এমনভাবে চালিয়েছে যে দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারা পাঠশালা কামাই ক'রে সব আগষ্ট বিদ্রোহ দিবস পালন করতে বেরিয়েছে। আপনারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে ত আমরা আর গ্রামে টেঁকতে পারবো না। আর দিন দিন যেরকম দল তার ভারী হয়ে উঠছে।

ইনস্‌পেক্টারবাবু তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের কথাগুলি লিখে নিয়ে বললেন, আপনাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেলেই আমরা ব্যবস্থা করবো নিশ্চয়ই। আমরা ত এর জন্যেই বসে আছি। এই বলে একজন সিপাইকে ডেকে তার হাতে একটা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন, এখুনি সাইকেলে চেপে তুমি সদরে চলে চাও—সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এইগুলো দিয়ে এসো। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোন অর্ডার যদি দেন ত নিয়ে আসবে।

সেলাম করে তখনি সেই সিপাইটা ছুটলো।

ইনস্‌পেক্টারবাবু তখন তিনকড়ির দলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা চলে যান, ব্যবস্থা এখনি হয়ে যাবে—আপনারা গ্রামে ফিরতে ফিরতে তা বুঝতে পারবেন।

গ্রাম থেকে পুলিশের ফাঁড়িটা ছিল প্রায় দু'ক্রোশ দূরে। তাই তিনকড়ি আবার দলবল নিয়ে যখন ফিরে এলো শুনলে সেখানে একশো চুয়াল্লিশধারা জারী হয়ে গেছে। সভা সমিতি শোভাযাত্রা সমস্তই নিষিদ্ধ।

বলাবাহুল্য, তিনকড়ির দলের আর আনন্দ ধরে না! কিন্তু ততক্ষণে শঙ্করের দলের শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে যে যার বাড়ীতে।

বিকেলে বকুলতলার মাঠে বিরাট জনসভা হবার কথা। কি করে তা শঙ্কর করবে তাই দেখবার জন্যে তিনকড়ির দল উৎসুক হয়ে রইল।

শঙ্কর ধীর ও অবিচলিতচিত্তে পুলিশের সে নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করলে। তিনকড়ির দল যে তাদের জব্দ করবার জন্যে এত নীচে নামতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। তবু এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য যত সে চিন্তা করতে লাগল ততই মনে হতে লাগল, এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। সত্যের পথ থেকে তাদের ভ্রষ্ট করতে পারে এমন শক্তি জগতে এখনো জন্মায়নি। শিবনাথ, তিনকড়ি, পুলিশ, ইংরেজ শাসক ত কোনছার! দপ্‌ ক'রে শঙ্করে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। সে তার দলের লোকদের আহ্বান ক'রে বললে, তোমাদের মধ্যে য়ারা যারা জেলে যেতে প্রস্তুত আছো এগিয়ে এসো। সভার তখনো দেরী ছিল তবু আগে থাকতে একে একে, দুয়ে দুয়ে সভ্যরা আসাতে শঙ্করের ঘর পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শঙ্করের মুখ থেকে সেই কথাটি বার হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য যেন সবাই গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। কেবল জন আষ্টেক যুবক কোন কিছু চিন্তা না করেই তৎক্ষণাৎ শঙ্করের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অজয়, সত্যপ্রিয়, নলিনাক্ষ, পশুপতি প্রভৃতি এরা ক'জনেই ছিল শঙ্করের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। শঙ্কর মনে মনে জানতো যে এদের সহযোগিতা সে পাবেই যখনই যেখানে প্রয়োজন। তাই তার অবশিষ্ট দলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শঙ্কর একটু মৃদু হাসলো। তারপর ধীরে বললে, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই—আমি জানি জেলে সকলে যেতে পারে না। তোমাদের ওপর

কাজের ভার রেখে দিয়ে আমরা তাই যাবো জেলে।

এই বলে সভা ভঙ্গ ক'রে দিয়ে শঙ্কর তখন অজয়দের পুলিশের আইন অমান্য করে এগিয়ে যেতে বললে। তারা তৎক্ষণাৎ 'বন্দেমাতরম্' বলে বেরিয়ে গেল। শঙ্কর বললে, তোমরা চলে যাও আমি পরে যাচ্ছি—

তারা চলে যেতেই ঝড়ের বেগে লাবণ্য এসে সেখানে ঢুকলো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, শঙ্করদা, দলে দলে পুলিশ আসছে। আমাদের গ্রামটাকে তারা ঘিরে ফেলেছে ; আজ আমাদের সভা তারা করতে দেবে না, কি হবে ?

কি আবার হবে ?

সভয়ে লাবণ্য বললে, কিন্তু—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শঙ্কর বললে, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই লাবণ্য !

পুলিশ যে আমাদের ধরার জন্যে এসেছে।

শঙ্কর তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, আসুক, আমরা আমাদের কাজ করতে ভয় পাবো না।

তার মানে তুমি জেলে যাবে শঙ্করদা ? লাবণ্যের কণ্ঠ যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠলো।

শঙ্কর গম্ভীরমুখে লাবণ্যের চোখের দিকে চেয়ে বললে, লাবণ্য তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি। তারপর মুহূর্তকয়েক চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের মুখের কয়েকটা রেখা কঠিন হয়ে উঠলো। সে ধীর অথচ অকম্পিত স্বরে বললে, সেই জন্যেই তো তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করছি শঙ্করদা !

দৃঢ়কণ্ঠে শঙ্কর এর উত্তর দিলে, কিন্তু রাজনীতির মধ্যে যে হৃদয় দৌর্ব্বল্যের স্থান নেই তা তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের জানা উচিত !

একটু ভেবে লাবণ্য বললে, যদি তোমার এই জেলে যাওয়াটাকে আমি হৃদয়-দৌর্বল্য বলি, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে ? আবার একটু থেমে হঠাৎ একপর্দা গলা চড়িয়ে দিয়ে লাবণ্য বললে, তোমাদের এইভাবে দলবদ্ধ হয়ে জেলে যাওয়াটাকে আমি কিন্তু কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না ! কেন তুমি জেলে যাচ্ছো ? যখন দেশের কাজের জন্যে সবচেয়ে বেশী তোমার প্রয়োজন, তখন মিছি-মিছি একটা জেদ বজায় রাখার জন্যে জেলে যাওয়ার অর্থ কি, আমি তো ভেবে পাই না। বেশ ত, পুলিশের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে চাও, সে ত হয়েছে, অজয় সত্যপ্রিয়রা গিয়েছে—আবার তুমি কেন ?

শঙ্কর এবারে একটু গোলমালে পড়লো। তাই কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

লাবণ্য এবার অনুরোধের সুরে বললে, শঙ্করদা আমাকে ভুল বুঝো না, আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো ! সারা গ্রামে যখন জাগরণের সূত্রপাত হচ্ছে

তখন তাকে অকালে নষ্ট করে দিয়ে তুমি জেলে চলে যাবে ! কারাগারের অন্ধকারে বসে দেশের কথা চিন্তা করলে কার ক্ষতি সবচেয়ে বেশী ! যে বীজ তুমি বপন করেছো তা যে আজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে । তাকে কে এখন রক্ষা করবে ?

শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, তোমরা পারবে না ?

লাবণ্য ঘাড় হেঁট করে বললে, আমরা জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে তোমার এ কাজ করে যাবো কিন্তু আমার সাধ্য কতটুকু তাও ত তুমি সব জানো । জ্যোৎস্নার কাছে জোনাকীর মত ! তুমি পুরুষ—তোমার শক্তি যে অপরিমিত । তুমি ইচ্ছা করলে ভূমিকম্পের মত সমস্ত দেশটাকে চুরমার কতে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তুমি তাতে প্রবল প্লাবন এনে উর্বর ও স্নিগ্ধ করতে পারো। সূর্য্যের মত শক্তি যে রয়েছে তোমাদের মধ্যে—পুরুষের স্পর্শে তাই ধরণীর মর্ম্মকোষে শত সহস্র প্রাণ উজ্জীবিত হয় প্রতিনিয়ত ।

শঙ্কর লাবণ্যর কথায় হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, চুপ করো লাবণ্য । আত্মপ্রশংসা শোনা পাপ ! তাছাড়া স্ত্রীলোকের মুখে যে পুরুষ নিজের গুণকীর্তন শুনতে ভালবাসে আমি যে তাদের দলের নই তাও তুমি জানো । তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বললে, আমি জানি আমি কি ।

এতেও লাবণ্য কিন্তু এতটুকু দমলো না । বরং আরো বেশী আবেগ কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে বললে, পুরুষকে চাটুবাদ দ্বারা যে মেয়ে তুষ্ট করতে চায়, মিথ্যা প্রশংসার গান গেয়ে যে তার ভালবাসা পেতে চায়, আমিও যে সে জাতের মেয়ে নই তার প্রমাণও এতদিনে তুমি পেয়েছো । বলে সহসা লাবণ্য থেমে গেল ।

শঙ্করও যেন এরপর কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে নীরব হয়ে রইল !

একটু পরেই সে নীরবতা ভঙ্গ করে লাবণ্য বললে, আচ্ছা শঙ্করদা আমি যা সত্য বলে জানি এবং বিশ্বাস করি—তাও কি আমার বলবার কোন অধিকার নেই ।

বলার অধিকার হয়ত তোমার আছে কিন্তু আমার তা শোনার অধিকার নেই ! তোমার কাছে যা সত্য তা তোমার মনেই থাক । যেদিন তোমার সত্যর সঙ্গে বাহিরের সকলের সত্য এক হয়ে যাবে সে দিন তা প্রকাশ করো মুখে—এইটুকু আমার অনুরোধ তোমার কাছে ।

শঙ্করদা, একটা অনুরোধ করবো, রাখবে ?

কি বলো ।

আমি যা বলেছি তা যে কেবল আমার সত্য নয় তার প্রমাণ আজ আমি দিতে চাই ।

প্রমাণ ? বলে একটু ইতস্ততঃ করে আবার শঙ্কর বললে, আমি ত চাইনি তোমার কাছে ।

লাবণ্য বললে, তুমি না চাইলেও আমি যে চাই শঙ্করদা । হয়ত এ সুযোগ আর জীবনে পাবো না, তাই তোমাকে এখুনি একবার যেতে হবে শঙ্করদা আমার

সঙ্গে! আমার এ শেষ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে। আমি আজ তোমার সব ভুল ভেঙ্গে দিতে চাই শঙ্করদা। বলে মিনতিভরা কণ্ঠে লাবণ্য তাকে এমন-ভাবে অনুরোধ করলে যে শঙ্কর আর না বলতে পারলে না।

লাবণ্য শঙ্করকে নিয়ে তখনি চললো—মাঠ পেরিয়ে, বনজঙ্গল অতিক্রম করে দূর গ্রামের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সোনাগাঁয়ে পা দিতেই শঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এ কি অপূর্ব শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে পল্লীটি। যেদিকে তাকায় দেখে কাপাসের গাছ তুলোয় সাদা হয়ে রয়েছে—যেন গ্রামটি হাসছে।

সে গ্রাম ছেড়ে তারা গেল হলুদপুরে। সেখানেও সেই একই দৃশ্য। ছোট বড় অসংখ্য কাপাসের গাছ—বনে জঙ্গলে, মাঠে ঘাটে। শঙ্করের চোখ ভরে যায়, অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে যেন কিসের এক অজ্ঞাত উল্লাসে।

এইভাবে আরো কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে যেতে যেতে তারা এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হলো যেখান থেকে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল দেখা যায় কাপাসের বনে তুলো সাদা হয়ে ফুটে আছে। যেন তুলোর সমুদ্রে তারা হারিয়ে গেছে। উৎসাহে, আনন্দে, আবেগে শঙ্করের মুখ, চোখ জ্বলে উঠলো। লাবণ্যর একটা হাত সহসা চেপে ধরে সে বলে ফেললে, সত্যি লাবণ্য, আজ তুমি যা আমায় দেখালে তার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরঋণী।

লাবণ্য ঈষৎ হেসে বললে, বরং ঠিক তার উল্টো। তোমার কাছে আমরা সবাই ঋণী! এ ত তোমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তোমার জিনিসই তোমায় এনে দেখালুম।

এ যে আমার স্বপ্নের অতীত লাবণ্য। আমি যে কল্পনা করতে পারিনি তুমি এত অল্পসময়ের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হয়েছো!

লাবণ্য বললে, সে শিক্ষা ত তুমিই দিয়েছো শঙ্করদা!

শঙ্কর বললে, বাস্তবিক আমি এতক্ষণে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। যদি তোমার কথা শুনেও আজ না আসতাম তাহলে কতবড় একটা সৌভাগ্য থেকে যে বঞ্চিত হতুম তা কি বলবো!

লাবণ্য বললে, তোমার সৌভাগ্যের এই ত সূচনা মাত্র! এখনো অনেক যে বাকী শঙ্করদা। এই বলে একটু হেসে আবার বললে, এবার এখানকার আশ্রমটা দেখবে চলো। তোমাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে সকলে ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি তাদের কথা দিয়েছিলুম যে আজ তোমাকে নিয়ে আসবো।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই শঙ্করের কানে ভেসে আসতে লাগল, তাঁত ও চরকার শব্দের সঙ্গে বহুকণ্ঠের একটা মিলিতসঙ্গীত।

লাবণ্য বললে, আশ্রমের ছেলে মেয়েরা চরকা কাটতে কাটতে গান গাইছে।

আশ্রমে পা দিয়ে শঙ্করের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। প্রকাণ্ড এক উঠানের চারিপাশে সারি সারি খড়ের চালা ঘর। তার মধ্যে কোনটায় তাঁত চলছে

কোনটায় চরকা ঘুরছে, কোনটায় তুলোর পাঁজ তৈরী হচ্ছে, কোন ঘরে তুলো ধোনা চলছে, আবার কোথাও বা কাপাসের ফল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগল শঙ্করের যে এই সমস্ত কাজ করছে গ্রামের সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। তারা হাতে কাজ করছে কিন্তু মুখে গান গেয়ে চলেছে। অদ্ভুত সে গান, আর অদ্ভুত তার সুর। কিশোর কণ্ঠের সেই মিলিত সুর যেন আশ্রমটিকে এক অপূর্ব মায়ায় ঘিরে রেখেছে।

শঙ্কররা যখন আশ্রমে ঢুকলে তখন তারা গাইছিল—

"সারা আকাশ জুড়ে কাপাস উড়ে ফুটবে মোদের হাসি
চরকা তাঁতের মিশ্র সুরে বাজবে মোহন বাঁশি"

শঙ্করকে দেখে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো 'বন্দেমাতরম' 'গান্ধীজী কি জয়' 'সুভাষচন্দ্র কি জয়' বলে। তারপর কাপাসের গুটিতে তৈরী একগাছা মালা এনে তারা তার গলায় পরিয়ে দিল। মালাটার স্পর্শ অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগালে শঙ্করের দেহে ও প্রাণে। তার মনে হতে লাগল যেন এ মালা নয়, বন্ধনমুক্ত ভারত মাতার মুখের এক টুকরো হাসি—শুভ্র, অম্লান ও পবিত্র।

শঙ্কর তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, এ মালা আমার প্রাপ্য নয়, যে সার্থক করে তুলেছে আমার স্বপ্নকে এ মালা তারই।

লাবণ্য ঘাড় হেঁট করে বললে, ছিঃ শঙ্করদা, ওকথা বলে আমার অপরাধ বাড়িয়ো না।

অপরাধ!

লাবণ্য বললে, হ্যাঁ, শঙ্করদা, এ অপরাধ ছাড়া আর কি? তোমার কল্পনার মত কতটুকু কাজ করতে পেরেছি। যেদিন তোমার স্বপ্নকে সত্যি সার্থক করে তুলতে পারবো সেদিন তোমার এ মালা মাথায় তুলে নেবো।

শঙ্কর বললে, যা পেরেছো তার তুলনা কোথায়?

না, না, ওকথা বলে তুমি নিজেকে ছোট করো না আমার কাছে। বলতে বলতে তারা আশ্রম থেকে বেরিয়ে আবার গ্রামের পথ ধরলে।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় মাঠ ঘাট বন-জঙ্গল সব যেন এক স্বপ্নময় কল্পরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

শঙ্কর এতক্ষণ আবিষ্টের মত পথ চলছিল, নিঃশব্দে। হঠাৎ একটা কাপাসের ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়তে তার যেন চমক ভাঙল। সে থমকে দাঁড়িয়ে একবার চারিপাশে চোখ বুলিয়ে নিলে। নির্মল আকাশ থেকে জ্যোৎস্নাধারা যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল কাপাসের বনে। লাবণ্যও শঙ্করের পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি নীরবে সেই সৌন্দর্য্যে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। শঙ্কর লাবণ্যের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে তাকিয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বললে, লাবণ্য আমার স্বপ্নকে তুমি সার্থক করতে পারবে? বলো—লাবণ্য, চুপ করে থেকো না—একথা আর কেউ কোনদিন বলেনি—অন্ততঃ একজনের মুখ থেকে শুনে জীবন ধন্য করি।

লাবণ্য বললে, আমার জীবনের একমাত্র পণ তাই শঙ্করদা।

সত্যি লাবণ্য তুমি পারবে তা করতে? আবেগে শঙ্করের গলা যেন কেঁপে উঠলো।

অন্ততঃ দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করবো, এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি শঙ্করদা।

গ্রামে যখন তারা ফিরে এলো তখন রাত অনেক হয়েছে। মুখুজ্যেদের বাড়ীর কাছে আসতেই তাদের কানে যেসব কথার টুকরো ভেসে এলো, তা শুনে তারা দু'জনেই সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ার যেসব লোকদের তারা রীতিমত শ্রদ্ধা করে তাদেরই কণ্ঠস্বর। উত্তেজিত কণ্ঠে একজন যেন বলছে, নেতা বলে একে? ছিঃ! গ্রামের কতকগুলো ভাল ছেলেকে পুলিশের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে সরে পড়লো।

কে একজন তার উত্তরে বললে, আর সরে পড়েছে একা নয়—দুজনেই, জোড়ে। লাবণ্যও নাকি গেছে তার সঙ্গে!

এইবার কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলো, কংগ্রেসের নাম করে গ্রামের মধ্যে এইরকম ব্যাভিচার ওরা চালাবে, এ আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না। কালই লাবণ্যর বাবার কাছে গিয়ে এর বিহিত করতে হবে! হয় মেয়ের বিয়ে দিক, নয়ত ওকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনু যা বলে দেখছি কথাটা ত মিথ্যে নয়!

এইবার একটা উচ্চ হাসির রোল উঠলো।

লাবণ্যর চোখে জল এসে পড়েছিল। সে শঙ্করকে বললে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব সহ্য করবে শঙ্করদা?

শঙ্কর বললে, দেশের কাজ করতে গেলে এরকম সামান্য অপবাদে বিচলিত হলে চলে না লাবণ্য, এ আমাদের দেশের মাটির গুণ! ভুলে যেয়ো না যে কোন পূজনীয় নেতা এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। দেবতাদেরও পদস্খলন হয় কিন্তু তাঁদের মত সব দেবদুর্লভ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বোধ হয় পুরাণ ও ইতিহাসে মেলে না লাবণ্য। বলতে বলতে একটু থেমে শঙ্কর আবার বললে, এসব কথা শুনে দুঃখ করো না, পূর্ব্বাচার্যদের কথা স্মরণ করে শুধু এগিয়ে চলো। দেখবে তাতে দ্বিগুণ বল পাবে, কাজে উৎসাহ পাবে।

লাবণ্য চোখের জল মুছে ফেলে বললে, তুমি ত খুব সহজে কথাটা বুঝিয়ে দিলে কিন্তু শঙ্করদা, এই লোকগুলো কি নেমকহারাম বলতে পারো?

তা যদি না হ'ত তাহ'লে এদেশের এ অবস্থা হবে কেন লাবণ্য! বলতে বলতে শঙ্করের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে উঠলো!

লাবণ্য এবারে আর কোন উত্তর দিতে পারলে না। শুধু চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ীতে পা দিতেই লাবণ্যর মা একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। তোর

জন্যে কি আমি গলায় দাঁড় দেব ? কি মেয়েই হয়েছিস্—এই এত রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে তুই ঘুরে বেড়াবি আর উনি আমায় গালাগাল দিয়ে বাপান্ত করবেন !

লাবণ্য ধীরকণ্ঠে বললে, আজ অনেকদূর গিয়ে পড়েছিলুম মা। তাই ফিরতে এত রাত হলো, আর কোনদিন হবে না বাবাকে বলো।

এই বলে ঘরে জামা কাপড় ছাড়তে চলে গেল। একটু পরে বাইরে থেকে কে ডাকলে, লাবণ্য দেবী কি এই বাড়ীতে থাকেন ?

লাবণ্য তার ছোট ভাইকে ডেকে বললে, দেখতো খোকা কে বাইরে ডাকছে ?

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বললে, দিদি পুলিশ এসেছে—একদল !

পুলিশ ! ওমা কি হবে গো ! উনি যে তোকে খুঁজতে বেরিয়েছেন এখনো বাড়ী ফেরেননি। ও লাবি, ও সর্ব্বনাশী তুই কোনখানে কি করতে গিয়েছিলি ? তোর জন্যে কি মাথা খুঁড়ে মরবো ?

লাবণ্য ধমক দিয়ে উঠলো। চুপ করো মা, পুলিশ এসেছে তা কি হয়েছে ? যাচ্ছি আমি।

মা কান্না চাপতে চাপতে বললেন, না, না, ও লাবি, তুই সোমত্ত মেয়ে, তুই একা যাসনি পুলিশের কাছে ?

চুপ করো মা তুমি !

খোকা বললে, মা আমি ওবাড়ি থেকে চন্ডী খুড়োকে ডেকে আনছি !

মা বললেন, ওরে ও খোকা, না না ওদিকে পুলিশ আছে তোকে যেতে হবে না।

তুমি বড় ভীতু মা। বলতে বলতে খোকা পাশের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, চণ্ডী খুড়ো পুলিশের নাম শুনে আর আসতে চাইলে না।

তা আমি জানতুম ! বলে লাবণ্য যেমন বাইরে বেরিয়ে এলো অমনি একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে তার হাতে একটুকরো কাগজ দিয়ে বললে, আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

লাবণ্য কাগজটা হাতে নিয়ে বললে, কিসের জন্যে জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

অফিসারটি বললে, সে খবর আমরা বলতে পারব না—আমাদের ওপর শুধু গ্রেপ্তার করার হুকুম—

আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কাপড়টা বদলে আসছি। বলে লাবণ্য ঘরে ঢুকে চুপি চুপি শঙ্করের নামে দু'লাইন একটা চিঠি লিখে ছোট ভাইয়ের হাতে দিয়ে, বেরিয়ে এলো। চিঠিতে সে শুধু এই কথাটাই লিখলে, "শঙ্করদা, পুলিশ এসেছে গ্রেপ্তার করতে, তবু তোমার কাজ কখনই অসম্পূর্ণ থাকতে দেবো না—যেখানেই থাকি। আশীর্ব্বাদ করো।"

পরদিন সকালে লাবণ্যর ভাই সেই চিঠিখানা শঙ্করকে দিতে গিয়ে শুনলে

দিদির মত শঙ্করকেও পুলিশ গত রাত্রে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। হৈমন্তী তার মুখ থেকে লাবণ্যর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লো। তার সঙ্গে একত্রে কাজ করতো হৈমন্তী। সে জানতো কি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল এই লাবণ্যর। তাই একসঙ্গে দাদা ও লাবণ্যর গ্রেপ্তারে সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

শঙ্করও যাবার আগে লাবণ্যর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল। সেকথা লাবণ্যর ভাইকে বলতে গিয়েও চেপে গেল হৈমন্তী। লাবণ্যর চিঠি লাবণ্যর হাতে দেবে—তা যখনই ফিরুক না কেন সে!

এদিকে লাবণ্যর গ্রেপ্তারে গ্রামে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে এই প্রথম সেখানে একজন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হলো। পল্লীগ্রাম জায়গা। তাই মেয়েদের সঙ্গে জেল-কর্ম্মচারীরের দুর্ব্যবহারের নিত্য নূতন কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে গ্রামবাসীদের কানে কানে মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।

লাবণ্যর বাবা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কুমারী মেয়ের নামে এই রকম সব কুৎসিত রটনা শুনে শঙ্করের মস্তক চর্ব্বণ করতে করতে তিনি আগে ছুটলেন তিনকড়ির কাছে। তারপর গিয়ে বললেন, আমি গরীব ছাঁপোষা লোক—তোমরা থাকতে বুড়ো বয়সে আমায় এইসব শুনতে হবে?

তিনু উদাসকণ্ঠে বললে, কি করবো কাকা, পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করলে তার ফল ত পেতেই হবে! এক্ষেত্রে আমাদের করার কোন ক্ষমতা নেই।

লাবণ্যর বাবা এবারে কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনুর একটা হাত দু'হাতে চেপে ধরে বললেন, ওকথা বললে আমি শুনবো না। অর্থ মানেই ক্ষমতা। যাদের পয়সা আছে ক্ষমতা তাদেরই আছে বাবা! তোমরা ইচ্ছা করলে দিনকে রাত করতে পার, রাতকে দিন করতে পারো, আমার এ অনুরোধ ত সামান্য! দোহাই বাবা চিরকাল তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো, আমার এ উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে।

তিনকড়ি একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু আপনার মেয়ে ত আমার উপকার চায় না।

ও হারামজাদী মেয়ের কথা আর বলো না—তার কথা ছেড়ে দাও বাবা! আমি তার বাপ হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তার দোষ সব ভুলে গিয়ে এখন আমার মুখ চেয়ে তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনে দাও বাবা। শিবনাথ বাবু আর তুমি হলে এ গ্রামের মাথা—তোমাদেরই দয়ায়ই ত আমরা বেঁচে আছি।

তিনকড়ি একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, কি বলেন যে আপনি কাকাবাবু।

তিনি বললেন, তুমি বিশ্বাস করো বাবা—একথা আমি শুধু তোমার কাছে নয়, সকলকে বলে বেড়াই। তাছাড়া একথা আজকাল কে না জানে! এগ্রামে

মানুষ বলতে আর কে আছে ? এখানকার যা-কিছু উন্নতি সব ত তোমাদেরই দৌলতে !

এবার তিনকড়ির চোখে মুখে একটা হিংস্র হাসি ফুটে উঠলো। সে বললে, তা যদি লোক জানতো, তাহলে কি আবার আমাদেরই বিরুদ্ধে যেতে সাহস করতো কাকাবাবু ?

যত সব বয়াটে ছোঁড়াদের কাণ্ড! তখনি আমি বারবার লাবিকে নিষেধ করেছিলুম যে ওদের দলে যাসনি—যদি যেতেই হয় ত শিবনাথবাবু, তিনকড়ি এদের দলে যা, তাতে আখেরে উন্নতি হবে। তা বলে কিনা বাবা 'ওরা আমাদের শত্রু' ! এখন দেখ কারা মিত্র, আর কারা শত্রু—তবে হ্যাঁ আমার মেয়ের এবারে চোখ ফুটেছে বাবা—যাবার সময় কি কান্না !

তিনকড়ি বললে, বলেন কি, খুব কাঁদছিল ?

কাঁদবে না ? কাজটা যে ভাল করেনি সেটা বোঝার বয়েস ত হয়েছে বাবা, ছেলে মানুষ ত নয় ?

তিনকড়ি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ যেন কি ভাবলে। তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে বললে, কিন্তু কাকাবাবু আপনাকে যদি মেয়ের জন্যে একটা মুচলেখা দিতে হয় তা দেবেন ত ?

নিশ্চয় ! একটা কেন দশটা দিতে আমি প্রস্তুত বাবা ! শুধু মেয়েটাকে আমার ছাড়িয়ে এনে দাও তোমরা পুলিশের কাছ থেকে !

তিনকড়ি বললে, আচ্ছা আপনি এখন বাড়ী যান—দেখি আমি চেষ্টা করে কি করতে পারি।

তুমি চেষ্টা করলে ঠিকই হবে, আমি জানি বাবা ! বুড়োর মাথা যেন আর না লোকের কাছে হেঁট হয়, দেখিস বাবা ! বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

শিবনাথের চেষ্টায় সাতদিন পরে লাবণ্যর বাবা পুলিশের কাছে একটা মুচলেখা দিয়ে লাবণ্যকে জেল থেকে মুক্ত করে আনলেন। লাবণ্যর প্রকৃত বয়স বেশী হ'লেও তিনি জাল কোষ্ঠী দেখিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে সে এখনো সাবালিকা হয়নি—তার বয়েস আঠারোর কম।

জেল থেকে লাবণ্য বাড়ী ফিরে এলো নতুন উৎসাহে ঝলমল করতে করতে। এই ক'দিনের কারাবাস যেন তাকে আরো মহীয়সী করে তুলেছিল। সে জানতো না যে তার মুক্তির মূলে ছিল তার বাপের দেওয়া মিথ্যা মুচলেখা ও শিবনাথ তিনকড়ির অনুগ্রহ।

বাড়ীতে এসে কাপড় বদলে প্রথমেই সে ছুটলো শঙ্করদার সঙ্গে দেখা করতে। শঙ্কর যে তারই সঙ্গে এক-ই রাত্রে গ্রেপ্তার হয়েছিল সে-খবর তার কানে তখনো কেউ দেয়নি। কারণ বাড়ীর লোকেরা শঙ্করকে তার দুষমণ মনে ভাবতো। তাই লাবণ্যর কাছে তার নামোচ্চারণ করতেও সকলে ঘৃণাবোধ করতো।

লাবণ্যকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে হৈমন্তী বেরিয়ে এলো এবং কোনরকম আহবান না জানিয়ে কেবল চুপ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। লাবণ্য খুশিতে চঞ্চল হ'য়ে একেবারে হৈমন্তীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে, তারপর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললে, শঙ্করদা কোথায় ভাই!

কোন উত্তর না দিয়ে মুহূর্ত্ত কয়েক হৈমন্তী শুধু চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তিনি ত জেলে!

জেলে! যেন লাবণ্যের সামনে বজ্রপাত হলো! সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, কবে ভাই! কৈ আমি ত এসবের কিছুই জানিনা?

তেমনি নিরুৎসাহভরা কন্ঠে হৈমন্তী উত্তর দিলে, তুমি যদি জানতে না চাও ত কে জানাবে বলো?

হৈমন্তীর জলভরা চোখের ওপর গভীর দৃষ্টি স্থাপন করে' লাবণ্য তখন বললে, আমি শঙ্করদার খবর জানতে চাই না? এ তুমি কি বলছো ভাই? তারপর একটু থেমে আবার বললে, তুমি কি জানো না, শঙ্করদাকে আমি কি রকম ভক্তি করি—

হৈমন্তী সহসা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললে, তাই জানতুম কিন্তু এখন দেখ্‌ছি 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ'!

তার মানে? লাবণ্যর চোখমুখ সহসা যেন কঠিন হয়ে উঠলো। আমি ত তোমার কথার কিছুই অর্থ বুঝতে পারছি না ভাই—একটু পরিষ্কার ক'রে বলো!

পরিষ্কার ক'রে আমায় বলতে হবে না। তোমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কিংবা শিবনাথবাবু ও তিনুদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো—ঘৃণা ও ব্যঙ্গে তার কণ্ঠ একেবারে যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

আমাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে তোমাদের মনে কি হয়েছে—হিমীদি—

হৈমন্তী বললে যারা কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সঙ্গে আমরা কোন কথা বলিনা, তারা শুধু আমাদের শত্রু নয়, দেশের শত্রু—সমস্ত জাতির শত্রু!

আমি কংগ্রেসের শত্রু! কি বলছো আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না!

তা পারবে কেন? এখন যে একেবারে কচিখুকী হয়ে গেছ। শিবনাথবাবুকে ধরে মুচলেখা দিয়ে কেন তোমার বাবা তোমাকে জেল থেকে খালাস ক'রে নিয়ে এলেন সেটাও কি বোঝো না?

মাইরি হিমীদি, এই তোমায় ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আমি এসবের কিছু জানিনা! বলে লাবণ্য যেমন হৈমন্তীর হাতটা ধরতে গেল হৈমন্তী অমনি লাবণ্যর হাতটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললে, আর ঢঙ্ করতে হবে না, যাও—আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। বলতে বলতে সে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

লাবণ্য বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে শঙ্করের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। তার সমস্ত কল্পনা যেন কে নিমেষে ভূমিসাৎ ক'রে দিলে।

ব্যাপারটা ভালো ক'রে জানবার জন্যে সে প্রথমেই ভবতোষের বাড়ী গেল। এই ভবতোষ ছিল অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। তাদের দলের খুব প্রিয় কর্ম্মী। তার সঙ্গে দেখা হতে সেও তার সঙ্গে হৈমন্তীর মতই ব্যবহার করলে—তাকে দেখে মুখ বেঁকিয়ে নিলে, এবং বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বলে গালাগাল দিলে। পথে আরো দু'একজন কর্ম্মীর সঙ্গে দেখা হলো, তারাও তার সঙ্গে কথা না বলে তেমনিভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা এতক্ষণে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট হলো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে যে এর জন্যে দায়ী তার বাপই।

লাবণ্যর মনের যত কিছু বিষ তখন তার বাপের উপর গিয়ে পড়লো।

পথ চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল যদি এখনি বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে দেখতে পায় ত গুরুজন বলে, বাপ বলে আর মানবে না। এমন কথা শোনাবে যাতে চিরকাল তাঁর মনে থাকে। বাপ হ'য়ে মেয়ের এতবড় অনিষ্ট যে করতে পারে তাঁকে কি ক'রে আর সে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে? এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে লাবণ্য এখন কি ক'রে বেঁচে থাকবে তার সমাজের মধ্যে!

এমনি সব আরো কত কি চিন্তা করতে করতে সে বাড়ীর দিকে চললো। কিন্তু বাড়ীতে পা দিতেই প্রথম যাঁর সঙ্গে তার দেখা হলো সে তার বাবা।

লাবণ্য মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে নিয়ে যেমন ঘরে ঢুকতে গেল অমনি তার বাবা পিছন দিক থেকে বলে উঠলেন, কোথায় গিয়েছিলি এতক্ষণ?

লাবণ্যর মনে যত রাগ জমেছিল সব যেন একসঙ্গে ফেটে পড়লো। বললে, যমের বাড়ী।

তাহ'লে ত বাঁচতুম, এই বয়সে আর মেয়ের জন্যে কলঙ্ক মাথায় নিতে হতো না।

ক্রোধে লাবণ্যর সর্ব্বাঙ্গ এবার থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, মেয়ের জন্যে তোমার কলঙ্ক, না তোমার জন্যে মেয়ের কলঙ্ক—একবার ভেবে দেখেছো কি? বলে একবার বাপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার সে শুরু করলে, এতই যদি কলঙ্কের ভয় তবে মিথ্যে কোষ্ঠি দেখিয়ে, আমার বয়েস কমিয়ে আমায় নাবালক প্রমাণ ক'রে, কে তোমাকে জেল থেকে আমার মুক্তি ভিক্ষা ক'রে আনতে বলেছিল? আমি পচে মরতুম সেখানে, মুদ্দফরাসে টেনে ফেলে দিতো—সেও যে ছিল তোমার এই পিতৃস্নেহের আধিক্যের চেয়ে শতগুণে ভাল।

তার বাবা বললেন, মরে গেলে ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, যদি জানতুম যে আর ফিরে আসবি না?

বাবা ! বলে কঠিনস্বরে লাবণ্য তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

লাবণ্যর মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে স্বামীর হাতটা ধরে টানতে টানতে বললেন, চুপ করো, কি যে যা তা বলো তার ঠিক নেই—যত বুড়ো হচ্ছো তত যেন তোমার ভীমরতি হচ্ছে—মেয়ে কি এখনো কচিখুকী আছে? তারপর গলাটা খাটো ক'রে বললেন বাইরে বয়েস যত কমই বলো না কেন আমরা ত জানি যে বাইশের কম নয়।

লাবণ্যর বাবা তার মায়ের হাতটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, কচিখুকী নয় বলেই ত আরো বেশী কড়াকড়ি দরকার।

লাবণ্যর মা তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, কড়াকড়ি করতে চাও ত মেয়েকে ডেকে বুঝিয়ে বললেই হয়, তা নয় ছোটলোকদের মত—

ভদ্দর লোকদের মত ঢের বলেছি—বলে বলে হার মেনে গেছি। তোমাদের মা ও বেটীকে—কিন্তু আর না ! বলে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি আবার বললেন, তুমিই যত অনিষ্টের মূল ! কবে থেকে বলছি হুঁসিয়ার, ছোঁড়াদের দলে মেয়েকে মিশতে দিয়ো না—

লাবণ্যর মা এবারে স্বামীকে টানতে টানতে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, কি হ'চ্ছে—মেয়ের সামনে ওই সব কথা বলে বুঝি খুব বাহাদুরি নেওয়া হচ্ছে। তুমি কচি খোকা যেন কিছু বোঝোনা। শঙ্করের দলে ভাল ভাল ছোকরারা রয়েছে যদি কারুর নজরে পড়ে যায় তাহলে হয়ত ওর একটা সদ্গতি হয়ে যাবে—এই ভেবেই ত—

লাবণ্যর বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, সদ্গতি হওয়া অত সহজ নয়—আজকালকার ছোঁড়াদের আর আমার চিনতে বাকী নেই। যত সব মক্ষিকার দল !

বলি অমন ষাঁড়ের মত না চেঁচালে হচ্ছে না, মেয়েটার কানে যে কথাগুলো যাচ্ছে সেদিকে বুঝি হুঁস নেই !

লাবণ্যর বাবা যেন ক্ষেপে গেছেন। বললেন, যাক্, আমিত তাই চাই। আমি আর তোমাদের কোন কথা শুনবো না। আমার হুকুম আজ থেকে তোমার মেয়ে কোন দলে মিশতে পারবে না।

লাবণ্য বাইরে থেকে ছুটে এসে বললে, আর যদি মিশি তাহ'লে—

তাহ'লে এবাড়ীতে আর স্থান হবে না। এই আমার শেষ কথা জেনে রেখো !

লাবণ্যর মা এইবার স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে, খপ করে মেয়ের কাছে গিয়ে তার মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে বললেন, কি হচ্ছে লাবি, চুপ কর।

তুমি থামো বলছি ! বলে একটা ধমক দিয়ে লাবণ্য মাকে চুপ করিয়ে দিলে।

আমি এবার তোদের দু'জনের সামনে মাথা খুঁড়ে মরবো। এই বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

লাবণ্য তখন বাবাকে বললে, অর্থাৎ আমায় বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও—এইবার বুঝলুম তোমার আসল উদ্দেশ্য !

তিনি বললেন, হ্যাঁ যে মেয়ে মা বাপের মুখে কালি দেয় সে মেয়ের মুখ আর আমি দেখতে চাই না। তার চেয়ে মনে করবো যে মেয়ে মরে গেছে—সেও ভাল। বলতে বলতে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

একটু পরে একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে একখানা চিঠি লাবণ্যর হাতে দিয়ে বললে, হৈমন্তীদি দিয়েছেন। বলেই ছেলেটি কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত চলে গেল।

খামটা হাতে করেই লাবণ্য যেন শিউরে উঠলো। এক অজানা আনন্দে তার শরীরের অভ্যন্তর ভাগ তখন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এ যে শংকরদার হস্তাক্ষর! জেল থেকে তাকে চিঠি দিয়েছে মনে করে সে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। কিন্তু খুলতেই দেখলে জেলে যাবার দিনে লেখা সেই চিঠি—কেবলমাত্র দু'টি লাইন। 'আমার কল্পনা যে দিন তোমার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে সেদিনের প্রতীক্ষায় রইলুম—আমার সমস্ত প্রাণ মন নিয়ে।"

চিঠিখানা পড়ে লাবণ্যর চোখে জল এসে পড়লো। শংকরদার কাছে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা এখন কি করে রক্ষা করবে! তার দলের কাছে যে সে আজ বিশ্বাসঘাতিনী। তারা কেউ আর তাকে চায় না! তারা তাকে দলচ্যুত করেছে! এখন সে কি করবে! তার এতদিনের সাধনা কি তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আরো বারকয়েক লাবণ্য সেই চিঠিখানা পড়লে। কিন্তু শেষবারে তার চোখের জল আর বাধা মানলো না। লাবণ্য ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল!

আরো মাসখানেক কেটে গেল। প্রত্যেকটি দিন লাবণ্যর কাছে যেন বোঝার মত ভারী হয়ে ওঠে—হতাশায় আর নিষ্ক্রিয়তায়। মনে প্রাণে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শংকরদার কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথাটা যত মনে পড়ে ততই যেন লাবণ্যর চিন্তা আরো বেড়ে যায়।

এই সময় হঠাৎ একদিন দুপুরে শশাঙ্ক এসে চুপি চুপি লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করলে। সে তাকে উৎসাহ দিয়ে বললে, কে তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে? কে বলে কংগ্রেসের শত্রু?

একথা শুনে লাবণ্যর বুকে যেন বল ফিরে আসে! তার চোখ দু'টো আবার উৎসাহে জ্বলে ওঠে। সে বলে, বাবা যা করেছেন তার জন্যে কি আমি দায়ী শশাঙ্কদা? অথচ নিজের বাপের এই অন্যায়ের কথা কি ক'রে দশের কাছে বলি? আমি যে তাঁর মেয়ে! কি এখন করি বল তো! অথচ সকলের চোখে আজ আমি অপরাধিনী, বিশ্বাসঘাতিনী প্রতিপন্ন হয়েছি। হৈমন্তীদিকে তবু আমি সকল কথা খুলে বলেছিলুম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমায় ক্ষমা করলেন না। লাবণ্যর কণ্ঠস্বর আবার ভারী হয়ে এলো!

শশাঙ্ক বললে, কে হৈমন্তীদি, মানবো না তাকে আমরা! শঙ্করদার বোন তিনি হ'তে পারেন, তা ব'লে নিরপরাধকে—

লাবণ্য বললে, তা বলে নয় শশাঙ্কদা, কথাটা দেশের সকলের কাছে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে সকলেই এখন আমার বিরুদ্ধে।

শশাঙ্ক বললে, কে বলেছে সকলে? আমরা আছি তোমার দিকে। চলো ফের আমরা একটা দল তৈরী করিগে—দেখি কে আমাদের রুখতে পারে! ওদলকে আমি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে দিতে পারি, সে ক্ষমতা এখনো রাখি! তুমি কিছু ভেবো না। আজ থেকেই আমরা নতুন দল গড়বো সংকল্প করছি।

নতুন দল! শঙ্করদার দল ভেঙ্গে? লাবণ্য ভয়ার্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

শশাঙ্ক সগর্ব্বে উত্তর দিলে, ভাঙ্গতে হবে না লাবণ্য, তুমি জানো না যে তোমার প্রতি সকলের কতখানি আস্থা রয়েছে! ওদল থেকে অনেকেই এখন তোমার দলে আসতে রাজী।

ঈষৎ হেসে লাবণ্য বললে, তা জানি কিন্তু আমি যে তাতে রাজী নই শশাঙ্কদা। বলেই হঠাৎ সে যেন গম্ভীর হয়ে পড়লো। তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, সে আমি কিছুতেই পারবো না। শঙ্করদার আদর্শে যে দলটি আজ এত বড় হয়ে উঠেছে, যাকে আমি নিজে হাতে ক'রে তৈরী করেছি তাকে আমি ভাঙতে পারবো না এবং আর কাউকে ভাঙতে দেবোও না। শশাঙ্কদা, ভাঙা সহজ কিন্তু গড়া সহজ নয়। এই দলাদলি করেই চিরকাল আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছি! তাই আমার দ্বারা তার পুনরাবৃত্তি কিছুতেই হবে না। তার চেয়ে আমি বরং তাদের শাস্তি মাথায় পেতে নেবো—সেও শতগুণে ভালো।

শশাঙ্ক বললে, ভালো? কি বলছো লাবণ্য—তোমাকে শাস্তি দেবে ওরা—তা আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না—তুমি কংগ্রেসের জন্যে কি করেছো তা কি আমরা জানি না?

লাবণ্য এইবার প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, শুধু তোমরা কেন তারাও জানে। তবু আমি যখন সহ্য করতে প্রস্তুত, তখন তোমরাই বা করবে না কেন?

শশাঙ্ক এর পর আর কিছু বলতে সাহস করলে না, নীরবে চলে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এর পরে মধুলোভী ভৃঙ্গের মত একজন, দু'জন ক'রে সেই দলের আরো কয়েকজন যুবক এসে আবার লাবণ্যর কাছে সেইরকম প্রস্তাব দিতে লাগল। তারাও বললে, তোমার অনুমতি পেলে এখনি আমরা নতুন দল তৈরী করবো। কে হৈমন্তী? কে শঙ্করদা? আমরাই তাদের দলের খুঁটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

ল্যবণ্য জানতো যে এদের দলের অনেকেই মনে মনে তাকে ভালবাসতো। কেউ কেউ ইঙ্গিতে সেকথা জানাতেও ছাড়েনি! লাবণ্য তাই তাদের এই প্রস্তাবে রীতিমত চটে উঠলো, এবং বললে, আপনাদের এ মনোবৃত্তির আমি প্রশংসা করতে পারি না। আপনাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার কাজে আমি কিছুতেই অনুমতি দিতে পারবো না।

মতিলাল বলে উঠলো, আর যদি তোমার অনুমতি না নিয়েই আমরা আর একটা দল গঠন করি, তাহ'লে তার নেতৃত্ব করতে তোমার কোন আপত্তি নেই ত ?

কঠিনস্বরে ল্যবণ্য বললে, নিশ্চয়ই আপত্তি আছে।

এই মতিলাল একদিন গোপনে তাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিল লাবণ্যর কাছে। তাই তার ঠোঁটের কোণে এবার একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। সে একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বললে, ওঃ বুঝেছি !

কি বুঝেছেন ? বলে লাবণ্য কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালে।

ঈষৎ হেসে মতিলাল জবাব দিলে, যা সকলে বুঝেছে অর্থাৎ দুই আর দুইয়ে চার।

কথাটা বলেই মতিলাল ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু লাবণ্য তার পথ আগলিয়ে বললে, তার মানে কি, স্পষ্ট করে আমায় বলে যেতে হবে।

মতিলালের কণ্ঠ এবার যেন ব্যঙ্গে ফেটে পড়লো। বললে, আরো স্পষ্ট ক'রে শুনতে চাও ? কেন, আর কারুর মুখ থেকে কি শোনোনি ?

সে-খবর জানবার অধিকার আপনার নেই ! আমি শুধু আপনাকে প্রশ্ন করেছি, আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

মতিলাল এবার বোকার হাসি হেসে উঠলো। তারপর উচ্চকণ্ঠে বললে, কেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ—'

মতিবাবু ! বলে ক্ষুধিতা সিংহিনীর মত একটা হুঙ্কার ছাড়লে লাবণ্য। তারপর বললে, আপনি ভুলে যাবেন না যে এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, আর আপনি একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

মতিলাল বললে, তুমিও ভুলে যেও না যে ভদ্রলোকের মেয়ে বলে দেশসেবার অজুহাতে রাত দুপুর পর্যন্ত যা খুশি তাই ক'রে বেড়াবে, আর সমস্ত লোকে তাই মুখ বুজে সহ্য করবে।

লাবণ্য বললে, শুধু আপনার সঙ্গে বেরোলে বোধহয় লোক সমস্ত সহ্য করতো। চলে যান্, শিগগির আমার সামনে থেকে, তা নাহ'লে সকলের সামনে আপনার কথা বলে দেবো।

মতিলাল নিঃশব্দে দরজার দিকে যেমন দু'পা গিয়েছে অমনি লাবণ্য হুকুমের ভঙ্গীতে বলে উঠলো, দাঁড়ান !

মতিলাল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তখন লাবণ্য তার মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম—সামনের মাসে আমার বিয়ে—আপনাদের সকলের নেমন্তন্ন রইল, আসবেন।

মতিলালের সামনে যেন একটা বজ্রপাত হলো। মুহূর্তকয়েক তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শুধু একবার বিস্ময়াবিষ্টকণ্ঠে বললে, বিয়ে ! কার সঙ্গে ?

লাবণ্য কঠিনভাবে জবাব দিলে, কেন, তাহ'লে সেখানে গিয়ে ভাঙ্চি দিয়ে

আসবেন ?···

মতিলালের কাছে এবার সমস্ত ব্যাপারটা যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল। শঙ্কর জেলে—তবে কার সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে! সেই কথাটা নিয়ে মনে তোলাপাড়া করতে করতে সে পথ চলতে লাগল!

৭

লাবণ্যর মা রান্নাঘরে তখন রাঁধছিলেন। লাবণ্য সোজা সেখানে গিয়ে বললে, মা আমি বিয়ে করবো বাবাকে বলো।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের খুন্তি থেমে যায়। মেয়ের মুখ থেকে একথা শুনেও যেন তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই লাবণ্যর মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন, কি বললি? যেন এর চেয়ে অসম্ভব কথা আর কখনো শোনেননি।

লাবণ্যর চোখ দুটো এবার যেন কিসের জ্বালায় জ্বলে উঠলো, বললে, বিয়ে করবো তাই বাবাকে আমার মতটা জানাতে বলছি।

এই বিয়ের জন্যে কতদিন তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে সাধ্যসাধনা করেছেন তবু মেয়েকে কিছুতেই রাজী করাতে পারেননি। ভাল মন্দ—কত সম্বন্ধ এসেছে গিয়েছে! সেইজন্য লাবণ্যর মুখ থেকে সেই প্রস্তাবটা শুনে তিনি আপনমনে বলে উঠলেন, বাবা সত্যনারায়ণ তোমায় জোড়াসিন্নী দেবো বাবা! লাবির মাথায় তুমি ভর করো বাবা! তারপর একটু থেমে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে লাবি এ সুবুদ্ধি তোর মাথায় কে দিলেরে? যে ছেলেরা এখন দেখা করতে এসেছিল তারা বুঝি! আহা, ভগবান তাদের মঙ্গল করুন!

তুমি চুপ করবে কি মা! তোমার সঙ্গে যদি একটা কিছু পরামর্শ করা চলে! বলতে বলতে লাবণ্য দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মা এইবার কড়াতে খুন্তিটা জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলে উঠলেন, কেবল রাগ-ই করতে শিখেছিলি। আমার কথা যদি এতদিন শুনতিস্ তাহ'লে কবে বিয়ে হয়ে যেতো। কবে থেকে খোসামোদ করছি, 'দেখ লাবি, মেয়েছেলে কখনো বিয়ে না করে থাকতে পারে—এ কখনো হয় না—একদিন না একদিন বিয়ে করতেই হবে, তা না হ'লে যে আমাদের শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যাবে! তা আমার কথা গেরাহ্যি করবি কেন? লেখাপড়া শিখে মনে করলি কি হয়েছি!'

ঘরের মধ্যে থেকে এবার লাবণ্য বলে উঠলো, আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া জানা মেয়েদের চেয়ে যে বেশী জানো তা আমি স্বীকার করছি—দোহাই তোমার, এখন তুমি একটু দয়া ক'রে চুপ করো! পাড়ার লোকেরা শুনলে কি মনে করবে!

মা তেমনিভাবেই উত্তর দিলেন, বলি এতদিন এ জ্ঞান কোথায় ছিল মা

তোমার! তারপর সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, পাড়ার লোকেদের জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না! ভাবছি ও'র কাছে আমি কি বলবো। ভাল ভাল কত পাত্র গেল তখন তোর পায়ে ধরতে বাকী রাখিনি!

লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, এই যে কদিন আগে বাবা কি একটা সম্বন্ধর কথা তোমায় বলছিলেন!

মা বললেন, সে যে দোজপক্ষে, বয়েস বেশী, তাছাড়া—

তাছাড়া আর যাই থাক, সবেতেই আমি প্রস্তুত—তুমি বাবাকে বলতে পারো!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলার স্বর একেবারে পাল্‌টে গেল। তিনি একটু সুর টেনে বললেন, অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের তুলনায় বয়েস এমন কিছু বেশী নয়, তাছাড়া উনি বলছিলেন, সে নাকি মস্ত বড় জমিদারের ছেলে—নেই নেই করেও বাপ যা রেখে গেছে তা তিনপুরুষে শেষ করতে পারবে না।

লাবণ্য একটু ভেবে বললে, তাই যদি তবে আবার এত চিন্তা করছিলে কেন মা!

কথাটাকে টপ করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, না চিন্তা করছি না, বরং তোমাকেই আমি চিন্তাটা একটু ভাল ক'রে করতে বলছি—আবার যেন ও'র কাছে কথাটা বলে তারপরে অপদস্থ না হই! এমনি ত আজকাল দিনরাত উঠতে বসতে বাপান্ত করেন তোর জন্যে—

না-না-না—তোমাকে বড় এক কথা একশো বার বলতে হয় মা! বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে সে চলে গেল।

এই জোর করে 'না' বলার মধ্যে যেন এই ইঙ্গিত ছিল, যে সে দেখাবে সমস্ত গ্রামের লোককে, তাকে নিয়ে শংকরদার সম্বন্ধে তাদের যে কুৎসিত সন্দেহ তা সত্যি নয় মিথ্যা! তাছাড়া এইভাবে দূরে সরে গিয়েও শংকরদাকে সে আরো বড় ক'রে তুলে ধরবে সকলের সামনে।

বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীর মুখে মেয়ের মতি পরিবর্ত্তনের কথা শুনে ইন্দুবাবু যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন! ফলে সেই দিন রাত্রের গাড়ীতেই তিনি কলকাতায় রওনা হলেন এবং বিয়ের সব ঠিক ক'রে দু'দিন পরে বাড়ী ফিরে এলেন—খুশিতে ও গর্ব্বে ডগমগ করতে করতে। এত বড়লোক জমিদার-জামাই পাওয়া তাঁর কাছে যেন কল্পনাতীত সৌভাগ্য!

বলা বাহুল্য শুভকার্য্যে বিলম্ব হ'লো না। যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। লাবণ্যর কিন্তু বর দেখে প্রথমেই মনে একটা 'শ্যক্' লাগল। কেবল যে বয়েস হয়েছে তাই নয়, চোখে মুখে এমন একটা বার্দ্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট যে সেদিকে চেয়ে তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠলো। শংকরদার মুখ চেয়ে এত দ্রুত কাজটা করা হয়ত উচিত হয়নি, বারবার তখন সেই কথাটাই তার মনে হতে লাগল।

ঘাড় হেঁট ক'রে বিবাহের মন্ত্র পড়তে পড়তে সে কিন্তু একটু পরেই আবার

নিজেকে সামলে নিলে। স্বেচ্ছায় বিয়ে করে সে যে হেরেছে, একথাটা অন্তত কাউকে জানতে দেবে না, মনে মনে এই দৃঢ়সংকল্প করলে, এমন কি বাপ-মাকেও না।

প্রৌঢ় জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে যেটুকু ক্ষোভ তার মনে জমেছিল আবার শ্বশুরবাড়ীর বিরাট প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে তা যেন শতগুণে বেড়ে গেলো!

বিরাট চকমেলানো বাড়ী—তিনমহল—বরাবর দোতলা, বড় বড় থামের সারি নিয়ে ঘুরে ফিরে কোথা থেকে যে কোথায় চলে গেছে তা দেখলে যেন মাথা ঝিমঝিম করে। এতবড় বাড়ী কিন্তু এত শ্রীহীন! থামগুলো ভাঙ্গাচোরা, চুনবালি খসে খসে পড়ছে এখান ওখান থেকে—সারা বাড়ীটায় রংয়ের কাজ যে কত বছর হয়নি তার ঠিক নেই। গোলাপায়রার বাসা থামের মাথায় মাথায়—তাদের শুষ্ক বিষ্ঠা বারান্দার চারিদিকে ছড়ানো। ঘরে ঢুকতে গেলেই কেমন একটা চামসানী গন্ধ প্রথমেই নাকে লাগে! ঘরগুলোর ছাদের দিকে চাইলে লাবণ্যর গা যেন ছম্ছম্ করে। উঁচুউঁচু বিরাট বিরাট ঘর—তার বড় বড় দরজা জানলা—সেকেলে বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, কতদিন তাতে হাত পড়েনি। ধুলোয় কালিতে বিবর্ণ, কিন্তু তারি মধ্যে একালের ইলেকট্রিক আলো আশ্রয় নিয়েছে। ভারী ভারী সেকেলে খাটপালঙ্—তার ওপর পুরণো মোটামোটা গদি তোষক, বিবর্ণ তাকিয়া বালিশ আর প্রতি ঘরেই দু'একখানা ক'রে দেওয়াল জোড়া পুরনো অয়েলপেণ্টিং সোনালী ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো! এবাড়ীর বংশধরদের সব স্মৃতিচিহ্ন। বাড়ীটা যেমন বড়, লোকজন তেমনি অল্প—এমন কি নেই বললেই হয়। যেন একটা হানাবাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো লাবণ্য।

ফুলশয্যার দিন। লাবণ্য পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সেইসব প্রাচীন অয়েলপেণ্টিংগুলোকে প্রণাম ক'রে ঘরের পর ঘর অতিক্রম করতে করতে পিস্শাশুড়ীর সঙ্গে চলল।

পিসীমা কোন ছবিটা কার, বলে দিতে দিতে একবার ক'রে চোখের জল মুছতে লাগলেন—বোধ করি সেইসব মৃত ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করে।

শেষে সাবেকী অলঙ্কারের একটা বোঝা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লাবণ্য বড় একটা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। গয়নাগুলির অধিকাংশই তার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর—যদিও এখন এর সব-ই তার, তবুও তার মনে কোনরকম উত্তেজনা হলো না। বরং সেই অলঙ্কারগুলো যেন তাকে কোন এক হতভাগিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল।

লাবণ্য চুপ করে বসে কত কি ভাবে!

রাত্রি গভীর থেকে গভীর হয়, নিমন্ত্রিতের কোলাহল থেমে যায়। ফুলশয্যার সময় যত নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে তত যেন কে একটা হাতুড়ীর ঘা মারতে থাকে তার বুকের মধ্যে। এখনি তার জীবনে সত্যিকারের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

তার কুমারীত্বের ঘটবে অবসান! সেই আসন্ন মহামুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষায় সে যেন বসে থাকে।

রাত্রি একটায় লগ্ন সে শুনেছিল। কিন্তু একটা ত দেওয়ালের বড় ঘড়িটায় অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। দু'টো বাজতেও আর বেশী দেরী নেই! তবে কেন এত দেরী হচ্ছে! এক একবার লাবণ্য মনে ভাবে যত দেরী হয় তত যেন ভাল—আর যদি এইরকম করতে করতে রাতটা পুইয়ে যায় ত বেশ হয়!

কিন্তু সময় যতই চলে যায়, সেই বিশেষ ক্ষণটি যেন আর আসে না। সবাই কি যেন কানাকানি করে। সকলের চাপা কথাবার্ত্তার মধ্যে এবং মুখচোখের ভাবে যেন এক অমঙ্গলের আশঙ্কা। লগ্ন তো শেষ হয়ে গেল কিন্তু বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—জমিদারবাবু যে কোথায় ডুব মেরেছেন, কেউ জানে না!

এইভাবে রাত্রি যখন প্রায় শেষ হতে চললো তখন হঠাৎ জমিদারবাবু আবির্ভূত হলেন রঙ্গমঞ্চে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে শেষ করে মেয়েরা সবাই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন লাবণ্যর বুকটা আরো বেশী ঢিপ ঢিপ করতে লাগল! সেই বিরাট ঘরের মধ্যে সে ও জমিদার-কুমার!

খাটের বাজুটা ধরে লাবণ্য অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সহসা এক ঝলক তীব্র মদের গন্ধ লাবণ্যর নাকে গেল। সুব্রত একটু থেমে বললে, সামনে ত খাট বিছানা প্রস্তুত, শোবে চলো—এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন সোনারচাঁদ?

লাবণ্য কোন উত্তর দিতে পারলে না। তার নিচের ঠোঁটটা শুধু থরথর করে বারকতক কেঁপে থেমে গেল। ফুলশয্যার দিনে এই কি স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে সে ভাবতে লাগল, দ্বিতীয় পক্ষ, তার ওপর মাতাল, তার ওপর বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। সুতরাং ফুলশয্যার রাত্রে এরকম বরের কাছ থেকে এছাড়া আর কি সে কল্পনা করবে? গলায় ফুলের মালা, সামনের পালঙ্কে ফুল বিছানো সজ্জা, সব যেন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

চুপ্ করে রইলে যে! বলে সুব্রত তার বাঁ হাতটা ধরলে। তারপর একটু টান দিয়ে বললে, চলো, বিছানায়!

ঘৃণায় লাবণ্যর দেহটা যেন শিউরে উঠলো। সুব্রত বললে, কি যাবে না?

লাবণ্য তখন তেমনি অধোমুখে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, ও বুঝেছি, আমায় বুঝি পছন্দ হয়নি তোমার, সত্যি করে উত্তর দাও। তা না হলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি! মাতালের কথাগুলো শেষের দিকে যেন জড়িয়ে আসতে লাগল।

লাবণ্য এইবার ধীরে ধীরে শুধু বললে, উত্তর, কাকে দেব?

কেন, আমাকে? কুমার সুব্রতকে! বলে সে জোরে জোরে, তার বুকে বার দুই হাত ঠুকলে।

মাতাল কুমার যখন প্রকৃতিস্থ হবেন তখনই এর উত্তর দেবো। বলে লাবণ্য গম্ভীর হয়ে গেল।

সুব্রত আবার হা হা করে মাতালের হাসি হেসে উঠলো। তারপর জড়িত কণ্ঠে বললে, প্রকৃতিস্থ? তুমি বোধহয় জানো না যে এই হলো আমার সবচেয়ে প্রকৃতিস্থ অবস্থা! কৈ আগে জবাব দাও আমার কথার? বলে সে গলার স্বর আরো একপর্দা চড়িয়ে দিলে।

লাবণ্য বললে, একজন মাতাল ও প্রায় বৃদ্ধ বরকে একটি মেয়ের কতখানি পছন্দ হতে পারে সেটা বোঝবার মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনার আছে!

তবে সব জেনেশুনে তুমি এ কাজ করলে কেন? বল শিগ্‌গির! পয়সার লোভে? সত্যি উত্তর দাও! কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর হ'য়ে উঠলো সুব্রতর।

লাবণ্য ঘাড় হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে বললে, যদি বলি আপনার মনকে ফেরাতে পারবো এই ভরসায়!

মিথ্যে কথা! বলে ধমক দিয়ে উঠলো সুব্রত। তারপর আবার একপ্রকার ব্যঙ্গের সুর এনে বললে, 'আপনার মনকে ফেরাতে পারবো,' ওঃ কে আমার সাত পুরুষের দরদীনি এলেন রে! যা করতে কেউ পারলে না—বাপ, মা, বৌ সব মরে ফৌত হয়ে গেল, উনি এলেন তাই করতে। মায়ের চেয়ে দরদী বড় তারে বলি ডান। ওসব বুজরুকি এখানে চলবে না সোনারচাঁদ—বলে বুকে একবার জোরে হাত ঠুকলে। তারপর তীব্রকণ্ঠে সুব্রত বললে, সত্যি জবাব দাও! পয়সার লোভে আমায় বিয়ে করেছো বল?

লাবণ্য তেমনি ভাবে উত্তর দিল, আমি সত্যি বলছি, এখন বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।

কেন আমার মত লম্পট বুঝি দেশে আর ছিল না! কৈ, তাদের জন্য ত তোমার প্রাণে এত দরদ উথলে উঠেনি! না ভেবেছিলে এমন শাঁসালো মাল বুঝি আর কেউ নেই!

লাবণ্য বললে, মাতলামো করবেন না। ফুলশয্যার রাত, হয়ত বাইরে কেউ কান পেতে আছে, তারা শুনলে কি মনে করবে!

বেশ করবো আমি মাতলামো করবো। তোমার বাবার পয়সায় মদ খেয়ে আমি মাতলামি করছি!

সহসা লাবণ্যর চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। সে বললে, বাপ্ তুলে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি—যা বলবার ইচ্ছে আমায় বলুন!

আল্‌বাত্ বলবো—একশোবার বলবো, তোমার বাবা একটা জোচ্চোর শয়তান, আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ঘুষ নিয়ে তবে মেয়ে আমায় দিয়েছে—

লাবণ্যর কণ্ঠ এবার যেন জ্বলে উঠলো, সে বললে, বাবা ঘুষ নিয়েছিল না আপনি ঘুষ দিয়েছিলেন তার মেয়েকে বিবাহ করবার জন্যে?

সুব্রত বললে, তার মানে ?

তার মানে আপনার মত মদ্যপ, লম্পট, ও স্ত্রী হত্যাকারীর সঙ্গে আর কেউ মেয়ের বিয়ে দেবে না বলে !

কি বললে ?

বলছি, আপনি যে চাবুক মেরে আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন সে-খবর জানতে আর কারুর বাকি নেই—

তাই নাকি ! কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'লো। বলে সুব্রত কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তা না হ'লে আমি জানলুম কি করে ? বলে লাবণ্য সুব্রতর চোখের ওপর তার বিস্ফারিত চোখ দুটি তুলে ধরলে।

সুব্রত বললে, হুঁ ! বুঝেছি ! তাহ'লে সব জেনেশুনেও যখন আমার গলায় মালা দিয়েছো তখন পয়সার লোভ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

লাবণ্য বললে, কিন্তু পয়সা আমার কি হবে ?

এ্যা নেকি ! ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। পয়সা আমার কি হবে ? খোল্ শিগগির গা থেকে সব গয়না ! বলতে বলতে সুব্রত নিজেই তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গয়না কেড়ে নিতে গেল।

ঘৃণায় দু'পা পেছিয়ে গিয়ে, লাবণ্য তখন নিজের থেকেই গয়নাগুলো খুলে খুলে তার পায়ের কাছে ফেলে দিতে লাগল।

সেইগুলো সব কুড়িয়ে নিয়ে, দেওয়াল আলমারী খুলে তাতে রেখে একটা মদের বোতল বার করে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা সে গলায় ঢাললে। তারপর মুখ চোখ কুঞ্চিত করে বললে, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—তোমার মত শয়তানীর স্থান এখানে হবে না—চলে যাও ঘর থেকে।

লাবণ্যর সর্ব্বশরীর তখন থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে বললে, কোথায় যাবো কেউ যদি দেখতে পায়—

দেখতে পাক্, তারা জানুক তোমার স্বরূপ কি। আমি ত তাই চাই—

লাবণ্য তার পায়ের ওপর বসে পড়ে বললে, অন্ততঃ সকালটা হতে দিন, তারপর আমি নিজেই তখন চলে যাবো—এখন এই ঘরের একপাশে পড়ে থাকি—

লাথি মেরে লাবণ্যকে পায়ের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সুব্রত খাটের উপর গিয়ে বসল। লাবণ্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আবার লজ্জাবতী লতার মত মায়াকান্না হচ্ছে—বলতে বলতে বোতল থেকে ঢক্-ঢক্ করে আরো খানিকটা গলায় ঢাললে। শেষে বোতলটা যখন নিঃশেষ হয়ে গেল তখন টল্‌তে টল্‌তে ঘরটায় পায়চারী করতে করতে সুব্রত দেওয়ালে টাঙানো তার স্ত্রীর বড় অয়েল-পেণ্টিংটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর নীরবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার টল্‌তে টল্‌তে চলে গেল খাটের দিকে। খাট থেকে ফুলগুলো নিজের ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে পায়ে করে মাড়াতে মাড়াতে

নিজের গলার মালাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে। তারপর খাটের ওপর গিয়ে শুলো। কিন্তু একটু পরে আবার কি মনে করে উঠে খাট থেকে নেমে এলো এবং ধীরে ধীরে লাবণ্যর কাছে এগিয়ে গেল।

টল্‌তে টল্‌তে তার একটা হাত ধরে টেনে বললে, আবার ছিনালী করে কান্না হচ্ছে, ভেবেছো কেঁদেই সতী-সাবিত্রী থেকে যাবে, তা হচ্ছে না সোনার চাঁদ, যাবার আগে ফুলশয্যাটা আমি সেরে দেবো—

লাবণ্য তার হাতটা এমন জোরে ঠেলে দিলে যে ছিট্‌কে সুব্রত সেখানে পড়ে গেল। তারপর অনেক কষ্টে পা ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার লাবণ্যর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, তবে রে হারামজাদী, আমার সঙ্গে লড়বি—আয়, বলে আলমারী থেকে একটা চাবুক বার করে বললে, আয় দেখি কত শক্তি আছে—এই চাবুক দিয়ে একদিন তাকে শেষ করেছিলুম, আজ তোকেও শেষ করবো—

বন্ধ ঘরের মধ্যে লাবণ্য কোনদিকে যাবে স্থির করতে না পেরে চট করে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে থরথর করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

সুব্রত বার কয়েক সেই বন্ধ দরজাটার ওপর সপাং সপাং করে চাবুক মেরে শেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়লো। এবং একটু পরে তার সজোরে নাক ডাকতে লাগল।

দরজায় কান লাগিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য।

সুব্রতর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেয়ে যেন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। আস্তে আস্তে দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই সে চমকে উঠলো।

মাতালের অনেক কাহিনী লাবণ্যর শোনা ছিল কিন্তু কোনদিন তা চোখে দেখেনি! তাই সুব্রতর সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহটার দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় তার মন বিষিয়ে উঠল। এই তার স্বামী, ছিঃ!

মদ খেয়ে মানুষ এমন পশু হয়ে যায়! লাবণ্য আর যেন ভাবতে পারে না। তার মাথার মধ্যেটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মতো আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে সামনের খোলা জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো! দূরে কাদের একটা খুব উঁচু বাড়ির মাথার ওপরে তখন শুকতারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। লাবণ্য সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়লো শঙ্করদার কথা। এখন শঙ্করদা কি করছে? তার কথা কি একবারও তার মনে পড়ছে?

এমনি আরো কত কি চিন্তা করতে করতে কখন যে রাত পুইয়ে গেছে তা সে বুঝতেও পারেনি। হঠাৎ কতকগুলো পাখীর ডাক কানে যেতেই লাবণ্যর যেন চমক ভাঙলো। ঘরের দরজা খুলে সে তখন ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু ভিতরের বারান্দায় পা দিতেই প্রথম চোখাচোখি হ'লো তার

পিসশাশুড়ীর সঙ্গে। তিনি তখন ঘরের চৌকাটে চৌকাটে জলছড়া দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এ বাড়ির শেষ কল্যাণটুকু রক্ষা করার গরজ যেন একার তাঁরই।

লাবণ্যকে তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ বৌমা, এতো ভোরে উঠে এলে কেন মা—আর একটু শুয়ে থাকলেই পারতে—কাল অত রাত্রে শুয়েছো! এখনো যে বাড়ির ঝি-চাকরেরা সব ওঠেনি?

ক্ষীরোদা এ বাড়ির পুরোনো ঝি। সে এই সময় গুল মুখে দিয়ে স্নানের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। সহসা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, হ্যাগা পিসী, বৌদিদির এক গা গয়না কোথায় গেল গা?

পিসীমা লাবণ্যর দিকে চেয়ে যেন শিউরে উঠলেন! ওমা তাই তো। এ কি অলুক্ষুণে কাণ্ড মা! হ্যাঁ বৌমা সব গয়না কোথায় খুলে রাখলে!

লাবণ্য যেমন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইলো। শুধু তার দুচোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

পিসীমা মুহূর্তখানেক চুপ করে রইলেন। তারপর সহসা যেন লাবণ্যর প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলেন। বললেন, কেন তোরা মরতে আসিস এখানে! আর কি কোন চুলোয় ঠাঁই পেলিনা! বলিহারী তোদের বাপ-মাকে! এর চেয়ে তারা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে না কেন মেয়েকে!

ক্ষিরোদা বললে, তা বৌদির কি দোষ বাপু—তুমি মিছিমিছি সকালবেলা ওঁকে গালাগাল দিচ্ছো কেন পিসী। আহা, বেচারী ফুলশয্যার রাত—

পিসীমা যেন ক্ষেপে উঠলেন, বললেন, দেবো না গালাগাল? নিশ্চয় দেবো, একশোবার দেবো। আর শুধু ওকে একা কেন? ওদের গুষ্ঠীর যে যেখানে আছে সকলকে দেবো। মেয়ের বিয়ে দেবার আগে একবার কেউ খোঁজখবর নিতে পারেনি, তাহলে তো এমন প্রতিমার মত মেয়েটার কপাল এভাবে পুড়তো না। তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললেন, আর এই ছোঁড়াটাও হয়েছে তেমনি। তখন পাঁচশোবার বারণ করলুম, দেখ সুবো একাজ আর করিসনি—বাপচোদ্দপুরুষের মুখে আর কালি দিস নি—তা ছোঁড়া কিছুতেই শুনলে না আমার কথা, বললে এবার থেকে আমি খুব ভালো হয়ে চলবো দেখো পিসীমা।

এবার লাবণ্য বলে উঠলো, আমি ইচ্ছে করেই বিয়ে করেছি পিসীমা—তাদের কোন দোষ নেই।

সহসা যেন সামনে বজ্রপাত হলো। ক্ষিরোদা ও পিসীমা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে।

তারপর কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষিরোদা বলে উঠলো, কি জানি মা তোমাদের ইচ্ছের, আমরা মুখ্যুলোক আমরা ওর মর্ম্ম বুঝিনা। বলতে বলতে আরো চারটি গুল মুখে গুঁজে স্নান করতে চলে গেল।

পিসীমা তখন লাবণ্যকে বললেন, চলো বৌমা, আমার ঘরে ততক্ষণে একটু শুয়ে নেবে চলো। বেলা হলে উঠো। আহা, ছেলেমানুষ—

লাবণ্যর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে পাছে পাঁচজনে তার এই নিরাভরণ দেহটা দেখতে পায় সেই জন্যই বোধহয় তিনি তাকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখলেন।

বেলা বারোটা নাগাদ জমিদারবাবুর ঘুম ভাঙলো। তারপর চা খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন গড়গড়ায় টান দিতে বসলো তখন বেলা দেড়টা বাজে।

দুটো নাগাদ ক্ষিরী এসে পিসীমাকে খবর দিলে যে বাবু একবার বৌদিকে এখনি ডাকছেন।

কথাটা কানে যেতেই পিসীমা রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলেন, বলগে যা ক্ষিরী, যে পিসীমা বললে বৌমা এখন যাবে না তার ঘরে।

ক্ষিরী কিছুদূর চলে যেতে পিসীমা আবার তাকে ডাকলেন—বললেন, শোন ক্ষিরী, আচ্ছা, তোকে কিছু বলতে হবে না, বৌমা যাচ্ছে এখনি।

ফাঁসি কাঠের দিকে যেভাবে আসামীরা এগিয়ে যায় লাবণ্য তেমনি করে চললো সুব্রতর ঘরের দিকে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে লাবণ্য দরজার এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গত-রাত্রের অপমানের কালিমা, যেন দিনের আলোয় শতগুণ বর্দ্ধিত হয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভরে তুলছিল। একটা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল সুব্রত। তাতে তার গড়গড়ার দীর্ঘ নলটা। মধ্যে মধ্যে সে তাতে টান দিচ্ছিল। দরজার পাশে কখন যে নিঃশব্দে লাবণ্য এসে দাঁড়িয়েছিল তা সে জানতে পারেনি। একটু পরে হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়তে সে বলে উঠলো, ওকি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—এগিয়ে এসো আমার কাছে।

লাবণ্য যেন কথাটা শুনতে পায়নি, এইভাবে নীরবে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এইবার রুক্ষকণ্ঠে সুব্রত আদেশ করলে, আমার কথাটা বুঝি গ্রাহ্য হচ্ছে না! শিগ্‌গির কাছে এসো!

লাবণ্য তখন আস্তে আস্তে তাঁর ইজিচেয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো নির্ব্বাক নিস্তব্ধ পাষাণ প্রতিমার মত।

তার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েই সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে। তারপর তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, জানো, তুমি কোন বংশের বৌ?

লাবণ্য এবার কোনও উত্তর দিলে না। তেমনি নির্ব্বাক হয়ে রইল।

জবাব দাও—বলে ধমক দিয়ে উঠতে, লাবণ্য ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বললে, জানি।

যদি জানো তবে অলঙ্কার না পরে এইভাবে কেন পাঁচজনের মধ্যে গিয়েছিলে? জানোনা, এতে আমাদের মাথা পাঁচজনের কাছে নীচু হয়?

লাবণ্য বললে, যদি ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীর গায়ের গহনা কেড়ে নিয়ে তাকে

ঘর থেকে চাবুক মেরে বার করে দিলে, বংশের মাথা নীচু না হয়, ত পাঁচজনে এই অবস্থায় দেখলে কিছু হবে না !

সুব্রত এবার লাবণ্যের হাতটা ধরে তাকে কোলের কাছে টেনে আনলে। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, লাবণ্য তুমি কি বলছো ?

লাবণ্য বললে, যা সত্যি তাই বলছি, এখন বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা, কেননা সেখানে তখন কোন সাক্ষী ছিল না।

আমি চাবুক মেরেছি ? আমি তোমার গা থেকে গহনা খুলে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। কি বলছো বড় বৌ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

লাবণ্য ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। এবার তার চোখের কোণে জল টলটল্ করে উঠলো। সুব্রত তাকে চেয়ারের হাতলটার ওপর বসিয়ে তার শাড়ীর প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, যদি সত্যি তাই হয়, তা আমি সজ্ঞানে করিনি, আমায় বিশ্বাস করো লাবণ্য ! আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। দেখো, ওই একটা আমার দোষ মদ খেলে আমি সব ভুলে যাই তখন কি করি কিছু মনে থাকে না।

লাবণ্য বললে, তবে খান কেন ?

একটু থেমে সুব্রত জবাব দিলে, সেটা আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না বড় বৌ !

লাবণ্য বললে, কোনদিন কি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন, তা হলে নিশ্চয়ই পারতেন !

সুব্রতর কণ্ঠ সহসা যেন নরম হয়ে এলো। লাবণ্যের যে হাতটা তখনো তার হাতের মধ্যে ধরা ছিল—তার ওপর হাত বুলতে বুলতে বললে, চেষ্টা আমি করি বড় বৌ কিন্তু কিছুতেই পারি না। মনের সঙ্গে সে কি দারুণ যুদ্ধ ! যত সন্ধ্যা হয়ে আসতে থাকে তত মনে হয় যেন এ পৃথিবীর কোথাও আমার স্থান নেই। এর আনন্দ উৎসব এর হাসি গান, সব যেন বিধাতা অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। আমি এক অভিশপ্ত জীব। এই সংসার রঙ্গমঞ্চের বিরাট প্রেক্ষা-গৃহে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি যেন বন্দি আমার নিজের মধ্যে। এই শূন্য ঘরগুলো চারিদিক থেকে যেন আমায় গ্রাস করতে আসে। আমি মনে করতে পারি না সে অবস্থা ! শুধু অন্ধকার—শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার—কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই, বাতাস নেই, আমার জন্যে···তখন আমার সমস্ত সত্বা যেন চিৎকার করে কাঁদতে চায়, এ পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য একটা জায়গায় পালিয়ে যেতে চায়, যেখানে আমার কেউ নেই অথচ আছে শান্তি।

লাবণ্য তার মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, এসব কি বলছেন আপনি ?

সত্যি বলছি বিশ্বাস করো বড় বৌ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—তখন একমাত্র সান্ত্বনা পাই ওই মদের বোতলে। ও যে আমার কত বড় বন্ধু, কত

দুর্দিনের সাথী আমি তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না কাউকে। ওকে তাই কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারি না।

এমন সময় একজন ভৃত্য এক টুকরো কাগজ এনে তার হাতে দিলে। কাগজটাতে কার নাম লেখা ছিল। সুব্রত বললে, শীগ্‌গির ভেতরে নিয়ে আয় বাবুকে।

বাবু শুনে লাবণ্য উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুব্রত বললে, ওঠবার দরকার নেই, আমার বিশেষ বন্ধু।

পরমুহূর্তে শিবনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে লাবণ্যর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। সে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বসলো।

শিবনাথ কিন্তু একেবারে লাবণ্যর সামনে এসে বললে, নমস্কার লাবণ্যদেবী, ভাল আছেন?

আপনি! আপনি এখানে?

আমার বিদেয়টা এবার নিতে এসেছি। বলে শিবনাথ একটু মুচ্‌কী হাসলেন।

বিদেয়! লাবণ্যর মনটা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

শিবনাথ বললে, বোধ হয় বুঝতে পারলেন না? বিদেয় মানে এত বড় ঘটকালীটা যে করলুম তার পুরস্কার কৈ?

এইবার লাবণ্যর চোখদুটো যেন সাপের মতো চক্‌চক্‌ করে উঠলো। শিবনাথ যে বিয়ের মূলে আছে তা সে জানতো না। সে যে তার ওপর চরম প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তার বাবাকে দিয়ে এখানে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে তা বুঝতেও তার বাকী রইল না। শিবনাথ তাই বিয়ের সময় উপস্থিত না হয়ে পরে সেই কথাটা তাকে জানাতে এসেছে। কিন্তু লাবণ্য তার মনের কথা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললে, ও আপনি এই ঘটকালী করেছেন? নমস্কার।

কেন, এ খবর কি আপনি আগে জানতেন না?

লাবণ্য বললে, না। তাহলে হয়ত অনেক আগেই এর জন্যে আপনাকে পুরস্কার দিতুম।

তাহলে খুশি হয়েছেন ত?

খুশি হবোনা! কি বলছেন শিবনাথবাবু! একি আমার কম সৌভাগ্য! তা নাহলে আমার মত গরীবের মেয়ে কি কোনদিন এত বড় লোকের ঘরে আসবার কল্পনা করতে পারতো।

নিমেষে যেন শিবনাথের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। তবে কি তার গণনা ভুল হয়ে গেল। এখানে দুর্দান্ত সুব্রতর হাতে তার লাঞ্ছনা হবে—তাহলেই লাবণ্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে ভেবেছিল। তাই কপট খুশিতে মুখ উদ্ভাসিত করে লাবণ্য যখন তার কথার উত্তর দিতে লাগল তখন সে রীতিমতো বিস্মিত হলো।

লাবণ্য বললে, বাস্তবিক আপনি যা আমার উপকার করেছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই!

শিবনাথ যেন আর সহ্য করতে পারে না। তাই সহসা উঠে পড়লো।

লাবণ্য রহস্যময় হাসিমুখ টেনে এনে বললে, একি! এর মধ্যে উঠছেন যে।

শিবনাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে, একটা জরুরী কাজ আছে, এখনি যেতে হবে।

খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে লাবণ্য বললে, জরুরী কাজ থাকলে অবশ্য বাধা দেব না, তা'হলে আর একদিন আসতে হবে কিন্তু—

নিশ্চয়। বলে দ্রুতপদে শিবনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শিবনাথ চলে যেতে সুব্রত লাবণ্যর মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, তুমি ত বেশ অভিনয় করতে পারো দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যও গম্ভীর হয়ে পড়লো এবং বললে সত্যি কথা বলতে গেলে যে আবার আপনাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে একজনের কাছে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। বলে যেন কিল খেয়ে কিল চুরি করলে সুব্রত!

এরপর কি বলবে লাবণ্যকে সুব্রত যেন তা ভেবে পেল না। তাই নীরবে শুধু লাবণ্যের হাতটা মুঠির মধ্যে নিয়ে বসে রইল। একটু পরে সে তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং লোহার সিন্দুকটা খুলে সেই গহনার পুঁটুলিটা বার ক'রে এনে একখানা একখানা করে নিজের হাতে গয়না লাবণ্যর গায়ে পরিয়ে দিতে লাগল।

লাবণ্য পাষাণ প্রতিমার মত শুধু নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মুখে চোখে কোন উৎসাহ, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। সজ্জাকরের মত সুব্রত নিজে হাতে করে তাকে সাজাতে লাগল এবং সাজানো শেষ হ'লে পরমাগ্রহে বলে উঠলো, কি সুন্দর তোমায় মানিয়েছে একবার আয়নাতে দেখো।

লাবণ্য আয়নার দিকে না চেয়ে তেমনি ভাবেই বসে রইল, কেবল তার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

এবার যেন সুব্রতর হুঁশ ফিরে এলো। সে আস্তে আস্তে বললে, লাবণ্য কাল রাত্তিরের কথাটা ভুলে গিয়ে আজ আমায় ক্ষমা করতে পারবে না?

লাবণ্য চোখের জল সংবরণ করতে করতে বললে, স্ত্রীলোকের কাছে স্বামী দেবতা স্বরূপ—সকল দোষগুণের ঊর্দ্ধে। কাজেই ওসব বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে লাবণ্য যেন কি ভবে নিলে। তারপর আবার বললে, আর ভুলে যাওয়ার কথাটা যদি বলেন তবে বলবো ফুলশয্যার কাহিনী কি কোন মেয়ের পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব!

লাবণ্যর দুটো হাত চেপে ধরে সুব্রত তখন বললে, একটা মাতালের সঙ্গে তোমার ফুলশয্যা যে হয়নি সেতো ভালই হয়েছে লাবণ্য!

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, সেটা হয়ত সত্যি, কিন্তু ওদিনটা যে

আমার জীবনে আর আসবে না।

নিশ্চয় আসবে লাবণ্য ! আমি একদিন তোমাকে তার প্রমাণ দেবো। বলতে বলতে সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠে আবার সুব্রত বললে আমি চেষ্টা করি ভালো হবার তুমি বিশ্বাস কর লাবণ্য—রোজই মনে করি আর মদ খাবো না কিন্তু পারি না। তবে একদিন নিশ্চয়ই পারবো। তাই আজ আমার সকল দোষ ক্ষমা কর লাবণ্য !

সুব্রতর মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। কোনদিন সে তা আর কাজে পরিণত করতে পারে না। প্রতিদিন রাত্রেই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে আর লাবণ্যর সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। দিনের সুব্রতর সঙ্গে রাত্রের সুব্রতর যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ—দেবতার সঙ্গে যেমন অসুরের। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না লাবণ্য। একই মানুষের একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

বার কয়েক সে সুব্রতকে নিষেধ করতে গিয়েছে কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হয়েছে দেখে ইদানিং সে চুপ করে থাকে। সুব্রত কোনদিন রাত্রে বাড়ীতে ফেরে কোনদিন বা ফেরে না। আবার কখনো কখনো একাদিক্রমে সাত আট কিংবা পনের দিন পর্যন্ত দর্শন মেলে না।

বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে লাবণ্য কেবল ভাবে শঙ্করদার কথা। আজ এই অবস্থা কার জন্যে সে সেচ্ছায় বেছে নিয়েছে তা কি শঙ্করদা জানে? সেই বিরাট অট্টালিকার মধ্যে শূন্যঘরে প্রেতিনীর মত কেবল একাকিনী জেগে থাকে লাবণ্য। তার চোখে ঘুমের পরিবর্ত্তে কখন জল এসে পড়ে জানতেও পারে না।

আবার কোন কোন দিন বিছানায় ছটফট করতে করতে কেবলই তার মনে হয়, হয়ত শঙ্করদা জেলের মধ্যে কত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে কি তার কথা একবারও মনে পড়ছে না? আবার লাবণ্য ভাবে দেশেতে যে কাজ সে আরম্ভ করে এসেছিল তা নিশ্চয় চলেছে পূর্ণোদ্যমে। সে না থাকলেও ক্ষতি হবে না। কিন্তু যেদিন শঙ্করদা এসে দেখবে যে তার আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণরূপ নিয়েছে অথচ সে নেই তাকে খুঁজে পাবে না, তখন লাবণ্যের কথা নিশ্চয় বেশী করে তার মনে হবে। কিন্তু কি করবে শঙ্করদা তখন? একবারও কি তার মনে হবে যে তার সুনাম বজায় রাখার জন্যেই সে নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছে এবং এখানে এইভাবে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করছে। লাবণ্য মনে মনে ভাবে যদি একবার শঙ্করদা এসে চোখে দেখে যেতো তার এই অবস্থা, তাহলে বোধ হয় সব চেয়ে খুশী হতো সে।

৮

বিয়ের তেরো মাস পরে পিসীমা নতুন বৌ ও সুব্রতকে নিয়ে কুসুমপুরে গেলেন। অনেকদিন ধরে তিনি সেখানে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সুব্রত কথা দিয়ে বারবার কথার খেলাপ করছিল বলে এতদিন সুবিধা হয়নি। প্রজাদের

কাছে জমিদারের নতুন বৌকে দেখাতে নিয়ে যাবার রীতি বংশগত। তাই এগারো বছর পরে কুমার সুব্রত যখন কুসুমপুরে আবার পদার্পণ করলেন তখন প্রজাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। জমিদার বাড়ীতে উৎসবের সমারোহ লেগে গেল। প্রজারা স্ত্রীপুরুষ 'নজর' নিয়ে জমিদার ও তাঁর নবপত্নীর চরণ দর্শন করতে এলো। যার যেটুকু ক্ষমতা সে তাই দিয়ে যেন দেবতাকে তুষ্ট করতে চায়। ভক্তির সে চেহারা দেখে লাবণ্য বিচলিত হয়ে উঠলো। যে জমিদারকে প্রজারা এত ভালবাসে সে কেন তবে এদের ছেড়ে শহরে বাস করে ? কেন শহরে পড়ে থাকে, সে ভাবতে পারে না। এখানে তারা রাস্তা দিয়ে হাঁটলে প্রজারা যেন বুক পেতে দেয়, আর সেখানে কে কাকে চেনে ?

লাবণ্য একদিন সুব্রতকে বললে, কি জন্য তুমি শহরে থাকো বুঝতে পারি না ? প্রজারা তোমাকে কি চোখে দেখে তা কি বুঝতে পারোনা ?

সুব্রত একটু হেসে বললে, ওসব মিছরীর ছুরি—ওদের মুখের কথায় ভুলোনা।

এইসব অশিক্ষিত নিরীহ প্রজা, যারা মুখে কথা কইতে শেখেনি তাদের সম্বন্ধে তুমি কি বলছো ?

সুব্রত গলায় একপ্রকার সুর টেনে বললে, এটা যে গণ-জাগরণের যুগ, ভুলে যেয়োনা প্রজারা আর রাজাকে মানতে চায় না।

লাবণ্য বললে, কিন্তু তার ত কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না এদের মুখে-চোখে। বরং তার উল্টো বলে মনে হলো। এত বেশী রাজভক্তি যেখানে সেখানে কোন জাগরণই সম্ভব নয়। কি সরল চাউনী ! কি বিনম্রভাব, যেন দাসানুদাস, সর্ব্বদা পায়ের তলায় পড়ে আছে।

সুব্রত একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, ভিজে বেড়াল। ওই রকমভাব দেখতে। ওদের কীর্ত্তিকলাপ কত, তাতো তুমি জানোনা। তা নাহলে লাবণ্য তুমি ভাবতে পারো যে ওরা 'খাজনা' বন্ধ করে। আন্দোলন ক'রে দু'-দুবার একেবারে জমিদারী অচল করে তুলেছিল।

লাবণ্যর মুখচোখ যেন কিসের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে বললে তা জমিদার যদি তাদের দিকে একেবারে পিছন ফিরে থাকেন তাহ'লে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুব্রত বললে, আরে আমার কি করবে ওরা। দিলুম ঠাণ্ডা করে। এই বলে ঈষৎ হেসে সে বললে,অবশ্য এর জন্যে আমার কিছু খরচা হলো।

লাবণ্য সভয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি রকম।

রকম আবার কি। ওর ওষুধ একই রকম। সুব্রত হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, তারপর গোটা-কয়েক ঘরে আগুন লাগাতেই, আর জনকতকের মাথা ফাটাতেই সব থেমে গেল।

স্বামীর অজ্ঞাতে লাবণ্য শিউরে উঠে চুপ করে গেল।

সুব্রত লাবণ্যর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এখন আবার নতুন ধোঁয়া উঠেছে জমিদার-প্রথা লোপ। হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

লাবণ্য বললে, কিন্তু এইসব মূর্খ নিরীহ প্রজা, এরা এসব শিখলে কোথা থেকে।

কেন শেখাবার আবার লোকের ভাবনা? কংগ্রেসের কতকগুলো হামবাগ্ আছে এখানে, তারাই যে ক্ষেপাচ্ছে ওদের।

লাবণ্য বিস্ময়াবিষ্টকন্ঠে প্রশ্ন করলে, এরকম ঘোর পল্লীগ্রামেও তাহলে কংগ্রেস কাজ করছে?

কাজ করছে বলো না, অ-কাজ করছে বলো। সিগারেটে জোরে টান দিতে গিয়ে সহসা ধোঁয়া গলায় আটকে কাশতে কাশতে সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে আবার ঘরে এসে সুব্রত লাবণ্যকে বললে, ওঃ হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, কাল-ই আমাকে সকালে গাড়ীতে কলকাতায় চলে যেতে হবে। বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে।

লাবণ্য বললে, সেকি! পরশু এখানকার মাইনর স্কুলে প্রাইজ—তোমার সেখানে সভাপতিত্ব করার কথা। তারপর রবিবার সন্ধ্যায় পাঠাগারে তরফ থেকে তোমায় মানপত্র দেওয়া হবে। তাছাড়া গার্লস্কুল, জনকল্যানসঙ্ঘ, সব জায়গা থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেছে—একদিন অন্ততঃ সেগুলো দেখতে যাওয়া উচিত, আর তুমি বলছো চলে যাব কাল!

কি করবো আমার বিশেষ কাজ, যেতেই হবে!

লাবণ্য বললে, আমার মনে হয় সেকাজ যত বিশেষই হোক, তার চেয়ে এ অনেক বেশী প্ররোজনীয়।

সুব্রত বললে, তার জন্যে তুমি ত রইলে।

লাবণ্যর শত অনুরোধসত্ত্বেও সুব্রত রইলো না। চলে গেল শহরে। লাবণ্য জানতো এই বিশেষ কাজের অর্থ কি! পল্লীগ্রামে বিলীতি মদ খাওয়ার অসুবিধা বলেই সুব্রত সেখান থেকে পালালো।

যাই হোক স্বামীর এই দুর্ব্বলতাকে গোপন ক'রে লাবণ্য একাই সভাসমিতি গুলোতে উপস্থিত হলো। কিন্তু মাইনর স্কুলে পুরস্কার বিতরণ করতে গিয়ে সেক্রেটারী মহাশয়ের রিপোর্ট শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেখানকার স্কুলের শিক্ষকদের সাতমাসের মাইনে বাকী। কেউ পঞ্চাশ, কেউ চল্লিশ, কেউ তিরিশ টাকা মাইনে পায়, তাও বাকী। দুর্ভিক্ষপীড়িত, শীর্ণকায়, সেইসব শিক্ষকদের দেখে তার চোখে জল এসে পড়লো। তার ওপর সম্পাদক মশায় যখন বললে যে জমিদারের তরফ থেকে যে সাহায্যটা স্কুলকে দেওয়া হতো তাও বন্ধ আছে একবছর, তখন লাবণ্য রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সভানেত্রীর বক্তৃতা দিতে উঠে লাবণ্য বললে, শিগ্গির যাতে স্কুল মাষ্টাররা

বাকী বেতনটা পান তার ব্যবস্থা আমি করবো।

সেদিন ম্যানেজার গোপনে লাবণ্যকে ডেকে বললে, আপনি করলেন কি—এত টাকা কোথা থেকে আসবে!

লাবণ্য বললে, জমিদারবাবুর মদের খরচা যেখান থেকে আসে, সেইখান থেকে এই টাকা আসবে।

ম্যানেজারবাবু একটু মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু বর্ত্তমানে এস্টেটের যে আয়, তাতে ও দু'টো খরচা একসঙ্গে দেওয়া অসম্ভব।

লাবণ্য ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে, তাবলে সারা গ্রামের যেটি একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাকে বঞ্চিত ক'রে মদের খরচ জোগাতে হবে! ম্যানেজারবাবু আপনি শিক্ষিত লোক—আপনার বিবেক কি এই কথা বলে?

ম্যানেজারবাবু এর উত্তরে কি বলবেন ভেবে না পেয়ে কণ্ঠস্বরকে আরো বিকৃত করে বললেন, কি করবো বলুন যার নুন খাই—

লাবণ্য তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, ম্যানেজারবাবু ওটা যে শিক্ষিত লোকের কথা নয়—এটা ত আপনি আমার চেয়ে ভালো বোঝেন। তবু বলি, যার নুন খান তার প্রতিটি কথা শুনে কাজ করেন?

একথার কোন জবাব সঠিক দিতে না পেরে ম্যানেজারবাবু এবার চুপ করে গেলেন।

এমন সময় হেডমাস্টারমশায় সেখানে এসে পড়লেন এবং হাতজোড় করে বললেন, আপনাকে আর একটু কষ্ট দেবো। আমাদের স্কুলের বোর্ডিংটায় একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।

ছিঃ ছিঃ কি যে আপনি যা তা বলেন! বলে লাবণ্য হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করলে।

না-না- যা-তা নয়, স্বয়ং মা অন্নপূর্ণাকে যে আজ আমরা পেয়েছি এখানে।

পথে যেতে যেতে লাবণ্য হেড মাষ্টারমশায়কে বললে, আচ্ছা এক বছরে মাইনে পাননি ত কাজ করেন কেন, ছেড়ে দিতে পারেন না?

লাবণ্যর কথা শুনে তিনি প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন! তারপর বললেন, ছেড়ে দেবো কাকে মা! তিরিশ বছর যে এই স্কুলটা নিয়ে পড়ে আছি। আমি ছেড়ে দিলেই গ্রামের ছেলেগুলোই মূর্খ হয়ে থাকবে—কে তাদের পড়াশুনা করাবে। এই পর্যন্ত বলে তারা চুপচাপে পথ হাঁটতে লাগল। দুজনেই যেন কোন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

চলতে চলতে একসময় হঠাৎ সে নীরবতা ভঙ্গ করে হেডমাস্টার বলে উঠলেন, আমার এক মাসতুতো ভায়েরাভাই কলকাতায় বড় চাকরী করে, সে ত কেবল লিখছে, কলকাতায় চলে এসো, এখন যুদ্ধের সময় চাকরীর ভাবনা হবে না। দেড়শো, দুশো টাকার একটা চাকরী জুটে যাবে।

এই বলে আবার একটু গিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠে হেডমাষ্টার বললেন,

ও:ত আমি কিছুতেই মত দিতে পারবো না।

লাবণ্য বললে, কিন্তু আপনারও ত চলা চাই ?

সে চলে যাবে কোন রকম করে ?

তার মানে স্কুলের মাইনেটা না পেলেও আপনার চলে, এই ত ? অর্থাৎ আপনার ঘরে ধানচাল আছে ?

আবার একবার তেমনি নির্মল হাসি হেসে তিনি বললেন, কথাটা সেইরকমই শোনায় বটে।

লাবণ্য বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, ওকথা বলার অর্থ।

হেডমাস্টারমশায় একটু চুপ করে থেকে বললেন, ধানচাল কোথায় পাবো মা—তবে আপনাদের আশীর্বাদে একরকম করে চলে যায় !

সেটা কি রকম মাষ্টারমশায়, একবার আপনার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছা করে। বলে লাবণ্য সহাস্যমুখে একবার তাঁর চোখের দিকে তাকালে।

মাষ্টারমশায় বললেন, একটা বিধবা মেয়ে থাকে বাড়ীতে, আর আমার এক আইবুড়ো ভাগনী আছে—তারা দুজনে অন্যের ধান ভেঙ্গে দেয়, তাতে করে দিন দেড় পালী করে চাল 'বানী' পায় তারা। আর আমি সকালে একটা তামাকের আড়তে খাতা লিখি, সেখানে পাই ন' টাকা এবং বিকেলে একটা মুদিখানায় হিসেব লিখে পাই বারো টাকা। এতেই কোন রকমে চলে যায় মা ! বলতে বলতে আবার তাঁর চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

একটু পরে তারা বোর্ডিংয়ের দরজায় এসে হাজির হলো। অতি জীর্ণ এক-খানা চালাবাড়ী, দরমার বেড়ার ওপর মাটি লেপে ছোট ছোট খুপরী তৈরী করা—তারি মধ্যে একটা ঘরে তিনজন চারজন করে ছাত্র থাকে। আসবাব বলতে ছেঁড়া মাদুর ও ময়লা কাঁথা, অধিকাংশ ঘরে কালিপড়া হ্যারিকেন লণ্ঠন ও আম-কাঠের বাক্স।

ছেলেদের একটা দল তখন খেতে বসেছিল রান্নাঘরে। হেডমাস্টারমশায় লাবণ্যকে সেখানে নিয়ে গেলেন। লাবণ্য তাদের খাদ্য দেখে অবাক হয়ে গেল ! লাল মোটা মোটা চালের ভাত, জলের মতো পাতলা একটা ডাল আর কুমড়োর খোসা চচ্চড়ি—আগের দিন রাত্রে যে কুমড়োর তরকারী হয়েছিল তারি খোসা।

সবচেয়ে রোগা ছেলেটাকে দেখিয়ে হেডমাস্টারমশায় সগর্বে বললেন, ওই আমার এ বছরের সেরা ছেলে, এবার মাইনর পরীক্ষায় জলপানি নিশ্চয়ই পাবে।

লাবণ্য ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পেট-জোড়া পিলে, হাত পা গুলো কাঠির মত সরু সরু, পাণ্ডুর বর্ণ চোখ দুটি কোটরাগত। ওই রোগা ডিগডিগে ছেলেটি, যার চোখ দুটো সমস্ত মুখের মধ্যে কেবল রাক্ষসের মত জ্বল জ্বল করছে, ওই পাবে জলপানি ! এই রকম খাদ্য খেয়ে কি করে স্মৃতিশক্তি থাকে, তাই তখন লাবণ্যর কেবলি মনে হতে লাগল। সেদিন সে চোখের জল

গোপন করতে করতে বাড়ী ফিরে এল।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে এসে কেবলি তার সেই স্কুলটির কথা, বোর্ডিংয়ের ছেলেদের কথা, মনে পড়তে লাগল! লাবণ্যর মনের মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে ভাবে, যারা জেলে যায় দেশের কাজ করতে গিয়ে তারা বড়, না যারা না খেয়ে আত্মত্যাগ করে শিক্ষার ক্ষীণ আলোকরশ্মিটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমস্ত রকম দুঃখ ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে, তারা বড়?

পরের শনিবার দিন মেয়েদের স্কুলের ছিল প্রাইজ! লাবণ্য তাতে সভানেত্রীত্ব করলে। সেখানেও সেই একই অভিযোগ! মাসিক কুড়ি টাকা করে সাহায্য পাওয়া যেতো কিন্তু জমিদার কয়েকমাস হলো তা বন্ধ করে দিয়েছেন। গ্রামের তিনচারটি বৃদ্ধের অনুগ্রহে স্কুলটি এখনো চলছে। তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে দেশের মেয়েদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখান। বলা বাহুল্য লাবণ্য তাঁদেরও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে।

গ্রামের লাইব্রেরীটির অবস্থা আরও মুমূর্ষু। তার সংস্কার করা অবিলম্বে প্রয়োজন। কাজেই সেখানে কিছু টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দিতে লাবণ্য কার্পণ্য করলে না। বরং তার ভগ্নদশা দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং বললে, যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন এই লাইব্রেরীটিকে প্রাণপণ সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। লাবণ্য বললে, স্কুল থেকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শুধু অন্ধকে চক্ষুষ্মান করে তোলার মত—কিন্তু সত্যিকারের পথনির্দেশ দেয় এমনি সব লাইব্রেরী মহা-মনীষীদের সারাজীবনের তপস্যা এসে মিলিত হয়েছে যেখানে—এ সেই জ্ঞানের পরম তীর্থ!

জনকল্যাণ সংঘের কর্তৃপক্ষরাও একদিন এসে লাবণ্যকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। এইটা হলো সত্যিকারের কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান। তারা বললে পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে নামটা তারা ওইরকম রেখেছে। ইতিপূর্বে যতবার তারা কংগ্রেসের নাম দিয়ে কিছু করতে গিয়েছে রাজরোষ তাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

লাবণ্য বললে, কিন্তু আসল কাজ তো এখানে কিছুই দেখছি না—চরকা কাটা, তাঁত বোনা?

একজন চুপিচুপি বললে, তার একটা পৃথক কেন্দ্র আমরা অল্পদিন হলো খুলেছি, সেখানে এখনি আপনাকে নিয়ে যাবো।

সেখানে গিয়ে লাবণ্য অবাক! এ যেন তারই হাতে গড়া, শঙ্করদার পরিকল্পিত সেই আশ্রম। তেমনি কর্মপদ্ধতি, তেমনি সব। এমন কি চরকা কাটতে কাটতে যে গানটি আশ্রমের ছেলেমেয়েরা গাইছে সেটাও সেই এক। এ-গানটা এরা এখানে কি করে পেলে? সেই কথা চিন্তা করার সঙ্গেই আগেকার সমস্ত স্মৃতিলাবণ্যর মনে পড়ে গেল। যেদিন শঙ্করদাকে নিয়ে সে আশ্রমটা দেখাতে গিয়েছিল সেদিনের মত এরাও ঠিক তাকে সেইভাবে অভ্যর্থনা করলে তুলোর মালা দিয়ে। এবার শঙ্করদার মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এবং চোখের

কোণে জল এসে পড়লো।

উদ্গত অশ্রু গোপন করে লাবণ্য বললে, এখানে এসে আমি এত খুশি হয়েছি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এ যেন আমার-ই কল্পনা, আমার কাছে আবার নতুনরূপে দেখা দিলে।

তারপর আপন মনেই ব'লে উঠলো, কিন্তু আমি ভুলিনি তাকে। একদিন শঙ্করদার কাছে লাবণ্য প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই কথাটাও তার মনে পড়ে গেল। 'আমি যেখানেই থাকি তোমার পরিকল্পনাকে সুসম্পূর্ণ করবোই।'

লাবণ্য বললে, আজ থেকে আমি আপনাদের এই আশ্রমের একজন কর্মী হলুম। আমার সাহায্য সবসময়েই আপনারা পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যর মনে পড়লো একদিন শঙ্করদা তাকে ব'লেছিল, 'তোমার পরিকল্পনা যেদিন সুসম্পূর্ণ হবে, সেদিন নিশ্চয়ই আমি আসবো যেখানেই থাকি না কেন?'

আশ্রমের কর্মীরা বললে, একজন নতুন কর্মী আমরা কিছুদিন হলো পেয়েছি তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে এটা গড়ে উঠেছে—তিনি বাইরে চ'লে গেছেন চাঁদা সংগ্রহ করতে। তার সঙ্গে আলাপ হলো না আজ আপনার।

আচ্ছা সে পরে হবে'খন। আমি ত আজ থেকে আপনাদেরই একজন হলুম! বলে সে বিদায় নিলে।

কিছুদিন পরে ম্যানেজারবাবু লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখুন কলকাতা থেকে মালিক কি লিখেছেন!

লাবণ্য পড়ে দেখলে সুব্রত লিখেছেন, একটা টাকাও যেন এস্টেট থেকে তার স্ত্রীকে দেওয়া না হয়। ওসব বাজে খরচা করার মত অবস্থা এখন তাঁর নেই।

ম্যানেজারবাবু মাথা চুলকে বললেন, এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি মা বলুন?

লাবণ্য কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, কিন্তু আমি যে সকলকে কথা দিয়েছি।

ম্যানেজারবাবু বললেন, হ্যাঁ তাঁরাও সব আমার কাছে কদিন ধরে এসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। আমি কেবল বড়বাবুর চিঠির উত্তরের আশায় তাদের ঘুরিয়ে দিচ্ছিলুম।

এই বলে একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহ'লে তাদের সকলকে ব'লে দেবো যে জমিদারবাবু নাকচ করে দিয়েছেন—

লাবণ্য গম্ভীর কণ্ঠে বললে, কিন্তু আপনার জমিদারবাবু ত এটাকা তাঁদের দেবার প্রতিশ্রুতি দেননি?

তাহ'লে? বলে যেমন বিস্মিতদৃষ্টি মেলে ম্যানেজারবাবু লাবণ্যর মুখের দিকে তাকালেন, অমনি লাবণ্য তার গলা থেকে একটা সোনার হার খুলে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, এটা আমার জিনিস, আপনি বিক্রী ক'রে সকলকে টাকা দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজারবাবু 'যে আজ্ঞে' বলে নমস্কার করে তখনি বিদায় নিলেন।

ম্যানেজারবাবু চলে গেলে চুপ করে লাবণ্য সেই চেয়ারটায় বসে রইল। স্বামীর এই অপমানের কথাটাই বোধহয় তখন তার মনকে পীড়িত করে তুলেছিল।

এর পরেই একদিন দুপুরে হঠাৎ সুব্রত এসে হাজির হলো এবং গম্ভীরস্বরে লাবণ্যকে বললে, এখনি কলকাতায় যেতে হবে, সব গুছিয়ে নাও।

এখনি? বলে লাবণ্য শুধু বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে তাকালে।

হ্যাঁ, এখনি, মানে বিকেলের গাড়ীতে।

লাবণ্য অনুযোগের সুরে বললে, এত তাড়াতাড়ি কি ক'রে হবে—জিনিসপত্র সব গোছ করে নিতে ত সময় লাগে? তুমি যদি একটু চিঠি লিখে আগে জানাতে!

ধমক দিয়ে উঠলো সুব্রত। বললে, কোন কথা শুনতে চাই না—আমি যা বলেছি তার একচুল এদিক ওদিক হবে না!

লাবণ্য এবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, একটা দিন পরে গেলে কি তোমার খুব অসুবিধে হবে?

সুব্রতর মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে বললে, তার কৈফিয়ত আমি তোমায় দিতে বাধ্য নই—আমার হুকুম এই—এখন যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছা, ব্যস্। বলতে বলতে সে পিসীমার ঘরের দিকে চলে গেল।

স্বামীর এই ক্রোধের কারণটা যে কোথায় তা অনুমান করতে লাবণ্যর এতটুকু দেরী হয়নি। তাই কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে বসে কি যেন ভাবলে। তারপর একটা কাগজ কলম নিয়ে দ্রুত একখানা চিঠি লিখে ফেললে—

জনকল্যাণসংঘ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিশেষ কাজেই আমাকে আজ কলকাতায় চলে যেতে হচ্ছে। তাই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনাদের শনিবারের সভায় উপস্থিত হতে পারবো না। আশাকরি এর জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। জানিনা আবার কবে আপনাদের এখানে আসবো। তবে যেখানেই থাকি নিজেকে আপনাদের সংঘের একজন কর্ম্মী বলেই মনে করবো। আপনাদের সংঘের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। নমস্কার।

ইতি,
সেবিকা
লাবণ্য দেবী

চিঠিখানার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লাবণ্য তাড়াতাড়ি খামের মধ্যে ভরে ফেললে। তারপর একটা চাকরকে গোপনে ডেকে তখনি সেটা পেঁছে দিয়ে আসতে বললে।

চাকরটা চিঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাবণ্য জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলে।

কিছুক্ষণ পরে চাকরটা এসে খবর দিলে. মা সেখানকার সম্পাদকবাবু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছেন।

কোথায় রে! এখানে এসেছেন নাকি? বলে লাবণ্য তাকে সভয়ে প্রশ্ন করলে।

চাকরটা বললে, হ্যাঁ মা, আমি তাঁকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি। বলে লাবণ্য তখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। পাছে আবার সুব্রতর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, মনে মনে এই আশঙ্কাটাই ছিল তখন তার বেশী। কিন্তু যেমন ঘরের দরজাটা ঠেলে ভেতরে পা দিয়ে 'নমস্কার' বলেছে, অমনি সহসা তার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কে! কাকে সে নমস্কার করছে!—এযে মতিবাবু! তাই মুহূর্তকয়েক হতভম্বের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লাবণ্য অস্ফুটস্বরে বললে, আপনি? আপনি এখানে?

মতিলাল ঈষৎ হেসে সগর্বে জবাব দিলে, আমি-ই ত এই সঙ্ঘের সম্পাদক। সেদিন আমাকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হয়েছিল জরুরী কাজে তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ তুমি চলে যাচ্ছো শুনে সঙ্ঘের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

লাবণ্য এবার বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কিন্তু এখানে আপনি কেমন ক'রে এলেন?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মতিলাল বললে, দেশের প্রতিষ্ঠান যখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল—

লাবণ্য তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, নষ্ট হয়ে গেল?

মতিবাবু বললে, হ্যাঁ. শিবনাথের উস্কানিতে পুলিশ লাগলো পেছনে। তারা সমস্ত ভেঙ্গে চুরে বাজেয়াপ্ত করে নিলে, তারপর গ্রামের সব যুবকদের ধরে নিয়ে গেল।

লাবণ্যর কণ্ঠস্বর এবার একটু তীব্র হয়ে উঠলো। সে বললে, তাই জন্যে বুঝি আপনি পালিয়ে এলেন, এখানে?

ইতস্ততঃ ক'রে মতিলাল বললে, না ঠিক তা নয়—তবে এখানকার জমিদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে শুনে, এখানে এসেই এই সঙ্ঘটা খুললুম। জানতুম যে একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবেই—শুধু তোমায় চোখে দেখতে পাবো এই আশায়।

মতিবাবু! বলে একটা ধমক দিয়ে লাবণ্য তাকে চুপ করিয়ে দিলে।

মতিলাল আর কি বলবে বোধহয় তাই ভাবছিল। তাই দু'জনেই মুহূর্তকয়েক নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে হঠাৎ লাবণ্য গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো, আশা করি আপনার ধন্যবাদ জানানো শেষ হয়েছে?

মতিলাল বললে, যাচ্ছি, তবে আমি প্রাণ দিয়ে এই সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবো জেনো। বলে একটু চুপ করে থেকে, শেষে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, আবার কবে এদিকে আসবে?

জানি না। বলে লাবণ্য তাড়াতাড়ি যেন নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁচল।

৯

কান্নার রোল ওঠে ঘরে ঘরে। কারুর নাতি, কারুর ভাই, কারুর ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এই নাকি তাদের অপরাধ, তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিকল করে দিতে চায়। ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ইংরেজ প্রভুরা তাই ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলে দেয়। কংগ্রেসের নাম গন্ধ পেলেই হলো! তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে জেলের অন্ধকার 'সেলে'। তাদের ওপর এইভাবে অমানুষিক অত্যাচার ক'রে তারা কংগ্রেসের গোপন তথ্য বার করবার চেষ্টা করে।

গভর্ণমেণ্টের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিবনাথ জব্দ করে দেয় গ্রামের সকলকে। পুলিশের কাছে গোপনে যারা সংবাদ যোগায়, তিনকড়ির দল তাদের ইন্ধন জুগিয়ে দেয়। এমনি করে অল্প দিনের মধ্যে শঙ্করের দলকে তারা নিঃশেষে বিনষ্ট ক'রে ফেললে। স্বদেশী আন্দোলনের যে ঢেউ গ্রামে উঠেছিল দেখতে দেখতে তা আবার যেন থেমে গেলো।

তিনকড়ি বুকে হাত ঠুকে বলে, কার সঙ্গে লাগতে এসেছিস্ এবারে দেখ—কে এবার শঙ্করের দলে যায় দেখি।

বৃটিশের রুদ্রনীতির তাণ্ডবলীলা সমস্ত দেশটাকে যেন লণ্ডভণ্ড করে দিলে। এতে বাইরে থেকে কংগ্রেসের কার্যকলাপ থামে বটে কিন্তু লোকের মনের মধ্যে তা যেন দ্বিগুণবিক্রমে গর্জে ওঠে।

হাতে পায়ে ধরে গ্রামের লোকেরা এসে তিনকড়ি ও শিবনাথের কাছে। কেউ বলে, দোহাই বাবা, আমার ছেলেটাকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে দাও। কেউ বা বলে তার ভাইকে, আর কেউ বা বলে তার নাতিকে।

তিনকড়ি বলে, কিন্তু এযে পুলিশের ব্যাপার, এখানে তাদের কিছুই করার নেই, তাছাড়া তাদের কথা পুলিশ শুনবেই বা কেন?

যাদের বলে, তারা কিন্তু কেউ সে কথায় কর্ণপাত করে না। তারা বলে, তোমরা ধনী, তোমরা হ'লে গ্রামের মাথা—তোমাদের কথায় পুলিশ ওঠে বসে আমরা জানি!

কিন্তু তারা এইভাবে যত শিবনাথের তোষামোদ করে তত সে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে মুখে প্রতিহিংসার হাসি খেলে যায়। এদের এত তোষামোদ পেয়েও কিন্তু শিবনাথের মন ভরে না, যারা তাকে অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে তাদের কাছ থেকে তার শতাংশের এককণা পাবার জন্যে যেন তার মন ছট্‌পট্ করে। সেই সীতেশ লাহিড়ী, মৃত্যুঞ্জয় ভট্‌চায প্রমুখ ব্যক্তিরা যারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য শিক্ষিত ও অভিজাত

বসে খাত, তাদের স্বীকৃতির জন্যে তখন তার মন কাঙ্গাল হয়ে ওঠে।

শিবনাথ ভাবে, তারা তো কেউ আসে না! তাদেরও তো ছেলে, ভাইপো প্রভৃতিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে! কেন তবে তারা আসে না তার কাছে সুপারিশ করতে?

এমনি সব চিন্তা করতে করতে এক একদিন তার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন শিবনাথ আর ঘরে থাকতে পারে না। বাইরে বেরিয়ে পড়ে একা। আত্মরক্ষার জন্যে একটা পিস্তল সে সর্বদা সঙ্গে রাখতো। গ্রামের লোকেরা যাতে ভালভাবে সেটা দেখতে পায় সেইজন্যে জামার ওপর সেটা ঝুলিয়ে নিয়ে সে বেড়াতে বেরোয়।

গ্রামের পথে বেরিয়ে কেবলি তার কৌতূহল হতো—সেই সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কেমন আছে—একবার নিজের চোখে দেখতে। তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে শিবনাথ গোপনে চলে যায়। রাত্রির অন্ধকারে লোকে তাকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু সে দেখে তাদের।

নীরব নিস্তব্ধ গ্রামখানা যেন শোকাচ্ছন্ন! কোথাও কোন চাঞ্চল্য কোন হাসির কোলাহলের চিহ্ন নেই। গ্রামের যুবক সম্প্রদায় ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং বেশীর ভাগ তখনো জেলে।

এই দেখে শিবনাথ মনে বেশ একটা সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চাঁপার মন্দিরের কাছে এসে পড়তে সেদিন সে চমকে উঠলো। দেখলে তার সংকীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে স্ত্রী পুরুষের ভীড়! কে একজন ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করছেন আর তাকে ঘিরে একাগ্রমনে সবাই শুনছে। এঁদের মধ্যে সতীশ লাহিড়ী, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, স্কুলের হেডমাষ্টার এবং গ্রামের গণ্যমান্য আরো বহু লোককে দেখে শিবনাথের মন এক প্রচ্ছন্ন ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো।

এই সব মহান ব্যক্তিদের শিবনাথ অনেক রকমে অনেকবার আমন্ত্রণ করেছিল কিন্তু কখনো তাঁরা কেউ তার বাড়ীতে পা দেয়নি! তবে কি চাঁপার স্থান সমাজে তার চেয়ে উঁচুতে? এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে তার সব রোষটা গিয়ে পড়ে চাঁপার ওপর।

চাঁপাকে জব্দ করার জন্যে তখন শিবনাথের মনে এক মতলব এলো।

পর দিন সকালে তিনকড়িকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, খুব শিগ্গির একটা মন্দির তৈরী করতে হবে।

তিনকড়ি তো অবাক্! শিবনাথের আবার এর মধ্যে ধর্মেকর্মে এত মতি গেল কোথা থেকে বুঝতে না পেরে সে প্রশ্ন করলে, মন্দির কি হবে? তিনকড়ি জানতো না, শিবনাথের মনে আসল ব্যথাটা কোথায়! শিবনাথ সকলের কাছেই সেটা গোপন রাখতো। এটা তার দুর্বলতা, এটা তার হীনমন্যতা! চাঁপাকে জব্দ করতে না পারলে এবং দেশের সব লোকেদের তার দলে না টানতে পারলে

তার যেন মনে আর শান্তি ছিল না।

কিন্তু তিনকড়ির কাছে সব গোপন ক'রে শিবনাথ শুধু বললে, সকলের একটা পুজো অর্চনা করার সুবিধা হয়. তাই মনে করছি শিগ্‌গির একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করবো।

তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, খুব ভাল প্রস্তাব এটা—আরো আগে এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। তাহ'লে বৃদ্ধরা খুব খুশী হতো! ওই চাঁপার মন্দিরে গিয়ে তারা চাঁপার গর্ব বাড়িয়ে দিতো না। তার মন্দিরে এই সব গণ্যমান্য লোকেরা যায় বলে অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না।

তাই নাকি! কৈ এসব তো এর আগে একদিনও তুমি বলোনি? বলে তিনকড়িকে শিবনাথ বরং একটু অভিযোগ করলে। যেন সে এসবের কিছুই খবর রাখে না।

যাই হোক কার্যকালে কিন্তু উল্টো ফল হলো। বহু অর্থব্যয়ে শিবনাথ মন্দির তৈরী করালে। কাশী থেকে রাধাকৃষ্ণের ভাল বিগ্রহ আনিয়ে তাতে প্রতিষ্ঠা করলে। তারপর কলকাতা থেকে বড় বড় নামকরা কীর্তনিয়া আনিয়ে, ভাল ভাল কথক আনিয়ে সেখানে কথকতা, কীর্তন গানের ব্যবস্থা করলে। কোনদিন বা কৃষ্ণযাত্রা, কোনদিন ভগবত পাঠ, কোনদিন কীর্তন, ভোগ মচ্ছব, এছাড়া নিত্য-সেবা তো আছেই। তার ওপর আবার বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে—জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, ঝুলন প্রভৃতিতে কলকাতার নামকরা যাত্রার সব দলকে বায়না করে আনে। সাতখানা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ে, মন্দির প্রাঙ্গণে স্থান সংকুলান হয় না। শিবনাথের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে সেখানকার আকাশ বাতাস।

শিবনাথের কানে কিন্তু সে সব ঢোকে না। তার চোখ সেই জনতার মধ্যে কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে ফেরে। তাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে তার মনটা অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। স্তাবকদলের সেই একই মুখ সেই একই ভাষায় যেন তার অরুচি ধরে গিয়েছে, আর ভালো লাগে না! বরং তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে শিবনাথের মন যেন এবার হাঁপিয়ে ওঠে। কেন তার এমন হয়! তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। চাঁপার মন্দিরে যারা ভীড় জমাতো তারাতো কেউ আসে না? এই প্রশ্নটাই বারবার তার মনকে পীড়িত ক'রে তোলে।

পয়সার জোরে অল্পদিনের মধ্যেই শিবনাথ গ্রামের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানগুলোর মাথার উপরে চড়ে বসলো। স্কুল, লাইব্রেরী, বালিকাবিদ্যালয়, ক্লাব, হাসপাতাল, দরিদ্রভাণ্ডার, অনাথ আশ্রম, প্রভৃতি যত কিছু প্রতিষ্ঠানের সম্মানিতপদ ইহলোকে মানুষের কাম্য তার প্রত্যেকটিই সে অধিকার করে ফেললে কিন্তু তবুও তার মনে শান্তি ছিল না। একটা কিসের ব্যথা যেন সর্বদা তার মনের মধ্যে কোথায় খচ্ খচ্ করে। গ্রামের যারা শিক্ষিত বিত্তবান ব্যক্তি তারা কেন তাকে দূরে সরিয়ে রাখে! তারা কেন ঠাকুর দেবতার পুজো উৎসবেও মন্দিরে আসে না!

আজ মিটিং, কাল বাৎসরিক উৎসব, পরশু পারিতোষিক বিতরণ, তার পরের দিন কোন সঙ্ঘের কোন অধিবেশন,—কত ফুলের মালা, কত অভিনন্দন, কত সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি, মুগ্ধ ভক্তদলের অযাচিত কত প্রশংসা শিবনাথের কানে মধু বর্ষণ করে অহরহ। কিন্তু তবু তার মন তাতে ভরে না। আরো কি যেন চায়। আরো কিসের আশায় তার মন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে!

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা; শিবনাথের মন্দির ফুলে লতায় পাতায় ঝলমল করছে। সানাইয়ের মধুর রাগিণী ক্ষণে ক্ষণে ভরে তুলছিল মন্দির প্রাঙ্গণ ও দিগ্‌বিদিগ্‌! লোকে লোকারণ্য। কত লোক আসে, কত লোক যায়। রাতে শুরু হলো কলিকাতার বিখ্যাত 'নদের নিমাই' গীতাভিনয়। সাতখানা গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো!

শিবনাথ চারিদিকে চোখ বুলিয়ে যেন কাদের খুঁজতে লাগল। শেষে একসময় নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চাঁপার মন্দিরের দিকে চললো। তার সমারোহের জৌলুষ চাঁপার উৎসবকে কতখানি ম্লান ক'রে দিয়েছে তাই একবার নিজে চোখে দেখবার জন্যে তার মন তখন কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

চাঁপার ছোট্ট মন্দির ও দীনতম আয়োজন—দূর থেকে দেখে মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলো শিবনাথ। কিন্তু কাছে যেতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল এবং চোখের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠলো। দেখলে গ্রামের গণ্যমান্য বহু লোক তার মন্দিরে ভীড় করে রয়েছে।

শিবনাথ আর স্থির থাকতে পারলে না সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে। সেখানকার আনন্দ কোলাহল সব যেন তখন তার কানে বিষ ঢালতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই শিবনাথ বেড়াতে বেরুল থানার দিকে। তারপর থানার বড় দারোগার কুশলসংবাদ নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে এক সময় কৌশলে জানিয়ে দিলে যে চাঁপার সেই মন্দিরে কতকগুলি লোক মিলিত হয়ে গোপনে কংগ্রেসের কাজ চালায়।

থানা থেকে তখনি চাঁপাকে হুমকী দিলে। যদি ফের তার মন্দিরে লোকজন সমবেত হয় তাহ'লে ওরা তাদের প্রতি চরম ব্যবহার করতেও ইতস্তত করবে না এবং মন্দির বন্ধ করে দেবে।

চাঁপার মন অত্যন্ত মুষড়ে পড়লো। মন্দিরে লোকজন আসা বন্ধ হ'য়ে গেল। একাকী চাঁপা ঠাকুরের সেবা করে দিন কাটাতে লাগল।

এই ভাবে চাঁপা জব্দ হওয়াতে শিবনাথ যেন মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে যেন কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলে চাঁপার। বিশেষ ক'রে সে নিজে চাঁপার কোন অনিষ্ট করতে পেরেছে এ কথা চিন্তা করেই শিবনাথ সবচেয়ে বেশী উল্লসিত হয়ে ওঠে। কেন এমন হয় তা বোধকরি অন্তর্যামি ছাড়া আর কেউ জানে না। যেখানে শিবনাথের চরম অপমান, কেন সেখান থেকে সে চায় পূজা—খ্যাতি প্রতিপত্তি এত পেয়েও কেন চাঁপার মত একটা সামান্য মেয়ের

কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়নি বলে শিবনাথের অন্তর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে? গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে হীন-চোখে দেখে বলে কেন তার মনে হয় সব পাওয়া অসম্পূর্ণ—সব পাওয়া ব্যর্থ।

এক একদিন শিবনাথের মন এই চিন্তায় যেন অস্থির হয়ে ওঠে। ঘর থেকে ছুটে সে বাইরে আসে। তারপর একাকী ঘুরে বেড়ায় কখনো মাঠে, কখনো নদীর ধারে, কখনো বা গ্রামের নির্জন পথে পথে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে চাঁপার মন্দিরের কাছে এসে পড়েছে! কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে এলো তা সে ভাবতেই পেলেনা। তবুও থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করবে—এগবে কি পেছবে? এগুলে যদি চাঁপা তাকে দেখতে পায়! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন শিবনাথের বুকটা কেঁপে ওঠে। তখন সে ফিরে যাওয়া স্থির করে। কিন্তু যে-ই পা বাড়াতে যায় অমনি মনের কোণে একটা দারুণ বাসনা জাগে—ভাবে চাঁপা কি করছে একবার চুপি চুপি দেখে চলে যাবে।

তাই ধীরে ধীরে সে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়।

রাত তখন খুব বেশী হয়নি। কিন্তু গ্রামের পথ ঘাট সব যেন নির্জন। মন্দিরের বিপরীত দিকে যে উঁচু গাব গাছটা নিস্তব্ধ হয়ে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ছিল তার মাথার ওপর থেকে তখন এক টুকরো ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে পড়েছিল মন্দিরের ঠিক ফটকটার সামনে।

শিবনাথের বুকের মধ্যেটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে—চোরের মত নিঃশব্দে সে গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়।

চাঁপা একমনে তার বিগ্রহকে ফুলের মালা দিয়ে সাজাচ্ছিল আর মুখে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে কি একটা ভজন গান গাইছিলো। শিবনাথের দিকে সে পিছন ফিরেছিল, তাই বুঝতেই পারেনি যে একজন নীরবে তার দিকে চেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায় শুধু নিঃশব্দে। চাঁপার এত কাছে এসেও শিবনাথ যেন কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। কি বলে ডাকবে চাঁপাকে ভেবে পায় না। একবার মনে করে দরকার নেই, তার চেয়ে পালিয়ে যাই, যেমন নিঃশব্দে এসেছি তেমনি ভাবে। শেষে মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে করতে একসময়ে পকেট থেকে একমুঠো টাকা নিয়ে ছুঁড়ে দিলে সে বিগ্রহের সামনে। সিমেণ্টের মেঝেয় পড়ে টাকাগুলো ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠতেই চমকে ফিরে দাঁড়ালো চাঁপা। কিন্তু সামনে শিবনাথকে দেখেই তার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। সে আর কালবিলম্ব না করে তখনি সেই টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়িয়ে ফেলে দিলে সামনের জঙ্গলটার মধ্যে।

মুখের ওপর এইভাবে আর কেউ অপমান করলে শিবনাথ কি করতো ভাবতে গেলে ভয় হয়। কিন্তু চাঁপার বেলায় সে যেন হঠাৎ কেমন জড় হয়ে গেল।

এতবড় অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া দূরে থাক নিঃশব্দে সব যেন হজম করলে। শুধু একটু পরে ক্ষীণকণ্ঠে সে একবার মাত্র জিজ্ঞেস করলে, ফেলে দিলে যে আমার টাকা?

চাঁপা ঠাকুর সাজাতে সাজাতে পেছনে ফিরেই উত্তর দিলে, ও তো দেবপূজার কোন কাজেই লাগবে না, তাই।

এবার শিবনাথের মনে কি হলো কে জানে। সে আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। 'ও' বলে শুধু মুখে ছোট্ট একটি শব্দ করেই দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করলে। কিন্তু যত যায় ততই যেন চাঁপার সেই কথাটা ভূতের মত পিছনে পিছনে ফেরে। তার কাছে লজ্জা ঘৃণা ভয় অপমান কিছু নয়, তার চেয়েও শতগুণ বেশী কিসের এক গ্লানি তার সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

সে দেবতা মানে না, বিগ্রহ মানে না, সে ধর্মাধর্ম কোন কিছুর ধার ধারে না, সে নাস্তিক। তবু তার মনে চাঁপার সেই কথাটায় এমন প্রতিক্রিয়া হয় কেন, তা শিবনাথ নিজেই বুঝতে পারে না। তার পয়সায় দেবতার কোন পূজা হবে না! একথাটা ভাবতে গেলেও কেন তার মনের গোপন কোণে কিসের ব্যথা জাগে? কিন্তু কেন এমনটা হয় শিবনাথ ভেবে পায় না। বাইরে থেকে মনকে যত দৃঢ় করতে যায় তত পাথরের বুকে ফাটলের মত কোথায় যেন একটা দাগ থেকেই যায়। লোকের চোখ সেখানে গিয়ে না পড়লেও তা যে ধ্রুব তা যে সত্য, সে ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তাই পথ চলতে শিবনাথ যুক্তির পর যুক্তির ঘা মেরে মনটাকে একসময় কঠিন করে তোলে—তার মনে হয় কে এই চাঁপা? একটা অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, কি এসে যায় তার কথায়! পর মুহূর্তেই মনে হয় এত অহঙ্কার চাঁপার কিসের! কোন সাহসে সে তাকে এমন করে অপমান করে? মৃত্যুঞ্জয় ভট্চাজ, সীতেশ লাহিড়ীর দল-ই তো ওর সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা চাঁপাকে এমনি ভাবে মাথায় তুলেছে। তা না হ'লে চাঁপার আজ এতদূর স্পর্ধা হবে কেন? অথচ একদিন এই চাঁপাই ছিল তার সব চেয়ে আপন! থাক। সেদিনকার সেই সব পুরোনো স্মৃতি, মনে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে তার চোখ দুটো সহসা জ্বলে উঠলো।

শিবনাথ তখনি থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে, তারপর আবার ফিরে গেল চাঁপার মন্দিরে।

চাঁপা তখন তেমনি করে আপনার বিগ্রহকে সাজাচ্ছিল। পিছন থেকে সহসা শিবনাথের কণ্ঠ কানে যেতে সে সচকিত হয়ে উঠলো।

আচ্ছা আমার পয়সা দেবতার পূজায় লাগবে না কেন বলতে পারো? শিবনাথ প্রশ্ন করলে।

চাঁপা বললে, সে কথাটা কি এখনো আপনাকে বলে দিতে হবে? নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন, ভাল করেই জানতে পারবেন।

সহসা যেন চমকে ওঠে শিবনাথ। তারপর একটু থেমে আবার বললে, কথাটা আর একটু খুলে বললে ভাল হয়।

চাঁপা এবার কঠিনস্বরে বললে, শিবনাথবাবু, পয়সার জোরে আপনি যা নয় তাই হতে পারেন—লোককে ঘুষ দিয়ে তাদের মুখে নিজের জয়গান শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, এমন কি সমাজেও দশের কাছে নিজেকে বড় বলে জাহির করতে পারেন কিন্তু তবু নিজের মনকে কি ফাঁকি দিতে পারেন?

অকস্মাৎ কেন জানি না শিবনাথের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ্ বোলাতে বোলাতে সে প্রশ্ন করে, তার মানে!

চাঁপা বললে, তার মানে অত্যন্ত সহজ। আপনি মনে করছেন খুব উঠছেন কিন্তু এদিকে যত উঠছেন ওদিকে তত যে নেমে যাচ্ছেন তা বোধ হয় এখনো বুঝতে পারছেন না। আপনি যাকে আজ ভাবছেন জয়, তা যে আপনার কত বড় পরাজয় তা বোধ হয় এখনো বুঝতে পারেন নি। এই পর্যন্ত বলে চাঁপা একটু থামলে। তারপর আবার শুরু করলে, বুঝতে একদিন নিশ্চয়ই পারবেন কিন্তু যখন পারবেন তখন আর সময় থাকবে না! সেদিন জানতে পারবেন যে কি করেছেন। আপনার দুষ্কৃতি—যত কিছু পাপ, যত অন্যায় অত্যাচার সব যে ছায়ার মত আপনার সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ক'রে চলেছে তা বাইরের জগৎ না বুঝলেও আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন। বাইরের লোককে ঘুষ দেওয়া যায় কিন্তু যে মানুষ আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বাস করছে তাকে কি করবেন? সে যে আপনার সত্য পরিচয়। আপনার সকল দুষ্কৃতির চরম সাক্ষী! দুঃস্বপ্নের মত সে যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে অহোরাত্র, ঘরে ও বাহিরে—তাকে ফাঁকি দেবেন কি করে!

মিথ্যে কথা! শিবনাথ চেঁচিয়ে উঠলো।

কঠিন স্বরে চাঁপা বললে, কার কথা মিথ্যা যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিনেরও আর খুব বেশী দেরী নেই!

বুকের মধ্যে থেকে কিসের একটা ব্যথা ঠেলে উঠে শিবনাথের গলা চেপে ধরতে লাগল! তৃষ্ণায় তার কণ্ঠ যেন বুজে আসতে থাকে। চাঁপা এত সত্য কথা কি ক'রে জানলে? কি ক'রে সে শিবনাথের কথা বুঝলে? তবু সে অন্তরের সেই সত্য গোপন ক'রে বললে, তোমার মুখ থেকে উপদেশ শুনতে আমি আসিনি—চুপ করো! বলে সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে সরে পড়লো!

চাঁপা বললে আমি চুপ করলেও যা সত্য তা কোনদিন চুপ ক'রে থাকবে না। সেদিন আপনি নিজেই সব বুঝতে পারবেন।

মুখে যতই শিবনাথ চাঁপার কথাগুলোকে উড়িয়ে দিক তার মনের মধ্যে কিন্তু সেইগুলো কেবলই ঘুরপাক খেয়ে মরতে থাকে। চাঁপা যেন তার মনে কি এক অসন্তোষের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে তাদের যত তাড়াতে চেষ্টা করে

কিছুতেই পারে না। খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে মনকে ডুবিয়ে রাখে, কিন্তু তবু নিষ্কৃতি পায় না তাদের হাত থেকে। পালিয়ে যায় শিবনাথ পরিচিত জায়গা থেকে কিন্তু তাতেও সুবিধে হয় না। এর প্রতিক্রিয়া হয় সর্বদা ! তার অবচেতন মন যেন দিনরাত কি চিন্তা করে !

স্বামীর এই মানসিক পরিবর্তন ইদানীং জ্যোৎস্নার চোখে বড় বেশী ধরা পড়ে। সে একদিন শিবনাথকে বললে, তুমি আজকাল দিনরাত কি এতো ভাবো বলতো !

শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, জানি না।

জ্যোৎস্না বললে, জানিনা বলে গোপন করবার চেষ্টা করলে আমি শুনবো না। আমায় বলতেই হবে ! বিশেষ করে দেখি দেশ থেকে ফিরলেই তোমার এই চিন্তা যেন বাড়ে। দেশে কি আছে বলো তো ? আর যদি এতই ভাবনার কিছু থাকে তো যাবার দরকার কি সেখানে ! এমন নয় যে সেখানে না গেলে তোমার মুখে অন্নজল উঠবে না ?

শিবনাথ হ্যাঁ বা না কিছুই বললে না। শুধু তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল ! তার মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে বললে, কি হয়েছে বলো না গো ?

জানিনা। বলে শিবনাথ জ্যোৎস্নার হাতটা তার মাথার মধ্যে থেকে সরিয়ে দিলে।

একটু অপেক্ষা করে আবার জ্যোৎস্না যেমন তার হাতটা সস্নেহে শিবনাথের মাথায় রাখলে অমনি সে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, দোহাই তোমার আমায় একটু একা থাকতে দাও !

জ্যোৎস্না এবার নীরবে সেখান থেকে চলে গেল।

১১

স্বামীর এই ভাবভঙ্গী দেখে জ্যোৎস্নার মনে সন্দেহ ক্রমশই বাড়তে থাকে। শেষে একদিন সে গোপনে নিজেই দেশে গেল তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে। আগে জ্যোৎস্না এই পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করতো বলে কোনদিন সেখানে যায় নি। ইদানীং আবার যেতে চাইলেও বেশ বুঝতে পারতো যে শিবনাথ পছন্দ করে না। তাই শিবনাথ যখন কি একটা জরুরী কাজে আটদিনের জন্য দিল্লী গেল তখন জ্যোৎস্না চাকরকে সঙ্গে করে দেশে বেড়াতে গেল।

দেশে গিয়ে শিবনাথের কীর্তিকলাপ দেখে অবাক হয়ে গেল জ্যোৎস্না, সত্যই সেখানকার লোকের জন্য সে কত করেছে ! দশের মুখে বারবার স্বামীর গুণগান শুনতে শুনতে গর্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিবনাথের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে দেশের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, তার প্রতিষ্ঠিত

হাসপাতালে দেশের লোকেরা চিকিৎসিত হচ্ছে, মন্দিরে নিত্য দেবপূজোর সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণের সেবা চলেছে। যেদিকে চায় দেখে তার স্বামীরই জয়ধ্বজা উড্ডীন। তবে শিবনাথ কেন এমন মুখভার করে থাকে এখান থেকে ফিরলে, জ্যোৎস্না তা বুঝতে পারে না। যেখানে তারই মহিমা কীর্তিত হচ্ছে সেখান থেকে ফিরে কেন তবে তার মনে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হয়! জ্যোৎস্না অনেক খোঁজ করে কিন্তু কোথাও এমন কিছু পায় না যা নাকি শিবনাথের মনোব্যথার কারণ হতে পারে।

কিন্তু ফিরে আসবার দিন অকস্মাৎ এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। ভোরের দিকে নদীর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে অনেকদূর গিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্না। ফিরছে, এমন সময় একজন দুঃস্থ লোক, জীর্ণ শীর্ণ বেশে তার সামনে এসে হাত পাতলে। বললে, জয় হোক মা জননী, গরীব ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দাও মা!

থমকে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না তার রুমাল থেকে একটা সিকি বার করে তার হাতে দিয়ে বললে, এই নাও।

ধনে পুত্রে তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক মা, বলে আশীর্ব্বাদ করে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যোৎস্না বললে, খেতে যদি চাও তো ওই মন্দিরে দুপুরে যেয়ো, ওখানে দরিদ্র আতুর যে যায় তাকে খেতে দেয়।

রামো, ঐ চণ্ডালের অন্ন খেতে যাব আমি! আমি যে ব্রাহ্মণ, এখনো গায়ত্রী না করে মুখে জল দিই না মা!

চণ্ডালের অন্ন! জ্যোৎস্নার কানে হঠাৎ কথাটা বড় বাজলো। সে বললে, দেব মন্দিরের ভোগ আরো কত লোক তো খায়, তাতে দোষ কি?

দেবমন্দির বটে কিন্তু ওতে দেবতা নেই মা! যত গরীবের চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাস যে জমাট হয়ে আছে ওই পাষাণ-প্রতিমায়। কোনদিন ওই বিগ্রহের মুখে কি প্রসন্ন হাসি দেখেছিস মা? ও যেন কাঁদছে—নিখিল বিশ্বের হাহাকার যেন ওর চোখে মুখে! হবে না, এত অধর্ম সহ্য হবে কেন? এখনো চন্দ্র সূর্য উঠছে!

জ্যোৎস্না বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, অধর্ম?

ব্রাহ্মণের সেই শুকনো তোবড়ানো মুখটা সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠলো। সে বললে, আমার এই বাষট্টি বছর বয়েস হলো মা, আমি মিথ্যা বলছি না।

জ্যোৎস্না বললে, কিন্তু লোকে যে—

লোকের কথা ছেড়ে দাও মা! গরীব দেশ, দুবেলা দু-মুঠো ভাত তাদের জোটে না। তাদের কাছে আর বেশী কি আশা করতে পার মা! তাই দুমুঠো যে খেতে দেয় তারি গুণগান করে! তবে আসল ব্রাহ্মণ যারা তারা কেউ ও অন্ন ছোঁয় না।

জ্যোৎস্না ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কেন?

সেসব অনেক কথা, থাক মা—আর সে শুনে তোমার কি লাভ হবে! আঁচল

থেকে আরো দু'আনা পয়সা খুলে তার হাতে দিয়ে জ্যোৎস্না বললে, লাভ অবশ্য কিছু হবে না তবে আপনি যখন কথাটা তুললেন তখন শুনতে কৌতূহল হয়!

ব্রাহ্মণ তখন সাড়ম্বরে বলতে শুরু করলে,—মানুষের পরিচয় তার আচার আচরণে মা, নইলে পয়সা তো মেথর মুদ্দফরাসেরও আছে। তাইত যখন লোকে 'শিবনাথবাবু শিবনাথবাবু' বলে তখন মনে মনে হাসি! ভাবি হায়রে পয়সা! কালে কালে আরো কত কি দেখতে হবে। নারায়ণকে তাই ডাকি, নারায়ণ নাও, আর সহ্য হয় না, চার পোয়া কলি পূর্ণ হয়েছে! এবার মহাপ্রলয় হবে দেখে নিয়ো মা—আমি ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী না ক'রে মুখে জল দিই না, আমার কথা মিথ্যে হবে না। মা ধরিত্রী আর কলঙ্ক বহন করতে পারছে না! তা নাহ'লে আস্তা কুঁড়ের আবর্জনা কিনা আজ এইভাবে সমাজের মাথায় চড়ে বসে?

জ্যোৎস্নার মুখ নিমেষে যেন বিবর্ণ হয়ে উঠলো। ব্রাহ্মণের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, সে বলার আনন্দে তখনো বলে চলেছে—এই শিবু কি না করেছে—চুরি, জুয়াচুরি, বদমায়েশি, নেশাভাঙ—

জ্যোৎস্না বললে, কিন্তু এ আপনি কার কথা বলছেন!

তুমি যার কথা শুনতে চাইছো তার কথা?

জ্যোৎস্না বললে, কিন্তু তিনি তো লেখাপড়া জানেন, শিক্ষিত, বড় বড় লোকের সমাজে মেশেন!

ব্রাহ্মণ ঈষৎ থেমে বললে, বড় লোকের সমাজ? হ্যাঁ তার মত বড় লোকের তো অভাব নেই দেশে মা! তারপর আবার শুরু করলে, শিবু লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বখাটে ছেলের দলে নেশাভাঙ খেয়ে বেড়াতো। শেষে পাড়ার একটা মেয়ের ওপর যেদিন অত্যাচার করলে সেদিন আর লোকে সহ্য করলে না। বেশ ক'রে মার দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না এবার দু'হাতে তার কান চেপে ধরে বললে, চুপ—চুপ করুন—

শোনো মা এখনো ত কিছুই হয়নি—এইত সবে শুরু—

জ্যোৎস্না অস্ফুট কণ্ঠে বললে, না—না—থাক—আর শুনতে চাই না।

ঠাকুরমশায় বললে, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? যদি বিশ্বাস না হয় তো গ্রামে আরো লোক আছে, তাদের জিজ্ঞেস করবে, আমি ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী না ক'রে কোনদিন মুখে জল দিই না, আমি তোমায় মিথ্যা বলছি না মা।

জ্যোৎস্না বললে, আমি তো তা বলিনি ঠাকুর।

তা বলবে কেন মা, তুমি যে ভদ্দর লোকের বউ! আমি কি মানুষ চিনি না! এই বাষট্টি বছর বয়সে অনেক দেখলুম। বলে আবার শিবনাথের প্রসঙ্গে ফিরে এলো। বললে, তারপর এই শিবু যুদ্ধ লাগতে শুরু করলে চুরি নয় ডাকাতি, সরকারের ঘরে—দেশে বিদেশে ঘুরে যুদ্ধের সময় সরকারের কাজে চুরি করে অনেক টাকা ক'রে ফেললে। তারপর ধরলে কালোবাজার। আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মরে গেল। এখানকার সমস্ত চাল তিন ডবল, চার

ডবল দামে অন্যত্র চালান দিয়ে ও লক্ষপতি হলো। বলতে বলতে ব্রাহ্মণের গলা ভেঙ্গে এলো—আমার দু'টি ছেলে মা না খেতে পেয়ে সেই মন্বন্তরে মারা গেল। আজও গ্রামের ঘরে ঘরে কান্না থামেনি আবার তারই ষড়যন্ত্রে দেশের সব ছোকরারা যারা কংগ্রেসের কাজ করতো এখনো জেলে পচে মরছে—তাদের অপরাধ তারা তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করেনি—

বুঝেছি। বলে জ্যোৎস্না সহসা তাকে থামিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেল।

পথে চলতে চলতে কেবলি তার মনে হতে লাগল ব্রাহ্মণ যা বললে তা কি সত্যি! সত্যি কি তার স্বামীর এইরকম চরিত্র! সে এইভাবে পয়সা উপার্জন করছে! না-না-তা হতে পারে না! তা কি সম্ভব? এক একবার তার মনে কেমন সন্দেহও জাগে। শিবনাথ সর্বদা কি যেন একটা তার কাছে গোপন করার চেষ্টা করে। শিক্ষা-দীক্ষার যে ভাণটা সে করে সব কি তবে ভুয়ো! আবার ভাবে তাই যদি হয় তবে সে দেশে বারবার আসে কেন? এখানকার লোক নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে তা না'হলে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য এত পয়সা সে ব্যয় করবে কেন? ব্রাহ্মণের হয়ত তার স্বামীর ওপর কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে, তাই এইভাবে লোকের চোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে।

এমনি করে সেই কথাটা নিয়ে মনের মধ্যে নানাভাবে তোলাপাড়া করতে করতে জ্যোৎস্নার মনে হলো কিন্তু মিছিমিছি একটা লোকের নামে এইভাবে কলঙ্ক রটিয়ে সেই ব্রাহ্মণেরই বা কি লাভ! তাই সে স্থির করলে নিজের পরিচয় গোপন ক'রে এই কথাটার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার জন্যে আরো দু'চার জনের কাছে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্য, যেখানে জ্যোৎস্না ভয়ে ভয়ে শিবনাথবাবুর কথা উত্থাপন করলে সেখান থেকেই সেই রকম উত্তর সে পেলে। বরং আরো বেশী কিছু তাদের কাছ থেকে সে শুনলে। চাঁপার নামটাও এবার তার জানতে বাকী রইল না।

ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে জ্যোৎস্নার যেন মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। এই তার স্বামীর পরিচয়? এত নীচ, এত হেয়? ভাবতে গেলে তার মাথা যেন গরম হয়ে উঠে! অথচ এর সমস্তটা গোপন ক'রে নিজেকে শিবনাথ কিভাবে তার চোখের সামনে বড় ক'রে তুলে ধরেছিল! অদ্ভুত শয়তান! সে আর চিন্তা করতে পারে না। মুর্খ, লম্পট, লেখাপড়া জানেনা, লোকের সর্বনাশ ক'রে পয়সা উপার্জন করে এই তার স্বামী! এই লোকের সে স্ত্রী! জ্যোৎস্নার যেন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছিল।

শিবনাথের সম্বন্ধে এই রকম সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে জ্যোৎস্না কলকাতায় ফিরে এলো।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়ে যখনই শুনলে শিবনাথ দিল্লী থেকে ফিরেছে দু'দিন আগে, তখনই-ই তার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠলো। আট'দিন তার দিল্লীতে থাকার কথা এখনো দু'দিন বাকী—এরমধ্যে সে কি ক'রে ফিরে এলো! ভাবতে

ভাবতে সে ঘরের দিকে যাচ্ছে এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়ালো শিবনাথ। তার মুখের রেখা কঠিন ও চোখের দৃষ্টি ক্রুর !

স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিষাক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জ্যোৎস্নাও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুহূর্ত-কয়েক এইভাবে কেটে যাবার পর শিবনাথ বললে, দেশে গিয়েছিলে কেন ?

জ্যোৎস্না বললে, কেন আমাকে কি সেখানে যেতে নেই ?

শিবনাথ বললে, আছে। কিন্তু আমাকে গোপন করে এইভাবে যাবার অর্থ কি ?

জ্যোৎস্নার চোখ দুটো এবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, সে অর্থ আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো।

শিবনাথ এবার ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, জানি, তুমি আমায় অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করো—আমার কোন কিছুই তোমার ভালো লাগে না—প্রত্যেক কাজের মধ্যে থেকে ছল ধরার চেষ্ট করো, আর শুধু তুমি কেন, তোমার বাপ মা ভাই বোন সকলেরই দেখি মনের ভাব সেই রকম ! আমি যা করি তাতেই কেমন একটা সন্দিগ্ধভাব ! যেন আমার পক্ষে সবই অশোভন ! আমি মূর্খ অশিক্ষিত ! তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললে, চুপ ক'রে থাকি বলে মনে ভাবো বুঝি তোমাদের মনোভাব আমি বুঝতে পারি না ?

জ্যোৎস্নার মুখ চোখ নিমেষে যেন কালো হয়ে উঠলো। সে বললে, ছিঃ তুমি এত নীচ তা আমি জানতুম না !

এর জবাবে শিবনাথ বললে, এখন ত আমি নীচ হবোই—আর শুধু নীচ কেন, আরো কত কি এবার শুনতে হবে !

জ্যোৎস্না আর কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। শিবনাথ তৎক্ষণাৎ তার পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, চলে যাচ্ছো যে ? আমার কথার জবাব দিয়ে যাও আগে ?

জ্যোৎস্না পাথরের মত কঠিন দৃষ্টিতে একবার শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সে জবাব তো তুমি নিজেই দিয়েছো।

ঠাট্টা নয় জ্যোৎস্না, আমি জানতে চাই, কেন তুমি দেশে গিয়েছিলে গোপনে ?

যদি তার উত্তর না দিই ?

তাহ'লে বুঝবো আমি যা অনুমান করেছি তাই সত্যি।

জ্যোৎস্না কোন উত্তর না দিয়ে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল।

শিবনাথ বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হতে লাগল তাহ'লে হয়ত সবই জেনেছে জ্যোৎস্না—তাই আমার মুখের ওপর সে কথা বলতে পারলে না। আবার মনে হলো, না তা হয়ত নয়, তা যদি জানতে পারতো তাহলে তাকে অন্ততঃ একবার জিজ্ঞেসও করতো। কিন্তু সে আবার ভাবে জিজ্ঞেস

করবার অবসর তো সে তাকে দিলে না। আবার ভাবে সে ভালই করেছে সে-অবসর না দিয়ে—স্ত্রীর মুখ থেকে ওসব কথা শুনে তারপর আবার তার সঙ্গে ঘর করা কি সম্ভব হতো তার? কিন্তু এত গম্ভীর কেন জ্যোৎস্নার মুখ! তবে কি জানতে পেরেছে আমার আসল পরিচয়? না—না—

শিবনাথ কোনমতে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

এধারে জ্যোৎস্না সেদিন থেকে নিজেকে যেন স্বামীর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখে। যদি বা শিবনাথ নিজে থেকে কাছে এসে দাঁড়ায়, দেখে কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য একটা দূরত্বের সহজ ব্যবধান রচনা ক'রে রেখেছে জ্যোৎস্না। কিছুতেই যেন আর সে সহজ হ'তে পারে না।

জ্যোৎস্না আজকাল দিন রাত বই পড়ে। শিবনাথের বইয়ের অভাব ছিল না, পড়ুক না পড়ুক, ভাল ভাল বই কিনে আলমারী সাজিয়েছিল। জ্যোৎস্না এখন সেই সব বইয়ের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজবার চেষ্টা করে, তার পাতার মধ্যে সে যেন তার আহত অপমানিত অন্তরের সান্ত্বনা খোঁজে।

শিবনাথ কিছু রসিকতা করতে গেলে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সে শুধু বলে, ভাল লাগে না রঙ্গরস, চুপ করো।

একদিন শিবনাথ তার বইটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, কেন ভাল লাগে না—স্ত্রীর সঙ্গে কি স্বামীর রঙ্গরসের সম্পর্ক নয়? কেন তুমি এমন নিস্তব্ধ হয়ে থাকো আমায় বলতে হবে!

জ্যোৎস্নার মুখটা এবার পাথরের মত কঠিন ও ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু স্তব্ধভাবে শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে সে বসে থাকে।

শিবনাথ তার হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, কি হ'য়েছে আজ বলতেই হবে!

জ্যোৎস্না যেন পাষাণ-প্রতিমার মত স্তব্ধ ও নিস্পন্দ। তবু তার সুস্থির চোখ দু'টো ভেদ ক'রে যেন স্রোতস্বিনীর ধারা ছুটে বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু হৃদয়ের কঠিনতম সংযম দিয়ে সে তার বেগ প্রতিরোধ করতে করতে শুধু ছোট্ট দুটি কথা উচ্চারণ করে, জানি না।

এ তার অভিমান নয়, এ তার দুঃখ নয়, এ তার ঘৃণাও নয়! এ যে তার কি, তা জ্যোৎস্নার ভাষায় প্রকাশ করারও বুঝি ক্ষমতা নেই। যে তার স্বামী, যাকে সে ভদ্র, উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মনে ক'রে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবতো সে যে একটা প্রতারণার জাল বিস্তার ক'রে তাকে ঠকিয়ে এসেছে এতদিন একথা জানতে পারার পর তাকে সে কি বলবে ভেবে পায় না। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে, মিথ্যা, ভণ্ডামী, প্রতারণাকে চিরকাল ঘৃণা করেছে আবর্জনার মত। তাছাড়া নিজেও রীতিমত লেখাপড়া শিখেছে এখন তার পক্ষে শিবনাথকে মেনে নেওয়া বা না নেওয়া একটা সমস্যা বৈকি!

ভাবে—দিনরাত—শুধ ভাবে জ্যোৎস্না সেই একই কথা! ভেবে ভেবে সে

কোন কুল কিনারা পায় না—অথচ স্বামীর দুর্নামের কথা কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রেও মনটা হালকা করবে, বা তার কোন প্রতিকার করবে, সে উপায়ও নেই। স্বামীর অপমান যে তার-ই অপমান, একথা তার চেয়ে বেশী আর কে বোঝে!

এমনিভাবে মন গুমরে থাকতে থাকতে তার দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া, সব বন্ধ করে দিলে সে একে একে। শেষে হঠাৎ একদিন জ্যোৎস্না কঠিন রোগে পড়লো। বড় বড় ডাক্তার আসে। মোটরের পর মোটরের ভীড় গেটে জমে যায়। বহু চিকিৎসার পর ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন হাওয়া পরিবর্তন করার। শিবনাথ কালবিলম্ব না করে তাকে সাঁওতাল পরগণার এক স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না যেন সেই বাড়ীর আবহাওয়া থেকে বাইরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এখানে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতো যখনই তার মনে হতো সেই বাড়ীঘর, সেই আসবাবপত্র সব শিবনাথের—তার অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থে কেনা! ডাক্তারদের তাই জ্যোৎস্না মনে মনে ধন্যবাদ জানালে!

এদিকে জ্যোৎস্না চলে যাওয়াতে শিবনাথও যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। পুলিশ দেখলে যেমন অপরাধীর মনের ভাব হয় ইদানীং জ্যোৎস্নার সামনে এলে যেন তার তেমনি একটা অনুভূতি হতো। স্ত্রীকে ভয় করা একরকম, কিন্তু স্ত্রীর কাছে নিজেকে সর্বদা অপরাধী মনে করা সে যে ভয়ানক শাস্তি! ঈশ্বর না করুন, তা যেন কাউকে ভোগ করতে না হয়! সে যেন দ্বীপান্তরের আসামীর মত বেঁচে থেকে প্রতিমুহূর্তে প্রতিপলে অপরাধের যন্ত্রণা ভোগ করা!

সাঁওতাল পরগণার এই নিভৃত অঞ্চলটি জ্যোৎস্নার বড় ভাল লাগে। চারিদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়, তার মাঝে সুশোভিত জঙ্গল প্রান্তর ক্ষীণস্রোতা পার্বত্য নদী—কি অপূর্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য! দেখে দেখে তার আশা যেন মেটে না! সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই ব'লে আরো বেশী ভাল লাগে। গাড়ীঘোড়া নেই, মোটরের ধুলো নেই, পিচের রাস্তার উত্তাপ নেই, আর সবচেয়ে মানুষের ঐশ্বর্যের দম্ভ-স্বরূপ বিরাটকায় অট্টালিকার শ্রেণী নেই বলে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় জ্যোৎস্না!

অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে জ্যোৎস্না। মনে প্রাণে সে যেন শান্তি লাভ করে। চাকর, বামুন, দাসদাসী অনেকগুলো শিবনাথ সঙ্গে দিয়েছিল তার সেবার জন্যে। কিন্তু সুস্থ হবার পর তাদের সেবা নিতেও যেন জ্যোৎস্নার মনে কেমন ঘৃণা বোধ হতো। শিবনাথেরই অর্থপুষ্ট লোকজন চারিপাশে দেখে কেবল তাদের মনিবের কথা তার মনে পড়ে যেতো। তাই একজন, দু'জন ক'রে লোকজন সব কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র একটি চাকর ও একটি ঠাকুর নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগল। ক্রমশঃ তাদের হাতের সেবা নেওয়াও সে ছেড়ে দিলে। ঠাকুর চাকররা প্রথমে খুব আপত্তি করেছিলো এবং বাবুকে এখনি চিঠি লিখে জানাবে

বলে ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু টাকা দিয়ে জ্যোৎস্না তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিলে। মাসে মাসে যত টাকা শিবনাথ কলকাতা থেকে পাঠাতো তার সবটাই সে তাদের দিয়ে দিতো। তারা মুখে মায়ের জয়গান করতে করতে নিজেদের রান্নাবান্না নিয়ে থাকতো। এদিকে জ্যোৎস্না খেতো নিজের রোজগারে। সাঁওতালদের কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া বলে দিতো ব'লে তারা তাকে কেউ চাল দিতো, কেউ গাছের ফল ও তরিতরকারী দিতো—তাই দিয়ে নিজের হাতে রেঁধে খেয়ে আনন্দে তার দিন কাটতো। এতে যেন সে নতুন জীবনের আস্বাদ লাভ করতো। নতুন আশায়, নতুন প্রেরণায় তার অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এতদিন পরে জ্যোৎস্না যেন তার নিজের পথ দেখতে পেলে।

শিবনাথের চিঠি আসে জ্যোৎস্নার কাছে—কেমন আছে, কবে ফিরবে। জ্যোৎস্না তার উত্তরে অনবরতই লেখে, শরীর সারছে—তবে খুব আস্তে আস্তে, সম্পূর্ণ সারতে এখনো সময় লাগবে। এমনি করে যতদিন পারে শিবনাথের কাছ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করে!

শিবনাথও জ্যোৎস্নার চিঠি পেয়ে যেন বেঁচে যায়। জ্যোৎস্নাকে তাই সম্পূর্ণরূপে সারবার উপদেশ দিয়ে সেখানে আরো কিছুদিন থাকতে বলে। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে বিদেশে রাখারও একটা সীমা আছে। প্রথম দিন সে গিয়ে তাকে রেখে এসেছিল, তারপর আর যায় নি। চিঠি মারফৎ খোঁজ খবর নিতো। তাছাড়া তত্ত্বাবধানের জন্যে লোকজন রেখেছে বলে নিশ্চিন্ত থাকত। তাই হঠাৎ একদিন শিবনাথ সেখানে গিয়ে স্বশরীরে উপস্থিত হলো।

জ্যোৎস্নাও এইরকম একটা আশঙ্কা করেছিল। তবু শিবনাথকে দেখে সে বললে, হঠাৎ যে!

জ্যোৎস্না তখন স্বপাকে রান্না করছিল। তাই গম্ভীরমুখে শিবনাথ বললে, কেন, খুব কি অসুবিধা করলুম?

জ্যোৎস্না নতমুখে বললে, না তা নয়।

চীৎকার করে উঠলো শিবনাথ, তা নয় তো কি? এসব কি হচ্ছে! এইজন্যে বুঝি আমি তোমায় চেঞ্জে পাঠিয়েছি। তারপর একটু ভেবে বললে, শরীর সারতে কেন এত দেরী হচ্ছে এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। ঠাকুর কোথায় গেল, তুমি রাঁধছো যে?

জ্যোৎস্না বললে, ঠাকুর আছে। আমি রাঁধছি তার কারণ একটা ব্রত নিয়েছি —এতে অপরের হাতে খাওয়া নিষেধ!

ব্রত! বলে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে শিবনাথ বলে উঠলো, শহরের লেখাপড়া জানা, শিক্ষিতা মেয়েরা আবার ব্রত মানে নাকি! তারপর জ্যোৎস্নার পরণের শাড়ীটার দিকে চেয়ে বললে, এ ব্রত করতে গেলে বুঝি এইরকম শাড়ীও পরতে হয়।

জ্যোৎস্না বললে, কেমন সুন্দর! সাঁওতালী শাড়ী আমার বেশ লাগে!

শিবনাথ বললে, এই ছোটো-খাটো, কুৎসিত পাড়ওলা 'ক্যাডাভেরাস্' শাড়ীটা

তোমার খুব সুন্দর লাগছে ! হুঁ—বুঝেছি। বলে একটা অর্থপূর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। তারপর তার থালাটার দিকে চেয়ে বললে, এই লাল মোটা মোটা পাথর মেশানো চাল; আর এক টুকরো কাঁচা পেঁপে—এও কি এই ব্রত করতে গেলে খেতে হয় !

জ্যোৎস্না এর জবাবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

শিবনাথ বললে, এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার শরীরটা আর কিছুতেই সারছে না ! তারপর সে আবার রাগে চীৎকার ক'রে উঠলো, এর মানে কি আমি জানতে চাই—কেন তুমি নিজের ওপর এইভাবে অত্যাচার করছো—কি করেছি আমি তোমার !

জ্যোৎস্না ঘাড় হেঁট করে বসে রইল, কোন উত্তর দিলে না। এতে শিবনাথের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে তখনি চাকরটার নাম ধরে চীৎকার ক'রে উঠলো, কালীপদ—এই কালীপদ—উল্লুক, শুয়ার কি বাচ্চা !

আজ্ঞে যাই, বলে ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বাবুর পায়ের কাছে সে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম করলে। পায়ের জুতো দিয়ে তার মাথাটা ঠেলে দিয়ে শিবনাথ বললেঃ এসব কি ! তোর মা যে এইভাবে খাওয়া দাওয়া করে কেন আমায় জানাসনি ? পুরনো বিশ্বাসী লোক ব'লে তোকে বেশী মাইনে দিয়ে এইজন্যে এখানে পাঠিয়েছিলুম ? বলেছিলুম না কোন-কিছু হলেই আগে আমায় চিঠি দিয়ে জানাবি ! আজই তোর চাকরী গেল, দূর হয়ে যা এখান থেকে—

ভৃত্যটি অনেকদিনের। মনিবের কড়া মেজাজের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়। শিবনাথের ইংরিজী ও হিন্দি মেশানো সব গালাগালগুলো শুনে শুনে তার কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর নতুন ক'রে তাতে কোন ক্রিয়া করে না। তাই একটি কথাও না বলে, চুপচাপ সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছুই হয়নি। শেষে যখন শিবনাথ ক্লান্ত হয়ে পড়লো এবং গজগজ করতে করতে বললে, আমারই খাবি, আমারই পরবি, আবার আমারই কাজে ফাঁকি—তখন ভৃত্যটি সেখান থেকে অপরাধীর মত নীরবে ঘরের দিকে চলে গেল। কিন্তু সেখান থেকে যখন প্রায় গজ-দশেক দূরে চলে গেছে তখন শিবনাথ পেছন থেকে খিঁচিয়ে উঠলো, হারাম-জাদা আবার মেজাজ দেখিয়ে চলে যাচ্ছিস যে ! সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে আবার কালীপদ মনিবের সামনে দাঁড়ালো। তারপর ডানহাত দিয়ে মাথার পেছন দিকটা চুলকাতে চুলকাতে বললে, আজ্ঞে হুকুম করেন।

শিবনাথ প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চট্ করে মানিব্যাগটা বার করলে। তারপর একগোছা নোট কালীপদর হাতে দিয়ে বললে, আজই রাত্রের গাড়ীতে আমি কলকাতায় ফিরতে চাই—তাই আমাদের দু'খানা ফার্স্টক্লাশ বার্থ রিজার্ভ করবি, আর তোদের দু'টো সার্ভেণ্ট টিকিট, এখনি গিয়ে কেটে নিয়ে আয়।

কালীপদ চলে গেলে জ্যোৎস্না স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু আগে থাকতে ধমক দিয়ে শিবনাথ তাকে বললে, আমি তোমার কোন

কথা শুনতে চাই না। আজই তোমায় কলকাতায় যেতে হবে—কোন কারণেই তার ব্যতিক্রম হবে না—এইটুকু শুধু জেনে রাখো। ব'লে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

জ্যোৎস্না জানতো শিবনাথের গোঁ। একবার যা বলবে কিছুতেই তা থেকে কেউ তাকে টলাতে পারবে না। তাই নিঃশব্দে শুধু নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলে!

কলকাতার বাড়ীতে ঢুকে এবার যেন জ্যোৎস্নার একটা নতুন অনুভূতি হয়। কারা যেন চারিদিক থেকে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে আসে! কেবলই তার মনে হয় যেন সেটা শিবনাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নয়, একটা লোকের জীবনব্যাপী কুকর্মের বাস্তব ইতিহাস। সে যেন প্রত্যক্ষ করে তার পাতায় পাতায় সহস্র সহস্র নর-নারীর হাহাকার—তাদের কত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, কত চোখের জলের অব্যক্ত কাহিনী, কত অকালমৃত্যু, কত বঞ্চিতের প্রতিদিনের চিত্তবিক্ষোভ। যে ঘরে ঢুকলে একদিন আনন্দে তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—সেই ঘরকে আজ যেন তার মনে হয় জেলখানা। সেখান থেকে পালাতে পারলে সে যেন বাঁচে! কতকগুলো খুনী আসামী তার কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পাশে জ্যোৎস্নার কেবল মনে পড়ে সেই সাঁওতাল পরগণার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন জীবন-যাত্রার কথা! ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর নয় যেন শান্তির স্বর্গ! কি সরল অনাড়ম্বর জীবন, কি নির্লোভ ও স্বল্পতুষ্ট!

জ্যোৎস্নার মন কাঁদে সেই জীবনের জন্যে। এ সোনার পিঞ্জর যে তার আত্মাকে ক্লিষ্ট করে, মনুষ্যত্ব খর্ব করে, কেমন ক'রে তা সে বোঝাবে শিবনাথকে!

স্বামীর সেই বহুমূল্য চিত্র-শোভিত, কার্পেট-বিছানো, বৈদ্যুতিক ঝাড়-লণ্ঠনের আলোকোজ্জ্বল ঘরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাই সে শুতে পারে না! সকলে ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি ঘরের মেঝেয় কিংবা বারান্দার কোণে এসে শোয়।

শিবনাথ একদিন এর জন্যে তাকে খুব তিরস্কার করলে। বললে, ঝি-চাকরদের সামনে আমাকে এভাবে অপমান না করলে বুঝি চলে না, জানো তুমি কার স্ত্রী? জানো সমাজে আমার একটা 'পোজিশন্' আছে?

জ্যোৎস্নাকে এর কোন উত্তর দিতে না দেখে সে আরো রেগে ওঠে। বলে, শিক্ষিত বলে তুমি আবার অহংকার করো? এই বুঝি তোমার শিক্ষার পরিচয়!

জ্যোৎস্না এবারেও কোন জবাব দেয় না, শুধু গুম্ হয়ে বসে থাকে। যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করে।

শিবনাথ বলে, খবরদার, আর যেন কোনদিন এখানে শুতে না দেখি!

সেইদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শিবনাথের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে সে জ্যোৎস্নার ঘরের দিকে ছুটলো। ঝন্‌ঝন্-খন্‌খন্ করে যেন বিস্তর কাচভাঙ্গার শব্দ আসছিল তার ঘরের মধ্যে থেকে।

বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দেখলে ইতিমধ্যে চাকরবাকরেরাও জেগে উঠে সব ছুটে এসেছে সেখানে, সকলেই দরজা বন্ধ বলে অপেক্ষা করছে। শিবনাথ গিয়ে দুম্ দুম্ করে লাথি মারতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে লাগল, 'জ্যোৎস্না শিগ্গির দোর খোল।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! যত সে ডাকে, ভেতরে যেন তত বেশী শব্দ হয়। শেষে সকলে মিলে দরজাটা ভেঙ্গে ফেলে যখন ভেতরে ঢুকলো তখন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল সকলে। ঘরের মধ্যে যেন এই মাত্র একটা অসুরের লড়াই হয়ে গেছে। বড় বড় দেয়াল জোড়া আয়নাগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, দামী দামী ছবিগুলো সব ছিঁড়ে ঘরের মেঝেয় লুঠছে, ফুলদানী, কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন, ভালভাল সব আসবাব ভেঙ্গেচুরে ঘরের মেঝেয় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, আর তার মধ্যে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে জ্যোৎস্না—তার সারাদেহ কেটে ছড়ে গিয়েছে, তা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি জ্যোৎস্নার কাছে গিয়ে বললে, জ্যোৎস্না কি হয়েছে? তুমি এখানে এরকম করছো কেন?

জ্যোৎস্না পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো। ভেঙ্গে ফেলবো, সব ভেঙে ফেলবো।

এ সব কি বলছো তুমি! বলে যেমন শিবনাথ তার হাতটা ধরে তাকে তুলতে গেল অমনি সে স্বামীর হাতটাকে ছুঁড়ে সরিয়ে দিয়ে বললে, দূর হয়ে যাও—ছুঁয়োনা—তুমি ছুঁয়োনা—আমায় এখানে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। আমি এখান থেকে চলে যাবো—বলে সে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল!

জ্যোৎস্নার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এই মনে করে শিবনাথ তখনি একজনকে পাঠালে ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে অনেক পরীক্ষা করে শেষে মাথার গোলমালই সাব্যস্ত করলেন। এবং শিবনাথকে গোপনে ডেকে বললেন, এসব মনোবিকলনের ব্যাপার, আমার মনে হয় এর জন্যে আপনার উচিত গিরীন্দ্রশেখরকে একবার দেখানো। এসব রোগের তিনি 'অথরিটী'—ভারতবর্ষে তাঁর জোড়া আর কেউ নেই!

পরদিন দুপুরে শিবনাথ গিরীন্দ্রশেখরকে বাড়ীতে আনলে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা কইলেন গোপনে। জ্যোৎস্না সব কথার উত্তরই খুব সহজ সরলভাবে দিলে। মাথা খারাপের কোন লক্ষণই তিনি দেখতে পেলেন না। শুধু শিবনাথকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনি কি এমন কোন কাজ করেছেন যাতে আপনার স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড রকমের আঘাত লেগেছে এবং উনি কিছুতেই আপনাকে তার জন্য বরদাস্ত করতে পারছেন না। এমন কি আপনার তৈরী এই বাড়িঘর বলে তার মধ্যে থাকতেও তিনি ঘৃণা বোধ করছেন?

শিবনাথ একটু ভেবে বললে, কৈ সে রকম কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ে না !

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি এরকম কোন গর্হিত কাজ করেছেন যে আপনার স্ত্রীর কাছে গোপন রেখে মনে করছেন সে জানে না অথচ কোনক্রমে সেটা তিনি জানতে পেরেছেন ?

নিমেষে যেন শিবনাথের মুখের রঙটা বদলে গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের প্রশ্নটাকে চাপা দেবার জন্যে বললে, আচ্ছা জ্যোৎস্না কি সেরকম কোন আভাষ দিলে ?

ডাক্তার বললেন, না না তাহলে তো আমার আর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হতো না। আপনার সম্বন্ধে কোন কথা ওঁর মুখ থেকে বার করতে পারলুম না। তবে ও'র অবচেতন মনে ওই রকমের একটা ভাব যে রয়েছে তা পরীক্ষা দ্বারা অনুমান করতে পারা যায়।

ডাক্তারের কথা থেকে শিবনাথের বুঝতে দেরী হলো না যে জ্যোৎস্না তার অতীত জীবনের গোপন কাহিনীর অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। তাই ঘৃণায় সে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়—এমন কি নিজে উপার্জন করে তার দ্বারা আপনার ভরণপোষণ করতে চায় ! তার অন্ন গ্রহণ করাকেও সে পাপ মনে করে !

শেষের কথাটা মনে হলে তার নিজের জীবনের ওপর ধিক্কার জন্মায় ! এমন স্ত্রীর সে স্বামী, যে তার ভাত পর্যন্ত খেতে ঘৃণা বোধ করে !

পরের দিনই ডাক্তারের পরামর্শ মত সে জ্যোৎস্নাকে আবার সাঁওতাল পরগণার সেই স্বাস্থ্যকর স্থানটিতে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু জ্যোৎস্না চলে যাবার পর থেকে সে যেন মনের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য, যতদিন জানতো যে জ্যোৎস্না তার পূর্বজীবনের কথা জানে না ততদিন সে বেশ ছিল কিন্তু যেই শুনলে সে জেনেছে অমনি তার মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। জ্যোৎস্না ছিল যেন তার মনের ভারসাম্য—তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার বংশগৌরব সব নিয়ে সে যেন শিবনাথের অশিক্ষার দৈন্যকে ঢেকে রেখেছিল। এতদিন সে তা বুঝতে পারে নি, আজ যেন তা সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল শিবনাথের সামনে। তার অভাব তাই আজ বড় হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে !

১২

এর পর কয়েকটা দিন শিবনাথ আর বাড়ী থেকে বেরুল না। দিন রাত চুপ করে বসে কি যেন ভাবে ! কত আবোল তাবোল চিন্তা, তার ঠিক নেই। তবে সব কথার মধ্যে জ্যোৎস্না যে তার আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছে সেটাই যেন তার মনকে পীড়িত করে সবচেয়ে বেশী ! তবু শিবনাথ এক একবার মনকে এই বলে সবল করার চেষ্টা করে যে কিছুতেই সে স্ত্রীর কাছে মাথা নীচু করবে না।

এই পৃথিবীতে পয়সার চেয়ে বড় আর কিছু নেই, যার পয়সা আছে তার সব আছে মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি! ঘরের লোক না মানলে তো বয়ে গেল। বাইরের লোকের কাছে তার 'পোজিশন' ঠিক আছে তো!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনটা এমন চাঙ্গা হয়ে উঠলো যে সে তখনি বেরুবার জন্যে সাজগোজ করতে লাগল। এমন সময় তিনকড়ি এসে তাকে ডাকলো।

শিবনাথ সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, খবর কি দেশের?

তিনকড়ি বললে, খবর তো ভালই ছিল কিন্তু শুনছি পাড়ার লোকেরা এবার চাঁদা তুলে চাঁপার মন্দিরে ঝুলন করবে খুব ঘটা করে—আমাদের মন্দিরে যাতে কেউ না যায় সেই রকম আয়োজন চলছে। বলে একটু থেমে আবার সগর্বে বলে উঠলো, মুর্খরা জানে না যে কার সঙ্গে লেগেছে! কত টাকা তোরা খরচ করবি! গ্রামের লোকের মুরদ তো আমার আর জানতে বাকী নেই!

শিবনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠলো চাঁপার সেই মন্দিরটা—সঙ্গে সঙ্গে তার টাকা ফেলে দেওয়ার দৃশ্য, তারপর চাঁপার সেই স্পর্দ্ধিত উক্তি। 'ও টাকায় আমার ঠাকুরের পুজো হবে না' তার কানের কাছে বেজে উঠতেই শিবনাথের মনের মধ্যে যেন বৃশ্চিক দংশন করে উঠলো। সে গলাটা নামিয়ে তিনকড়িকে বললে, সূর্যের তাপ সহ্য হয় কিন্তু বালির তাপ কিছুতেই সহ্য করবো না। একটা সামান্য মেয়েমানুষকে জব্দ করতে পারছো না তোমরা।

তিনকড়ির পৌরুষে যেন কথাটা বাজলো। সে একটু থেমে বললে, ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ লাগে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে শিবনাথ বললে, ও বিষ এবার আমি সমূলে নাশ করতে চাই।

সোৎসাহে তিনকড়ি বলে উঠলো, আমারও ঠিক সেই মত।

শিবনাথ পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে হাতে দিতে দিতে বললে, ওই মন্দিরটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে হবে—তিন দিন সময়।

তিনকড়ি যেন শিউরে উঠলো, ব্রাহ্মণের ছেলে সে, মন্দির ভাঙবে কি করে! তাই সে যেন কি চিন্তা করতে লাগল। তখন শিবনাথ পকেট থেকে আরো একশো টাকার নোট বার করে বললে, বিগ্রহের টুকরো এনে দেখাতে পারলে এই বকশিস? কেমন পারবে না? বলে বিজয়গর্বে তার মুখের দিকে তাকালে।

তিনকড়ি শুকনো মুখে জবাব দিলে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কাজটা কি করে করি বলুন?

শিবনাথ বললে, আরে আমি কি তোমায় করতে বলছি—কালু সর্দার তো এখনো মরে যায় নি!

এইবার তিনকড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, হ্যাঁ তা পারবো না কেন? তবে—বলে একটু ইতস্তত করে তিনকড়ি বললে, মন্দির ভাঙবার অর্ডারটা

আমি নিজে মুখে তাকে তো দিতে পারবো না—আপনাকে বলতে হবে।

শিবনাথ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, অর্থাৎ এর দরুণ যে পাপটা সেটা যাতে তোমার ঘাড়ে না চেপে আমার ঘাড়ে চাপে এই তো ?

তিনকড়ি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, সত্যি কথা বলতে কি জানেন ওটা যেন একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে—যতই মুখে আস্ফালন করি 'না কেন তবু মন্দির ভাঙো, কি বিগ্রহ ভাঙো—এ কথাটা উচ্চারণ করতে গেলে যেন জিভ জড়িয়ে আসে, গা শিউরে ওঠে। হাজার হোক পিতামহ, প্রপিতামহদের ব্রহ্মরক্ত তো এখনো দেহে রয়েছে !

শিবনাথ তিনকড়ির মুখের ওপর একটা তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনে বললে, আমার দেহে কি ও জিনিসটা নেই তিনকড়ি ?

তিনকড়ি এবার দ্বিধায় পড়লো। বারকতক মাথা চুলকে বললে, আছে, তবে কি জানেন আপনারা বড়লোক আপনাদের কথা আলাদা। ও ব্রহ্মরক্ত আপনাদের কিছুই করতে পারে না। বড়লোকদের টাকার গরমের কাছে সব জব্দ !

শিবনাথ আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে গেল, এবং তখনি তিনকড়ির সঙ্গে দেশে গিয়ে কালু সর্দারকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়ে দিলে। তার যেন আর দেরী সইছিল না। চাঁপার এই স্পর্দ্ধা ক্রমশঃ যেন সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্ছিল। অনেক রকমে সে শিবনাথকে অপমান করেছে কিন্তু এবার সে আর সহ্য করবে না! যত শিগ্‌গির পারে তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে! চাঁপার কথা মনে হলে তার যেন আর জ্ঞান থাকে না। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে সে শত্রুতা করে চলেছে! তারই জন্যে আজ তার যত অপরাধ, যত কলঙ্ক! তাই এবার শিবনাথ তাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে আর কোনদিন তার সঙ্গে সে না লাগে !

কালু সর্দার দু'দিন পরে বিগ্রহের ভাঙা টুকরো এনে শিবনাথের হাতে দিলে এবং আরও একশো টাকা বকশিস্ নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু বিগ্রহের সেই ভাঙা টুকরোগুলো স্পর্শ করা মাত্র যেন শিবনাথের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি সেগুলোকে নামিয়ে রাখলে সামনের টেবিলটার ওপর। তারপর মনটাকে একটু কঠিন করে নিয়ে সেই পাথরের ভগ্নাংশগুলির দিকে এমনভাবে তাকালো যেন এক দুর্দান্ত শত্রুকে সে নিজহাতে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলেছে! চাঁপার দম্ভ ও স্পর্দ্ধা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে তার মধ্যে।

যত এই কথা তার মনে হয় তত উল্লাসে স্ফীত হয়ে ওঠে তার বুক! এইভাবে আনন্দে ডগমগ হ'য়ে শিবনাথ সেদিন কলকাতায় ফিরলে!

কিন্তু ঘরে ঢুকেই হঠাৎ তার মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। মনে হলো চড়াসুরে বাঁধা ছিল তার যে মন, কে যেন সহসা তার তারগুলো সব ছিঁড়ে দিলে। তারি বেসুরো আওয়াজে শিবনাথ যেন কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

জ্যোৎস্না চলে গেল? কেন এই ঐশ্বর্যকে সে বিষ মনে করলে? কেন স্বামীর উপার্জিত অর্থ সে গ্রহণ করলে না?

শিবনাথের মনে হয় যদি অর্থ-ই জগতের সারবস্তু—যদি টাকা থাকলেই মানুষ যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহ'লে জ্যোৎস্নাকে কেন সে ধরে রাখতে পারলে না তার কাছে? কেন তার স্ত্রী তার অর্থ নিতে হবে বলে ঘৃণায় দূরে চলে গেল! আর চাঁপা! সেই বা কেন ছুঁড়ে ফেলে দিল তার টাকা। কেন সে বললে তাতে তার দেবতার পূজা হবে না! তবে কি টাকাই একমাত্র কাম্য নয়—অর্থবল কি শ্রেষ্ঠ বল নয়?

শিবনাথের মনে সংশয় জাগে। এ নিয়ে যত চিন্তা করে তত তার চাঁপার কথাগুলোই মনে পড়ে যায়। তবে কি চাঁপা ঠিক বলেছে!

পরমুহূর্তেই মনে হয় অসম্ভব! চাঁপা যা বলেছে তা ভুল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমতে পারে না। তার মনে একটা সংগ্রাম চলে। এতদিন তার মনে হতো যে টাকাই সব। যার টাকা আছে তার সব আছে। কিন্তু এতদিনের সেই সুদৃঢ় মতকে আজ তার ভ্রান্ত বলে মনে হতে থাকে। তবে কি সে ভুল পথে যাচ্ছে! কিন্তু সমস্ত জগৎই তো আজ অন্ধগতিতে ছুটে চলেছে অর্থের পিছনে! ছলে, বলে, কৌশলে—যেমন ক'রে হোক্ শুধু টাকা আর টাকা। টাকার সাধনায় সারা পৃথিবী অন্ধ, উন্মত্ত। সবাই কি তবে ভুল করছে! কেবল আমার স্ত্রী আর চাঁপাই জগতের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি! হাসি পায় শিবনাথের! আশ্চর্য যত এই সব চিন্তা করে তত চাঁপার সেই কথাগুলো তার কানের কাছে যেন ধ্বনিত হতে থাকে। ছোট মুখে বড় কথা! চাঁপার এই অকালপক্কতার জন্যে দায়ী গ্রামের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, যাঁরা তার মন্দিরে সমবেত হ'য়ে তার অহমিকাকে নিত্য বাড়িয়ে দেন! তা না'হলে কোন সাহসে চাঁপা তাকে এত বড় বড় কথা বলতে পারে! তাই চরম প্রতিহিংসা নিলে শিবনাথ তার ওপর! যে মন্দিরকে উপলক্ষ্য ক'রে তার এই গর্ব তাকে চূর্ণ করে দিলে!

বিগ্রহের সেই টুকরোগুলোকে বিছানা থেকে তুলে, আলো জেবলে আবার সে হাত নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে আর হো হো ক'রে আপন মনেই হেসে ওঠে! কিন্তু হাসতে হাসতে হঠাৎ তার মনের মধ্যেটা যেন কেমন করে—কোথায় যেন একটা কি গভীর অন্যায় করেছে বলে তার মনে হল।

কিন্তু একটু পরে আবার তার মন গর্জন ক'রে ওঠে—কেন করবো না অন্যায়—চাঁপা তার ওপর কম অন্যায় করেছে! বেশ করবো, তার ওপর প্রতিহিংসা নেবো! এইভাবে সে যেন নিজেই নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দেয়!

কেন এমন হয়? এই নিয়ে শিবনাথ তার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে! কিন্তু যত দিন যায় তত যেন সেই চিন্তাটাই তাকে পেয়ে বসে। খেয়ে, ঘুমিয়ে, বসে, সুখ পায় না। তাই হঠাৎ মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে শিবনাথ

শিকারে চলে গেল—তাঁবু, বন্ধুবান্ধব, বাঈজী, চাপরাসী সব সঙ্গে নিলে এবং একটা নিরবিচ্ছিন্ন স্ফুর্তির স্রোতে গা ঢেলে দিলে। কিন্তু তার মধ্যে থেকেও চাঁপার সেই কথাগুলো তার কানে অনবরত বাজতে থাকে—সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ইদানীং সকল কাজে চাঁপার সেই কথাগুলো যেন তাকে সতর্ক করে দিতো। তাই চাঁপার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে তার ওপর চরম প্রতিহিংসা নিলে। সে জানতো ওই বিগ্রহই চাঁপার সব, তার প্রাণ!

১৩

দেশ থেকে লাবণ্যকে নিয়ে আসার সময় থেকে সেই যে সুব্রতর মনটা তার ওপর তিক্ত হয়ে গেল, সে আর কোনদিন ঘুচলো না। স্ত্রী হ'য়ে স্বামীকে অপমান করা বিশেষ ক'রে প্রজাদের সামনে। এ অপরাধ অমার্জনীয়। এর জন্যে লাবণ্যর ওপর সে যখন তখন অকথ্য অত্যাচার করে। মাতাল হয়ে এসে মুখে যা আসে তাই বলে, কখনো বা দুপুর রাত্রে গালাগাল দেয়—আমার মুখে কালি দিতে এসেছিস্? দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে।

লাবণ্য পাষাণের মত নিঃশব্দে সব সহ্য করতো। ঘৃণা হয় তার মাতালের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে। যতবার সে এই অবস্থায় কিছু স্বামীকে বলতে গেছে, ততবার ফল হয়েছে উল্টো। তাই চুপ ক'রে থাকে। আগে তবু মধ্যে মধ্যে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাকে পাওয়া যেতো কিন্তু ইদানীং একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে—সকল সময়ই মদে ডুবে থাকে সুব্রত। আর বাড়ীতে ফেরে কখনো দশ দিন, পনেরো দিন, কখনো বা আরো বেশিদিন পরে।

সেদিন রাত্রে সুব্রত বাড়ীতে ছিল, প্রায় শেষ রাত্রে একদল পুলিশ এসে তার বাড়ীটা ঘেরাও ক'রে তাকে ডেকে তুললে এবং একটা তল্লাসী পরোয়ানা দেখিয়ে বললে, এখুনি আপনার বাড়ীটা সার্চ করবো দুজন সাক্ষী চাই—দুজনকে ডাকুন তো?

অসময়ে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে একে সুব্রতর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর সামনে এত পুলিশ দেখে সুব্রত একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। জমিদার বাড়ীর চৌকাঠ ইতিপূর্বে আর কখনো কোন পুলিশ ডিঙ্গোয়নি—অপমানে লজ্জায় সুব্রতর যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে সুব্রতর আলাপ ছিল। চুপি চুপি সে তাকে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি বলুন তো, আমার বাড়ীতে সার্চ করার মত কি হলো?

ইন্‌স্‌পেক্টার তখন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আপনার স্ত্রীর জন্যেই আমরা সার্চ করতে এসেছি—তিনি গোপনে গোপনে কতকগুলো স্বদেশী গুণ্ডাকে যে সাহায্য করেন সেটা বোধহয় আপনার জানা নেই।

বলেন কি! বলে বিস্মিত দৃষ্টিতে সুব্রত তার মুখের দিকে তাকালো।

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু বললেন, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে আছে তা নাহলে কি আমরা এসেছি ?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?

মুচকি হেসে ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এখুনি সে প্রমাণ পাবেন ব্যস্ত হবেন না।

সত্যি কিছুক্ষণ পরে লাবণ্যর ঘর থেকে কয়েকটা জিনিস পুলিশ বার ক'রে আনলে। সুভাষচন্দ্রের লিখিত একখানা নিষিদ্ধ পুস্তক ও স্বদেশী আন্দোলনের সম্পর্কে আরো কতকগুলো কি কি বই! এ ছাড়া চরকা, তকলী, সুতো, জনকল্যাণসঙ্ঘের দু'চারখানা চিঠি ও কয়েকটা মনিঅর্ডারের রসিদ—লাবণ্য মধ্যে মধ্যে তাদের যে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো তার সাক্ষী!

এবার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার লাবণ্যকে থানায় নিয়ে যাবেন, সুব্রতকে জানালেন।

সুব্রত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, থানায় না নিয়ে গেলে চলে না, ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু ?

না। বলে তিনি তখনি একটা ট্যাক্সি আনতে হুকুম দিলেন একজন সিপাইকে।

লাবণ্যকে নিয়ে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার যখন থানায় গিয়ে ঢুকলেন, তার পিছনে আর একটা গাড়ীতে সুব্রতও সেখানে গিয়ে হাজির হলো!

ঘণ্টা তিন চার অপেক্ষা করার পর লাবণ্য মুক্তি পেলে। তাকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেই সুব্রত একেবারে রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলো। বললে, এর মানে কি? তুমি কি মনে করছো যে যা ইচ্ছা তাই করবে? আমাদের বংশের মুখে এমনি ক'রে রোজ রোজ কলঙ্ক দেবে ?

লাবণ্য এতক্ষণ নীরবে সব অপমান সহ্য করছিল, এবার শুধু মুখ তুলে বললে, কলঙ্ক? খিঁচিয়ে উঠলো সুব্রত, না কলঙ্ক নয় যশের ডালা! ন্যাকা, মনে করো ডুবে ডুবে জল খাই, শিবের বাবাও জানতে পারে না! এসব ছিনালী চলবে না—যদি আমাদের বাড়ীর নিয়মকানুন মর্যাদা না মেনে চলতে পারো তো বেরিয়ে যাও—দোর খোলা আছে!

লাবণ্য নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বললে না। কিন্তু সুব্রত তাতে চুপ করলো না। বরং তাতে তার রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে বললে, আমাকে লুকিয়ে যত সব লোফার, গুণ্ডা, বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে গোপনে এই সব কাণ্ড হয়!

লাবণ্য এবারে বলে উঠলো, আমাকে যা ইচ্ছে তুমি বলো, কিন্তু যারা দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের নামে অপবাদ দিয়ো না—

—আলবাত্‌ দেবো—হাজার বার দেবো—কেন, তারা বুঝি তোমার সব পিরীতের ইয়ে হয়—

চুপ, মুখ সামলে কথা বলো বলছি। বলে ধমক দিয়ে লাবণ্য সুব্রতকে থামিয়ে দিলে।

সুব্রত বললে, তবে রে—আমার-ই বুকের ওপর বসে আমারই দাড়ি ওপড়াবে, আবার আমায় তার জন্যে চোখ রাঙানো। আমাকে কি ভেড়ো পেয়েছো—দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি। বলে ছুটে গিয়ে আলমারী থেকে সেই চাবুকটা বার ক'রে এনে সপাং সপাং ক'রে লাবণ্যকে মারতে লাগল।

লাবণ্যর ধবধবে সুন্দর দেহ দেখতে দেখতে চাবুকের ঘায়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠলো। পিসিমা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে একেবারে সুব্রতর চাবুকটা চেপে ধরে বললেন, আবার একটা অঘটন ঘটাবে দেখছি। ওরে ছাড় ছাড় সুবি চাবুকটা—তোর কি কোন কালে আক্কেল হবে না?

ছেড়ে দাও বলছি পিসি—আজ আমি ও হারামজাদীকে দেখে নেবো—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—

পিসিমা এবার লাবণ্যকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুব্রত সেখানে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল, আর কোনদিন যদি কংগ্রেসের নাম শুনেছি মুখে তো জ্যান্ত পুঁতে ফেলে দেবো! যারা আমার সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে—তুমি আমার স্ত্রী হ'য়ে তাদেরই গোপনে গোপনে সাহায্য করছো! ঘর শত্রু বিভীষণ—দুধ কলা দিয়ে আমি কাল সাপ পুষছি!

পিসিমা তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তোমারই তো অন্যায় বাছা, আজ মুখুজ্যেবংশের মুখ তুমি কোথায় ডোবালে! পুলিশ এসে আজ ঘরদোর তচনচ ক'রে দিয়ে গেল, আর এ বাড়ীর কুলবধূকে কিনা থানায় ধরে নিয়ে গেল! কি লজ্জার কথা মা! কর্তা আজ বেঁচে থাকলে কি হতো জানো?

লাবণ্য ধীরে ধীরে বললে, আমি জানতুম না পিসিমা যে কংগ্রেসকে সাহায্য করলে আপনাদের বংশের মাথা এত নীচু হয়ে যাবে! আমায় ক্ষমা করুন—আর কক্ষনো এমন কাজ করবো না।

পরদিন নেশা ছুটে গেলে সুব্রত লাবণ্যর গায়ের দাগগুলোয় ওষুধ ঘষতে ঘষতে বললে, তুমি কেন আমায় এমন করে মনোকষ্ট দাও।

লাবণ্য একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমার দুর্ভাগ্য!

সত্যি দুর্ভাগ্য! এর কিছুদিন পরে এক দুপুরে দারোয়ান লাবণ্যকে গিয়ে একখানা চিঠি দিলে। বললে, মাইজী একজন ছোকরা সাইকেল ক'রে এসে দিয়ে গেল।

লাবণ্য ঘরের মধ্যে গিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। চিঠিখানা এইভাবে লেখা—আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন যে কুসুমপুর জনকল্যাণ সঙ্ঘকে

নষ্ট করবার জন্য একদল দুর্বৃত্ত ১৯ তারিখে আক্রমণ করে কিন্তু মতিলালবাবুর অসীম সাহসের জন্য দুর্বৃত্তরা সঙ্ঘের কোন অনিষ্ট করতে পারেনি, তবে সাংঘাতিকভাবে মতিলালবাবু আহত হয়েছেন। আশ্রমের আরো দু'একজন কর্মীর কিছু কিছু আঘাত লাগে, তবে তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি। তাঁরা ভালই আছেন। কিন্তু মতিবাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আজ কয়েকদিন হলো তিনি মেডিক্যাল কলেজে চ্যাটার্জীস্ ওয়ার্ডে ৯ নম্বর বেডে এসে রয়েছেন। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটময়, কখন কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় ও বার বার তিনি আপনার নাম করছেন। আপনি জনকল্যাণ সঙ্ঘের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট তাই আপনাকে এই সংবাদ দিচ্ছি—যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন মনে করেন তো আর দেরী করবেন না।

ইতি—

জনৈক সেবক।

চিঠিখানা পড়া শেষ করেই লাবণ্য সেখানা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে জানলার দিকে গেল এবং মনে মনে বলে উঠলো, না তার সঙ্গে দেখা করবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। এই বলে তাড়াতাড়ি সে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলতে গেল, কিন্তু কি মনে হলো, আবার একবার চিঠিখানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে। তারপর চিঠিখানা হাতে করে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ যে তিন দিন মতিবাবু তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল সেদিনের কথাটা তখন সহসা তার মনে পড়ে গেল! সে বলেছিল, প্রাণ দিয়ে আমি এই সঙ্ঘকে রক্ষা করবো! তবে কি তার কাছে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যই—না-না, তা সম্ভব নয়। বলে আমার মন থেকে সেই চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে দিলে। কিন্তু যতবার মনকে সেই চিন্তা থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে ততবার অজ্ঞাতে যেন লাবণ্যর মনে আসে সেই কথাটাই ঘুরে ফিরে। চিঠিখানাকে ছিঁড়ে না ফেলে সে তখন বিছানার তলায় রেখে ঘরের কাজে মন দিতে চেষ্টা করলে। অনাবশ্যকভাবে ঘরের কতগুলো কাজ ফেলে আবার গুছতে লাগল কিন্তু যতই মনকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখতে চায় ততই মতিলালের কথা গোড়া থেকে সব যেন একে একে লাবণ্যর মনে পড়ে! বাস্তবিক লোকটা কি বেহায়া—বলে কিনা তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে তোমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে এসে জনকল্যাণ সঙ্ঘ করেছি। ছিঃ আবার প্রলাপের ঘোরে আমারই নাম বলছে! ছিঃ ছিঃ কি অসভ্য! আরো কত কি হয়ত বলেছে—যারা আশেপাশে থাকে তারা কি বলছে আমার সম্বন্ধে! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় আবার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তাকে খবর দিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু কেন সে যাবে—মতিলালের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ। চিরদিন তো তাকে সে ঘৃণাই ক'রে এসেছে! সে যাবে তবে কি করতে। না—অসম্ভব। সে যদি মরে যায় তো যাক—তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে সে

যাবে কেন? তার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক। একটু থেমে আবার সে ভাবে, বরং মতিলাল তাকে যা ভাবে তাতে তার সঙ্গে দেখা না করাই তার উচিত—

অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনের সঙ্গে এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে একসময় লাবণ্য যেন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পিসিমার ঘরের দোরে গিয়ে হাজির হয়।

পিসিমা তাকে দেখে ভিতরে ডাকলেন, বললেন, কিছু বলবে বৌমা!

লাবণ্য ইতস্তত করে বললে, আমি একবার হাসপাতালে যেতে চাই—আমার এক ভাই মরমর এখুনি একজন এসে চিঠি দিয়ে গেল!

ওমা ভাই মরমর—তার জন্যে আবার যাবে কিনা জিজ্ঞেস করছো! এখুনি যজ্ঞেশ্বরকে বলো গাড়ী ডাকতে। আহা মানুষটা চিরকালের মত মরে যাচ্ছে—আর একবার শেষ চোখের দেখা দেখবে না!

লাবণ্য ভেবেছিল পিসিমা হয়ত আপত্তি করবেন তাহ'লেই সে বেঁচে যাবে? অন্ততঃ না যাওয়ার কৈফিয়ৎ ত মিলবে নিজের কাছে। তাই পিসিমা যখন এইভাবে উৎসাহ দিলেন তখন সে পড়লো মুস্কিলে। এখন আর না বলা যায় না তাহ'লেই বরং নানারকম সন্দেহ পিসিমার মনে জাগবে।

বুড়ো দারোয়ান যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে করে লাবণ্য যখন হাসপাতালে গিয়ে পেশছল তখন ঘণ্টা পড়তে পনেরো মিনিট বাকী।

দোতলায় উঠে একজন নার্সকে ন' নম্বর বেডটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে কোণের দিকের একটা লোহার খাট—তার চারিদিকে সাদা পর্দা ঝুলছে! লাবণ্য পর্দার কাছে যেতেই একজন ছোকরা এসে তাকে নমস্কার জানিয়ে বললে, আসুন, আসুন, এই কতক্ষণ আগেও বিকারের ঘোরে আপনার নাম করছিল। তারপর একটু থেমে বললে, কি যে বলে সব বোঝা যায় না তবে এই কথাটাই অধিকাংশ সময় তার মুখে লেগে থাকে—প্রাণ দিয়ে আমি রক্ষা করেছি তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিক ক'রে রেখেছি। তুমি দেখে খুশি হ'লে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে! কবে তুমি আসবে বলো না?

শুনতে শুনতে লাবণ্যর মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো। সে সেকথার কোন জবাব না দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মতিলাল তখনো বকে চলেছে সেই একই কথা। তাকে দেখেই লাবণ্য চমকে উঠলো! তার মাথায়, বুকে, পিঠে, সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করা। কেবল চোখ দু'টি মুখের মধ্যে চেনা যায়।

লাবণ্যর কানে এলো শুধু এইটুকু—বলো কবে তুমি আসবে—বলবে না—বলবে না—লাবণ্য?

এইবার সেই ছোকরাটি মতিলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একটু চেঁচিয়ে বললে, কে এসেছেন দেখ দেখি—

লাবণ্যর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিস্মিত মতিলাল স্থির হয়ে চেয়ে

রইল। একটু পরেই তার চোখের দু' কোণে উপচে পড়লো জল! তারপর ধীরে ধীরে সে বললে, জ্বলে গেল সব—আমার মাথায়, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

লাবণ্য মুহূর্তকয়েক চিন্তা করে ধীরে ধীরে মতিলালের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর হীরের আংটি পরা ধবধবে সুন্দর হাতটি তার মাথার ওপর আলতোভাবে যেমন রাখলে, অমনি তড়িৎস্পৃষ্টের মত মতিলালের সারা দেহ যেন শিউরে উঠলো। লাবণ্য তাড়াতাড়ি তার হাতটা সরিয়ে নিলে ব্যথা লেগেছে মনে করে। মতিলাল আকুল আগ্রহে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দুটো তুলে লাবণ্যর সেই হাতটা নিজে একবার স্পর্শ করার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু যন্ত্রণায় অবশ হাত দুটো একটুখানি উঠেই থেমে গেল আরো একটু উঁচুতে তোলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুতেই মতিলালের হাত সেখানে পেঁছিল না। এদিকে ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠতেই লাবণ্য উঠে দাঁড়ালো। দর্শনার্থীদের দেখা করার সময় শেষ হয়ে গেল।

মতিলালের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই ব্যর্থ কাহিনীটা যাকে কেন্দ্র করে সেদিন ঘটে গেল সে কিছুই বুঝতে পারলে না নিষ্ঠুর বিধাতার কি কঠিন নিয়ম। তাই লাবণ্য চলে যাবার পর যখন মতিলালের বুকের যন্ত্রণা সহসা আরো বেড়ে গেল এবং ডাক্তার-নার্স ছুটোছুটি করতে লাগল তখনও কেউ তার এই আকস্মিক রোগবৃদ্ধির কারণটা অনুমান করতে পারলে না।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই লাবণ্যর বুক কেঁপে উঠলো। দেখলে সুব্রত ঘরের সামনে ক্ষুধিত সিংহের মত পায়চারী করছে।

সামনের বারান্দা দিয়ে ঘাড় হেঁট করে লাবণ্য ভেতরে চলে যাচ্ছিল, সহসা সুব্রত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, শোন!

অপরাধীর মত ধীর ও মন্থর পদক্ষেপে লাবণ্য ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নীরব ও কঠিন দৃষ্টিতে একবার তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে সুব্রত বললে, কোথায় গিয়েছিলে!

লাবণ্য কণ্ঠের ভয়কে চাপতে চাপতে বললে, হাসপাতালে।

কেন?

পিসিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম তিনি যেতে বললেন তাই।

রাগে চীৎকার করে উঠলো সুব্রত। বললে, কি জিজ্ঞেস করেছিলে পিসিমাকে!

লাবণ্য আরও আস্তে বলতে লাগল, আমার এক মাসতুতো ভায়ের—

আর বলতে হলো না। তাকে থামিয়ে দিয়ে সুব্রত বললে, এরকম মাস্‌তুতো ভাই তোমার আর ক'টি আছে জানতে পারি কি?

লাবণ্য নীরবে ঘাড় নীচু করে রইল।

বলো—উত্তর দাও—শিগ্‌গির—। তারপর গদির তলা থেকে সেই চিঠিখানা

নিয়ে লাবণ্যর পায়ের কাছে ফেলে দিতে দিতে বললে, তোমার কোন্ মাসিমার ছেলে জানতে পারি কি ?

লাবণ্যর মুখ নিমেষে মড়ার মত কাঠ হয়ে গেল। সুব্রত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, বলো শিগগির ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ?

লাবণ্য নিরুত্তর।

বলবে না ?

এবার লাবণ্য অস্ফুটস্বরে বললে, সে ত ওই চিঠিতেই লেখা আছে !

আমি কতবার তোমায় নিষেধ করেছি ওদের সঙ্গে মিশতে। আমি বুঝি এ বাড়ীর চাকর যে আমার কথার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে ! যত বখাটে ছোঁড়ার দল কংগ্রেসের নাম ক'রে ওখানে গিয়ে জুটেছে মেয়েদের সঙ্গে বদমাইসী করবার জন্যে, তারাই তোমার আপন !

লাবণ্য এবার চোখ তুলে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, আমার সামনে তাদের নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না বলছি।

ওঃ, পিরীত যে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে দেখছি ! তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ করবো দেবো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তারা যা ইচ্ছে তাই করবে, আর তাই আমাকে দেখতে হবে !

ছিঃ—তাদের নাম আর তুমি মুখে উচ্চারণ করো না।

কেন ? তারা বুঝি দেবতা।

সহসা লাবণ্যর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বললে, হ্যাঁ তাই। তোমার কাছে তারা দেবতা। কি করছো তুমি মানুষের জন্যে ! শুধু মদ খাও আর বেশ্যার ঘরে গিয়ে পড়ে থাকো, লজ্জা করে না তোমার তাদের নামে কলঙ্ক দিতে !

হুঁ, বুঝেছি এখন, কেন তুমি আমায় মাতাল, লম্পট জেনেও বিয়ে করেছিলে। ভেবেছিলে ও ত বাড়ী থাকে না—তাহলে বেশ সুবিধে হবে—ডুবে ডুবে জল খেলেও শিবের বাবা জানতে পারবে না।

স্পর্দ্ধিতস্বরে লাবণ্য বললে, তাই যদি মনে করো ত বাড়ীতে থেকে স্ত্রীকে পাহারা দিয়ে দেখলেই পারো।

চুপ্, লজ্জা করছে না কথা কইতে ! বদ্মাইস্ লম্পট ! আমারই খেয়ে আমারই ঘরে বসে আবার আমাকেই শাসন ?

লাবণ্য বললে, তুমি যদি মাথাটা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখতে তাহ'লে বুঝতে পারতে যে লজ্জাটা আমার চেয়ে তোমারই করা উচিত ছিল। যার জন্যে তুমি আমায় দোষ দিচ্ছ সে অন্যায় বরং তুমিই করছো প্রতিদিন আমার ওপর। ভেবেছিলুম কিছু বলবো না। যেদিন মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে সেইদিন সব বলবো। কিন্তু দিন দিন তোমার মাতলামি যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে আর চুপ করে থাকা শোভন হবে না ! উত্তেজনায় লাবণ্যর কণ্ঠস্বর থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে বললে, তুমি কি ভেবেছ যে বিয়ে করেছ ব'লে যা ইচ্ছে

অত্যাচার আমার ওপর করবে !

সুব্রত কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় পিসিমার গলা পেল, তুই কি মনে করেছিস্ সুবি, মেয়েটাকে কি অমনি ক'রে রোজ রোজ দু'পায়ে থেঁতলাবার জন্যে বিয়ে করতে গিয়েছিলি—এতে বুঝি বংশের মর্যাদা বাড়ছে ?

সাহসা লাবণ্যের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে সুব্রতকে অনুনয় ক'রে বলল, দোহাই তোমার, পিসিমাকে কিছু বলো না, তাঁকে মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিলুম, শুনলে তিনি বড় ব্যথা পাবেন।

সুব্রত বললে, তিনি ব্যথা পাবেন—আর কেউ ব্যথা পেলে বুঝি তোমার কিছু এসে যায় না !

ক্ষমা করো, আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না। এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

সুব্রত চেঁচিয়ে উঠলো, ক্ষমা চাচ্ছি বললেই সব চুকে গেল না ! দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে সব, চলে যাও শিগগির—

পিসিমা বললেন কি হয়েছে, এত চেঁচাছিস্ কেন ?

সুব্রত একটু থেমে বললে, কিছু হয়নি তুমি ভেতরে যাও।

লাবণ্যরা বাড়ীর ভেতরে চলে যেতে সুব্রত একটা মদের বোতল আলমারী থেকে বার করে ঢকঢক ক'রে খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে।

১৪

এর পরে কিছুদিন সুব্রত লাবণ্যর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলে। এমন কি মধ্যে মধ্যে তাকে কাছে ডেকে প্রেম নিবেদনও করলে। কিন্তু বেশীদিন তা টিকলো না। আবার এক কাণ্ড ঘটলো। শঙ্করের এক চিঠি এলো লাবণ্যর নামে এবং পিওন এসে একেবারে সুব্রতর হাতেই সেটা দিয়ে গেল। পোস্ট অফিসের বহু ছাপ মারা সেই খামটায় জেলখানার ঠিকানা দেখে সুব্রতর কৌতূহল আরো বাড়লো। জেলখানা থেকে আবার কে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখলে !

চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। আগেই সে পত্রপ্রেরকের নামটা দেখে নিয়েছিল। কিন্তু 'ইতি তোমার শঙ্করদা' পড়েই সুব্রতর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। তারপর চিঠিটা গোড়া থেকে পড়তে সুরু করলে। হিজলী জেলখানা থেকে সে লিখছে—লাবণ্য, তোমার চিঠিখানা নানা জেলখানা ঘুরে ঠিক ছ'মাস পরে আজ আমার হাতে এসে পড়লো। হৈমন্তীর চিঠি থেকে তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আমার কানে এসেছে। তুমি বিয়ে করেছো এবং বিরাট বড়লোকের সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়েছে একথা শুনে ভারী খুশি হয়েছি। আশা করি মনের সুখে ঘরকন্না করছো। এই কথাটা শুনে মনে সবচেয়ে বেশী আনন্দ হলো যে এখনো তুমি দেশসেবার আদর্শতে বিস্মৃত

হওনি, এখনো আমার কল্পনাকে সত্যে পরিণত করবার জন্যে তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করছো। এর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার মনস্কামনা সফল করেন। তুমি লিখেছো একদিন যেন তোমাদের জনকল্যাণ সঙ্ঘকে দেখতে যাই। একদিন কেন, যেদিন প্রথম এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাবো সেইদিনই কুসুমপুরে গিয়ে তোমার জনকল্যাণ সঙ্ঘ চোখে দেখে জীবন সার্থক করে আসবো। তোমার নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করলুম।

পুনশ্চ দিয়ে, চিঠির এককোণে আবার লিখেছে, হ্যাঁ একটা আনন্দ সংবাদ জানাই, এইমাত্র খবর এলো যে পনেরই আগস্ট যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে, তার ঠিক আগের দিন আমি এখান থেকে মুক্তি পাবো। তাহ'লে ওইদিনই আমি কুসুমপুর রওনা হবো—কথা রইল। বন্দেমাতরম্।

চিঠিখানা বার দুই সুব্রত পড়লে। তারপর উন্মাদের মত ঘরে পায়চারী করতে লাগল। একবার মনে হ'ল এখনি ছুটে গিয়ে লাবণ্যর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এনে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে চাবুক মারে। আবার মনে হলো—না, এতে ওর মত শয়তানীর কিছু হবে না—এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে শুধু ও নয়—ওর চোদ্দপুরুষের পর্যন্ত মনে থাকে।

তাড়াতাড়ি আলমারীটা খুলে খানিকটা মদ খেয়ে নিলে তারপর চাবুক বার করে সে টেবিলের ওপর রেখে চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালে লাবণ্যকে।

ঘরে এসে ঢুকেই লাবণ্য-মদের গন্ধ পেলে এবং সামনে চাবুকটা দেখে বুঝতে পারলে ব্যাপার সুবিধার নয়। তাই মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে জিজ্ঞেস করলে, আমায় ডেকেছো!

সুব্রত যেন শুনতে পায়নি, এইভাবে সামনের জানলাটা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে রইল!

একটুখানি অপেক্ষা করে লাবণ্য আবার বললে, আমায় ডাকছিলে কেন?

এইবার জানলার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে লাবণ্যকে সে বললে, আচ্ছা বলতে পারো যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে গোপন ক'রে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম চালায়, তারপর স্বামী যদি তা ধরে ফেলে তখন তার কি শাস্তি হওয়া উচিত?

লাবণ্য একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, ওটা বলা আমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা সেটা সেই স্বামীর ওপর-ই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে—স্বামীর চরিত্র কেমন—স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা কতটা আন্তরিক—সেটা আগে বিচার করতে হবে। একজন দুশ্চরিত্র লম্পট স্বামী যদি স্ত্রীকে শাস্তি দিতে যায় তা'হলে শুধু বিবেকের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকেও তিনি তার অধিকারী নন!

সুব্রত বললে, কিন্তু সেই স্ত্রী যদি নিজেকে সতীসাবিত্রী বলে অনবরত প্রচার করেন তাহ'লে—

তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। মিথ্যা কথা বলার অপরাধের জন্যেও তার শাস্তি

পাওয়া উচিত।

সুব্রত এর ওপর আর কোন কথা না বলে সেই চিঠিখানা বাঁ হাতে ক'রে ছুঁড়ে দিলে লাবণ্যর গায়ের ওপর।

লাবণ্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই দেখলে শঙ্করদা তাকে দিয়েছে—জেলখানা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। চিঠিখানা সে নিঃশব্দে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললে এবং বারবার কেবল সেই কথাটাই তার মনে হতে লাগল—চৌদ্দই আগস্ট সে মুক্তি পাবে। আনন্দে তার হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁপতে লাগল।

আড়চোখে লাবণ্যর মুখের দিকে চেয়ে সুব্রত বললে, তাহলে কি শাস্তি তোমার হওয়া দরকার!

এ তো আমার শঙ্করদার চিঠি!

সুব্রত কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করে বললে, তোমার এরকম দাদা আর কতগুলো আছে বলতে পারো লাবণ্য! আমি মাতাল হতে পারি, লম্পট হতে পারি কিন্তু আমার এটুকু বোঝবারও কি ক্ষমতা নাই যে তুমি প্রেমের কারবার কিভাবে চালিয়ে যাচ্ছো আমাকে ফাঁকি দিয়ে?

ফাঁকি দিয়ে! কি বলছো তুমি!

কেন বলবো না—এর আগে কোনদিন ত এই শঙ্করদার কথা তোমার মুখে শুনিনি, যদি সত্যি তোমাদের সম্পর্ক ভাল হতো তাহ'লে কেন গোপন করেছিলে তার নাম এতদিন? তা ছাড়া কত আর ধরবো এরকম। সেদিন মেডিক্যাল কলেজের ব্যাপারটা হঠাৎ ধরা পড়ে গেল—আজ আবার এই চিঠিটা আমার হাতে এসে পড়লো তাই জানতে পারলুম। বাড়ীতে আমি থাকি না—আরো কত কি আসে তা তুমিই জানো! তারপর একটু থেমে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি কি ভেবেছো এইভাবে আমাদের কুলে কালি দেবে আর আমি তা সহ্য করবো—তা হবে না? আজ থেকে আমার হুকুম বাড়ীর বাইরে এক পা আর তুমি বেরুতে পারবে না। আর কোন চিঠিপত্র তোমার হাতে কেউ দেবে না এবং তুমিও কাউকে কিছু লিখতে পারবে না। সমস্ত চাকর দারোয়ানদের ডেকে আমি এখুনি বলে দিচ্ছি! বলতে বলতে সুব্রত বাইরে বেরিয়ে গেল।

স্বামীর এই শ্রেণীর অপমান লাবণ্যর গা-সওয়া হয়ে গেছে। তার সঙ্গে তর্ক করতেও এখন তার ঘৃণা হয়! তাই চুপ করে থাকে। নেহাৎ খুব অসহ্য না হলে কথা কয় না। যে মাতাল সব সময় মদের ঝোঁকে থাকে তার কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার যে কোন অর্থ হয় না তা সে জানে। কিন্তু চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বন্ধ করাতে লাবণ্য অত্যন্ত অসুবিধায় পড়লো। খুব যে সে চিঠি লিখতো যাকে তাকে তা নয়। সবচেয়ে কষ্ট তার হতে লাগল শঙ্করদার সেই মুক্তির খবরটা জনকল্যাণ সঙ্ঘের সম্পাদককে জানাতে পারছে না বলে। মতিবাবু সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়েছে সে খবর

ইতিপূর্বে সে পেয়েছিল। অথচ এদিকে দিনও আর বেশী নেই, শঙ্করদাকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা করতে সময়ও লাগবে। তাই অস্থির হয়ে ওঠে লাবণ্য। এদিকে বাড়ী থেকে বাইরে যাবারও তার হুকুম নেই। কি করবে তাই লাবণ্য ভেবে সারা হয়। রাত্রে ঘুম আসে না, অনেকদিন চোখের জলে বালিশ ভিজে ওঠে। শঙ্করদা তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এতদিন পরে আসছে, অথচ সে যেতে পারবে না তাকে অভ্যর্থনা জানাতে? এ কি সম্ভব?

একবার ভাবে সুব্রতর পায়ে ধরে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে তার মনে হয় তা'হলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে। সব কথা তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকেই হয়ত আবার বিকৃত ক'রে দ্বিগুণ গালিগালাজ করবে—ফলে তার মুখ দেখানো ভার হবে।

শঙ্করের মুক্তির দিন যত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তত যেন লাবণ্য পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছটফট করে। এক একবার তার মনে হয় অন্ততঃ খবরটাও যদি মতিলালের কাছে সে কোনমতে পেঁছে দিতে পারতো, তা'হলে শঙ্করদার অভ্যর্থনার জন্যে তাকে আর কোনরকম চিন্তা করতে হতো না—না হয় সে উপস্থিত হতে নাই পারলে। লাবণ্য ভাবে তার এই অনুপস্থিতিতে শঙ্করদা তার সম্বন্ধে আরো বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠবে। আর সেই হবে তার পুরস্কার। সেই ভালো! সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয় কিন্তু সে যে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে এবং শঙ্করদার জন্যেই যে এইভাবে কত ত্যাগ স্বীকার করেছে, কত দুঃখ জ্বালা বহন করেছে সেটা একবার নিজে মুখে তাকে না জানিয়ে দিলে সে কি ক'রে জানবে। কে তাকে শোনাবে তার কথা? শঙ্করদা যে রকম আত্মভোলা উদাসীন প্রকৃতির লোক হয়ত লাবণ্যকে দেখতে না পেলে ভাববে, সে এমন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করছে, যে ভুলে গিয়েছে তার কথা। তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। সে যাবেই—যেমন করে হোক যাবেই। কিন্তু তার আগে খবরটা কি ক'রে পেঁছবে মতিলালের কাছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব এল। পরের দিন ছিল রবিবার, সেদিন মেথরাণী আসে বাড়ীর ও বাইরের ড্রেন পরিষ্কার করতে, আর তার সঙ্গে আসে তার একটা বছর বারোর ছেলে! ব্যস আর পায় কে! তৎক্ষণাৎ সে বিছানা থেকে নেমে এলো। এবং আলো জেবলে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে মতিলালকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখলে। তাতে সব কথাই সে খুলে লিখলে। শঙ্করদাকে জেল থেকে নিয়ে আসবার ভারও সে তার ওপর দিলে এবং তার যাওয়াটা যে অনিশ্চিত সে কথাটাও জানালে। তবে যাবার জন্যে যে সে বিশেষ চেষ্টা করবে, তা বলা বাহুল্য।

পরের দিন চুপি চুপি সেই মেথরানীর ছেলেকে চারটে পয়সা জল খেতে দিয়ে চিঠিখানা লাবণ্য ডাক বাক্সয় ফেলে দিতে দিলে। বাড়ীর ঝি চাকরদের ওপর কড়া হুকুম ছিল তাই তাদের আর সে বিশ্বাস করে না। পিসিমা পর্যন্ত ইদানীং বিরক্ত তার ওপর। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে সে যেন একা। তার কোন সঙ্গী নেই,

মনের কথা পর্যন্ত বলার একটা দ্বিতীয় লোক নেই। শুধু শ্বশুরের আমলের এক আলমারী পুরানো বই ও সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো বড় সাইজের কতকগুলো গ্রন্থাবলী, তার একমাত্র সাথী! এছাড়া খবরের কাগজ আসে প্রতিদিন তার স্বামীর নামে। তা নিয়েও সময় কাটে অনেকটা। আগে চরকা কাটতে অনেকটা সময় তার মন ব্যস্ত থাকতো ইদানীং আবার তাও বারণ! কাজেই লাবণ্য সর্বদা মনগুমরে থাকে। তার ওপর সুব্রতর নির্লজ্জ গোয়েন্দাগিরি যেন দিন দিন বাড়ছে। আজকাল ঘন ঘন বাড়ীতে আসে লাবণ্যর ওপর কড়াদৃষ্টি রাখবার জন্যে। আবার মুখে সেকথা স্পষ্টই তাকে জানিয়ে দেয়।

লাবণ্য স্বামীর এই ঘৃণিত উক্তিতে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় না। সে শুধু ভাবে কি ক'রে শঙ্করদাকে অভ্যর্থনা জানাতে যাবে। লাবণ্য মনে করেছিল যা হবার হবে তবু সুব্রতর কাছে গোপন না করে তাকে বলে চলে যাবে একদিনের জন্যে। আবার ভাবে মাতালের খেয়াল বলা যায় না, হয়ত ঘরেতে চাবি দিয়েই তাকে আটকে রেখে দেবে। তাছাড়া শঙ্করদার ওপর তার রাগটা যেন সবচেয়ে বেশী। তার চিঠির মধ্যে নাকি এমন আবেগ ছিল যা থেকে তার বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে তাদের মধ্যে কোথায় একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাই যখন আর একদিন বাকী আছে তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ শুকিয়ে উঠলো। আহার নিদ্রা সব ভুলে গিয়ে সে কেবলি চিন্তা করতে লাগল কি করবে। শেষে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রে স্থির করলে, শঙ্করদাকে অভ্যর্থনা জানাতে সে যাবে-ই। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না—কারুর কথা সে শুনবে না। সে ত কোন অন্যায় করতে যাচ্ছে না। যাকে সে দেবতা জ্ঞানে পূজো ক'রে এসেছে, যার আদর্শে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছে। তার-ই আমন্ত্রণে আসছে শঙ্করদা আর সে থাকবে অনুপস্থিত! অসম্ভব! সে যাবেই স্থির করলে এবং সেদিন রাত্রেই যাবে—কাল শঙ্করদা আসবে।

কিন্তু সেই দিনই সুব্রত হঠাৎ বাড়ীতে এসে পড়লো সন্ধ্যের সময়! তার গলার আওয়াজ পেয়ে লাবণ্যর বুক কেঁপে উঠলো।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি তার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলে যাতে খেয়ে উঠে শিগগির সুব্রত ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ সেদিনই তার যেন কি হলো আলো জেবলে জমিদারীর কি হিসাব-নিকাশ করতে বসলো।

লাবণ্য তার বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রার ভান ক'রে পড়ে রইল এবং ঘড়ি যতই বাজতে থাকে মনে মনে সে ততই প্রমাদ গোনে। ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো, একটাও বেজে গেল—তখনো সে শুতে এলো না দেখে লাবণ্য চিন্তায় পড়লো। শেষে যখন রাত্তির দেড়টা বাজলো, তখন সুব্রত আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

একটু পরে তার নাক ডাকছে শুনে লাবণ্য নিশ্চিন্ত হ'লো। কিন্তু এত রাত্রে সে যাবে কোথায়, একা? তাই ভোরের অপেক্ষায় জেগে রইল। শেষে সাড়ে

তিনটে বাজতে লাবণ্য ধীরে ধীরে উঠে আলমারী খুলে একখানা ভাল শাড়ী পরে নিলে তারপর ছোট দু'লাইন চিঠি লিখলে সুব্রতকে—"আমি বিশেষ দরকারে কুসুমপুরে যাচ্ছি কালই ফিরবো। তোমার অনুমতি চেয়ে নেবো ভেবেছিলুম কিন্তু পাছে তুমি না দাও তাই চিঠিতে অনুমতি চেয়ে নিয়ে চললুম। তুমি আমার অনেক উপদ্রব সহ্য করেছো—তাই এই শেষ প্রার্থনা এবারটাও আগের মত আমায় ক্ষমা করো।"

চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য চুপি চুপি খিড়কীর দরজাটা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। এবং একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলো কুসুমপুরের দিকে।

কুসুমপুরে পৌঁছে লাবণ্য অবাক হয়ে গেল। কি সুন্দর সাজানো গ্রামখানা, রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় ফটক—ফুলে লতায় পাতায় ঝলমল করছে—তাদের কোনটা গান্ধী তোরণ, কোনটা সুভাষ তোরণ, কোনটা বা নেহেরু তোরণ। আর জনকল্যাণ সঙ্ঘের প্রবেশ পথে যেটা প্রধান তোরণ, তার নীচে লাল শালুর ওপর লেখা—শঙ্করনাথ তোরণ।' এটা দেখে লাবণ্যর চোখে আনন্দে জল ভরে এলো। এই তোরণের মধ্যে দিয়ে ঢুকেই সামনে জনকল্যাণ সঙ্ঘের বিরাট প্রাঙ্গণ, তার ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজানো এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ। মণ্ডপের চারিপাশে বাঁশের খুঁটী দেবদারুপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো। তারি এক-একটাতে ঝুলছে দেশপুজ্য নেতাদের সব ছবি! আর সেই মণ্ডপের মাঝখানে শঙ্করনাথের বসবার আসন। কি চমৎকার সাজানো, মনে মনে লাবণ্য মতিলালকে ধন্যবাদ জানালে।

মতিলাল তাকে দেখে ছুটে এলো অভ্যর্থনা জানাতে। বললে, বড় খুশি হলুম আপনাকে পেয়ে। ভেবেছিলুম বুঝি আর এলেন না আপনি, দেখুন যদি কোথাও কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, ছেলেরা প্রস্তুত আছে সব ঠিক করে দেবে। আমি কয়েকজন ছেলে নিয়ে এখনি চললুম হিজলীর দিকে। সেখানে একখানা মোটর গাড়ী সাজানো প্রস্তুত আছে—শঙ্করদাকে নিয়ে তারা আসবে, আমরা গিয়ে পথে তাদের অভ্যর্থনা জানাবো। আপনার ওপর এইখানে বরণ করার ভার। আপনি এই প্রধান তোরণে অপেক্ষা করুন—সব প্রস্তুত আছে। এই বলে মতিলাল তখনি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শাঁখ বাজাতে বাজাতে ফুলের ডালা হাতে এলো ছোটবড় মেয়েদের দল—তারা তোরণের উভয় পার্শ্বে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের পরণে লালপাড় বাসন্তী রঙের শাড়ী—মাথায় ফুল গোঁজা! আর সকলের আগে ঘড়াভরা জল ও বরণডালা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল লাবণ্য। তার চোখমুখ দিয়ে যেন উপচে পড়ছে কিসের আনন্দ।

দূর পথের শেষ বাঁকটার দিকে সে চেয়েছিল, অধীর আগ্রহে। কেবলি তার মনে হচ্ছিল—ওই বুঝি এলো—ওই বুঝি এলো!

ছোট ছেলের মত তার মন যেন আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিল না। তাই বার বার

তার আশা বিফল হচ্ছিল।

সহসা সুসজ্জিত সেই মোটর গাড়ীটা তার দৃষ্টিপথে আসতে লাবণ্য একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠলো। রাস্তায় দু'পাশে যে জনতা অপেক্ষা করছিল তারা চীৎকার ক'রে উঠলো, 'বন্দেমাতরম্' 'সুভাষচন্দ্র কি জয়' 'শংকরনাথকী জয়' বলে! মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলো অভ্যর্থনা সঙ্গীত! শঙ্খে শঙ্খে বাজলো মঙ্গলধ্বনি।

লাবণ্যর সামনে মোটরগাড়ীটা এসে দাঁড়াতেই সে আগে পূর্ণ-কলসটার জল সেই গাড়ীর চাকায় ঢেলে দিলে। তারপর বরণডালা হাতে নিয়ে শংকরদার সামনে গিয়ে যেমন চন্দনের টিপ তার কপালে পরালো অমনি 'বুক গেল', 'বুক গেল', করতে করতে দু'হাতে প্রাণপণে বুকটা চেপে ধরে শংকর সেখানে লুটিয়ে পড়লো।

'থামাও গান, বন্ধ করো শঙ্খধ্বনি—বলে চীৎকার ক'রে উঠলো মতিলাল। তারপর ভীড় ছাড়ুন ভীড় ছাড়ুন—পাখা পাখা, জল জল—রব উঠলো চারিদিকে।

লাবণ্য ছুটে গিয়ে ফটকের মঙ্গলকলসটা উঠিয়ে নিয়ে এসে শংকরের মুখে চোখে জল ছিটে দিতে লাগল। তিন চার জন কোথা থেকে তিন-চারখানা পাখা হাতে ক'রে ছুটে এসে একসঙ্গে বাতাস করতে লাগল শংকরের মাথায়।

মতিলাল তখন মোটরটাকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আশ্রমের সামনে দাঁড় করালে। তারপর সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে শংকরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে! মতিলাল ঘরের ভেতর থেকে তখনি সকলকে চলে যেতে বললে। শুধু লাবণ্য ও আর দু'চারজন লোক সেখানে রইল। লাবণ্য ভয়ার্তমুখে মতিলালকে জিজ্ঞেস করলে, কি হবে কোন কথা বলছে না কেন—বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে—শিগ্গির ডাক্তারকে খবর পাঠান? কেন এমন হ'লো!

মতিলাল্ বললে, বেশ ত আসছিলেন, হঠাৎ এই চন্দনের টিপটা পরাবার সঙ্গে সঙ্গেই এমনি হয়ে পড়লেন। অত্যধিক উত্তেজনায় এরকম হয় শুনেছি। বোধহয় তাই হবে! কিছু চিন্তা করবেন না—জোরে জোরে হাওয়া করুন—আমি ডাক্তার আনতে মোটরে ক'রে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

লাবণ্য হাওয়া করতে করতে দু'একবার ব্যাকুল স্বরে ডাকলে, শংকরদা, শংকরদা? কিন্তু কোন উত্তর এলো না। জলের ঝাপটা আরো দু'একবার সে দিলে। কিন্তু তবু কোনো সাড়া মিললো না। আরো একটু পরে তেমনি নীরব থেকে শেষে 'উঃ বুক গেল'—ব'লে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একেবারে লাবণ্যর কোলের কাছে মুখটা নিয়ে এলো।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি তার মাথাটা তুলে কোলের উপর যেই রাখতে গেল অমনি অক্ অক্ ক'রে ঝলকে ঝলকে রক্তবমি করতে লাগল শংকর। লাবণ্যর সর্বাঙ্গ সে রক্তে লাল হয়ে উঠলো। ভয়ে তার মুখচোখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। হাত পা ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। আঁচলের প্রান্ত দিয়ে শংকরদার মুখটা মুছিয়ে দিতেই

ঘাড়টা গুঁজে আবার সে শুয়ে পড়লো।

লাবণ্য মুখটা নীচু ক'রে বললে, শঙ্করদা কি কষ্ট হচ্ছে ?

কে তার কথার জবাব দেবে ! শঙ্কর তখনো অজ্ঞান অচৈতন্য !

একটু পরেই ডাক্তার এলো। বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে বললে, হোপলেস্, বুকে কিছু নেই—দু'দিকটাই ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে—এ শক্‌টা কাটিয়ে ওঠা শক্ত !

লাবণ্যর চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসতে চাইল কিন্তু পাষাণমূর্তির মত কঠিন হয়ে সে বসে রইল, তেমনি ভাবে শঙ্করের মাথাটা কোলে নিয়ে।

মতিলাল একটু পরে এসে বললে, অনেকক্ষণ আপনি একভাবে বসে আছেন এইবার একটু কাপড় ছেড়ে মুখে হাতে জল দিয়ে আসুন—আমার ঘরে একটি মেয়ে শাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে, যান্।

মতিলাল সকলের সামনে লাবণ্যকে আপনি বলতো এবং জমিদারের স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ভুল করতো না। লাবণ্য বললে, আমি এখান থেকে এখন উঠবো না—আমায় দয়া করে কোন অনুরোধ করবেন না।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে অপরাহ্ণও যখন যায় যায় তখন হঠাৎ আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলো শঙ্কর। সকলে মনে করলে হয়ত জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু তা যে জ্ঞান নয় বিকারের ঘোর, তা বুঝতে কারুরই বিলম্ব হলো না।

কিন্তু লাবণ্য তখনো আশা ছাড়েনি। তার মনে হতে লাগল হয়ত জ্ঞান আসছে, তাই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগল, শঙ্করদা, শঙ্করদা —চেয়ে দেখো, এই যে আমি এসেছি—

চোখ চেয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে লাবণ্যর মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর যেন কি খুঁজতে চেষ্টা করে। লাবণ্যর বুক এইবার উৎসাহে ভরে ওঠে। সে বলে, শঙ্করদা. আমায় চিনতে পারছো না ?

কে তুমি ? বলে শঙ্কর এবার চেঁচিয়ে উঠলো।

লাবণ্য একটু চুপ ক'রে থেকে জবাব দিলে, আমি···আমি···তোমার লাবণ্য শঙ্করদা !

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের চোখ যেন স্তিমিত হয়ে এলো, কণ্ঠস্বরও বুজে আসতে লাগল। তবু অস্ফুট স্বরে সে বললে, লাবণ্য ? কে লাবণ্য ?

চিনতে পারছে না, তোমার লাবণ্যকে ? বলতে বলতে কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে এলো তার গলা কিন্তু প্রাণপণে সে তা সামলে নিলে !

না—না—আমি চিনি না তোমায়—বলে সহসা শঙ্কর চীৎকার ক'রে উঠলো !

আবার কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সমস্ত ঘরটায় যেন কিসের আতঙ্ক থমথম করে !

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। হঠাৎ একসময় আবার শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলো, দাও—দাও আমাকে ওই পতাকাটা দাও—আমি সব ঘরে ঘরে তুলে দেবো। বলতে বলতে শঙ্করের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠলো—আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা লাবণ্যর কোল থেকে ঢলে পড়লো।

লাবণ্য চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো, শঙ্করদা, শঙ্করদা, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে !

লাবণ্যর কান্না শুনে তখনি ছুটে এলো লোকজন, আশ্রমের চারিদিক থেকে। ঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল ! সকলের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। শোকে যেন সবাই স্তব্ধ ও মুহ্যমান !

সহসা সেই নিশীথ রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে যেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠলো। ভারতের ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে— এক অভুতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দিল। দু'শো বছরের পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষ এইমাত্র পেলে মুক্তি !

নিমেষে সকলে সচকিত হয়ে উঠলো। সকলে যেন এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিল এর কারণটা। তাই শঙ্খধ্বনি কানে যেতেই, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়াটাও যেন একেবারে বদলে গেল। সকলের মুখে চোখে যে কি অদ্ভুত ভাব তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না !

ভারতবর্ষের বহু বাঞ্ছিত, বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা আজ এলো। সেই মহাশুভক্ষণ, সেই মহামুহূর্তের সূচনা তাই বিঘোষিত হলো। শঙ্খে শঙ্খে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তা যেন অনন্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। শঙ্খধ্বনি নয়, ও যেন কোটি কোটি ভারতবাসীর মুক্তি ! আত্মার প্রথম অর্ঘ !

সকলের সঙ্গে লাবণ্যরও মনে পড়ে গেল সেই কথা। শঙ্করের মুখের দিকে এতক্ষণ সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিল। হঠাৎ সেই শঙ্খধ্বনি কানে যেতে চমকে উঠে আপনমনে সে বলে উঠলো, তবে কি ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিয়ে শঙ্করদা তুমি চলে গেলে ! তোমার ব্রত পূর্ণ করার জন্যে কি এই মহাক্ষণটি পর্যন্ত বেঁচে ছিলে ?

লাবণ্যর চোখের দু'কোণ ছাপিয়ে জল পড়লো।

মতিলাল ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, এইবার, আপনি উঠুন এখান থেকে—চলুন ভেতরে—আপনার কাজ ত সব শেষ হয়েছে !

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাবণ্য মতিলালের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, শেষ হয়েছে ? না—না—এখনো ত আমার কাজ শেষ হয়নি—তার আসন যে এখনো শূন্য পড়ে রয়েছে—শেষ অভ্যর্থনা যে তাকে সেখানে করতে হবে মতিবাবু ?

মতিলাল বললে, আপনার ইচ্ছা আমি কোথাও এতটুকু অপূর্ণ রাখবো না। এখনি আমি আমাদের এই পরম অতিথিকে তাঁর সুসজ্জিত আসনে নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলে একটু পরে মণ্ডপের মধ্যস্থলে প্রস্তুত চিতার ওপর তার মৃতদেহ রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করলে।

শুধু সেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা নয়—সারা ভারতের নরনারী যখন দীর্ঘ

রাত্রি ধরে স্বাধীনতার উৎসবে মগ্ন তখন শঙ্করের নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মে পরিণত হলো। তার সেই পূতচিতাগ্নির শেষ আভাটুকু মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুসুমপুরের বৃক্ষশ্রেণীর ঘন অরণ্যের মাথার ওপর সহস্র কিরণজাল বিস্তার করে নব অরুণোদয় হলো।

তখন গ্রামের পথে পথে প্রভাত ফেরী বেরিয়েছিল তাদের মিলিতকণ্ঠের রামধনু সঙ্গীত দূর থেকে এসে সেখানকার আকাশ-বাতাস সব যেন এক পবিত্র সুরে ভরিয়ে তুললে।

লাবণ্য চিতার দিকে চেয়ে এতক্ষণ পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে ছিল। সুব্রত ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর লাবণ্যর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, লাবণ্য এবার চলো?

লাবণ্য চমকে উঠে বললে, হ্যাঁ, চলো! এবার আমায় যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চলো—আর কিছু বলবো না তোমায়।

সান্ত্বনার সুরে সুব্রত বললে, আমি ত তোমায় কিছু বলিনি লাবণ্য—

এর জবাবে লাবণ্য শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সত্যি সুব্রতর যেন কি হয়েছে! লাবণ্যর চিঠিখানা ঘুম ভেঙ্গে উঠে পেয়েই ক্রোধে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। এবং দুপুরের গাড়ীতেই ছুটে এসেছিল লাবণ্যকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সেখানে পৌঁছে লাবণ্যকে ওই অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! সাহস হ'লো না তার লাবণ্যর সেই সেবাময়ী দেবীমূর্তির কাছে এগিয়ে যেতে!

লাবণ্য এসবের কিছুই জানতো না। তাই সুব্রতর সঙ্গে যেমন এক পা এগিয়েছে অমনি মতিলাল ছুটতে ছুটতে এসে হাতজোড় ক'রে সুব্রতকে বললে, এখানে একটু বিশ্রাম না ক'রেই এখনি চলে যাবেন? আপনি আমাদের আশ্রমে প্রথম পদার্পণ করলেন কিন্তু এমনি সময়ে এলেন যে আপনার দিকে একেবারে মনোযোগ দিতে পারলুম না। বলে শুধু জমিদারবাবুকে নয়, লাবণ্যর স্বামীকেও যেন একই সঙ্গে সৌজন্য দেখাতে গেল। লাবণ্য যেন যন্ত্রচালিতের মত চলছিল. সে এর উত্তরে একটি কথাও বললে না। শুধু সুব্রত বললে, বিলক্ষণ, কাল সন্ধ্যে থেকে ত আপনাদের এখানে রয়েছি এরই মধ্যে আপনারা আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখিয়েছেন তা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। তারপর একটু থেমে আবার বললে, বরং আর একদিন এসে দেখে যাবো।

মতিলাল হাত দুটো কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, বহু ধন্যবাদ। আপনার পায়ের ধুলো পড়লে—আমরা কৃতার্থ হবো।

ছি-ছিঃ—কি যে বলেন। আমি অতিনগণ্য আপনাদের কাছে! বলতে বলতে সুব্রত লাবণ্যকে নিয়ে চলে গেল। সুব্রতর মত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকের মুখ থেকে এই রকম বিনয়-বাক্য শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলো! এমন কি লাবণ্যও।

পরের দিন বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় যাবার জন্যে সুব্রত ও লাবণ্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখন হাঁপাতে হাঁপাতে মতিলাল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। তাকে দেখেই সুব্রত বলে উঠলো, এই যে আসুন, আসুন, বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি ওকে—

বলে ভেতরে গিয়ে লাবণ্যকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে।

লাবণ্য সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মতিলাল যেন কেমন হয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হলো কি যেন সে লাবণ্যকে বলতে চায় অথচ কিছুতেই তা মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

লাবণ্য জিজ্ঞাসুনেত্রে তার মুখের দিকে তাকাতে, মতিলাল একটু ইতস্তত ক'রে বলে ফেললে, আজকেই চলে যাচ্ছো?

সংক্ষেপে শুধু 'হ্যাঁ' বলেই লাবণ্য আবার চুপ করলো।

মতিলাল এরপরে কি বলবে যেন ভেবেই পেলে না। তাই আরো একটু চুপ ক'রে থেকে নিঃশব্দে শুধু লাবণ্যর মুখের দিকে একবার চোখ মেলে তাকালে।

লাবণ্যও কিছুক্ষণ তেমনি নীরব থেকে শেষে মৃদু ও স্নিগ্ধস্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলে, আমাকে কি আর কিছু বলতে চান?

লাবণ্যর কণ্ঠের এই কোমলতায় মতিলালের মন নিমেষে যেন আর্দ্র হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি নিজের কণ্ঠে জোর এনে বললে, বলতে চাই? না—হ্যাঁ —না—তবে এমন কিছু নয়। বলে মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে আবার বললে, এই বলছিলুম কি আর কি এদিকে আসবে না কোন দিন লাবণ্য?

'হ্যাঁ' কি 'না'—কি বলবে লাবণ্য তাই যেন ভেবে পেলে না। তাই আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে শুধু বললে, বলতে পারি না।

আর একটা কথাও না বলে মতিলাল সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরলে এবং নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

লাবণ্যও কোন কথা না বলে শুধু চিত্রার্পিতের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মতিলালের মূর্তিটা ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে থেকে দূরে চলে গেল।

কলকাতায় ফিরে এবার লাবণ্য একটু বিস্মিত হলো সুব্রতর ব্যবহারে। সে ভেবেছিল হয়ত ফিরে এলে অনেক গালাগালি ও তিরস্কার শুনতে হবে তার কাছ থেকে। কিন্তু এই প্রথম হলো তার ব্যতিক্রম। ইদানীং সে লক্ষ্য করে প্রায়ই তার কাছে কাছে থেকে সুব্রত যেন সান্ত্বনা দিতে চায় তাকে। লাবণ্যর মনে যে গভীর একটা ব্যথা লেগেছে সেটা যেন সে অনুভব করেছে। তথাপি লাবণ্য সর্বদা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। সুব্রত তাকে যেসব ভালবাসার কথা বলে কিছুতেই যেন সে তা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তবু সুব্রতর আন্তরিকতা কমে না।

লাবণ্যর এই ভাবটা অনেকদিন থেকে সুব্রতও লক্ষ্য করে। ভাবে কালের

গতিতে আস্তে আস্তে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যত দিন যায় দেখে কিছুই হয় না। তাই সেও ভাবতে থাকে কি ক'রে লাবণ্যর মনটা ফেরাবে।

এমন সময় একদিন রাত্রে লাবণ্য হঠাৎ সুব্রতর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে, বললে, আমি আর পারছি না, আমায় তুমি কিছু দিনের জন্য বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও!

সুব্রত একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, বেশ ত! তবে আমি একটা অনুরোধ করবো বলো রাখবে?

লাবণ্য ধীর ও স্থির কণ্ঠে বললে, বলো?

সুব্রত একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে চাই ত নিয়ে যাবে?

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য যেন লাবণ্যর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর মৃদুকণ্ঠে সে বললে, কিন্তু সেখারে ত মদ পাওয়া যায় না।

সুব্রত বললে, ওটা আর দরকার হবে না—শুনলে তুমি বোধহয় বিশ্বাস করবে না, যে আমি কিছুদিন হলো ওটা ছেড়ে দিয়েছি।

লাবণ্য কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট ক'রে রইল, তারপর বললে, তাহ'লে আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে!

সুব্রত পরদিন লাবণ্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তীর্থ ভ্রমণে।

১৫

চাঁপার বিগ্রহ ভেঙে দিয়ে আসার পর থেকে কয়েকটা দিন শিবনাথের মনটা খুব খারাপ বোধ হতে লাগল। যখনই একা থাকে কে যেন তার মনের মধ্যে বলে ওঠে, কাজটা তুমি ভাল করলে না। হিন্দু বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শেষে কিনা বিগ্রহ ভাঙতে হুকুম দিলে? ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে ঘরে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থেমে পায়ের জুতো মাটিতে জোরে ঠুকে শিবনাথ বলে ওঠে, আলবত্ ভাঙবো। চাঁপার ওই ঠাকুর বড় না আমার পয়সা বড় দেখতে চাই। এতবড় স্পর্দ্ধা যে বলে কিনা আমার পয়সায় ওর ঠাকুরের পুজো হবে না! তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আপনমনেই সে বলে উঠলো, আমার পয়সা ঠাকুরের পুজোয় না লাগুক, ঠাকুর ভাঙবার কাজে ত লাগল। বলে নিজের অন্তরের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে খুব জোরে হেসে উঠলো। এই সময় চাকর এসে খবর দিলে যে তিনকড়িবাবু দেখা করতে এসেছেন।

শিবনাথ একটা সিগারেট মুখে দিয়ে লা-লা লা-লা করে ফিরিঙ্গী ঢঙে একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নীচের ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হোল। তারপর তিনকড়িকে দেখে একেবারে আনন্দে ফেটে পড়লো।

বললে, হ্যাল্লো, খবর কি সব? বলেই নিজের হাতের সিগারেটের বড় টিনটা তিনকড়ির সামনে খুলে ধরে বললে, তাহ'লে ঝুলনটা এবার কি রকম হচ্ছে!

তিনকড়ি যেন কথাটা লুফে নিলে। সিগারেটটা আঙ্গুল দিয়ে টেনে তুলতে তুলতে বললে, চাঁপা ত ভাগল্ বা?

ভাগল্ বা? সেকি? বলে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

তিনকড়ি বললে, হ্যাঁ, শুনেছি নাকি মনের দুঃখে একেবারে শ্রীবৃন্দাবন।

অট্টহাসি হেসে উঠলো, শিবনাথ। সে হাসির অর্থ যে কেমন হয়েছে, লাগতে এসো আমার সঙ্গে! তারপর সহসা গান ধরলে, 'আমি যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে যেথা আছে গুণনিধি।'

তিনকড়ি বললে, আর কোনদিন নাকি ফিরবে না।

এবার সিগারেটটা দু'টো আঙ্গুলে চেপে ধরে হাতটা নাড়তে নাড়তে ফিরিঙ্গী ঢঙে আবার গেয়ে উঠলে—লা-লা-লা-লা-লা-লা—লা।

তিনকড়ি ত অবাক! শিবনাথকে কোনদিন সে এত উৎফুল্ল হ'তে দেখেনি। তবে কি চাঁপা এর কারণ! তাকে সে তাড়িয়েছে বলে তার এত স্ফূর্তি! তাই তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তিনকড়ি বলে উঠলো, ওই যা, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি!

শিবনাথ বললে, আসল কথা? সেটা আবার কি!

তিনকড়ি হাতমুখ নেড়ে বললে, আপনার পথ এবার 'ক্লিয়ার' মানে যাকে বলে পরিষ্কার! বাবা, ওপরে ভগবান আছেন—তার কাছে ত আর চালাকী চলবে না? নেয্য বিচার! তা নাহ'লে যে আজীবন দেশের লোকের সেবা করে এলো সে হ'লো শত্রু, আর যারা দু'দিন জেলখেটে স্বদেশী ছাপ নিয়ে এলো তারা হলো দেশের নেতা? এত অন্যায় কি সয়, তাই ভগবান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এখন বোঝো ঠেলা!

শিবনাথ তিনুর এই উক্তির একবর্ণও বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কার কথা বলছো?

তিনকড়ি হাসতে হাসতে বললে, আপনার যে সবচেয়ে বড় শত্রু—তার কথা।

শিবনাথ কথাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলে না! ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করলে, কি বললে?

তিনকড়ি একগাল হেসে বললে, জানেন না আপনায় শঙ্কর যে পটল তুলেছে!

শিবনাথ চমকে উঠে বললে, সেকি? কবে মারা গেল? কৈ আমি ত কিছুই শুনিনি!

তিনকড়ি রসিকতা করে বললে, কি ক'রে শুনবেন। সে ত আর দেশে এসে মরেনি।

শিবনাথ বললে, ও জেলখানার ভেতরে বুঝি ?

তিনকড়ি দরদী কণ্ঠে বললে, তা হলে ত বাঁচতুম। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নাকি ছুটেছিল লাবণ্যর কাছে। কিন্তু এত বড় অন্যায় কি সহ্য হয়, তাই যাওয়া মাত্র বুক কেমন করছে বলেই একেবারে ফৌত !

কথাটা শেষ করেই তিনকড়ি লক্ষ্য করলে শিবনাথের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। শত্রুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শিবনাথ দ্বিগুণ উল্লসিত হ'য়ে উঠবে, তিনকড়ি এই রকমটাই আশা করেছিল তাই তার এই গাম্ভীর্য দেখে সে মনে মনে রীতিমত বিরক্ত হলো।

শিবনাথকে একটু সময় দিয়েও যখন দেখলে তার মনে কোন সাড়া নেই তখন সে নিজেই আবার শুরু করলে, রবিবার দিন বিকেলে তার জন্যে গ্রামে এক শোক-সভার আয়োজন হয়েছে।

সহসা শিবনাথের কণ্ঠে যেন উৎসাহের বন্যা আনলো। সে বললে, তাই নাকি ?

তিনকড়ি হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গ্রামের আদ্দেক লোক সেখানে যাবে না।

এইবার হো হো করে হেসে উঠে শিবনাথ বললে, জানি তুমি যখন আছো এর ভেতরে তখন একটা সুব্যবস্থা হবেই।

এমন সময় ভোঁ-ভোঁ করে বাইরে একটা মোটরের হর্ন বেজে উঠল। শিবনাথ তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, আমাকে এখনি বেরতে হবে।

তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে উঠে পড়লো। বাইরে এসে দেখলে ফটকের সামনে নতুন চকচকে একটি বিরাট মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে, আর তার মধ্যে বসে রয়েছে সুবেশা এক নারী। তার মাথায় বব্ করা চুল্, ঠোঁটে পুরু লাল রঙ্, চোখে ও ভ্রূতে কাজলের রেখা। আড়চোখে একবার চেয়ে তিনকড়ি একটি গভীর নিঃশ্বাস তার বুকের মধ্যে চেপে নিলে। তারপর রাস্তার বাঁ দিকে ঘেঁষে চলতে লাগল।

একটু পরেই তাকে অতিক্রম ক'রে হর্ন বাজিয়ে ছুটে চলে গেল সেই গাড়ীটা। পেছন দিকের কাঁচের মধ্যে দিয়ে চকিতে সে দেখে নিলে শিবনাথ ও সেই সুন্দরী মেয়েটি পাশাপাশি বসে আছে।

রবিবার দিন বিকেলের অনেক আগে থেকেই বকুলতলার মাঠটা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সাত ক্রোশ দূর থেকে লোক আসে শঙ্করের শোক সভায়। এরকম অদ্ভুত ভীড় ইতিপূর্বে আর সেই গ্রামে কখনো হয়নি। বালক, বৃদ্ধ, যুবা কেউ আর বাকী নেই। যেন জনস্রোত চলেছে। শঙ্করের একখানা বড় ফোটো উঁচু সভামঞ্চের সামনে ফুল দিয়ে সাজানো ছিল, চারিপাশে দাঁড়িয়ে কত

লোক কত বক্তৃতা করলেন। শেষে কলকাতা থেকে আগত বাংলার প্রাচীন জন-পূজ্য নেতা যখন সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে আবেগময়ী ভাষায় শঙ্করের ত্যাগের কথা বললেন তখন সকলের চোখ সজল হয়ে উঠলো।

তিনি বলতে লাগলেন, আজ দেশের স্বাধীনতা আনলো কারা? যারা ফুলের মালা গলায় দিয়ে দেশের নেতা সেজে বসে আছে তারা, না যারা এই শঙ্করের মত হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিলে দেশের সেবার জন্যে তারাই সত্যিকারের স্বাধীনতা আনলে? তাদের এই ত্যাগের কথা হয়ত খবরের কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়নি, হয়ত সে সংবাদ দেশবিদেশের লোকের মুখে প্রচারিত হয়নি, হয়ত জনসাধারণের কাছে তাদের নাম আজও অজ্ঞাত। তা বলে কি তাদের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে! যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে আজ এই মুহূর্তে হাজারে হাজারে লোক এখানে সমবেত হয়েছে কেন? কে শঙ্কর? কি আছে তার? ধনদৌলত, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ডিগ্রী কি আছে? প্রতিদিন ত এই রকমের কত লোকের মৃত্যু হচ্ছে পৃথিবীতে, কিন্তু তাদের কথা কে স্মরণ করে?

তাহ'লে নিশ্চয় সে এমন কিছু দিয়ে গেছে যার ঋণ সকলে অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে! তাই বলি, যারা তাকে দেখেছে, যারা তাকে পেয়েছে, যাদের জন্যে সে জীবন দিয়ে গেছে তারা যদি তাকে মনে না রাখে তা বিশ্বাসঘাতকতার পাপ হবে।

এই বলে একটু থেমে তিনি একটা লিখিত আবেদন হাতে তুলে নিয়ে আবার বললেন, এখানকার কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে শঙ্করের নামে একটি ফাণ্ড খোলা হয়েছে। আপনারা যথাসাধ্য তাতে দান করলে শঙ্করের নামে একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হবে এই গ্রামে। এই স্মৃতিমন্দিরের যা পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ করতে অনুমান পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। তাই আমার অনুরোধ আপনারা সকলে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে অল্পদিনের মধ্যে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবেন।

এই বলে যেমন তিনি বসলেন, অমনি কেউ দশ টাকা, কেউ কুড়ি টাকা, কেউ পাঁচ টাকা চাঁদা তখনি এই ফাণ্ডে দিতে লাগল। সভাপতিমশায় তখন অনুরোধ করলেন, আপনারা এখন যা দেবেন সাদরে তাও গৃহীত হবে।

একজন, দুজন করে গিয়ে গিয়ে সভাপতির হাতে দিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক থেকে ভীড় ঠেলে গিয়ে শিবনাথ একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক সভাপতি মশায়ের হাতে দিয়ে দিলে।

সভাপতিমশায় তৎক্ষণাৎ সকলের সামনে শিবনাথকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সেই টাকার পরিমাণটা সকলকে জানিয়ে দিলেন। সভার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। জনকতক চীৎকার ক'রে উঠলো 'শিবনাথ কী জয়' বলে। সকলের কাছ থেকে শিবনাথ তখন সমর্থন লাভ করলে না বলে তার দুঃখ ছিল না। তবে সভাপতিমশায়ের আশেপাশে মঞ্চের ওপর গ্রামের যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

ছিলেন তাঁদের নীরব থাকতে দেখে তার মনটা খুব দমে গেল। শিবনাথ ভেবেছিল এইবার সে বুঝি সকলকে জয় করতে পারবে।

ভারাক্রান্ত মনে শিবনাথ যখন বাড়ীতে ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চাকর বৈঠকখানায় আলো দিয়ে গেল। শিবনাথ নিঃশব্দে সেই আলোটার দিকে চেয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। একটু পরে তিনকড়ির গলা পেয়ে সে সোজা হয়ে বসলো।

তিনকড়ি ঘরে ঢুকেই বললে, শুনলাম নাকি আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন শঙ্করের স্মৃতি মন্দির তৈরী করতে?

শিবনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনকড়ি বিরক্তিকর কণ্ঠে ব'লে উঠলো, কাজটা কিন্তু আপনি খুব ভাল করলেন না। গ্রামের লোকের কাছে আমাদের কি পোজিশন হলো বলুন দেখি। আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না। আপনার আর কি, আপনি এখান থেকে কালই চলে যাবেন কিন্তু আমাদের এখানে চিরকাল বাস করতে হবে—আমাদের কি অবস্থা হবে সেটা আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিল। শত্রুরা শুধু হাসবে না, এবারে হাততালি দেবে পথেঘাটে আমাদের দেখলে! ছি ছি, কাজটা আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।

শিবনাথ এবার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, কেন?

উত্তপ্তস্বরে তিনকড়ি বললে, কেন আবার জিজ্ঞেস করছেন! যার বিরুদ্ধে এতদিন ধরে এতকাণ্ড করলুম আজ কিনা তার স্মৃতিরক্ষার-জন্যে আপনি দিলেন টাকা! তাও এক-আধ টাকা নয়, পঞ্চাশ হাজার টাকা!

শিবনাথ বললে, ভাবলুম যার সঙ্গে আসল বিবাদ সেই যখন নেই তখন আর মনোমালিন্যটা রেখে কি হবে—

তিনকড়ি এবার আরও চটে উঠলো, বললে তাই বলে আপনি নিজে যেচে গিয়ে এইভাবে টাকাটা দিয়ে এলেন? এতে অপমান আমাদেরই যে বেশী হলো।

শিবনাথ বললে, অপমান? এরপরে অপমানের কথা তুমি ভাবতে পারো?

তিনকড়ি বললে, তা হয়ত নয়। তারা আপনার কাছ থেকে যখন এত টাকা পেয়েছে! তবে কিনা কাজটা আপনি খুব ভাল করলেন না।

শিবনাথ বললে, আচ্ছা দেখা যাক্ ভাল মন্দ কি হয়। যা হবার তা হয়ে গেছে যখন।

এর এগারো মাস পরে এলো ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শান। তিনকড়ি শিবনাথকে পরামর্শ দিলে, এত টাকা যখন কংগ্রেস কমিটিতে দিলেন তখন ওদের দ্বারা কংগ্রেসী নমিনেশন্‌টা আদায় করে নিন না, তাহলে বিনা খরচায় একেবারে কিস্তিমাৎ। আপনার মেম্বার হওয়া আটকায় কে? আর মেম্বার একবার হ'লে প্রেসিডেণ্টের পদটাও আপনার বাঁধা। এ আমি লিখে দিতে পারি।

ইউনিয়ন্ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট! পল্লীগ্রামে বোধ হয় এটা সবচেয়ে সম্মানিত

পদ ! তিনকড়ির এই মতলবটা তাই শিবনাথের মনে খুব লাগল। সে কংগ্রেসী নমিনেশনের জন্যে তখনি একটা দরখাস্ত ক'রে দিলে। কিন্তু এর ফলাফল যখন বেরুল তখন শিবনাথ একেবারে স্তম্ভিত ! শিবনাথের বদলে কংগ্রেসীদলের একটা অল্পবয়স্ক ছোকরাকে তারা নমিনেশন্ দিয়েছে !

তিনকড়ি ত রেগে লাল, বললে, দেখলেন ত ব্যাটাদের কান্ড ! টাকার বেলা ঠিক আছে কিন্তু আসল ব্যাপারে অষ্টরম্ভা ! ও আমি তখনি জানতুম। আপনি যেমন ওদের কাছে গেলেন যেচে অপমান নিতে।

শিবনাথের মনে একটা সংশয় ছিল। তবু ভেবেছিল গ্রামের ছোট কংগ্রেস কমিটি, এত টাকা দিলে তাদের হাত করতে দেরী হবে না ! তাই এই ব্যাপারে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলে। তখন তিনকড়ির সঙ্গে পরামর্শ করে সে ঠিক করলে যে স্বাধীনভাবেই দাঁড়াবে এবং তার জন্যে যত টাকা লাগে সে খরচ করবে। তিনকড়ি বললে, দেখে নেবো কংগ্রেসকে একবার !

দু'হাতে পয়সা ছড়ালে শিবনাথ ! এক একটা ভোট কিনতে দশ টাকা, বারো টাকা পর্যন্ত ব্যয় করলে ! তিনকড়ি যেখানে যা খরচ করতে বলেছে কোনটাতেই সে না বললেনা।

কিন্তু এত খরচ ক'রে যখন ভোট যুদ্ধের ফলাফল বের হলো তখন দেখা গেল শিবনাথের নাম সকলের শেষে ! অর্থাৎ শিবনাথের শুধু হার হয়নি, সকলের চেয়ে কম ভোটও সে পেয়েছে ! কংগ্রেসের টিকিট ছাড়াও তার মতন আরো দু'জন স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়েছিল, শিবনাথের স্থান তাদেরও নীচে।

শিবনাথ একেবারে ক্ষেপে উঠলো। তিনকড়িকে বললে, তাহ'লে গ্রামের লোকেরা যে আমাকে কি চোখে দেখে তা বোঝা গেল। তারপর কণ্ঠস্বর আরো একটু চড়িয়ে বললে, অথচ তুমি আমাকে বরাবর এই বলে মিথ্যা স্তোক দিয়ে এসেছ যে গ্রামের লোকেরা আমায় চায়। এই কি তার নমুনা ?

তিনকড়ি বললে, ব্যাটারা যে এইভাবে বেইমানী করবে, বাস্তবিক বলছি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

শিবনাথ পাগলের মত ঘরময় পায়চারী করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন। চুপ করো, বেইমানী তারা করেনি করেছ তোমরা ! কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কিন্তু আর দু'জন যে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়েছিল তাদের পোজিশনও আমার চেয়ে ভাল। অথচ আশ্চর্য এই যে, এদের সুখ-সুবিধার জন্যে আমি গ্রামে কিনা করেছি। কেন তুমি একবার একটু আভাস দাওনি, তাহলে আমি এইভাবে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যেতুম না !

তিনকড়ির ওপরই সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে শিবনাথের। তিনকড়ি বললে, কি ক'রে বুঝবো বলুন—আপনার সব কাজে সব সময়ই যারা উৎসাহ দেয়, তাদের ওপর নির্ভর করাটা কি—

কিন্তু যদি তাই সত্য হয় তাহ'লে আর দু'জন কি ক'রে আমার চেয়েও ভোট

বেশী পায় আমি ত কিছুতেই তা ভেবে পাই না। কি পজিশন্ আছে তাদের সমাজে, কে তাদের চেনে? কেবল কংগ্রেসের কাছে হারলে আমার দুঃখ ছিল না কিন্তু এদের কাছে হারতে আমার যেন অপমানে মাথা কাটা যাচ্ছে। অর্থাৎ এদেরও দেশের লোকের কাছে যতটুকু পজিশন্ আছে আমার তা নেই! ওঃ আমার যেন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে।

একটু ইতস্তত করে তিনকড়ি বললে, আপনার নামে অনেক রকম বদনাম রটাচ্ছে—কেউ বলছে ও লেখাপড়া জানে না মূর্খ, ওসব কাজের কি বুঝবে? কেউ বা বলছে লম্পট চরিত্রহীন ঘুষখোর—

শিবনাথ এবার রাগে ফেটে পড়লো! বললে, তাহ'লে তুমি কি করছিলে এতদিন? এত টাকা নিয়েই বা কাদের দিলে তবে—তারা যা রটাচ্ছে লোকে যদি তাই বিশ্বাস করে! বলে একটু থেমে আবার ক্রুদ্ধ সিংহের মত পায়চারী করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলো, ওসব চালাকী আমার কাছে চলবে না। ভেবেছো ওই কথা বললে আমি ভুলে যাবো! কিন্তু আমি সে বান্দা নই!

তিনকড়ি চুপ করে রইল। শিবনাথের মুখের ওপর কোন জবাব করলো না। সে জানতো রেগে গেলে শিবনাথের জ্ঞান থাকে না! তাই অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর একসময় বললে, তখনই বারণ করেছিলুম যে ঠাকুর দেবতার গায়ে হাত দেবেন না—তা আপনি ত আমার কথা শুনলেন না। সেই থেকে আমি লক্ষ্য করছি সময়টা কেমন খারাপ হয়ে গেল। হাজার হোক হিন্দুর ছেলে, তায় আবার ব্রাহ্মণ—

শিবনাথ এবার খিঁচিয়ে উঠলো, চুপ করবে কি তুমি তিনকড়ি—আমি তোমার কাছ থেকে সান্ত্বনা শুনতে চাইনি! যাও, দয়া করে আমাকে একটু একলা থাকতে দাও—তোমাদের আমি সব চিনেছি!

১৬

কোন রকমের কুসংস্কার শিবনাথ মানতো না, কিন্তু তবু চাঁপার ঠাকুর ভাঙ্গার কথাটা তিনকড়ি মনে করিয়ে দেওয়াতে সে যেন ভেতরে ভেতরে একটু দুর্বল হয়ে পড়লো। ইদানীং প্রায়ই ওই কথাটা মনে আসতো কিন্তু আবার মনকে কঠিন ক'রে সে চিন্তা দূর করতো। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলো, ঘুরে ফিরে সেই কথাটাই কেবল তার মনকে আঘাত দিতে দিতে একসময় এমন ক'রে তুললে যে একদিন চুপি চুপি সে সত্যিই বৃন্দাবনে গিয়ে হাজির হলো।

বৃন্দাবন ছোট জায়গা নয়। সেখানে কোথায় কি ভাবে চাঁপা থাকে তার জানা ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি বাড়ী, প্রত্যেকটি কুঞ্জগলি, প্রত্যেকটি মন্দির ও যমুনার ঘাট অনুসন্ধান ক'রে একদিন সে চাঁপার খোঁজ বার করলে। চাঁপা তখন সবে পুজো শেষ ক'রে গলায় আঁচল দিয়ে তার বিগ্রহকে প্রণাম করছিল, এমন

সময় মুখ তুলেই দেখলেন শিবনাথ দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। প্রথমে তার মনে হলো সে বুঝি ভুল দেখছে? বারকতক চোখটা রগড়ে যখন বুঝলে না সে যাকে দেখছে তা একেবারে অভ্রান্ত—তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান দুষ্কৃতি শিবনাথ, তখন চাঁপা আর নিজেকে সংযত করতে পারলে না, ধমক দিয়ে উঠলো, আবার এখানে খুঁজে খুঁজে এসেছেন—দেশে এত সর্বনাশ করেও বুঝি আশা মেটেনি! চলে যান—শিগ্‌গির আমার সামনে থেকে—আপনার মুখ দেখলে পাপ হয়। বেরিয়ে যান এখান থেকে বলছি—আর এক মুহূর্ত দেরী করলে আমি অনর্থ করবো।

একটুখানি ম্লান হাসি শিবনাথের ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে গেল। সে বললে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ এসেছি এতদূরে ছুটে। আমায় ভুল বুঝো না চাঁপা। বলে এক তাড়া নোট তার সামনে রাখলো।

অমনি চাঁপা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। শিবনাথবাবু। আপনার পয়সা আছে জানি কিন্তু তা দিয়ে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করবেন না আবার বলছি!

চাঁপার সেই কণ্ঠস্বর শুনে শিবনাথ চমকে উঠলো। চাঁপা তখন সেই নোট-গুলোর দিকের আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, শিগ্‌গির এখান থেকে তুলে নিন এগুলো। রাগে তার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। কিন্তু শিবনাথকে তখনো বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাঁপা বললে, তুলবেন না?

শিবনাথ ধীরে ধীরে ধীরে বললে, চাঁপা আমায় ভুল বুঝো না, এদিয়ে আমি তোমাকে অপমান করতে আসিনি। আমি এসেছি আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে। তোমার বিগ্রহকে ভেঙে দিয়ে সেদিন আমি যে পাপ করেছি আজ তারি প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। তুমি এই টাকা দিয়ে তোমার এ বিগ্রহের মন্দির ক'রে না দিলে আমি কিছুতেই যেন সুস্থির হতে পাচ্ছি না! আমার এ অনুরোধটুকু তোমায় রক্ষা করতেই হবে চাঁপা!

চাঁপা বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আমার বিগ্রহ ভেঙেছেন আপনি! কে বলেছে এ কথা আপনাকে? মিথ্যে কথা, কার সাধ্য যে আমার বিগ্রহের দেহ স্পর্শ করে? ওই ত আমার সেই নয়নাভিরাম রাধা মদনমোহন! দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে প্রতিদিন যাঁর সেবা করেছি—যাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আশা মেটেনি, ওই ত আমার সেই দুরাশার ধন, অরূপ রতন!

সহসা যেন শিবনাথের চমক ভাঙ্গে। সে বললে, চাঁপা তুমি সত্যি বলছো কেউ তোমার বিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করেনি? একটু থেমে সে আবার বললে, কিন্তু আমি যে বহু টাকা ঘুষ দিয়ে গুণ্ডা পাঠিয়েছিলুম, সে তোমার বিগ্রহকে চূর্ণ করেছিল আর তার প্রমাণস্বরূপ কতকগুলো ভগ্নঅংশও আমায় দিয়ে এসেছিল।

মিথ্যে কথা! সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে ওই বলে।

তাই যদি হবে তবে তুমি এখানে চলে এলে কেন চাঁপা?

চাঁপা বললে, যাকে তুমি প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়েছিলে মন্দির ভাঙবার জন্যে সেই আমাকে আগের রাত্রে গোপনে খবর দেয়—এবং দেশছেড়ে পালিয়ে আসবার কথাও জানিয়ে দেয়। সবই আমার ওই মদনমোহনের করুণা!

শিবনাথ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল! কিন্তু তৎক্ষণাৎ একথাও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, আমার কাছ থেকে অতগুলো টাকা ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিলে কালু সর্দার?

একটুখানি চুপ করে থেকে চাঁপা বললে, কেবল কি কালু সর্দারই ঠকিয়ে নিয়েছে—আর কেউ কি আপনাকে ফাঁকি দেয় নি?

চাঁপার কথায় শিবনাথের মনের মধ্যে সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যায়—এতদিন ধরে যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছিল, এখন কি তবে তাকে ত্যাগ করতে হবে?

চাঁপা গম্ভীরস্বরে বললে, কিন্তু আমি আপনাকে ফাঁকি দেবো না। আপনি যে জন্যে টাকা দিতে চান তার যখন কোন কারণ ঘটেনি তখন ওতে আর প্রয়োজন হবে না, তুলে নিন্ এখান থেকে।

অপরাধীর মত টাকাটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে শিবনাথ তাড়াতাড়ি তার সামনে থেকে যেন পালিয়ে বাঁচল।

বাড়ীতে ফিরে এসে শিবনাথ একেবারে ভেঙে পড়লো। চাঁপার কথাগুলো যেন অক্ষরে অক্ষরে তার জীবনে সত্যে পরিণত হচ্ছে! ফাঁকি—সবাই তাকে ফাঁকি দিয়েছে! তার জীবনটাই হলো ফাঁকি! এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে সে কি জিতেছে! এতদিন সে মনে করতো টাকাই বুঝি সব—দুনিয়ায় যার টাকা আছে তার সব আছে। কিন্তু এখন দেখছে কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা! টাকার বিনিময়ে সে যা পেয়েছে তা ফাঁকি। টাকা দিয়ে সে তার স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলে না, টাকা দিয়ে চাঁপার বিগ্রহ চূর্ণ করতে পারলে না, টাকার হরিরলুট ছড়িয়েও সে দেশের লোকের মন জয় করতে পারলে না! তবে কিসের লোভে মানুষ এই টাকার পিছনে পিছনে ছোটে! তখন সহসা জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে একবার সে ফিরে তাকাল। যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে তাকিয়ে মনের মধ্যে কোথাও এমন কোন কিছু সঞ্চয় পেলে না যা নাকি স্বার্থহীন যা নির্ভেজাল, যেখানে আছে এতটুকু আন্তরিকতা।

তবে কেন সে এই মরীচিকার পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে। কিসের লোভে? যদি সব ফাঁকি তবে কি নিয়ে সে বাঁচবে! শিবনাথের মনের মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় উপস্থিত হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ সে ঘরে বসে থাকে, কোন কিছুতেই আর তার ইচ্ছা যায় না। জীবনটা যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে! এতদিন ধরে সে কি পেলে—সংসারের কাছে, বন্ধু বান্ধবের কাছে, দেশবাসীর কাছে? ভাবতে

ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। জীবনের কোথাও কি এক ফোঁটা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নেই তার জন্যে!

এত বড় মর্মান্তিক কথা ভাবতে পারে না শিবনাথ। তার সর্বাঙ্গ যেন থরথর করে কাঁপে!

টাকার জোরে সে যা পেয়েছে তাকে যত যাচাই করে, তত দেখে সব মেকী। তবে আর কিসের জন্যে সে উপার্জন করবে! বড় ব্যথা লাগে শিবনাথের মনে। সব ছেড়ে দিয়ে সে শুধু ভাবে অতীত দিনের কথা। এক একদিন ভাবতে ভাবতে তার যেন ইচ্ছা করে চীৎকার ক'রে কাঁদতে! তার জীবনের কোথাও কোন অবলম্বন নেই! কারুর কাছ থেকে সে পায়নি একফোঁটা সত্যিকারের ভালোবাসা? যদি জীবনের কোথাও কোন পাথেয় না থাকে তবে কি নিয়ে সে বাঁচবে!

ভাবতে ভাবতে অন্ধকার পথ-যাত্রীর সামনে সহসা যেমন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে তেমনি চাঁপার কথাই তার মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে বাল্যকালে সে তার সঙ্গে খেলা করতো। নদী পেরিয়ে গিয়ে শশা চুরি ক'রে এনে দু'জনে এক সঙ্গে খেতো। গাছের মগডালে উঠে পাখীর ছানা পেড়ে দিতো চাঁপাকে খুশি করার জন্যে। আর চাঁপা তার বিনিময়ে বাড়ী থেকে আচার চুরি ক'রে এনে তাকে খেতে দিতো।

যত ভাবে তত দেখে ওই একমাত্র তার জীবনের সম্বল, যেন অন্ধকার রাত্রের ক্ষণিক দীপশিখা! চাঁপার সঙ্গে বাল্যকালের সেই ক'টি দিনের মধুর স্মৃতি! চাঁপাই কি তবে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন? আবার চাঁপার কথাই ঘুরে ফিরে তার মনে আসে। সেই ত তাকে সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছিল বহুদিন আগে—সে-ই তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল।

আর ভাবতে পারে না। এক এক সময় মনে হয় ছুটে চাঁপার কাছে চলে যায়। অন্তত তাকে জানিয়ে আসে যে সে যা বলেছিল তা তার জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছে! কিন্তু তাতে ত চাঁপার কাছেই তার পরাজয় হবে। সে মুখ টিপে টিপে হাসবে। না, থাক তার চেয়ে নিজের দুঃখ নিজের মনেই থাক। কিন্তু বেশী দিন দুঃখের বোঝা বহন করা যে যায় না—একান্ত আপনার এমন একজন কাউকে দরকার যার কাছে নিজের মনের কথা অকপটে বলে অন্তরকে হালকা করা যায়। তা না হ'লে জীবনের বোঝা যে দুঃসহ হয়ে ওঠে, মানুষ কেমন ক'রে তা বহন করবে?

ভেবে ভেবে সে কোন কুলকিনারা পায় না। অবশেষে একদিন ছুটে গেল সে জ্যোৎস্নার কাছে। সে ত তার স্ত্রী! যেমন ক'রে হোক তাকে ফিরিয়ে আনবে—তাকে তার সুখ-দুঃখের সাথী করতেই হবে।

কিন্তু জ্যোৎস্নাকে আনতে গিয়ে বিপদ আরো বাড়লো। শিবনাথ গিয়ে শুনলে জ্যোৎস্না বাড়ী নেই—পাঠশালে পড়াতে গেছে।

চুপি চুপি পাঠশালার কাছে যেতে তার কানে এলো জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বর, কত-দিন পরে সেই মধুর স্বর শুনে শিবনাথের বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠলো।

পা টিপে টিপে ঘরটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে সে শুনলে জ্যোৎস্না পড়াচ্ছে—অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সয়—তারা দুজনেই সমান অপরাধে অপরাধী !

একজন ছেলে জিজ্ঞেস করলে, তার মানে কি দিদিমণি ?

জ্যোৎস্না বললে, মানে ? মানে এই যে যদি কেউ চুরি ক'রে বা অন্যায় ক'রে কেড়ে এনে কিছু তোদের খেতে দেয় ত কিছুতেই তোরা খাবি না—তাহ'লে চুরি যে করেছে সে যেমন পাপ করে—তোরা তার সেই জিনিস খেয়েছিস বলে সমান পাপ করবি। তাই মনে রাখিস্ চুরি করা যেমন অপরাধ, সেই চুরির অংশ গ্রহণ করাও তেমনি অপরাধের।

কথাগুলোর ওপর এমন জোর দিয়ে জ্যোৎস্না বোঝাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন শিবনাথকেই সে তার অপরাধের একটা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। আশ্চর্য, সেই কথাগুলো যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে—শিবনাথের মনে আরো আঘাত লাগল।

জ্যোৎস্নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার যেন লজ্জা করতে লাগল। তার সমস্ত দুষ্কৃতির ইতিহাস তখন একসঙ্গে মনের দোরে এসে ভীড় ক'রে দাঁড়ালো—তার অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সে তাই যেমন চুপি চুপি গিয়েছিল তেমনি চুপি চুপি আবার ফিরে এলো কলকাতায়।

এমনিভাবে মনের সঙ্গে তার নিত্য চলে দ্বন্দ্ব। ওদিকে ব্যবসা বাণিজ্যে তার অনুপস্থিতিতে কর্মচারীরা চুরি শুরু করলে। শিবনাথ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না কিছুতে। টাকার মোহ তার যেন ঘুচে গেছে। এখন তার শুধু চাই জীবনের পাথেয়। শুধু একবিন্দু স্নেহ, শুধু একটু ভালবাসা পাবার জন্যে মন তার যেন বুভুক্ষু হয়ে ওঠে।

সামনে পিছনে যেদিকে চেয়ে দেখে ধু ধু করে মরুভূমি ! সে কি তবে দিন-রাত এই ভাবে জ্বলে পুড়ে মরবে—অন্তর্দাহে। ভাবতে ভাবতে সে উন্মাদের মত ছটফট করে।

শেষে আর থাকতে পারলে না শিবনাথ। চাঁপার কাছে ছুটলো, তাকে গিয়ে জানাবে তার সব কথা—তাকে বলবে সে কত বড় সত্যি কথা তাকে বলেছিল—সে দেবী !

কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে সে যখন তার ঝোপড়ায় উপস্থিত হলো তখন দেখলে মন্দিরের দরজা বন্ধ—চাঁপা পুজোয় বসেছে। মন্দিরের বাইরে বসে শিবনাথ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে। শেষে একজন ব্রজবাসী এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, কি চান আপনি ?

শিবনাথ বললে, চাঁপা দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

ব্রজবাসী বললে, কিন্তু এখন ত তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

শিবনাথ বললে, আচ্ছা আমি আরো অপেক্ষা করছি, যখন তাঁর সময় হবে তখন তাকে আসতে বলবেন। তবে—আপনি তাকে বলে রাখুন যে কলকাতার শিবনাথবাবু তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ব্রজবাসী ভেতরে চলে গেল। কিন্তু একটু পরে এসে বললে, কোন বড়লোকের তিনি মুখ দেখবেন না—এই কথাটা আপনাকে বলে দিতে বললেন।

বড়লোক! নিজের বেশভূষাটার দিকে চেয়ে শিবনাথ দেখলে সত্যিই ত এখনো একটা মূল্যবান শাল তার গায়ে রয়েছে—এবং পায়ে রয়েছে দামী জুতো।

হুঁ। বলে চিন্তিতমুখে শিবনাথ উঠে দাঁড়ালো! তারপর একেবারে সোজা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলে। কিন্তু স্টেশনে এসে সে আরো মুস্কিলে পড়লো। কোথায় যাবে সে? কোথায় গিয়ে এখন দাঁড়াবে, তার ত আর কোন আশ্রয় নেই, আপন বলতে কেউ নেই। শেষে অনেক ভেবে স্থির করলে সেইখানে থাকবে। কেউ তাকে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না। এ তীর্থস্থান! এখানে কত ধর্মশালা, কত মন্দির রয়েছে। অবশেষে মথুরার একটা ধর্মশালায় গিয়ে সে উঠলো। পয়সা কড়ি সামান্য যা সঙ্গে ছিল একদিন তা যখন শেষ হয়ে গেল তখন সে গায়ের দামী শালটা ও জুতোটা গরীবকে দান করে দিলে।

এমনিভাবে আরো কিছুদিন চললো। শেষে একেবারে কপর্দকহীন যখন হয়ে পড়লো তখন ধরলে মাধুকরী; কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে সামান্য কিছু প্রসাদ চেয়ে তাই খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। আশ্চর্য, এই ক'দিনে লজ্জা ভয় মান অপমান সব যেন তার মন থেকে মুছে গেল। মথুরার ঘাটে ও মন্দিরে বসে সেই শিবনাথ এখন পুজো আরতি দেখে, ভজন গান শুনতে শুনতে তার দু'চোখ জলে ভেসে যায়।

সত্যি এখন আর সে-শিবনাথকে দেখলে চেনা যায় না। দরিদ্র ভিখারীর দলের সঙ্গে সে যেন একেবারে এক হয়ে গিয়েছে। অন্ধভাগ্যের পটভূমিকায় কখন যে নিয়তি কোন্ মানুষের অদৃষ্টে কি লিখে রাখে তা কে জানে!

তাই রাসপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে মাধুকরী করতে করতে শিবনাথ যখন একেবারে চাঁপার ঝোপড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলো তখন চাঁপাও তাকে চিনতে পারলে না। একটুকরো রুটি তার হাতে দিতে গিয়ে যখন দেখলে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে তখন চমকে উঠলো চাঁপা! একি, এ যে শিবনাথ-বাবু। ছেঁড়া ময়লা কাপড়পরা, একমুখ গোঁফ-দাড়ি, খালি গা, খালি পা—তাকে দেখে চাঁপার মনের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। একটুখানি চুপ করে থেকে সে ডাকলো, শিবনাথবাবু!

কি সুস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! কি সুমিষ্ট আহ্বান। বহুদিন—বহুকাল পর কে যেন শিবনাথকে ওইভাবে ডাকলে। সে ডাক শুনে তার সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

মনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত উত্তেজনা দমন করে একটু পরে সে বললে, চাঁপা আমায় ডাকছো?

চাঁপা ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁ, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন?

বিস্মিত কণ্ঠে শিবনাথ বললে, ভেতরে! তোমার এই দেবমন্দিরের ভেতরে?

না না ওখানে আমি যাবো না—ওখানে ঢোকবার আমার অধিকার নেই !

অধিকার আছে কি না আছে সেটা আমি বুঝবো ! আপনি শুধু ভেতরে আসুন ! বলে হঠাৎ চাঁপা এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে তাকে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে চলে গেল।

লালাবাবুর মন্দিরে তখন সবে পুজো শুরু হয়েছে, সানাইয়ের ক্লান্ত রাগিণী থেকে থেকে দুপুরের নীরবতাকে যেন মধুর থেকে মধুরতর করে তুলতে লাগল !

পদধ্বনি

শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়
কল্যাণবরেষু

প্রথম প্রথম খুব রাগ হতো। অপমানে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠতো কৃষ্ণার। মনে হতো পায়ের চটিটা ছুঁড়ে মারে ওই রকবাজ ছোঁড়াগুলোর মুখে! ছি ছি, এরা আবার শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে বলে নিজেদের পরিচয় দেয়! লজ্জাও করে না?

এক এক দিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মার কাছে কেঁদে ফেলে। হয় বাবাকে বলো এ পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যেতে, নয়তো আমি আর কলেজে যাবো না কাল থেকে বলে দিলুম! আগে তবু ঠারে-ঠোরে বলতো। এখন আর কিছু বাধে না, যা মুখে আসে তাই বলে। সে সব অসভ্য কথা উচ্চারণ করতেও ঘেন্না করে।

মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কোন্ পাড়ায় যাবি মা? শুনেছি সব জায়গায় নাকি এমনি অসভ্য জানোয়ারের উৎপাত। কে বলবে, ওরা স্কুল-কলেজে পড়া ভদ্রসন্তান!

একটু থেমে আবার বলেন, জানিস সেদিন তোর টালিগঞ্জের লিলি পিসীমা এসেছিল। তুই তখন কলেজে। বলে, তোমাদের এদিকে একটা ঘরভাড়া পেলে উঠে আসি। তোমরা বেশ আছো বৌদি!

জিজ্ঞেস করি, কেন, কী হলো ও বাড়ীর? এমন ভাল ফাঁকা জায়গায় হাওয়া-বাতাসওলা সুন্দর ফ্ল্যাটে ভদ্রলোকের পাড়ায় রয়েছিস। তোকেই বরং বলবো ভাবছিলুম, আমাদের জন্যে ও-পাড়ায় একটা বাড়ী খুঁজে দিতে।

তোর পিসি বলে, এককালে সত্যি খুব ভাল ছিল। আমাদের ও জায়গার তুলনা ছিল না। নতুন চওড়া রাস্তার ওপর, নতুন নতুন সব বাড়ী, ভাল প্রতিবেশী। বৃষ্টিতে একফোঁটা জল জমে না পথেঘাটে, বাজারহাট সবই কাছে। খুবই ভাল ছিলুম। কিন্তু এখন যা হয়েছে, মনে হয় ওখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি! মান-সম্ভ্রম নিয়ে পথেঘাটে বেরুবার উপায় নেই। তোর পিসী বলে, দুঃখের কথা কি বলবো, আমার পিছনেও ছোঁড়ারা হুইসিল্ মারে। যা-তা রিমার্ক করে! সন্ধ্যেবেলা বাজারে যাবার উপায় নেই। হয়ত একদিন কি দু'দিন চুপ করে, কিন্তু ইদানীং খুব বাড়িয়েছে। ইচ্ছা হয় ছোঁড়াদের কান ধরে বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখাই, তাদের মত একটা ছেলে ও আরো দু'টো মেয়ে আমার আছে!

কৃষ্ণা কলেজের শাড়ী ছাড়তে ছাড়তে বলে, তাদের দোষ নেই মা, সত্যি বলতে কি লিলি পিসীমার যত বয়েস বাড়ছে তত যেন সাজের ঘটাও বাড়ছে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না মা, সেদিন কলেজ থেকে আমরা তিন-চারজন বন্ধু মেট্রোতে ম্যাটিনী শো-তে চার্লি-চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস্' দেখতে গিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি মলয়দা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। বললুম,

কিরে, এখানে দাঁড়িয়ে যে, কার জন্য অপেক্ষা করছিস ?

হাসি চেপে বলে, দূর, সেসব কিছু নয়। মা কোক খাচ্ছে সামনের রেস্তোরাঁয়, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

পিসীমা এসেছে, তাই তাকে একা বসিয়ে তুই এখানে সিগারেট টানতে এসেছিস ?

একা নয়। অজয়কাকু আছেন, তিনিই খাওয়াচ্ছেন।

অজয়কাকু ? সে আবার কে রে ?

মলয়দা বলে, আমাদের বাড়ীওলার ছোট ভাই। এম. এ. পড়ে।

কৃষ্ণা বলে, একটু পরে পিসীমাকে দেখে আমি তো অবাক ! সত্যি, ওঁর যে ছেলে মলয়দা তা দেখলে বিশ্বাস হয় না ! অথচ এমন কিছু সাজগোজ করেননি। হাল্‌কা আকাশী রঙের একটা জাপানী নাইলন শাড়ীর সঙ্গে হালকা করে একটু কাজল চোখে দিয়েছেন, আর ন্যাচারাল লিপ্‌স্টিক একটু ঠোঁটে। তাতেই যেন অপূর্ব মানিয়েছে !

আমার বন্ধুদের যখন বললুম, এই মলয়দা ওই লিলি পিসীমার বড় ছেলে, তারা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, গ্যাস্ মারিসনি ! কাজেই পিসী ঠিকই বলেছে, সন্ধ্যের সময় পথেঘাটে বেরুলে ওঁর পিছনে ছোঁড়ারা লাগবে যে, তাতে আর আশ্চর্য কি মা !

এমনি করে আরো দিন কাটে।

॥ ২ ॥

একদিন দুপুরবেলা দূর থেকে ওই রকবাজ ছেলেগুলোকে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণার বুকটা ঢিপঢিপ করে ওঠে। সে ভেবেছিল এই ঠিক-দুপুরে হয়ত ওরা থাকবে না। যে যার বাড়ী চলে যাবে। খাওয়াদাওয়া করতে। সেদিন ওদের কলেজের ছেলেরা খেলায় শীল্ড জিতেছে বলে টিফিনের সময় ছুটি হয়ে গেছে। নইলে এসময় বড় একটা বাড়ী ফেরে না। চারটে সাড়ে চারটের সময় সাধারণত ফেরে, কোন কোন দিন বাস-এ ভিড় থাকলে দেরি হয়ে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'তিনখানা বাস্ ইচ্ছে করেই 'মিস' করে ! এত ঠেসাঠেসি ভিড় যে কার সাধ্যি ওঠে ! 'লেডিস্ সীট্' নেই, উঠবেন না, উঠবেন না।—বলে চেঁচিয়ে দড়িটা টেনে একসঙ্গে কতগুলো ঘণ্টি বাজিয়ে তার মুখের ওপর দিয়ে বাসটা ছুটে চলে যায়। এতে বরং সুবিধে হতো, কারণ বিকেল হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ওই গলিটার মুখে অনেক রিকশা, গাড়ীঘোড়া, লোকজনের ভিড় থাকে। তার মধ্যে দিয়ে সে একরকম ভাবে পাশ কাটিয়ে বাড়ী চলে আসতো, যদিও তারই ভেতর থেকে তীরের মত কানে এসে বিঁধতো, মুখে আঙুল দিয়ে বাজানো হুইসিল্, তার সঙ্গে কতগুলো বাক্যবাণ ! যার অর্থ সে জানতো না, পরে ক্লাসের সহপাঠিনীদের কাছে

তার মানে শুনে অপমানে মুখ লাল হয়ে উঠতো ! ছি ছি, এরা সব ভদ্রসন্তান ! সবচেয়ে লজ্জা লাগে ভাবতে, ওই দলের মধ্যে যারা সর্দারী করে, বড় মস্তান, তারা ওদেরই পাড়ায় থাকে। সকলকে না চিনলেও ওই রবি, ফট্‌কে, পিণ্টু, নিতাই এদের বেশ চেনে। ওরা একদিন হাফ-প্যাণ্ট পরে কৃষ্ণাদের ওই গলির সামনে টেনিস্ বল্ দিয়ে ফুটবল খেলতো। কতদিন ওদের বাড়ীর মধ্যে বল এসে পড়লে, ও নিজে কুড়িয়ে এনে দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ বা ওকে কোনদিন বলেছে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাওয়াবি রে ?

কৃষ্ণাও তখন ফ্রক পরে। ছুটে বাড়ীর ভেতর থেকে কাঁচের গ্লাসে করে জল এনে ওদের হাতে দিয়েছে। এক-আধদিন নয় একাধিক দিন। সেসব কথা কি ওই অসভ্যগুলো একেবারে ভুলে গেছে ? তাকে এইভাবে ঠারে-ঠোরে অশ্লীল ইঙ্গিত করতে এতটুকু লজ্জা বোধ করে না, ভদ্রতায় বাধে না ওদের ? বড় হয়ে ওরা যেন ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে গেছে ! ছি, ছি !

এক একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে, কৃষ্ণার মনে রাগের চেয়ে দুঃখ হয় বেশী। মনে হয় থমকে দাঁড়িয়ে, ওদের যে একদিন দাদা বলে ডাকতো, সে কথাটা ছোটবেলার হলেও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এও ভাবে, তা শুনে যদি হেসে ওঠে অপমানের হাসি ! কিংবা বলে, চিনি না ! তাহলে ? ওরা সব পারে। ভদ্রতা সভ্যতা শিক্ষাদীক্ষা সব হারিয়ে ওরা এখন যেন অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের বোঝা, এই মোটা ঝুলপি গালের অর্ধেক পর্যন্ত। এদিকে তেমনি আবার গোঁফের বাহার ! এক গোছা গোঁফ দুই ঠোঁটের ওপর দিয়ে দু'পাশে ঝুলে পড়েছে দাড়ির নিচে। ওরই সঙ্গে একটা চোঙা প্যাণ্টের ওপর রঙীন বিচিত্র ছাপ মারা টাইট জামা। আহা মরি মরি, কি রূপের বাহার ! যেন যাত্রার দলের সঙ্ ! চেহারার দিকে তাকালেই গা ঘিন্‌ঘিন্ করে কৃষ্ণার। ওরা যে একসময় ওদের পাড়ার ছেলে ছিল, কাউকে সে কথা বলতেও যেন মাথা কাটা যায়। ছ্যাঃ, ঘেন্না ঘেন্না ঘেন্না ! ওদের কথা কানে এলে রাস্তায় থুতু ফেলে চলে যায়, ফিরেও তাকায় না সেদিকে।

ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সেই বখাগুলো যে ইঙ্গিত ছুঁড়ে মারে সেটুকু বোঝার মত বিদ্যাবুদ্ধি তার যে আছে হারামজাদাগুলো বোধ হয় তাও জানে না। কিংবা জানে বলেই দিনে দিনে আরো বাড়ায়।

রোজই ভাবে মাকে গিয়ে বলবে। কিন্তু কৃষ্ণার মা একটু অন্য ধরনের। উল্টে তার ওপরই রাগ করবেন। হয়ত বলে বসবেন, তুই ওদের কথায় কান দিতে যাস কেন ? কত মেয়েই তো পথে যায় আসে ! সে যেন ইচ্ছে করে ওদের সব অশ্লীল কথা শুনে মনের ভেতর একরকম রস উপভোগ করতে চায়, এই তাঁর ধারণা।

প্রথম প্রথম তাই চেপে যেতো। নিজের মনে নিজেই শুধু গজরাতো।

কিন্তু যত দিন যায়, একটু একটু করে ওদের সাহসের সীমাও যেন বেড়ে ওঠে।

তাই সেদিন আর সামলাতে পারে না। রাগে অপমানে মুখ-চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে কৃষ্ণার। তার মনে হলো, ছুটে গিয়ে এখনি পায়ের চটি খুলে ওদের মুখের ওপর এমনভাবে মারে যেন ওরা মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার করতে সাহস না পায়!

তা করতে না পেরে তাই বাড়ীতে ঢুকেই সেদিন কেঁদে ফেলে।

মা বলেন, কি হয়েছে রে?

শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কৃষ্ণা বলে, এবার সত্যি আমি কাল থেকে আর কলেজে যাবো না, বাবাকে বলে দিয়ো। আগে তবু ইশারা-ইঙ্গিত করতো, এখন যা মুখে আসে বলে। সেসব অসভ্য কথা মুখে বলা যায় না।

মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কোথায় যাবি মা, সব জায়গায় এই একই ব্যাপার! অসভ্য জানোয়ারগুলো কোথায় নেই?

ঘুমোবার সময় রাত্রে কৃষ্ণার মা অবিনাশবাবুকে বলেন, এ পাড়ায় আর টেঁকা যাচ্ছে না, তুমি অন্য যেখানে হোক চলো। ভাল-মন্দ ঘরের বিচার করার দরকার নেই। কোনরকমে মাথা গোঁজার মত দু'খানা ঘর আর একটু রান্নার জায়গা হলেই চলবে। ভালো বাড়ীতে ঘেন্না ধরে গেছে!

অবিনাশবাবুর কণ্ঠে বিরক্তি ভরে ওঠে। তিনি স্ত্রীকে বলেন, তোমায় বলতে হবে না। আমি কি চুপ করে আছি ভেবেছো! কিন্তু করবো কি, আপিসে যাকেই বলতে যাই বাড়ীর কথা সে-ই বলে তাদের পাড়াতেও ছোঁড়াদের উৎপাতে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। পালাতে পারলে বাঁচে।

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, তুমি মনে করো না যে কেবল তোমরাই এ অসুবিধা ভোগ করছো। সকলেরই এক অবস্থা। যে যুগের যে হাওয়া, তাকে রুখবে কি করে!

॥ ৩ ॥

সেদিন মস্তানদের দলটা ছিল ভারী। রকে বসে একটা সিগারেট ভাগ করে করে সকলে একটু একটু করে টানছিল। রবি, ফটকের সঙ্গে নিতাই, কল্যাণ, ভোঁদা কি একটা অশ্লীল কথা নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে হঠাৎ ভোঁদা মুখের ভিতর দুটো আঙ্গুল পুরে সিটি মেরে উঠলো।

গুরু কি হলো, হুইশিল মারছিস্ যে! ভোঁদাকে সবাই গুরু বলে। ওদের দলের নেতা।

ওই দ্যাখ কে আসছে রে শালা, কি রকম মাঞ্জাটা দিয়েছে আজ! মাইরি মাইরি দেখ!

সকলের চোখ তখন গিয়ে পড়ে কৃষ্ণার ওপর। প্রফেসর আসেননি বলে ওদের আজ দু'পিরিয়ড্ আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণাকে তাই অন্যদিনের চেয়ে

অনেক আগেই ফিরতে হয়েছিল কলেজ থেকে।

রবির জিভে যেন জল গড়িয়ে পড়ে। সে মুখে একবার চুক্‌চুক্‌ আওয়াজ করেই গান ধরলে, 'ঝড়ে যায় উঠে যায় গো আমার বুকের আঁচলখানি। চাপা থাকে না হায় গো তারে রাখতে নারি টানি।'

নিতাই রবির পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে মুখে ঘোড়ার বাচ্চার মত চিঁহিচিঁহি রব তুলে বলে, মাইরি শলা—রবি ঠাকুর কি গান লিখেছিল! বেঁচে থাকলে হয়ত গানখানা তাঁর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে বলতুম, এই রকম স্পেশাল গান আমাদের জন্যে আরো দু'পাঁচখানা লিখে দাও গুরুদেব!

কৃষ্ণা অনেকটা তফাতে ছিল তবু কানে সবই শুনতে পাচ্ছিল। ওর বুকের ভেতরটা তখন ঢিপঢিপ করছে, পা দুটো যেন এগোতে চাইছিল না। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে তাই কান মাথা তার ঝাঁঝাঁ করে ওঠে রাগে। ওরা দু-তিনজন একসঙ্গে তখন গান ধরেছিল—"বোল্‌ রাধা বোল্‌ সঙ্গম হোগা কি নেহি..."। হিন্দী ছায়াছবি 'সঙ্গমের' বিখ্যাত গান, সে একদিন নিজে সিনেমায় শুনেছিল, কিন্তু এখন যেন তার সেই গান কানে আসতে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এই অবস্থায় ওদের সামনে দিয়ে কি করে হেঁটে যাবে যখন ভাবছে, ঠিক সেই সময় একজন স্যুট্‌ পরা ভদ্রলোককে আসতে দেখে সে বললে, দেখুন কিছু মনে করবেন না, আপনি যদি আমাকে ওই গলির মুখটা পর্যন্ত একটু এগিয়ে দেন—

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাতে সে বললে, ওই যে শুনতে পাচ্ছেন না, কি বিশ্রী গান ওরা গাইছে!

ভদ্রলোক এতক্ষণ শুনতে পাননি, এবার সেই হিন্দী গানের লাইনটা কানে আসতে বলে উঠলেন, চলুন আমি এগিয়ে দিচ্ছি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এরা সব ভন্দর-লোকের ছেলে, ভদ্রসন্তান বলে পরিচয় দেয়! যত সব কুলাঙ্গার কোথাকার! এরা কি সব এ পাড়ার ছেলে নাকি?

কৃষ্ণা গম্ভীর মুখে শুধু বলে, তা জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে ছোকরার দল ছুটে এলো। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহস বেশী ভোঁদা ও রবির। ওরা দু'জনে সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মুখ সামলে কথা বলবেন। আমরা ভন্দরলোকের ছেলে, আপনার মত বেজন্মা নই।

কি বললে! ভদ্রলোকের মেজাজ চড়ে যায় নিমেষে।

রবির গলা আরো চড়ে ওঠে। আপনি ভেবেছেন কি, আমাদের পাড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের পাড়ার মেয়ের কাছে আমাদের মা-বাপ তুলে গালাগাল দেবেন আমরা ভন্দরসন্তান নই বলে আর আমরা আপনাকে এমনি ছেড়ে দেবো?

আমি তো তোমাদের কিছু বলতে যাইনি।

খবরদার! তোমাদের নয়, আপনাদের বলুন। আমরা ভন্দরসন্তান, আপনার মত ছোটলোকের ছেলে নই।

ভদ্রলোক বলেন, আমি তো এ'র সঙ্গে কথা বলছি।

ভেবেছিলেন আমরা শুনতে পাবো না! আমরা কালা নই। ভোঁদা খপ্ করে ভদ্রলোকের পকেট থেকে দামী স্যোনার ফাউন্টেন্ পেনটা তুলে নিয়ে বলে উঠলো, যান্ শিগ্গির চলে যান এখান থেকে, আমাদের পাড়ার মেয়েকে জমাতে এসেছেন, আমরা থাকতে? সাহস তো খুব! যান শিগ্গির নইলে প্যাণ্ট কোট এখানে খুলে রেখে যেতে হবে বলছি। হটো জলদি—ভাগো!

ভদ্রলোকের অপমানে মুখ-চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। ঘাড় হেঁট করে অপরাধীর মত পায়ে পায়ে এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে মজা দেখার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমে যায়।—কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে? একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে।

ওরি মধ্যে একজন বলে ওঠে, আরে পকেটমার নাকি? ঘা'কতক না দিয়ে এমনি ছেড়ে দিলেন কেন? বেশ করে ধোলাই দিতে পারলেন না? আজকাল ওইরকম ভদ্রলোকের পোশাকে অনেক পকেটমার ধরা পড়েছে।

একজন রসিকতা করে বলে ওঠে, আরে না মশাই, পকেটমার নয়—ইজ্জতমার! ওই মেয়েটাকে নাকি একলা পেয়ে জমাতে গিয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায় পাড়ার ছোকরাদের কাছে। তখন ভয়ে সুড়সুড় করে সরে পড়ে।

কৃষ্ণা রাগে অপমানে ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। তার কানে সব কথাই এসে পেঁছিচ্ছিল। মিথ্যাবাদী, লায়ার কোথাকার! বলে মস্তানদের যখন মনে মনে গালাগাল দিতে থাকে তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, যাও বাবারা চলে যাও, তোমাদের সব হাতে ধরে বলছি, মিছিমিছি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে নিজেকে ছোট করো না বাবারা। তোমরা সব শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। যাও, আমি বুড়ো মানুষ, তোমাদের বাপের বয়েসী, আমার কথা রাখো বাপ সকল।

এই বলে সেই প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলেন, যান আপনি, আর দাঁড়াবেন না—যেখানে যাচ্ছিলেন চলে যান।

আমি তো মশাই ওদের কিছু বলিনি।

শ্যাট্ আপ্! বলে চেঁচিয়ে ওঠে ফটকে, আমরা সব শুনেছি, মেয়েটিকে একলা পেয়ে জমাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন মিথ্যে বলা হচ্ছে!

আহা-হা, জানি তোমরা কেউ কিছু করোনি বাবা—তাই বলছি, আর এখানে দাঁড়াবেন না—চলে যান যে যার নিজের কাজে…।

ভদ্রলোক চলে গেলে ছেলের দল বলে ওঠে, আপনি বুড়োমানুষ বলছেন যখন চলে যাচ্ছি, নইলে আমাদের পাড়ায় এসে আমাদের পাড়ার মেয়ের সঙ্গে বদমাইসি করা বার করে দিতুম!

নিমেষে ভিড় পাতলা হয়ে যায়। তখন বৃদ্ধটি কৃষ্ণার কাছে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বলেন, চলো মা, আমি ওই সামনের গলিতেই যাবো। চলো

তোমায় বাড়ী পোঁছে দিই ! এই বলে ওর পাশে পাশে হাঁটতে থাকেন, তাঁর গন্তব্যস্থল ওই দিকেই ছিল।

তিনি উপযাচক হয়ে বলেন, আমিও ওই দিকে যাবো।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেন, আজকাল যা অবস্থা হয়েছে, পথেঘাটে তোমাদের মত মেয়েদের একলা বেরুনো ঠিক নয় মা।

কৃষ্ণা বলে, হঠাৎ আমাদের আজ ক্লাস হলো না তাই একটু সকাল সকাল এসেছি। নইলে চারটে-পাঁচটার সময় এখানে বহু লোকজনের ভিড় থাকে, সাধারণত তখনই ফিরি।

বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞেস করেন, কোন্ কলেজে তুমি পড়ো মা ?

কৃষ্ণা কলেজের নাম বলতে বৃদ্ধ বলেন, ওখানে আমার নাতি পড়তো ছ'সাত বছর আগে। ওটা তো কো-এড্ কলেজ। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে।

কৃষ্ণা বলে, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ যেন কি বলতে গিয়েও পারলেন না, থেমে গেলেন।

একটু পরেই একটা বাড়ীর সামনে এসে কৃষ্ণা থেমে যায়। বলে, এটা আমাদের বাড়ী। আচ্ছা তাহলে আসি, আপনি অনেক উপকার করলেন। নমস্কার।

কিন্তু কৃষ্ণা পিছন ফিরতেই বৃদ্ধ বললেন, শোনো মা !

কি, বলুন ? থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণা।

আচ্ছা তোমার মা নিশ্চয় বাড়ীতে আছেন ?

হ্যাঁ।

তাঁকে একটা কথা একটু বলে যেতে চাই মা, যদি একবার ডেকে দাও—

আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি মাকে।

না না, ভেতরে বসার দরকার নেই মা। দু'মিনিটের জন্যে, শুধু একটু দেখা করতে চাই।

কৃষ্ণা ভেতরে চলে যায়। তারপর বৈঠকখানার দরজা খুলে বৃদ্ধকে আহ্বান করে, আপনি একটু বসুন। আসছেন মা এখুনি।

এখুনি আসছেন বললেও মিনিট দশেকের অনেক বেশী সময় কেটে যায়। বৃদ্ধ মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠেন, এমন সময় কৃষ্ণার মা ঘরে এসে ঢোকেন।

তাঁর বেশভূষা দেখে বৃদ্ধ তো অবাক। চোখে সরু কাজলের রেখা, ঠোঁটে লিপ্স্টিক নেচারেল, মুখে হাল্কা পেন্ট্, একটা ফ্যাশানেবল্ কন্ডাক্টর ব্যাগ কাঁধে, হাতে ফোল্ডিং ছাতা, পাতলা ফিনফিনে নাইলন শাড়ী, সংক্ষিপ্ত বুকপিট কাটা ব্লাউজ গায়ে। মেয়ের চেয়েও যেন মায়ের সাজের ঘটা আরো বেশী। বোধ হয় এখনি কোথাও বেরুবেন !

বৃদ্ধের হকচকিত দৃষ্টির উপর একবার চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কৃষ্ণার মা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেন, নমস্কার। তারপর বৃদ্ধকে কোন কথা বলতে না দিয়েই তিনি বললেন, মেয়ের মুখে সব শুনলুম। আপনার পায়ে তো জুতো

ছিল, দিতে পারলেন না রাস্কেলদের আচ্ছা করে শিক্ষা! ওই অসভ্য জানোয়ারগুলোর জন্যে আজকাল মেয়েদের পথেঘাটে বেরুবার উপায় নেই। অথচ এখন তো আর সে দিন নেই। মেয়েরা সব লেখাপড়া শিখেছে। শিক্ষিত হয়েছে। সব সময় তাদের বাইরে বেরুতে হয় কাজকর্মে, ঘরে বসে থাকলে তো আর চলে না! এই তো দেখুন, চলেছি ছোট মেয়েটাকে স্কুল থেকে আনতে। সাড়ে তিনটেয় তার ছুটি হবে।

এই বলে হঠাৎ থেমে যান। বৃদ্ধের মুখের ভাব তেমনি অপরিবর্তিত দেখে মহিলা বলে ওঠেন, হাঁ, আপনি যেন আমায় কি কথা বলতে চান আমার মেয়ে বলছিল?

বৃদ্ধ এতক্ষণ চেয়ারে বসে ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, না, থাক।

তার মানে? চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে কৃষ্ণার মার, কি হলো, চলে যাচ্ছেন?

মানে—না—থাক গে। বলে দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, মানে অন্য কিছু নয়, যা বলবো ভেবে এসেছিলুম মা, তোমাকে চোখে দেখে আর বলার ইচ্ছা নেই।

কৃষ্ণার মার এতে আত্মসম্মানে ঘা লাগে যেন। তবু মুখে ভদ্রতার খোলস এঁটে প্রশ্ন করেন, আপনার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পারলুম না তো?

আমি বুড়ো মানুষ, যদি কিছু অন্যায় বলি, অপরাধ নিও না মা।

না না, আপনি বলুন না কি বলবেন!

বৃদ্ধ তবুও একটু ইতস্তত করে শেষে বলেন, আচ্ছা মা, তুমি তো স্কুল থেকে তোমার বাচ্চা মেয়েটাকে আনতে যাচ্ছো, তার জন্যে এমনিভাবে সাজগোজ করার কি প্রয়োজন আছে? সত্যি কথা বলতে কি মা, আমি তোমায় নিষেধ করে দিতে এসেছিলাম, তোমার মেয়েকে এমনিধারা সাজগোজ করে আর কলেজে না পাঠাতে, বিশেষ করে যে কলেজে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে! কিন্তু তোমাকে দেখেই আমার সেই ইচ্ছা দূর হয়ে গেছে। নেহাত তুমি পীড়াপীড়ি করলে মা তাই বলে ফেললুম। তুমি তো পথেঘাটে বেরোও, ট্রামে-বাসে আজকাল কি রকম পেষাপেষি ভিড় নিশ্চয় চোখে দেখেছো তা! কাজেই আর বেশী কি বলবো!

এই বলে একটু থেমে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আবার বললেন, রাগ করো না মা। আমি তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের কোন দোষ দেখি না, বরং তারা খুবই সংযত ও ভদ্র বলবো!

কৃষ্ণার মা এবার রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠেন, ভদ্র! তাই বুঝি ওই রকম অশ্লীল রিমার্ক করে? তাদের ঘরে কি মা-বোন নেই?

বৃদ্ধ বলেন, বোধ হয় তাদের চোখে এগুলো এত বিশ্রী ঠেকে যে মুখে সেকথা বলতে লজ্জা পায়। ওই ভাবে রিমার্ক করে, যাতে ভবিষ্যতে সাবধান হয়, ওই রকম সব কাটাকুটি জামা পরে আর পথে না বেরোয়! তাদের ওই সব ইঙ্গিত

মেয়েদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েরা এইটাকে উল্টো বুঝে তাদেরই গালিগালাজ করে!

কৃষ্ণার মার কণ্ঠে যেন বিষ ছিট্‌কে ওঠে, চমৎকার! আপনার মুখে আজ নতুন কথা শুনলুম, যা এ পর্যন্ত কাউকে কোনদিন বলতে শুনিনি। এখানকার ছেলেরা নাকি বেশী ভদ্র, বেশী সংযত!

তারপর তিনি শেষ ছোবল মারলেন, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে এখানকার সব মেয়েরাই বেশী অভদ্র ও বেশী অসংযত!

বৃদ্ধ জিভ কেটে বলেন, ছি ছি মা, আমি এমন কথা বলবো কেন? তাহলে কি রাস্তাঘাটে এত মেয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো? আমি শুধু সেই সব মেয়েদের কথা বলছি, নির্লজ্জ যারা, এমনি সব বেশভূষা করে রাস্তাঘাটে বেরোয়, যা দেখে পুরুষের মনে লালসার উদ্রেক করে। মা তোমার ঘরে যদি বড় আয়না থাকে তো একবার নিজেকে দেখে এসো!

দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে কৃষ্ণার মার। বলেন, ও, এখন বুঝতে পারছি কেন এইভাবে বাড়ী বয়ে আপনি আমার মেয়ের উপকার করতে এসেছেন!

যদি না বুঝে সত্য ভাষণ করে অপরাধ করে থাকি মা, তাহলে বুড়োকে ক্ষমা করো।

এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যখন রাস্তায় হাঁটতে থাকেন তখন তাঁর কানে এসে তীরের মত বিঁধলো, এই বুড়োগুলোই যত নষ্টের গোড়া! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তাই ঘরে বসে বসে একালের ছেলেছোকরাদের চরিত্রে কোন দোষ দেখে না! মেয়েদের জামাকাপড়ের হলো যত দোষ! এদের কাছে প্রশ্রয় পায় বলেই ওই বখা ছোকরাগুলো দিন দিন এত তলিয়ে উঠছে! এই বুড়োগুলো যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ সমাজের কোন উন্নতির আশা নেই!

কৃষ্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে মার কথা শুনছিল। তাই তিনি থামতেই সে বলে ওঠে, ওই বুড়োটার মনে যদি এই ছিল জানতে পারতুম মা তাহলে ঘরে না ঢুকিয়ে আগেই রাস্তা থেকে বিদেয় করতুম!

মা কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বলেন, তুই যেমন নেকি! মানুষ চিনিস না, ওই বুড়ো ঘাটের মড়াটাকে ঘরে ডেকে আনলি! তোর জন্যেই তো এত অপমান ঘরে বসে হজম করতে হলো!

॥ ৪ ॥

ওদিকে ওরা চলে যেতে ফটকেদের দল তখন ছুটে যায় সেই ভদ্রলোকের পিছনে। ও মশাই, ও মশাই শুনছেন?

ভদ্রলোক এতক্ষণ যেন শুনতে পাননি, এইভাবে আরো দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন।

এবার ফটকে চেঁচিয়ে ওঠে, এই যে, আপনার 'পেনটা' নিয়ে যান।

কলমটা ছিল অত্যন্ত দামী। উপহার পাওয়া। সেকালের পার্কার। তাই কলমের কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কি জানি ছোঁড়াদের হয়ত সুবুদ্ধি হয়েছে। সত্যি, আমি তো কোন দোষ করিনি!

ফটকে তখন রবির পকেটে ছিল যেটা ফুটপাত থেকে কেনা এক টাকার কলম, সেটা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বললে, এই নিন আপনার কলমটা!

ভদ্রলোক কলমটা দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, তাই হাত দিয়ে না ছুঁয়েই বললেন, রাবিশ, এটা আমার নয়।

সে কি, এটাই তো ছিল আপনার পকেটে! কি রে রবি?

ভদ্রলোক এবার আর কোন কথা না বলে যেই হাঁটতে যাবেন কল্যাণ বলে ওঠে, আচ্ছা আপনি কি আগে পাইকপাড়ায় থাকতেন? মানে এই পাঁচ-ছ'বছর আগে?

না—বলে দু'পা এগিয়ে গেলে ওরাও তাঁর পিছনে এগিয়ে গিয়ে বলে, রাগ করছেন কেন, স্যার? ঠিক আপনার মত এক ভদ্রলোক থাকতেন। খুব পয়সাওয়ালা ধনীলোক বলে পাড়ার সবাই খুব খাতির করতো। তারপর হঠাৎ একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে চেঁচামেচি শুনে, আমার ছোটমামা থাকতেন যে বাড়ীটায়, তার দু'তিনটে বাড়ীর পরেই এক বিরাট বাড়ী ভাড়া করে সে ভদ্রলোক থাকতেন, আমি তখন মামার বাড়ীতে ছিলুম—বাইরে এসে দেখি, পুলিসে সেই বাড়ীটা ঘিরে রয়েছে। তারপর কালো গাড়ীতে করে ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে গেল লালবাজারে দেখলুম। ভদ্রলোক-আপিসের গো-ডাউন ফাঁক করে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল পাচার করেছিল নাকি! তারপর যা হয়, "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা! আর ধরা পড়লেই মরা!" হো হো করে এবার ওরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

ভদ্রলোকের দু'কান লাল হয়ে ওঠে রাগে। বলেন, খবরদার, যাকে চেনো না, জানো না, তার সম্বন্ধে যা-তা বলো না বলছি, ভাল হবে না। আমি মানহানির মামলা করবো তোমাদের নামে বলে দিলুম!

কল্যাণ বলে, যান না মামলা করতে। আপনি যে সেই দাগী মাল, তখনই আরো ভাল করে জানাজানি হয়ে যাবে!

ভদ্রলোক হন্‌হন্‌ করে এবার এগিয়ে যান।

কল্যাণ বলে, মাইরি, একেবারে হুবহু সেই মাল! দেখছিস না, ওই কথা বলতেই ব্যাটা আর কথা কইতে পারলো না! আগেই আমার মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি!

রবি বলে, ভাড়াটাদের মাইরি এই বড় সুবিধে। শলা—আজ এখানে আছে কাল একেবারে উল্টোদিকে চলে গেলো। আর তেমনি হয়েছে এই কলকাতাটা, কেবল ভিড় আর ভিড়। মানুষ আর মরতে জায়গা পায় না, সবাই ছুটে আসে এখানে। তাই বিশেষ করে এই সব লোকেদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সুবিধে।

এর চেয়ে চমৎকার স্থান আর দুটি নেই। শালা—কে ভাল কে মন্দ বোঝার উপায় নেই! ভাল জামাকাপড় পরলেই সবাই ভদ্দরলোক। এখানে কে কাকে চেনে!

কল্যাণ বলে, ঠিক বলেছিস্ ব্যাটা তাই 'নর্থ পোল' ছেড়ে একেবারে 'সাউথ পোলে' এসে গা-ঢাকা দিয়েছে।

রবি বলে, মাইরি, আমাদের হয়েছে যত জ্বালা! বাপ্ বাড়ী করেছে বলে চিরদিন পাড়ার লোকের কাছে দাগী হয়ে রইলুম।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে বলে, এই ফট্কে, মাইরি গলা শুকিয়ে কাঠ মেরে গেছে, একটা ধোঁয়া ছাড়! বলে হাত বাড়াল তার দিকে।

কোথায় পাবো! এই দ্যাখ পকেট গড়ের মাঠ!

রবি বলে, চল তবে মানিকের দোকানে, সিগারেট খাওয়াবি।

ফটকে বলে, না, ও ব্যাটা আমার কাছে অনেক টাকা পাবে—তাই ডুব মেরে আছি—ওদিক আর মাড়াই না।

কল্যাণ বলে তাহলে চল, পটলার দোকানে বিড়ি খাওয়াবি।

ফটকে বলে, ট্যাঁক খালি। বাবা আজ নিজে বাজার করেছে। তাই একটা বিড়ি দুজনে খেতে হবে, আগেই বলে রাখছি কিন্তু। এই নে—

সেদিন রবি বাড়ী ফিরলে ওর মা তাকে অনেক গালমন্দ দিয়ে বললেন, হতচ্ছাড়া, তোর জন্যে কি এবার পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে! আর কত মা-বাপের মুখে চুনকালি দিবি!

দেখো মা, যখন তখন তোমার মুখে ওই এক কথা ভাল লাগে না! কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছ কেন তাই বলো?

কি আবার হবে, কেন তুই ভদ্রলোকের মেয়ে দেখলে তাদের রাস্তায় অপমান করিস?

কে বলেছে অপমান করেছি?

হ্যাঁ, যা-তা অকথা-কুকথা সব বলেছিস নাকি! পাড়ার লোকেরা তোর বাবাকে বলেছে রাস্তায় দেখে।

বেশ করেছি। রবি চেঁচিয়ে ওঠে, ওদের আমি ভদ্দরলোকের মেয়ে বলি না। ভদ্দর হলে ওইভাবে অভদ্দরের মত সেজে রাস্তায় বেরুতে পারে? কিরকম ড্রেস মেরে যায়, তুমি যদি দেখো তো লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বলে 'হাগুন্তির লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ',—এখন হয়েছে তাই!

মা বলেন, হ্যাঁ দেখছি—দেখে দেখে চোখ পচে গেছে! তবু তাদের যদি মান-অপমান বোধ না থাকে তা তোর এত গায়ের জ্বালা কিসের?

ওই সব মেয়েদের জন্য আমাদের পাড়ার কি রকম বদনাম তুমি জানো না মা।

মা রেগে ওঠেন, পাড়ায় কি আর লোক নেই? পাড়া কি তোর একলার? ভারী তো মুরোদ তোর! বেকার, রকে বসে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারিস দিনরাত! না করিস চাকরির চেষ্টা, না কিছু! তুই যাস্ পাড়ায় মাতব্বরী

করতে—লজ্জা করে না, তোর ও-কথা মুখে আনতে?

ম্যালা ফ্যাকফ্যাক করো না মা। তুমি ওসব বুঝবে না, যাও।

মা গর্জে ওঠেন, তিন বছর ধরে পথেঘাটে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিস, একটা চাকরির চেষ্টা পর্যন্ত নেই! আবার মুখ নাড়তে লজ্জা করে না?

আজকাল চাকরির পেছনে কোন লোক না থাকলে হয় না তোমায় তো বলেই দিয়েছি।

মুখপোড়া তোকে কতদিন বলেছি একবার যা মঙ্গল ঠাকুরপোর কাছে, কর্পোরেশনের কত বড় অফিসার হয়েছেন এখন। এককালে পাশাপাশি বৌবাজারে ভাড়াবাড়ীতে আমরা পনের বছর একসঙ্গে ছিলুম। আমায় 'মিষ্টি-বৌদি' বলতে অজ্ঞান হতো! বললুম তুই শুধু আমার নাম করিস, আর কিছু করতে হবে না।

রবি বিকৃত কন্ঠে বলে উঠল, থামো থামো, তোমার ওই মঙ্গল ঠাকুরপো না গুষ্টির পিণ্ডি কি নাম বললে, তাকে ধরে চাবুক মারা উচিত।

ওমা সে কি! কত বড় লোক, মানী লোক, তার নামে এই সব বলতে আছে। ছিঃ।

ওর নাম করো না আমার সামনে আর। বড় লোক, মানী লোক না ছাই! তুমি রোজ রোজ ঘ্যানঘ্যান করো বলে আমি একদিন গিয়েছিলুম তার অফিসে। প্রথমে তো তোমাকে চিনতেই পারে না। তারপর যখন বললুম, আমার মা'র নাম বকুল, মিষ্টিবৌদি বলে আপনি ডাকতেন, বৌবাজারে থাকতেন পাশাপাশি বাড়ীতে, তখন বলে উঠলেন, ও হাঁ হাঁ, বুঝেছি। তুমি তার ছোট ছেলে? বলো কি দরকারে এসেছ? বললুম যে কোন রকমের একটা চাকরি যদি দেন, মা তাই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রবির মা বেশ গদ্‌গদ হয়ে উঠলেন, আমাকে তাহলে মনে রেখেছে এখনো, কি বলিস! তারপর কি বললে?

থাক, সেকথা শুনে আর দরকার নেই। বলে রবি মুখখানা গম্ভীর করে নিল। তারপর একটু চুপ করে থেকে মায়ের জিজ্ঞাসু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, সেকথা মনে হলে রাগে আমার সারা গা রি-রি করতে থাকে। বলে কি জানো, তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছো—বললুম দুবার স্কুল-ফাইনাল দিয়েছিলুম, পাস করতে পারিনি।

তখন শুধু একটু মুচকি হাসলেন। তারপর সামনে টেবিলের ওপর একগাদা কাগজের স্তূপ থেকে দুখানা টেনে নিয়ে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, একটা বেয়ারার পোস্ট খালি ছিল তার জন্যে দেড় হাজার দরখাস্ত এসেছে। এর মধ্যে বি-এ পাস, বি-এ ফেল, হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করা বোধ হয় হাজার খানেক হবে। কাজেই কি চাকরি তোমায় দেবো! এর নীচের কাজ ঝাড়ুদার আর মেথর।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল, বললুম ওসব তো লোক-দেখানো কথা, আসলে

আপনারা তো নিজেদের লোক ছাড়া কাউকে নেন না শুনেছি।

তিনি বললেন, ওসব মিথ্যে কথা। যারা চাকরি পায় না তারা রটায়। মোট কথা যোগ্যতা না থাকলে আমি কিছু করতে পারবো না।

এই কথা শুনে আমার মাথা এইস্যা গরম হয়ে উঠলো যে সঙ্গে সঙ্গে বললুম, আপনার কি যোগ্যতা আছে জানি! ইউনিভারসিটির কতগুলো ডিগ্রী পেয়েছেন যে এই পোস্টে বসেছেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, গেট্ আউট! দরোয়ান ঘাড় ধরকে নিকাল দেও।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এত বড় মানুষটার মুখের ওপর তুই এই সব বললি! আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা হলো!

তুমি থামো। রবির কণ্ঠে আগুনের ঝাঁজ। এইসব থার্ড ক্লাস লোকগুলো গদিতে বসলেই ভুলে যায়, একদিন নিজেরা কি মাল ছিল, কি করে ওই চেয়ারে বসেছে! ইচ্ছা করছিল দুই গালে দুই থাপ্পড় মেরে মুখোশ খুলে দিই।

মা বলেন, চুপ কর মুখপোড়া হতভাগা। লজ্জা করে না মুখ নাড়তে? একটা পাসও করতে পারিসনি, চাকরি কে দেবে তোকে?

তার জন্যে তোমরাই তো দায়ী। বললুম যে স্কুলের মাস্টার সত্যশরণ-বাবুকে প্রাইভেট্ টিউটর রাখতে, তখন আমার কথা শুনলে না। দাদাকে পড়াতেন যে বুড়ো মাস্টার, দিলে তাকে ঠেকিয়ে। আর এখন কি আর সেই সব আগের যুগ আছে? যে স্কুলে যে পড়ে সেই স্কুলের মাস্টারকে বাড়ীতে পড়াবার জন্যে রাখলে তিনিই নিজের দায়িত্বে পাস করিয়ে দেন। একশো টাকা মাইনে শুনে তোমরা চমকে উঠলে। ও টাকা তো উনি নিজে সব নেন না। ইংরিজী, বাংলা, অংক, ইতিহাস—সব শিক্ষকদের সঙ্গে গোপন ভাগাভাগির ব্যবস্থা আছে। ওঁদের আবার একটা গ্রুপ আছে, যাঁরা স্কুল-ফাইন্যালের পরীক্ষক—তাঁদেরও কিছু ভাগ দিতে হয়, কিন্তু পাস একেবারে সিওর। নিশ্চিত আমার চেয়ে ক্লাসের কত খারাপ সব ছেলে, এইভাবে পাস করে বেরিয়ে গেল। তোমাদের জন্যই কেবল আমার হলো না।

রবির মা রেগে উঠলেন, ও পাসের মূল্য কি?

মূল্য যদি না থাকে, তাহলে চাকরি করতে গেলে আগে জিজ্ঞেস করে কেন ক'টা পাস? লোকে এখন ঠেকে শিখেছে, তাই ধার-দেনা যেমন করে হোক ছেলে-মেয়েদের পাসটা আগে করাতে চায়। টাকার কথা কেউ ভাবে না আগে। জানে ছেলে চাকরি পেলে সুদেআসলে উঠে আসবে।

তোর বাবা কোথা থেকে এত টাকা দেবেন মাস্টারকে! রিটায়ার করে ক'টাকা পেন্সন্ পান জানিস তো সব!

রবি বলে, তাহলে চাকরির জন্যে যখন তখন খোঁটা দিও না বলে দিচ্ছি। আমি পাস করতে পারিনি, তার জন্যে তোমরা দায়ী। এঠা মনে রেখো সব সময়।

রবির মা এবার বলেন, কলকারখানার চাকরিতে তো পেটে বিদ্যে লাগে না,

তাও কি একটা চেষ্টা করলে এতদিনে যোগাড় করতে পারতিস না !

চেষ্টা করছি না তোমায় কে বললে ? তুমি তার কতটুকু খবর রাখো ?

বলবে আবার কে, সব সময়ই তো শুনি ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে হয় চায়ের দোকানে আর নয় তো রকে বসে আড্ডা মারিস। কখন করিস চেষ্টা ! বলে রাগে গজগজ করতে করতে তখন ছেলের সামনে থেকে চলে যান তিনি।

ঘরের ভেতরে গিয়ে বলেন, দুটো পয়সা রোজগার করলে তুই সুখে থাকবি, আমি নিতে যাবো না। তোর বাবার পেন্‌সন্‌টা যতদিন আছে দুটো নুন ভাত জুটবে জানিস আমার। বাপ-দাদার পকেট মেরে আর ক'দিন খাবি ?

চেঁচিয়ে ওঠে রবি, মুখ সামলে মা !

মা এবার কেঁদে ফেলেন, লজ্জা করে না ওকথা বলতে ? তোর নিজের দাদা তো এইজন্যে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেল। তার পকেটে টাকা পয়সা দেখে প্রায়ই কম। কোথায় গেল ! বৌমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি নিয়েছো ? কখনো বা আমায় জিজ্ঞেস করে। আগে ভাবতো, হয়তো এটা ঝি-চাকরের কাজ। ঘর ধুতে মুছতে গিয়ে হাতসাফাই করেছে। কিন্তু মুখের ওপর তাকে কিছু বলতে পারতো না। পাছে সে ছেড়ে গেলে, নতুন লোক আজকাল মেলা দায়, তাছাড়া নতুন-ই বা কেমন হবে কে জানে ! ইদানীং বৌমাকে টাকাপয়সা সব চাবির মধ্যে রাখতে দিতো। সেখান থেকেও যখন চুরি যেতে লাগল, তখন এ কাজ যে বাড়ীর লোকের, তাতে আর সন্দেহ রইলো না। বৌমার ভোলা মন। কখনো স্নানের ঘরে, কখনো বা ড্রেসিং-টেবিলে ভুল করে চাবি ফেলে যায়, তারপর হয়ত অনেকক্ষণ পরে মনে হলে ছুটে আসে খুঁজতে। এখানে ওখানে দেখতে না পেয়ে বলে, মা, তুমি দেখেছ, চাবিটা কোথায় রেখেছি ! মনে মনে সব জেনেও তারা তাই চুপ করে থাকতো। তোর বাবারও পকেট থেকে টাকাপয়সা মাঝে মাঝে কোথায় যায়, হিসেব মেলাতে গিয়ে পারে না যখন, কতদিন আমি নিয়েছি বলে তোকে সামলেছি। তোর বাবাকে তা জানতেও দিইনি। পাছে বেকার ছেলের নামে চুরির অপবাদ মা হয়ে কানে শুনতে হয়, তাই সব নিজে হজম করেছি। মা হওয়ার যে কত জ্বালা, তা তুই কি বুঝবি হতভাগা, কুলাঙ্গার কোথাকার !

দেখো মা, তুমি যখন-তখন আমায় বংশ তুলে গালাগাল দাও, কিন্তু এর জন্যে কি আমি দায়ী ! তোমরাই তো আমায় এনেছো, আমি নিজে যেচে আসিনি— তোমাদের বংশরক্ষা করতে হবে বলে !

ছি ছি, মা বলেন, মুখপোড়া জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো। কতগুলো ছোটলোকের সঙ্গে মিলেমিশে মুখের বাক্যি হয়েছে দেখো না। বাপ-মা সম্বন্ধে ওকথা বলতে একটু সমীহ হয় না তোর ?

রবি বলে, আমার কেন হবে, বরং তোমাদের সমীহ হওয়া উচিত ! যে ছেলে নিজের পায়ে এখনো দাঁড়াতে পারেনি, কোথায় তাকে 'পকেটমানি' দেবে, যাতে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সে তোমাদের মাথা হেঁট না করে, তা নয়

উল্টে গাল দিচ্ছো তাকে। লজ্জা করে না!

চুপ কর বেহায়া নচ্ছার। বাপ-দাদার পকেট মেরে ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে বিড়ি-সিগারেট খেয়ে, সিনেমা রেস্তোরাঁয় আড্ডা মারতে তোর লজ্জা করে না……

কেন করবে? সদর্পে জবাব দেয় রবি। যতদিন না আমার একটা চাকরি-বাকরি কিছু হয়, ততদিন আমার সব কিছু খরচ যোগাতে তোমরা বাধ্য।

মায়ের চোখ দু'টো যেন জ্বলে ওঠে, কি বললি?

যা সত্যি তাই বলেছি। দুনিয়ার সব মা-বাপই বেকার ছেলেদের সব কিছু খরচ যুগিয়ে থাকে—তোমরা এমন কিছু নতুন করোনি যে তার জন্যে এত হৈ হল্লা করছো।

চুপ কর মুখপোড়া। হৈ-হল্লা কেউ করেনি। যেদিন তোর দাদা জানতে পারলে যে তোর বৌদির ঘড়িটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তুই বললি বোধ হয় বাইরে থেকে কেউ টেনে নিয়েছে জানলা দিয়ে—সেদিনও একটা কথা তোর দাদা মুখে বলেনি। শুধু পরের মাসে এসে বললে, মা, আমাকে দিল্লীর অফিসে বদলি করেছে। সেখানে তোমার বৌমাকে নিয়ে চলে যেতে হবে এই মাসের পঁচিশ তারিখে। অফিস থেকেই কোয়ার্টার দেবে।

রবি চেঁচিয়ে ওঠে, ওসব বাজে গুল্ মেরো না মা আমার কাছে। আমি সব জানি। ওটা বৌদির চালাকি। এখানে শ্বশুর-শাশুড়ী ও বেকার দেওরের সংসারে খরচ দিতে ও গতরে খাটতে হচ্ছিল তাই একটা 'পলিসি' মাথা থেকে বার করে দু'জনে সরে পড়লো এখান থেকে। তার স্বামীর রোজগারে যে আমরা এতগুলো মানুষ খাচ্ছি সেটা সহ্য হচ্ছিল না। অনেকদিন থেকে তাই জাল কেটে পালাবার ছুতো বৌদি খুঁজছিল। জানে দাদা বাবাকে ও তোমাকে কিরকম ভালবাসে! সেখানে দিব্যি কপোত-কপোতী সুখে আছেন। দু'টিতে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছেন। থিয়েটার, সিনেমা, রেস্তোরাঁ করছেন। এখানে তো সেটার জন্যে বৌদির খুব অসুবিধা হচ্ছিল, তাই সরে পড়েছে। আজকাল সবাই তাই করে।

চুপ কর শয়তান! যদি জানতিস্ দাদা-বৌদি তোকে কত ভালবাসে, তাহ'লে ওকথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতিস না!

দেখো মা, কে আমাকে কত ভালবাসে সে আমি জানি ভাল করে। তুমি আমায় জ্ঞান দিতে এসো না। তারা তোমাকে যেমন বুঝিয়েছে, তুমি তেমনি বুঝেছো। তাই নিয়ে সুখে থাকো।

বেশ, তাই যদি হয় তো কার কি বলার আছে! সে যদি নিজে উপার্জন করে তার বৌকে নিয়ে জীবনটাকে 'এন্‌জয়' করতে চায় তো তোর কি তাতে? তোর কাছে তো হাত পাত্‌তে আসেনি, কিংবা বাপ-দাদার পকেট মেরে 'এন্‌জয়' করতে যায়নি তোর মত!

রুখে ওঠে রবি, ফের তুমি বাপ-দাদা তুলে কথা বলছো! বেশ করেছি।

বাপ-দাদা যদি না দেয় কি করবো? আমার হাতখরচা চলে কি করে ওদের না নিলে, তাই নিয়েছি, এটা এমন কিছু মহা অপরাধ নয়। ঘরে ঘরে সবাই করে। করে আসছে চিরকাল। আমার দাদাও একদিন করেছিল, এমন কি আমার বাবাও বাদ যায় নি এ কর্ম থেকে!

চুপ কর মুখপোড়া নির্লজ্জ। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তোর জিব্ খসে যাবে গুরুজনদের নামে এসব বললে মায়ের মুখের ওপর।

উচ্চ হাসি হেসে সেকথা উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় রবি বাড়ী থেকে।

॥ ৫ ॥

এর কিছুদিন পরে রাত্রে বাড়ী ফিরে রবি দেখে ওর মা কাঁদছেন। কি হয়েছে মা? কাঁদছো কেন? নিশ্চয় বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে টাকাপয়সা নিয়ে!

একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, আমায় একটু বিষ এনে দে, আমি খেয়ে আত্মহত্যা করি। আর পারছি না তোর কলঙ্কের বোঝা বইতে। বাপ-মায়ের মুখে আর কত চুনকালি দিবি বল্?

কি হয়েছে আগে বলো! কেঁদো না, আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

কাল বিকেলে তুই পলাশদের বাড়ী গিয়েছিলি? চোখের জল মুছে তিনি প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ গিয়েছিলুম, তাতে কি হয়েছে? কাঁদছো কেন? প্রায়ই তো যাই। শনিবার মোহনবাগানের খেলার একটা টিকিট দেবে বলেছিল সে তাই!

ক্রুদ্ধস্বরে মা বলেন, কিন্তু পলাশ তখন বাড়ী ছিল না, তুই ওর দিদির ঘরে রেডিও শোনার নাম করে ঢুকে বালিশের তলা থেকে তার গলার হার চুরি করেছিস। ওদের বাড়ীতে বাইরের লোক অন্য কেউ কাল আসেনি। ছি ছি ছি, তোর এতদূর অধঃপতন যে হয়েছে তা কল্পনা করতে পারিনি! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষকালে অপরের বাড়ী থেকে গয়না চুরি করলি!

কে বলেছে আমি চুরি করেছি? রাগে জ্বলে ওঠে রবি।

কে আবার বলবে, পলাশের বাবা নিজে এসে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছেন আমাকে আর তোর বাবাকে। তাই উনি বাড়ী ছেড়ে আজই রাগ করে দিল্লী চলে গেছেন তোর দাদার ওখানে। বলে গেছেন ও ছেলের আর মুখ দেখবো না।

এত বড় আস্পর্দা পলাশের বাবার! দেখে নেবো তাকে বাড়ী বয়ে আমার বাবা-মাকে অপমান করতে আসা! যদি আমার ওপর সন্দেহ, তাহলে আমাকে এসে বলতে পারতো! আচ্ছা দেখে নেবো তাকে!

মা এবার ছেলের হাতটা খপ করে ধরে ফেললেন, বললেন, লক্ষ্মী বাবা, এ

নিয়ে আর কেলেঙ্কারী করিসনি, তাহলে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না। যা হবার হয়ে গেছে।

রবির গলা চড়ে ওঠে। সেখানে অন্য সুর। বলে, তোমার ছেলেকে তোমাদের মুখের ওপর বাড়ীতে এসে এভাবে অপমান করে গেল, আর তোমরা চুপ করে রইলে? জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দিতে পারলে না? আমি থাকলে দেখিয়ে দিতুম। বাবা হয়েছে যেমন মেনিমুখো, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় তাঁর আওয়াজ খুব বেরোয় দেখেছি!

চুপ কর হারামজাদা। বংশের কুলাঙ্গার কোথাকার। এই দেবতুল্য বাপের নামে একটা কথা যদি বলবি তোর মুখ খসে যাবে।

রবির গলা চড়ে ওঠে, তোমরা মা-বাপ হয়ে যদি মুখ বুজে থাকো তাহলে তো বলবেই। নরম মাটিতেই বেড়ালে আঁচড়ায়। পড়তো পটলার মায়ের পাল্লায় তো ঝেড়ে কাপড় পরিতে দিতো! জানো, একদিন একটা মেয়ের বাপ কমপ্লেন করতে এসেছিল পটলার নামে তার বাপের কাছে, তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না শুনে পটলার মাকে ডেকে বলে, তার মেয়ের দিকে চোখ টিপে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল নাকি পটলা! যেই সেকথা বলা এইস্যা ধোলাই দিলেন তাকে, সে লোকটা ল্যাজ মুখে করে পালাতে পথ পেলে না।

পটলার মা শুধু বললেন, আমার ছেলে যে দেবচরিত্র তা বলছি না। কিন্তু আপনার চরিত্রটা কি, কারুর জানতে তা বাকি নেই। কেন ঝি টেঁকে না আপনার বাড়ীতে, সবাই তা জানে। নিজের চরিত্রটা আগে ভাল করুন, তারপর অন্যের ছিদ্র ধরতে আসবেন।

রবির মা চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, ওঃ, কি অপমানটা পলাশের বাবা করে গেলেন। বলেন ওই কুলাঙ্গারকে আবার ভাতের থালা বেড়ে দেন, বিছানায় শুতে দেন! আমি হলে বাড়ী থেকে দূর করে দিতুম, দেখি কে খেতে দেয় আর কোন্ চুলোয় থাকে! বাপ-মায়ের প্রশ্রয় পায় বলেই তো এতখানি বুকের পাটা ছেলের।

রবি দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বললে, এসব শুনেও তোমরা মুখ বুজে রইলে, আর বাবা বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন একেবারে দিল্লী!

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, পায়ে ধরে কত কাঁদলুম, কোন কথা শুনলেন না। বললেন, যতদিন না ছেলে মানুষের মত মানুষ হয়, এ মুখ আর কারুর কাছে দেখাবো না।

একটু থেমে গলায় সহানুভূতি ঢেলে তিনি বলেন, সত্যি করে আমার গা ছুঁয়ে বল্ বাবা, তুই হারটা নিয়েছিস কিনা? মায়ের গা ছুঁয়ে মিথ্যে বললে পাপ হয়, জানিস তো?

পাপ-পুণ্যের ধার ধারে না রবি। তবু মায়ের মুখের ওই কথাটা শুনে সহসা যেন নীরব হয়ে যায়। মৌনং সম্মতিলক্ষণং—তাই ওর মা সেই দুর্বল

মুহূর্তে কণ্ঠে স্নেহের সুধা ঢেলে বললেন, কোথায় রেখেছিস আমায় দে, আমি নিজে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। তুই কোন্ বংশের ছেলে ভুলে যাসনি বাবা।

এবার ঘাড় নীচু করে রবি বলে, সে আমার কাছে নেই।

তবে যার কাছে রেখেছিস তার কাছ থেকে নিয়ে আয় বাবা—যা লক্ষ্মীটি! তোকে কেউ চোর বললে, মায়ের বুকে—আমি তোর মা, কত বড় আঘাত লাগে, জানিস তো?

রবি বললে, আমি সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।

বেশ, সে টাকাগুলো কোথায়? তাই দে—ওদের ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

সে টাকা নেই। তাই দিয়ে অন্তুর বাবার ওষুধ ইনজেক্শান সব কিনে দিয়েছি। দু'মাস ধরে ওর বাবা ভুগছেন, হয়ত বাঁচবেন না, ওর মা কান্নাকাটি করছিলেন, এখনও ওষুধ ইনজেকশান্ করতে পারলে হয়ত জীবনটা রক্ষা হয়। কিন্তু এক বছর হলো অন্তুর বাবা যে কারখানায় কাজ করতেন, তা বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরে এমন একটা পয়সা নেই যে রেশন তোলেন। আমাদের পাড়ার কেউ কেউ যে সাহায্য করেনি তা নয়। কিন্তু তাতে আর কদিন চলে? শেষকালে ধার চেয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছেন, কিন্তু কেউ একটি পয়সাও দেয়নি। অবস্থা খারাপ, ভেবেছে শোধ দেবে কি করে? তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

বলে রবি থামতেই তার মা গর্জে উঠলেন, তাই তোকে এইভাবে চুরি করতে তিনি বলেছিলেন?

না—না, তিনি কেন বলতে যাবেন! তিনি একটি কথাও বলেন নি,, শুধু কেঁদেছেন। সেই কান্না শুনে আমি থাকতে পারিনি মা। সত্যি কথা বলছি মা, বিশ্বাস করো, হাজার হোক আমাদের পাড়ারই একজন এইভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! যদি তার প্রাণটা রক্ষা হয়, তাই গিয়েছিলুম পলাশের কাছে ধার চাইতে। ওর বাবা তো দুনম্বরী কালোবাজারী ব্যবসা করে এই ক'বছরে গাড়ী বাড়ী লক্ষ লক্ষ টাকা করেছেন, পলাশ এক-একদিন রেস্তোরাঁয় পঞ্চাশ একশো টাকার বিল দেয় আমাদের খাইয়ে।

বেশ তো, পলাশের সঙ্গে যখন দেখা হলো না, চলে এলেই পারতিস। তাদের ঘরে ঢুকে চুরি করতে গেলি কেন?

ওষুধ ইনজেকশান্ তখুনি না পড়লে চলবে না, তাই দেখলুম বালিশের তলা থেকে হারটা দেখা যাচ্ছে, আমি নিয়ে চলে এসেছি—বলো মা আমি কি অন্যায় করেছি?

মা একটু নীরব থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিতে নিতে বললেন, ন্যায় অন্যায় বুঝি না, তবে চুরিকে চুরি অন্যায়কে অন্যায় লোকে চিরদিন বলবেই বলবে। তুমি অন্যের জীবনরক্ষার জন্যে চুরি করেছ কিনা, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, তোমাকে চোরই বলবে।

বলুক তাতে আমি পরোয়া করি না। আমি জানি আমি কি করেছি।

রবির মা বলে ওঠেন, আমার শুধু রাগ হয় এই জন্যে যে পাড়ার যত দায়দায়িত্ব কি সব তোর? এত বড় পাড়ায় এত সব ধনী মাতব্বর থাকতে, তোর কেন মাথাব্যথা সব বিষয়ে? অথচ তোকে তো কেউ ভাল চোখে দেখে না!

না দেখুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। শুধু তুমি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কেঁদো না, এই আমার অনুরোধ।

এই সময় হঠাৎ বাইরে থেকে কারা মুখে সিটি দিয়ে ওঠে। রবি মাকে বলে, আমি এখুনি আসছি, তুমি চুপ করো মা, দেখো এই ছেলে একদিন বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে।

সেদিন যদি কখনো সত্যি হয়, আমি মা-কালীকে জোড়াপাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো।

কথাটা মার কানে ঢোকার আগেই রবি রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কয়েকজন বন্ধু তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফটকে বলে ওঠে, গুরু, ব্যাপার কি? মুখটা এমন চীফ মিনিস্টারের মত হাঁড়ি করে আছিস, মনে হয় যেন রাজ্যের সব ভাবনা-চিন্তাটা তোর মাথায় কে চাপিয়ে দিয়েছে!

রবি বলে, না মাইরি, ইয়ারকি ভাল লাগছে না, এখন মনটা সত্যি খুব খারাপ।

পটলা একটা বিড়ি পকেট থেকে বার করে রবির হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, গুরু, আগে একটু মুখ-অগ্নির ব্যবস্থা করো। তাতে দেখবে সব ধোঁয়া কেটে গিয়ে ব্রেন সাফ্ হয়ে গেছে। বলে ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার মুখে ধরলে।

বিড়িটায় একটা টান দিয়ে তখন রবি বলে, মাইরি, বাবা আমার ওপর রাগ করে বাড়ী থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন। আর কোনদিন ফিরবেন না মাকে বলে গেছেন, মা খুব কান্না জুড়ে দিয়েছে।

পটলা হো হো করে হেসে ওঠে সকলের হাতে একটা করে বিড়ি দিতে দিতে।

রবি বিড়িটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে বলে, দ্যাখ, দাঁত কেলিয়ে হাসিসনি। এতে হাসার কি আছে?

ভোলা বলে, ওসব মা'র গুলপট্টি, বিশ্বাস করিসনি। আমি ঢের মা দেখেছি। তোকে ভয় দেখাবার জন্যে, বুঝতে পারছিস না? তুই ব্যাটা দিন দিন বোকা-পাঁঠা হয়ে যাচ্ছিস। মায়ের চোখের দু'ফোঁটা জল দেখেই গলে গেলি? তুই তো আগে এরকম ছিলি না!

যা চুপ কর, মেলা ফাট্ নিসনি। ভাল লাগছে না তোর ওই ফ্যাঁচফ্যাঁচানি।

মাইরি গুরু, আমার কথা তুই বিশ্বাস কর। আমি শালা···ভুক্তভোগী। মায়ের চোখের জলে ভুলিসনি, ও স্রেফ গুলপট্টি।

রবি তখন বলে, না মাইরি, তোরা আমার বাবার কিছুই জানিস না। এমনি দেখলে মনে হয় মাটির মানুষ, বেশ আছে তো আছে, কিন্তু হঠাৎ বেগড়ালে

একেবারে শ্লা···আয়রন-ম্যান্।

ভোলা মুখ থেকে পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলে, গুরু, আমাকে আর আয়রনম্যান দেখাসনি ! জিজ্ঞেস কর ফট্‌কেকে, ও একদিন কিছুটা নমুনা পেয়েছিল আমার বাবার ! কিরে ফট্‌কে, মনে নেই তোর সেদিনের কথা ?

মাইরি গুরু, ফট্‌কে বলে ওঠে, মাইরি গুরু, ওরকম রাগ আমি কোন বাবার কখনো দেখিনি। তুই বললে বিশ্বাস করবি না, ছেলের ওপর রাগ করে ঘর থেকে ঘড়ি আয়না চেয়ার টেবিল ছুঁড়ে আছাড় মেরে উঠোনে ফেলে দেয়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে আমার তো শ্লা—আত্মারাম খাঁচাছাড়া। দে ছুট্! আমি গিয়েছিলুম ওকে ডাকতে সেদিন নাইট শো'য় 'ইভ্‌নিং ইন্ প্যারিসে'র টিকিট কেটেছিলুম দু'জনে দেখবো বলে, যেই বাইরে থেকে হুইসিল্ মেরেছি, ব্যস্, শুনেই একেবারে 'ব্যোম্'। বললে, বাড়ী থেকে বেরিয়েছো কি খুন করবো ! বোঝ আমার অবস্থাটা। মাইরি, ওরকম প্রচণ্ড রাগ দেখিনি কখনো।

আরে থাম্ তো ! ওসব রোয়াবি আমার কাছে মারিস নি। আমার বাবার রাগের কাছে ও তো শিশু। বলে পটলা শুরু করে। রাত ন'টার আগে যদি বাড়ী না ফিরি তো শ্লা—রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে বাবা নিজে সদরে চাবি দিয়ে বালিশের তলায় চাবি রেখে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দেবেন।

ভোলা বলে, তখন কি করতিস ? সারারাত পেটে কিল্ মেরে রাস্তায় পড়ে থাকতিস্ ?

আরে গুলি মারো ! তেমন বোকা আমি নই !

তখন কি করতিস্ বল না ? সকলে একসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করে।

পটলা বলে, তখন ? তখন কী আর করবো, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' !

ভোলা বলে, তার মানে ?

তুই ব্যাটা একটা বুদ্ধু ! তার মানে আর কি হতে পারে ?

তার মানে আর কি হতে পারে ! ওদিকে মাও লাগিয়ে দিয়েছে 'হাঙ্গার-স্ট্রাইক্'। শরীর খারাপ, কিছু খাব না বলে ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

ভোলা বলে, তারপর ?

তারপর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা এগারোটা বারোটাও যখন বেজে গেল, তখন বাবা গর্জন করে ওঠেন, ন্যাকামি পেয়েছো, শরীর খারাপ ! পীরের কাছে মামদোবাজী করতে এসেছো ! ছেলে এখনো বাড়ী ফেরেনি, তাকে শাসন করছি বলে না খেয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে, বুঝি না কিছু ?

মা কেঁদে ওঠেন, মায়ের জ্বালা তুমি কি বুঝবে ! তুমি তো দশ মাস পেটে ধরোনি। বাছা আমার সারারাত উপোস করে পথে পথে ঘুরবে, আর আমি মা হয়ে পেট পুরে খেয়ে আরামে ঘুমবো ? তুমি ছেলেটাকে বাড়ী ঢুকতে দেবে

না বলে দোরে তালা লাগিয়ে দিলে। এদিকে সোমত্ত ছেলে এই রাতদুপুরে বাড়ী ঢুকতে না পেরে যদি খারাপ পথে যায়!

বাবা রাগে জ্বলে ওঠেন, খারাপ দিকে যাবার আর কি বাকী আছে তোমার ছেলের?

মা কান্না চাপতে না পেরে ডুকরে ওঠেন, এখনো যেটুকু বাকী আছে তাও আর থাকবে না তোমার এই শাসনের চোটে! ছেলে বড় হলে যে বাপকে হিসেব করে কথা কইতে হয়, তাও তুমি যদি না জানো—

বাবা এবার ছুঁড়ে চাবির গোছাটা মায়ের কাছে ফেলে দেন। যা ইচ্ছে করোগে, এরপর যদি ছেলের ভালো-মন্দ নিয়ে একট কথা কইতে আসো তো দেখে নেবো।

এবার সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। ফট্‌কে বলে, গুরু, যতক্ষণ আমাদের ঘরে মায়ের চোখে জল আছে ততক্ষণ don't fear! বাবা কেন, বাবার বাবাও তোর কিছু করতে পারবে না। জানিস আমার এক পিসেমশাই আছেন, ছেলের ওপর রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান, তারপর দশ-পনেরো দিন ঘাপ্‌টি মেরে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী থেকে আবার সুড় সুড় করে বাড়ী ফিরে আসেন। মায়ের জন্যে মন কেমন করে যে।

কিন্তু আমার বাবাকে চিনিস না। বলে গেছেন যতদিন না ছেলে ভাল হচ্ছে, ততদিন আমার মুখদর্শন করবেন না, বাড়ীতেও আসবেন না।

গুরু, ওসব কথার কথা। গুলি মারো! অনেক বাপকে দেখলুম এই বয়সে। তুই নেহাত ছেলেমানুষ, তাই বাবাকে যুধিষ্ঠির মনে করছিস! নে—নে, একটা ধোঁয়া ছাড়।

খপ্ করে ফটকে রসিকতা করে উঠলো, দেখ, ওরকম সব বাবাই বলে। ছেলের মুখ না দেখুন ছেলের মা'র মুখ না দেখে কতদিন থাকবেন?

সবাই হেসে ওঠে হো হো করে। একটা হাসির হল্লা উঠে থেমে যায়।

গুরু, কোন চিন্তা করো না। ফট্‌কে শলা একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছে। এই বাপ জাতটাকে ও হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছে। এই নে টিকিট, রক্সিতে কাল ইভনিং শো সাড়ে পাঁচটার সময়, আমরা পাশের চায়ের দোকানে তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।

রবি বলে, না ভাই, আমি যাবো না। আমার পকেট গড়ের মাঠ। তাছাড়া বাবা চলে গেছেন, তাঁর পকেটও মারতে পারবো না। ওদিকে মায়ের মেজাজ 'গুড়খাট্টাই'! তাঁর কাছেও কোন হেলপ্ পাবার উপায় নেই।

আরে গুলি মারো, গুরু। এ শর্মা কোন শলার 'হেলপ্' চায় না। Self help! নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শেখো। ব্ল্যাকে চারখানা টিকিট ঝেড়ে দিয়েছি আগে। তারই প্রফিট্-এ আমরা দেখবো। যাকে বলে ফ্রি পাস। গুরু, তাহলে তো আর চিন্তা নেই?

ঠিক আছে—বলে রবি এবার বাড়ী চলে যায়।

॥ ৬ ॥

স্কুল। হেড মাস্টারের ঘর। বৃদ্ধ জনার্দনবাবু হেড মাস্টারমশাই চেয়ারে বসে মোটা চশমা চোখে দিয়ে কি লিখছিলেন, এমন সময় সত্যনারায়ণবাবু ইংরিজীর শিক্ষক ঘরে এসে ঢুকলেন, স্যার, আমায় ডেকেছেন ?

হ্যাঁ, বসুন। বলে হেড মাস্টারমশাই গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, দেখুন সেক্রেটারি আপনাদের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশ করেছেন। তিনি জানতে পেরেছেন, আপনারা কয়েকজন মিলে নাকি গোপনে একটা শিক্ষক সমবায় সমিতি করেছেন, যত অগামঘা অশ্লেষা গোছের বড়লোকের ছেলেদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে প্রাইভেট টিউশনের নাম করে সব পাস করিয়ে দেন। কয়েকজন ছাত্রের অভিভাবক সেক্রেটারির কাছে গিয়ে সেকথা জানিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে 'এনকোয়ারি' করে রবিবারের মধ্যে একটা রিপোর্ট দিতে বলেছেন।

এই বলে একটু থেমে বললেন, এটা কি সত্যি নাকি ?

সত্যনারায়ণবাবু মাথা চুলকে বললেন, দেখুন স্যার, মাস্টারী করি, আপনি বৃদ্ধ মানুষ, আমাদের প্রধান শিক্ষক যখন আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না। যা শুনছেন অনেকটা সত্যি।

এঁ্যা! বলে একটু চমকে উঠলেন তিনি। তারপর বললেন, সেক্রেটারি মশাই তাহলে ভুল বলেন নি! অথচ এর বিন্দুবিসর্গও তো আমি শুনিনি। না-না, দিস্ ইস্ ভেরী ব্যাড। এতে যে স্কুলের ভীষণ বদনাম রটে যাবে, আপনারা কি সেটা জানেন না!

সত্যনারায়ণবাবু বললেন, বদনাম হবে কেন স্যার, আমার তো মনে হয়, এতে স্কুলের আরো সুনাম হবে।

কি বলছেন ? সুনাম না দুর্নাম হবে বলুন!

সত্যনারায়ণবাবু বলেন, কেন একথা বলছি একটু ভেবে দেখুন স্যার। ধনীর ওই অপোগণ্ডগুলোকে যদি এইভাবে পাস করিয়ে না দিতুম, তাহলে ওরা তো এ স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতো। তাতে স্কুলের যেমন একদফা লস্, অন্যদিকে আমাদের মতো শিক্ষকদের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন! আপনারা এদেশী মানুষ, আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না আমাদের অবস্থাটা। দেশঘাট ছেড়ে, বাড়ীঘর পিতা-পিতামহের বহুকষ্টে অর্জিত বিষয়সম্পত্তি যা কিছু সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে প্রাণটা নিয়ে কোনরকমে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এখানে পালিয়ে এসেছি। তখন থেকে প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের, সেক্রেটারিমশাই শুধু নন্, মাপ করবেন, আপনিও তার কতটুকু খোঁজ রাখেন! এইসব ধনীর অপোগণ্ডগুলো আছে বলেই, স্যার, এই

দুদিনে একমুঠো খেয়েপরে কোনরকমে ভদ্রতা রক্ষা করতে পেরেছি। আপনি গুরুজন, পিতৃতুল্য—আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।

একটু থেমে সত্যনারায়ণবাবু বলেন, যেসব ছাত্রদের অভিভাবকরা আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন, তাঁদের তো এতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অথচ এঁদের কাছে স্কুলের কোন ব্যাপারে চাঁদা চাইতে গেলে—দেখছেন তো, কিরকম ব্যবহার করেন! থাক, সে-সব আর নতুন করে বলতে চাই না। আপনি তো সবই জানেন। অথচ ওঁদের এই অপগণ্ডদের পিছনে মুখের রক্ত তুলে যখন পাস করিয়ে দিই, তারপর ওরাই যে মোটর ছুটিয়ে চলে যায় তার কাদা ছিটকে লাগে আমাদের গায়ে মুখে চোখে।

হেড মাস্টারমশাইমোটা চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সত্যনারায়ণবাবুর মুখের দিকে।

সত্যনারায়ণবাবু হঠাৎ যেন ক্ষেপে যান। বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বলেন, স্যার, লেখাপড়া শিখে স্কুলে মাস্টারী করতে এসেছি বলে মনুষ্যত্ব বলতে কি আমাদের কিছু নেই? ভেবে দেখুন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে, কি কলকারখানায়, কি ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বত্র আজ মাগ্‌গি ভাতা, বোনাস্‌, পেন্‌সন, কোথাও কোথাও ডাক্তার-হাসপাতালের খরচ মায় মেটারনিটির ব্যয় পর্যন্ত পাচ্ছে লোক কর্মস্থলে, এছাড়া আছে কত রকমের উপরি পাওনা, ঘুষঘাষ—অথচ আমরা ওসব থেকে বঞ্চিত তো বটেই, এমন কি এসব চিন্তা করাও নীতিবিরুদ্ধ।

জনার্দনবাবু বলেন, কথাটা যা বলেছেন মিথ্যা নয়।

সত্যনারায়ণবাবু বললেন, তাই যদি স্বীকার করেন স্যার, তাহলে আমাদের অপরাধটা কোথায়? আমাদের বলভরসা বা অবলম্বন যাই বলুন, ওই ছাত্র ছাড়া তো "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে—"। কাজেই যেটুকু উপরি পাওনা উশুল করতে হবে তা তো ওদের দিয়ে। কিন্তু তার জন্যে তো স্কুলের এই খাটুনির পর আবার তাদের বাড়ী ছুটতে হয়, প্রাইভেট পড়াতে রাত্তির ন'টা-দশটাও বেজে যায় তখন বাড়ী ফিরতে। বলুন তাহলে আমাদের অন্যায়টা কোথায়, যদি ওদের পাস করিয়ে না দিই তাহলে তো আর আমাদের কাছে পড়তে আসবে না! আমাদের মুখের অন্নটা হারাতে হবে। চুরি-জোচ্চুরি না করে, ছাত্র ঠেঙিয়ে দু'টো পয়সা অতিরিক্ত উপার্জন করি। নইলে আমরা কোথায় যাবো? কার কাছে হাত পাতবো? শিক্ষকের একমাত্র ভরসা তো এই ছাত্ররাই।

প্রধান শিক্ষকমশাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আপনার কথাগুলোও যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি শিক্ষকদের একটা আদর্শের ভূমিকা আছে যা মেনে চলতে হয়, সেটা তো জানেন!

সত্যনারায়ণবাবু বলেন, আদর্শ কি কেবল শিক্ষকদের জীবনে? যিনি স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁরও কি আদর্শ রক্ষা করা উচিত নয়? যিনি শিক্ষকদের জন্যে

স্কুলের বদনামের কথা ভাবছেন, অথচ এটর্নী হয়ে, কত বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করে তিনি আজ গাড়ী ঘোড়া হাঁকিয়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সেজে রয়েছেন, তাঁর চরিত্র তো আপনার অজানা নেই ! স্কুলে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন যেমন তেমনি তা দিয়ে বাপের নামে স্কুলের নাম কিনে নিয়েছেন চিরদিনের জন্য। আপনি যাই বলুন, আমি কিন্তু একে ওঁর দান বলে স্বীকার করতে রাজী নই।

হেড মাস্টারমশাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, আমি ভাবছি কি জানেন, এইভাবে চললে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে !

সত্যনারায়ণবাবু বলেন, দেখুন স্যার, দেশের কথা ভাববার জন্যে বড় বড় সব নেতারা আছেন। সংবাদপত্রে যাঁদের ছবি বক্তৃতা নিত্য বার হচ্ছে। আপনি আমি তাঁদের কাছে তো চুনোপুঁটি। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কি কাজ !

হেড মাস্টারমশাই এবার বেশ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের ভেতরে চেপে বলেন, আচ্ছা আপনি যান। কিন্তু শিক্ষার ভিত্‌টাই যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জাতির পরিণাম কি হবে ?

সত্যনারায়ণবাবু বলে উঠলেন, পরিণাম নিয়ে কিছু ভাববেন না স্যার—ওটা তো Future tense, Presentটা থাকলে তবে তো ভবিষ্যৎ ! যাকে বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' !

এই বলে দু' পা এগিয়ে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন সত্যনারায়ণবাবু। বললেন, কিছু গোপন না করে আপনার কাছে যা সত্য তাই বলেছি বলে কিছু অপরাধ নেবেন না স্যার।

জনার্দনবাবু এখন কি গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। 'অপরাধ' কথাটা কানে যেতেই শিউরে ওঠেন। সত্যনারায়ণবাবুকে উদ্দেশ করে বলেন, না, অপরাধ আপনাদের আর কি ! আত্মগ্লানিতে যেন তাঁর কণ্ঠ বুজে আসে। বুকের মধ্যে একটা গভীর নিঃশ্বাস চেপে বলেন, আর একটা বছর বাকী আমার অবসর নেবার। এতকাল ধরে স্কুলের যে আদর্শ ও সুনাম রক্ষা করে এসেছি—তা শেষরক্ষা হলো না। এইটুকুই কেবল আমার দুঃখ মাস্টারমশাই—এ কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারবো না !

আপনি বৃথা আপসোস করছেন স্যার। আদর্শ বলতে যা বোঝায়, ঘরে বাইরে সমাজের কোথায় তা আজ আছে বলুন তো ? এর জন্যে যে সকলেই দায়ী, এ আমি কথনো ভুলব না।

॥ ৭ ॥

একদিন সতীশবাবু আরো তিনজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে হাজির হলেন। থানার ও. সি. মিঃ তালুকদার ঘাড় হেঁট করে সামনের টেবিলে একটা মোটা খাতায় কি লিখছিলেন।

সতীশবাবুরা চারজন যে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলেন, মিঃ তালুকদার যেন তাঁদের দেখতেই পান নি। মনোযোগ দিয়ে লিখতে লিখতে হঠাৎ একটু থেমে মুখটা উঁচু করতেই সতীশবাবু বলে উঠলেন, স্যার, কাল সকালে আমরা ডাইরী করে গেছি। আমাদের পাড়ায় একসঙ্গে তিন বাড়ী চুরি হয়ে গেছে। প্রায় ষাট-সত্তর হাজার টাকার মত চুরি হয়ে গেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কাল থানা থেকে কেউ "এন্‌কোয়ারি" করতে যাননি, আজও বেলা হলো···

ও. সি. একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কি বলছেন? যেন ওদের কথা শুনতে পাননি!

সতীশবাবু তখন বিনীত কণ্ঠে বললেন, আমাদের বাড়ীর চুরির কেস্‌টার এন্‌কোয়ারিতে কাল কেউ যাননি স্যার, অথচ কাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমরা ডাইরী করে গিয়েছিলুম।

কি করবো বলুন, আপনাদের পাড়ার কত সুনাম জানেন তো? পুলিসের ওপর বোমা মেরে গতমাসে চারজনকে আপনারা যে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন এখনো তারা সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিতে পারেনি।

কারা কি বোমা ফেলেছে, তার জন্যে আমাদের কি অপরাধ স্যার?

না, অপরাধ আপনাদের নয়—আপনাদের পাড়ার। তাই কোন লোক ওখানে যেতে রাজী হচ্ছে না।

সতীশবাবুর গলা এবার একটু উঁচুতে উঠলো। বললেন, তার মানে? কারা কি করেছে—তার জন্যে পাড়ায় চুরিডাকাতি হলে আপনারা তার কোন ব্যবস্থা করবেন না?

ও. সি. এবার সিগারেটটা মুখ থেকে ছাইদানের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, পুলিসের চাকরি যারা করে তারাও তো ভদ্রসন্তান, লেখাপড়া জানা, দু'তিনটে পাসও কেউ কেউ করেছে। আপনাদের মত তাদেরও ঘরসংসার আছে, মা বাবা ছেলে মেয়ে সব আছে। পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছে বলে জান দিতে তো আসেনি? তাছাড়া আপনাদের জানা উচিত, পুলিসের যেমন কর্তব্য বিপদে আপনাদের রক্ষা করা, তেমনি আপনাদেরও কর্তব্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। আপনারা যদি তাদের শত্রুজ্ঞান করেন, তাহলে তারা আপনাদের মিত্র মনে করবে কেন?

সতীশবাবু বলেন, আপনি থানার অফিসার-ইন-চার্জ হয়ে একথা বলেছেন?

হাঁ, যেহেতু আমার ওপর আমার অফিসের কর্মচারীদের রক্ষণাবেক্ষণের সব কিছু দায়দায়িত্ব, তাই একমাত্র আমি-ই একথা বলতে পারি।

সতীশবাবু বলেন, আপনি তাহলে দয়া করে এটা একটু লিখে দিন। আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি লালবাজারে।

লালবাজারে যান আর যেখানে খুশি যান, আমি কিছু লিখে দিতে পারবো না। আমার কাছে এখন আপনাদের চুরির চেয়েও অনেক গুরুতর সব কেস রয়েছে, যান এ নিয়ে আর বিরক্ত করবেন না।

অপমানে রাগে জ্বলতে জ্বলতে সতীশবাবুরা থানা থেকে চলে এলেন, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এর শোধ নেবে পাড়ার ছেলেরা। তাদের হাতে একবার জব্দ হয়েও ভয় নেই। দেখা যাক।

এর মাসখানেক পরেই পাড়ার ছেলেরা একদিন চাঁদার খাতা নিয়ে সতীশবাবুর দরজার কড়া নাড়তে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কে?

আমরা জেঠামশাই! একটু দরজা খুলুন!

পাড়ার ছেলেদের উৎপাতের ভয়ে সবাই সব সময় দরজা বন্ধ রাখেন। তাই আতঙ্ক মনে চেপে সতীশবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ওঃ, তোমরা! কি ব্যাপার বাবা, চাঁদার খাতা হাতে দেখছি যেন!

হাঁ। পিণ্টু ওই দলের নেতা, বললে, মেসোমশাই, পনের তারিখে বারোয়ারী দুর্গাপুজো যেখানে হয় সেই গলির চৌমাথায় একটা 'ফ্যাংশান্' করছি।

কিসের উদ্দেশ্যে? তিনি প্রশ্ন করলেন।

না, কোন কিছুর উদ্দেশ্য এবার নেই। কালীপুজোর পরে বরাবর একটু জলসাগোছের তো হয়, এবার আমরা সেটাকেই খুব বড়ভাবে করতে চাইছি। মানে বোম্বের আর্টিস্টরা কয়েকজন আসছেন। তাছাড়া আমাদের এখানের ফিল্ম স্টার প্রায় সবাই কথা দিয়েছেন। উত্তরকুমারকে আমরা সভাপতি আর সুচিত্রা সেনকে চীফ্ গেস্ট্ করবো স্থির করেছি। এছাড়া নাচ গান ও একটা থিয়েটার হবে।

সতীশবাবু বললেন, বেশ, এ তো খুব ভালো কথা।

কেষ্টো ততক্ষণে একটা চাঁদার বিল কেটে ও'র হাতে দিলে সতীশবাবু বলেন, পঞ্চাশ টাকা? না না, এটা খুব বেশী হলো বাবা। এটা কেটে পঁচিশ করে দাও।

পিণ্টু বললেন, জেঠামশাই, এবারে সবাই দিচ্ছেন বেশী করে। এত বড় 'ফ্যাংশান' তো আমাদের পাড়ায় আগে হয়নি কখনো। আপনারা যদি টাকা না দেন, তাহলে আমরা সব স্টুডেণ্ট কোথায় পাবো বলুন?

তা অবশ্য ঠিক। বলে সতীশবাবু টাকাটা ঘর থেকে এনে ওদের হাতে দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা ছাত্র, তোমরাই তো আমাদের বলভরসা বাবা, তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের পাড়ার ভাল-মন্দ সবই তোমাদের উপর নির্ভর করছে। আজকে তো দেশে শাসন বলে কিছু নেই—ন্যায় অন্যায় সবের প্রতি বিধান তোমাদেরই করতে হবে।

পিণ্টু বলে, জেঠামশাই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। এই যে চারিদিকে এত গোলমাল হচ্ছে, কিন্তু আমাদের পাড়ায় কোনদিন কিছু শুনেছেন? পুলিসরা পর্যন্ত ভয় করে আমাদের!

সতীশবাবু এই কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, তাই তো এতদিন জানতুম বাবা, কিন্তু এই যে কিছুদিন আগে আমার বাড়ী ও পাশের আরো দুটো বাড়ী থেকে এত টাকা ও গহনা চুরি হয়ে গেল, কিন্তু পুলিস থেকে একটা এন্‌কোয়ারি পর্যন্ত হলো না—! আমরা দু'দিন থানায় গেছি নালিশ জানাতে, কিন্তু ও. সি. আমাদের দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন অপমান করে।

পিণ্টু বলে, সব শুনেছি জেঠামশাই, আপনাদের অপমান করা মানে যে আমাদের অপমান করা সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবো তাদের কয়েকটা দিন শুধু মুখ বুজিয়ে থাকুন, তারপর দেখবেন।

যাক্, তোমাদের মুখ থেকে একথা শুনে বড় খুশি হলুম বাবা। বেঁচে থাকো—বলে সতীশবাবু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অন্য ছেলেরা পিণ্টুকে বলে, গুরু, এবার কিন্তু বিলিতী মাল খাওয়াতে হবে, আগে থাকতে বলে রাখছি। কালীপুজোর মত স্রেফ্ ধেনো দিয়ে সারলে কিন্তু চলবে না। এবার আমাদের কালেক্‌শন হিসাবের চেয়ে বেশী হচ্ছে মনে রেখো।

পিণ্টু বলে, এবার কোন অসুবিধে হবে না। এবার জলসায় বোম্বের আর্টিস্টদের জন্যে তো আনতেই হবে—ভাল মাল সেই সময় সরিয়ে ফেলবো দু'একটা।

মনে থাকে যেন গুরু। আগে থাকতে দরখাস্ত করা রইলো তোমার কাছে। কালীপুজোর রাত্রে ফণীদা একাই চারটে বোতল হাওয়া করে দিয়েছিল। একফোঁটা বিলিতী প্রসাদ আমি পাইনি জানো তো!

পিণ্টু বলে, এবার আর্টিস্টদের খাওয়া-দাওয়ার ভার আমি নিজের ওপর রাখবো, চিন্তা করিসনি।

॥ ৮ ॥

হেড মাস্টার কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, এত বড় অন্যায়কে জেনেশুনে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না।

পাড়ার লোকেরা স্কুলের দু'তিনজন শিক্ষককে ধরেছিলেন, যাতে তাঁরা একটু হেড মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে বলেন। বিশেষ কিছুই করতে হবে না তাঁকে, শুধু তাঁদের ছেলেরা যে সেদিন প্রেজেণ্ট ছিল, রেজেস্ট্রি খাতায় তাদের নামের পাশে 'এ' র বদলে 'পি' করে দিলেই সব হাঙ্গামা চুকে যাবে। ওই ছেলেগুলো যে নির্দোষ, পুলিসের ওপর বোমা ছুঁড়তে যায় নি, এটা প্রমাণ হয়ে যাবে, তাহলেই

থানার ও. সি. ছেলেগুলোকে হাজতবন্দী না রেখে মুক্তি দেবেন। ওরা পাঁচজন ছাত্রই ওঁর স্কুলের টেন্‌ ও ইলেভেন্‌ ক্লাসের ছাত্র।

যে শিক্ষকরা এ কথা গোপনে হেড মাস্টারমশাইকে অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি ভৎর্সনা করে বললেন আপনাদের মুখ থেকে এরকম কথা শুনবো, আমি আশা করতে পারিনি! এরকম অন্যায়কে যদি প্রশ্রয় দিতে বলেন, তাহলে স্কুলের অপর ছাত্রদের কাছে আমরা মিথ্যাবাদী শুধু না, আরো কত নীচে নেমে যাবো ভেবে দেখেছেন?

ওই তিনজন শিক্ষকই যে সেই পাড়ায় থাকেন এবং সেই সুবাদে অভিভাবকরা এসে তাঁদের ধরেছেন, এটা করে দিতে হবে স্যার। আপনার স্কুলের ছাত্র কেবল ওরা নয়, আপনাদের পাড়ারও ছেলে। তাদের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে আপনাদের।

হেড মাস্টারমশাইকে সেই শিক্ষকরা তখন খোলাখুলিভাবে সবই বললেন, এটা যে কতদূর অন্যায় তাঁরা তা ভাল করেই জানেন। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা, বিশেষ করে যারা ওই ধরনের, সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে একটু ভয় করেন তাদের—তাছাড়া ওই পাড়াতেই যখন বাস করেন তাঁরা।

হেড মাস্টারমশাই বলেন, আপনারা সোজা বলে দিন, এতে তো আপনাদের কিছু করার নেই—সবই হেড মাস্টারমশাইয়ের হাতে।

হাঁ, তাই বলবো স্যার আজ গিয়ে।

অভিভাবকরা সেকথা শুনে মনে মনে হেড মাস্টারমশাইয়ের ওপর রুষ্ট হলেও তাঁর হাতে তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়ার বিশেষ করে পাস ফেল নির্ভর করছে ভেবে তখন অন্য পথ ধরেন।

ঠিক তাই হলো, এবার তাঁরা স্কুল ছেড়ে স্থানীয় এম. এল. এ. হরিশ মণ্ডলের বাড়ী গিয়ে পরদিন সকালে হাজির হলেন, স্যার, আপনি একটু ও. সি.-কে গিয়ে যদি বলেন, তাহলে আমাদের ছেলেগুলো এখনি ছাড়া পায় হাজত থেকে।

হরিশবাবু এবার নতুন এম. এল. এ. হয়েছেন। অভিভাবকদের মধ্যে যিনি প্রবীণ, চুনীবাবু, তিনি বললেন, আমাদের ছেলেরাই তো আপনার জন্যে ইলেক্‌শনের সময় প্রাণপণ খেটেছিল, নিশ্চয় ভোলেননি। আর আমার ছেলে পিল্টু ছিল সেই দলের লীডার।

না না, ভুললে চলবে কি করে? আবারও ইলেক্‌শন্‌ আসছে, ওরাই তো আমার হাতিয়ার। তখন ওদের সাহায্য দরকার হবে। আচ্ছা আপনারা যান, দেখছি আমি কি করতে পারি!

চুনীবাবু এবার বললেন, আপনার মুখের কথা শুনলে ও. সি.-র বাবাও না বলতে পারবে না। বিশেষ করে যখন আপনাদেরই সরকার, ওরা তো আপনাদের হুকুমের দাস!

হরিশবাবু বলেন, তা ঠিক, তবে কি জানেন, ওরাও আজকাল লঘুগুরু মানে

না। এই সেদিন আমাদের এক বন্ধুর পাড়ায় এই রকম একটা 'কেস' হয়েছিল। থানার ও. সি. তাঁর কথা গ্রাহ্য না করায় তখন মিনিস্টারকে দিয়ে ফোন করাতে বাধ্য হন।

হরিশবাবু বলেন, আচ্ছা আপনারা যান, দেখি আমি কি করতে পারি! এই বলে ছেলেদের নাম ও কোন্ স্কুলের তারা ছাত্র ইত্যাদি ছোট্ট পকেট-ডাইরিতে লিখে নিয়ে তাঁদের বিদায় করলেন।

দুপুরের দিকে ও. সি. যখন তাদের রিপোর্টটা লিখতে ব্যস্ত, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

হ্যালো? বলে হাতের কলমটা থামিয়ে রিসিভার কানে লাগাতেই শুনলেন, হ্যালো লালবাজার বলছি,···স্কুলের যে চারটি ছেলেকে আপনি 'লক আপ্'-এ রেখেছেন, তাদের ছেড়ে দেওয়ার হুকুম এসেছে।

ও. সি. কণ্ঠের বিরক্তি চেপে বলেন, কিন্তু স্যার, ওরাই প্রকৃত আসামী—পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

দেখুন ওসব নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই, ওপরওলার যেমন হুকুম! সবই তো জানেন—

তা ঠিক। কিন্তু স্যার এভাবে চললে দু'দিন পরে আমাদের কেউ গ্রাহ্যই করবে না। অপরাধীর সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়েই চলবে।

হ্যালো? কি বলছেন? তাতে আপনারই বা কি আর আমারই বা কি! আমরা হুকুমের দাস। চাকরি করতে এসেছি যখন পেটের দায়ে, তখন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'!

এই শুনে রিসিভারটা টেলিফোনের ওপর রেখে আপন মনে রাগে গরগর করতে লাগলেন, উচ্ছন্নে যাক্ দেশ, আমার কি! আমি চাকরি করতে এসেছি যখন, ওপরওলার হুকুম তামিল করতে বাধ্য। যখন একজন কর্তা ছিল, তখনো অন্যায় অবিচার করতে হয়নি যে তা নয়—তবে এখনকার মত দশ-কর্তার মন যোগাতে গিয়ে যাকে বলে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'! চুলোয় যাক, ওসব ভেবে আমার শুধু শুধু কি লাভ! আমার চাকরিটা বেঁচে থাক। দেশ যদি দেশ যদি আসামীতে ভরে যায় তো আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বিবেকের কাছে আমি খাঁটি আছি। এই বলে একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

॥ ৯ ॥

জগদীশবাবুর অন্যদিন অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাঁর মেয়ে মঞ্জুলাকে যে গানের মাস্টার গান শেখান, তিনি তখন চলে যান। সেদিন অফিসে গিয়ে শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ায় তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে

আসেন। সেই সময় তাঁর মেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে গান শিখছিল। মঞ্জুলা গাইছিল—"যদি হে আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহেগো কভু / দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়া যেও না কভু।"

জগদীশবাবু ভেতরের ঘরে শুয়ে থাকলেও গানটা তাঁর কানে যাচ্ছিল।

ওই গানটা মঞ্জুলার গাওয়া শেষ হলে তখন মাস্টারমশাই বললেন, বেশ ভাল হয়েছে। এখন একটা নতুন গান তোমায় দিচ্ছি—বলে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে ধরলেন সেই গান ঃ

"তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে"…

একবার-দু'বার প্রথম স্তবক অস্থায়ী ও অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে মাস্টারমশাই ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, এই প্রথম অন্তরাটা ঠিক কেমন ভাবে দরদের সঙ্গে গাইতে হবে শুনলে তো? বার বার প্র্যাক্‌টিস্ করবে কেমন?

এই বলে তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গেলেন, হঠাৎ জগদীশবাবু পিছন থেকে তাঁকে ডাকলেন।

মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে পড়লে তিনি ইশারায় বললেন, এগিয়ে চলুন। ওঁর বাড়ীর কাছ থেকে বেশ কিছুটা তফাতে গিয়ে বললেন, একটা কথা আপনার সঙ্গে আছে!

কি, বলুন?

ওসব ঠাকুর-দেবতার গান, দয়াধর্মের গান শেখাবার দরকার নেই। আমি তো মেয়েকে সাধুসন্ন্যাসী করতে চাই না। বরং তাড়াতাড়ি যাতে বিয়েটা হয়, তার জন্যেই কয়েকটা ভাল গান শেখাতে চাই। এখানকার ছেলেরা পাত্রী দেখতে এসে আগে জানতে চায় কতদূর লেখাপড়া শিখেছে। অন্ততঃ বি. এ. পাস চাই। তারপরেই প্রশ্ন করে, গান গাইতে জানে কিনা? শুধু মুখে বললেই চলবে না, সামনে গেয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। এই বলে একটু থেমে বললেন, শুধু গোটাকতক বেশ রগরগে অতি আধুনিক এমন কাব্যসঙ্গীত শিখিয়ে দিন যা শুনলে—মানে যুবকদের দেহের ভেতর থেকে মনটা ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইবে।

মাস্টারমশাই বলেন, আজ্ঞে এর আগেই সে গান মঞ্জুলাকে শিখিয়েছি, শোনেননি—

'যদি হে আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ
রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেও না প্রভু।'

অর্থাৎ একেবারে বন্ধ-দোর ভেঙে প্রাণের মধ্যে চলে আসতে বলছে প্রিয়তমকে!

জগদীশবাবু বলেন, দূর মশাই, ওসব দোর ভাঙাভাঙির কাজে কেন যাচ্ছেন! তার চেয়ে বরং মেয়েকে সোজাসুজি দোর খোলা রাখতে শেখান! এমন গান শেখান যাতে দোর ভাঙতে না হয়, খোলাই থাকে!

মাস্টারমশাই একটু কবি-প্রকৃতির মানুষ। জগদীশবাবুর এই হেঁয়ালিপূর্ণ কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

জগদীশবাবু বলেন, বুঝতে পারছেন না আমি কি চাই? যাকে ইংরাজীতে বলে "ডাইরেক্ট এ্যাপীল্"! আপনার এতখানি বয়েস হয়েছে, আর এটা বুঝতে পারছেন না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই ঘাড়টা নেড়ে বলেন, আজ্ঞে না, আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না।

আরে মশাই, এতে ধরাধরির ব্যাপার নেই, সবই খোলাখুলি। এই বলে গলাটা আরো একটু নীচু করে জগদীশবাবু বলেন, মানে এখনকার মেয়েদের বেশভূষা দেখে বুঝতে পারছেন না ছেলে-ছোকরারা কি চায় তাদের কাছে? রবিঠাকুর মশাই মাথায় থাকুন, তিনি বিশ্বকবি। তাঁর কাব্যিক ভাষার আবরণ ছিঁড়ে ভেতরের রসে পেঁছবার শিক্ষাদীক্ষা বা ধৈর্য ক'জনের আছে! ছেলে-ছোকরাদের কাছে এখন তাই কাব্যসঙ্গীতের এত কদর বেড়েছে।

জগদীশবাবু মুচকি হেসে বলেন, কাব্যসঙ্গীত বলে বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি ওর মধ্যে কাব্যও নেই, সঙ্গীতেও নেই, আছে শুধু কতগুলো কথা, যা ভদ্রসমাজে মুখে বলতে লজ্জা হয়। কিন্তু গানের নামে দেখি চালু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ রেডিও খুলতে একটা কাব্যসঙ্গীত শুনে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে শোনা যায় না। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ছিঃ ছিঃ, গান না বলে তার নাম বলা যায় কাম বা কামনা!

এই বলে একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকে চেপে বলেন, আপনি বিয়ে-থা করেননি, বুঝতে পারবেন না, হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেদের অবস্থা। যে যুগের যে হাওয়া! তাই বলছিলুম কি, ওই রকম কাব্যসঙ্গীত যদি দু'চারটে শিখিয়ে দেন, তা হলে ছেলে-ছোকরাদের মন চট্ করে তাতে আকৃষ্ট হবে।

আমার মেয়েকে গান-বাজনায় ওস্তাদ করতে চাই না। এই যেমন সারা বছর বই না পড়ে আজকাল পরীক্ষায় পাস করার জন্যে 'শর্টকাট্' বা 'লাস্ট মোমেন্ট্স্ সাজেশন্' বেরিয়েছে, তেমনি চাই ক'টা গান। বুঝতে পারছেন তো?

এবার একটু ঢোঁক গিলে বলেন, এর পরেই নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেবো, সব ঠিক করে রেখেছি—সেখানের 'শর্টকাট্' তিন মাসের কোর্স! মানে "ওরিয়েন্ট্যাল ডান্স্", যেটা সবচেয়ে সহজ, জিম্‌নাস্টিকের মত—হাত-দু'টো উঁচু করে এপাশে ওপাশে এঁকেবেঁকে ঘোরাফেরা অর্থাৎ মেয়েদের ফিগারটাকে নাচের নাম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সম্পূর্ণ দেহটা দেখানো! কি বলবো দুঃখের কথা, এত করেও তবু ছোকরাদের মন পাওয়া যায় না। বিয়ের জন্যে মেয়েদের আজ লজ্জা-শরম সব কিছু বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এর ওপর আছে 'বয় ফ্রেন্ড'. রীতিমত মেলামেশা করা ছোঁড়াদের সঙ্গে। তারপর যদি আবার গোপনে মেলামেশা করে যাবে বলে 'প্রেমে পড়া', জাতকুল ভেঙে যদিও মেয়ের বাপ রাজী

হয়, তখন ছেলে বলে বসে, মা-বাপের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ কিনা বাপ-মা মুখে বলবেন, কিছু দিতে হবে না। পণ নিয়ে ছেলে বিক্রী করতে চাই না। তারপর ধরিয়ে দেবেন একটা বিরাট লিস্ট, গদি-খাট-বিছানা, ওয়ারড্রোব, গড্‌রেজের আলমারি, স্টেনলেস বাসনের সেট্ থেকে রেডিও—আবার হালে হয়েছে টি. ভি.!

এই বলে জগদীশবাবু কণ্ঠে রাগ চেপে বলেন, এখানেই শেষ নয়, এইভাবে যে মেয়েকে ধারদেনা করে বিয়ে দিয়ে দিলেন, কিছুদিন পরেই জানা গেল, কলেজ-লাইফে ছেলের যে গার্লফ্রেন্ড ছিল, তাকে উপলক্ষ করে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ঝগড়াবিবাদ, শেষে ডিভোর্স পর্যন্ত।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গাঢ়স্বরে জগদীশবাবু বলেন, বলতে পারেন মাস্টারমশাই, আমার মত দু'তিনটি মেয়ে যার গলায় সে কি করবে! কোন্ পথে যাবে!

এতে মাস্টারমশাইয়ের মনে বুঝি করুণার উদ্রেক হয়। তিনি বলেন, বুঝেছি আপনি কি চান। কিন্তু আমি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য গান শেখাই না। তাই একজন ভাল কাব্যসঙ্গীতের মাস্টার আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো, কালই। কিছু চিন্তা করবেন না। বলে দ্রুত তিনি প্রস্থান করেন।

॥ ১০ ॥

জহরবাবু একদিন অফিস থেকে ফিরে কোটের ভিতর থেকে একগোছা নোট বার করে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো লুকিয়ে রাখবে সেই খাটের চোরাকুঠুরিতে।

জানি। বেশী বলতে হবে না।

তখন জামা খুলতে খুলতে বলেন, হ্যাঁগো, খোকার কি হলো—আজ যে হীরেন্দ্রনাথ কলেজে তার ইণ্টারভিউ ছিল!

মিসেস্ রায় মুখটা ম্লান করে বললেন, ওর হয়নি। একজন ডি-ফিলকে নিয়েছে তারা।

জহরবাবু বলেন, তার মানে, আবার বেকার! এই যে সে বললে, হাজার খানেক টাকা খরচ করলে হয়ে যাবে!

মিসেস্ রায় বলেন, প্রিন্সিপ্যালের এক আত্মীয়ের ছেলে 'ডি-ফিল'—সে-ই পেয়েছে। খোকা বলছিল, সত্যি নাকি ছেলেটি ভাল নয়। এম. এ-তে সে ওর চেয়ে অনেক ভাল রেজাল্ট করেছিল। কিন্তু যেহেতু ডি-ফিল পেয়েছে গত বছর "রবীন্দ্র কাব্যে ফলফুলের নাম"-এর ওপর রিসার্চ করে, তাই তার দাবী আগে।

জহরবাবুর লেখাপড়ার দৌড় ম্যাট্রিক পর্যন্ত। স্ত্রীর মুখের ওপর বড় বড় চোখ রেখে বলেন, কি বললে? ফলফুলের নামের ওপর রিসার্চ করার কি আছে সে তো সকলেই জানে। তাঁর ধারণা রিসার্চ মানে গবেষণা, লেখাপড়ায়

গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য না থাকলে কেউ 'ডক্টরেট' হতে পারে না।

মিসেস্ রায় বলেন, সেসব আগের দিনকাল এখন আর নেই, যখন তোমরা স্কুল-কলেজে পড়তে—এখন নতুন যুগ, এখন তাই পাণ্ডিত্যের দরকার নাকি হয় না 'ডি-ফিল' করতে !

খোকা বলছিল, আজকাল শুধু বাংলায় এম. এ. পাস করলেই প্রফেসারী পাওয়া যায় না—'ডি-ফিল'দেরই আগে চান্স দেয়। সে তাই বলছিল, ওর এক প্রফেসরের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে "পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ" এই নিয়ে রিসার্চ করবে !

জহরবাবু বলেন, করুক। তা না হলে যখন চাকরির আশা নেই, করতেই হবে তখন।

এই বলে আপিসের জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তবে যা করুক না কেন, যেন তাড়াতাড়ি করে। এর জন্যে খরচ যা কিছু লাগবে আমি দিতে প্রস্তুত।

মিসেস্ রায় গলাটা নামিয়ে বলেন, এম. এ. পাস করার সময় যা খরচ করেছিল, তার চেয়ে আরো কমেই নাকি হয়ে যাবে। ওর বন্ধু-বান্ধব যারা এম. এ. সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে এতদিন বেকার বসেছিল, অনেকেই নাকি এইভাবে নানা বিষয়ে রিসার্চ শুরু করে দিয়েছে। ওঁর এক বন্ধু সন্ধান দিয়েছে, কোন এক প্রফেসর নাকি 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ'-এর ওপর থিসিস্ তৈরী করে রেখেছেন। তিনি গোপনে এইগুলো বিক্রি করেন। পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছেন ওর বাছে। খোকা কথা দিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, এখনি অর্ধেক 'এ্যাড্ভান্স' করতে হবে—বাকীটা তিন মাস পরে থিসিস্ কমপ্লিট করে দিলে তখন দিতে হবে।

জহরবাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলেন, রিসার্চও কিনতে পাওয়া যায় নাকি ?

মিসেস্ রায় বলেন, নইলে আজকাল এত হুদোহুদো সব ছেলেরা প্রফেসারির চাকরি পাচ্ছে কি করে ? এতদিন তোমার ছেলে যেমন করে বি. এ. এম. এ. পাস করেছে, এখনো তেমনি ভাবেই 'ডি-ফিল' পেয়ে যাবে।

এই বলে হেসে ফেললেন মিসেস্ রায়।—টাকা থাকলে আজকাল দুনিয়ায় কি না কেনা যায় !

॥ ১১ ॥

আবার পুজো এসে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে।

বারোয়ারী দুর্গাপুজোর ফর্দটা তৈরী রাখার কথা বলতে গেলে পুরোহিতমশাই পাড়ার ছেলেদের বললেন, আমার শরীরটা এবার ভাল নয়, ডাক্তার উপোস করে

পুজোর দায়িত্ব নিতে নিষেধ করেছেন। কাজেই আপনারা এবার অন্য পুরোহিত দেখে নিন।

ছেলেরা বলে, না না, তা হয় না ঠাকুরমশাই। আপনি আমাদের গত দু'বছর পুজো করছেন যখন, এই বছরটাও করতেই হবে। তাছাড়া উপোস করেই যে পুজো করতে হবে, এমন কথা তো কোন শাস্ত্রে লেখা নেই! আপনি খেয়েদেয়েই পুজো করবেন। মায়ের পুজো করতে গেলে আসলে মন্ত্রটাই বড় কথা। পেটে ক্ষিদে চেপে কি কখনো মনে ভক্তি আসে? তাছাড়া মায়ের পুজো করবেন, মা কখনো তাঁর সন্তানকে এইভাবে কষ্ট দিতে চান? বরং আপনি ভরা পেটে, সুস্থ দেহে তাঁর পুজোটা যাতে করতে পারেন সেটাই তিনি চাইবেন। তিনি জানেন খালি-পেটে ভক্তি আসে না!

আপনারা যা বলছেন তা সত্যি, কিন্তু খালি-পেট ভরাবো কোথা থেকে? গত বছরের দক্ষিণার অর্ধেক এখনো বাকি, তার আগের বছরের কুড়ি টাকা। তাছাড়া গত পুজোর এবান্নখানা শাড়ীর মধ্যে মাত্র তিনখানা আমায় দিয়ে বলেছিলেন, পরে বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন—আজ পর্যন্ত তো পেলুম না! এমন কি অঞ্জলি বাবদ পাবলিকের যে দক্ষিণা, তার মাত্র দু'ভাগ আমাকে দিয়ে বাকী চোদ্দআনা আপনারা পরে দেবেন বলেছিলেন—তার দরুণ একটা পয়সাও দিলেন না! সারা বছর আমার চলে এইসব পাওনাগণ্ডা দিয়ে। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, এই পুজো-পার্বণ ছাড়া আর তো আমার কোন আয় নেই! আপনারা সব শিক্ষিত লেখাপড়া জানা ছেলে, এত বড় পুজো, এত জাঁকজমক করছেন অথচ গরীব ব্রাহ্মণকে যদি তার পাওনা থেকে এইভাবে বঞ্চিত করেন, তাহলে কি করে মায়ের পুজো করি বলুন?

আচ্ছা এবারে আপনার সব পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেবো, কিছু চিন্তা করবেন না। ঠাকুরমশাই আপনি রাগ করবেন না, ওই জাঁকজমক করতে আজকালকার দিনে কিরকম খরচ হয়, জানেন তো শেষকালে এমন অবস্থায় পড়েছিলুম যে প্রতিমা বিসর্জন দেবার মত ট্রাকভাড়া ছিল না, ওই পুজোর শাড়ী বিক্রী করে তিনদিনের পুষ্পাঞ্জলির দক্ষিণার টাকা দিয়ে তবে মুখরক্ষা হয়েছিল। নইলে আগের বারে রাস্তায় প্রতিমা ফেলে রাখতে হয়েছিল আরো দু'দিন। তারপর কোনরকমে টাকা যোগাড় করে বিসর্জন হয়। সবই তো আপনি জানেন! সবই আপনারই আশীর্বাদে, আপনার দয়ায়।

পুরোহিতমশাই বলেন, গত বছর শেষকালে আমার গাঁটের কড়ি দিয়ে তন্ত্রধারকের পাওনা মেটাতে হয়েছিল।

ছেলেরা বলে, আপনি একটা কাগজে হিসাব লিখে রাখবেন, এবার সব একসঙ্গে মিটিয়ে দেবো।

পুরোহিতমশাই বলেন, একথা তো গত বছরেও বলেছিলেন, তারপর আর আপনাদের কারুর দেখা পাইনি।

একজন তখন এগিয়ে এসে বলে, এবার আমি হয়েছি এই পুজোর ব্যাপারের ম্যানেজার। আপনার যা কিছু পাওনা সব কড়ায়গণ্ডায় আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন। আমার নাম তপন চক্রবর্তী। লিস্টে আমার নাম ছাপা আছে।

বেশ, তাহলে আজ দক্ষিণার দরুন অন্তত একশোটা টাকা অগ্রিম বায়না দিয়ে যান।

তখন পকেট থেকে পঁচিশটা টাকা বার করে বললে, আজ এটা রাখুন, ফর্দটা যেদিন নিতে আসবো, বাকিটা দিয়ে যাবো।

একথা গত বছরেও বলেছিলেন, কিন্তু নিয়ে যাবার সময় বললেন মায়ের বোধনের দিন দেবেন। সেদিনও দেন নি।

ঠাকুরমশাই, যা হয়ে গেছে সেকথা ভুলে যান। এবার আমি আপনাকে সব কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দেবো।

দেখো বাবা, মায়ের পুজোয় পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়ো না।

তপন বলে, সেবার যে ছেলেটার ওপর এসব দায়িত্ব ছিল সে ব্যাটাকে হটিয়ে দিয়েছি। আপনার টাকা কেন, ঢাকীঢুলি, প্যাণ্ডেলওলা, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, সবাইয়ের টাকা মেরে ব্যাটা হাওয়া হয়েছে। ওকে এতটা বিশ্বাস করেই আমরা ঠকেছি। এবার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলে ছেলেরা বিদায় হলে, পুরোহিত-গৃহিণী বললেন, আবার তুমি ওই জোচ্চোর বদমাইশগুলোর পুজোর ভার নিলে? গত বছরে তোমার শিক্ষা হয়নি? বলেছিলে না, ও হারামজাদারা এবার এলে দূর করে দেবে তাড়িয়ে।

পুরোহিতমশাই তখন গলাটা নামিয়ে বলেন, আগে ভেবেছিলুম তাই, কিন্তু ওইসব ছোকরাদের চেহারা দেখে আর বলতে সাহস হলো না। জানো তো ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে। তাছাড়া বললে, দু'বছর যখন পুজো করছেন, এবার তৃতীয় বছর করতেই হবে।

তবে মরগে আবার ওদের কাছে। আগে যাও দিয়েছিল এবার আর কিছুই দেবে না দেখে নিয়ো।

হ্যাঁ, আমাকেও তেমনি বোকা ভেবো না, ওরা ভেবেছে আমায় ফাঁকি দিয়ে পুজোটা সেরে নেবে। আরে বাবা, আমি মহামহোপাধ্যায় শীতল চক্রবর্তীর ছাত্র, আমিও তেমনি। আমিও কি ওই রাস্তায় বসানো প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলুম ভেবেছো? তেমন বোকা আমায় পাওনি। কাজেই যা পাই তাই লাভ, শাস্ত্রে বলেছে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।

॥ ১২ ॥

পটলা, ফটকে, রবির দল চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে বিড়ি টানতে টানতে আড্ডা দিচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কল্যাণ এসে গেল। ফটকে জিজ্ঞেস

করে, কিরে আজ এত দেরি যে, নিশ্চয় অর্চনা কলেজ কেটে পালিয়েছিল তোর সঙ্গে দুপুরের ট্রিপে সিনেমায় ? তুই শ্লা বেড়ে আছিস ! তুই কোথায় পয়সা দিয়ে ওকে সিনেমা দেখাবি তা নয়, তারই ঘাড় ভেঙে সিনেমা দেখছিস আবার দিব্যি রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিস্ !

কল্যাণ ভ্রূটা কুঁচকে বলে, দ্যাখ ফট্‌কে, মাইরি যখন তখন ইয়ারকি ভাল লাগে না ! মনটা আজ খুব খারাপ।

পট্‌লা বলে, কেন, অর্চনা কি আজ পাত্তা দেয়নি ?

ফের পট্‌লা ! ও নাম মুখ আনবি না বলছি, মনটা খুব খারাপ আজ।

কেন, মনে কি হলো বলবি তো ?

জানিস তো দিদি একটা 'ট্যুইশানি' যোগাড় করে দিয়েছিল, তার বন্ধুর মেয়ে—কে. জি. টু-তে পড়ে মিশনারী স্কুলে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিতো। কিন্তু আজ তার ইংরিজী বইয়ের পড়াটা বলে দিতে গিয়ে বিদ্যাবুদ্ধি সব ফাঁস হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে বাংলা মিডিয়ামে পড়ে এলুম, আমার কি দোষ ! ওসব ইংরিজী বইয়ের নামও কখনো শুনিনি, চোখেও দেখিনি ! কে. জি. টু ক্লাসের ইংরিজী বই, কি শক্ত মাইরি কি বলবো !

পট্‌লা বলে, আসলে কি হলো, তাই বল্ ?

মানে ট্যুইশানিটা আজ চলে গেল। মেয়ের বাবার অসুখ বলে আজ আপিস যায়নি। ঘরের ভেতর থেকে আমার পড়ানো শুনছিল। পড়িয়ে যখন উঠেছি আমায় ঘরে ডেকে বললেন, কাল থেকে আর পড়াতে হবে না !

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন স্যার ?

মুখখানা বুল্‌ডগের মত করে বললেন, আমার মেয়ে যা শিখেছে, সব ভুলে যাবে, আপনার কাছে বেশীদিন পড়লে !

ফট্‌কে জোরে হেসে উঠতেই কল্যাণ বললে, হাসছিস যে, আমি বাজী রেখে বলতে পারি তুইও পড়াতে পারবি না। তুই তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে।

রবি মুখের পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব শ্লা ভাল ছেলে জানি ! সারাজীবন 'টুকলিফাই' করে কোনরকমে হায়ার সেকেণ্ডারীতে পিছলে গেছে সেকেণ্ড ডিভিশনে !

পট্‌লা বলে, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যাবে আমরা সবাই এক-একটি বিদ্যাসাগরের ছানা !

সবাই হো হো করে হেসে উঠলে সে আবার বলে, জানিস রবি, ওর বাবা নিজে নাকি চায়ের দোকানে বসে কোশ্চেনের উত্তর লিখে ছেলেকে সাপ্লাই করেছিল।

খবরদার পট্‌লা, বাপ তুলে কথা বলবি না ? তুই দেখেছিস চোখে ?

যারা দেখেছে, তাদের কাছে শোনা।

চল্ শ্লা কে দেখেছে, তার কাছে ! বলে একেবারে জামার আস্তিন গুটিয়ে

পট্‌লার গলাটা এসে টিপে ধরে ফট্‌কে। ফের যদি বাপ তুলে কথা বলেছিস তো টুঁটি ছিঁড়ে দেবো।

রবি ছুটে এসে ওর গলা থেকে ফট্‌কের হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, যা যা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আর লোক হাসাস্‌নি! শ্লা, বাব্‌রি ভক্তি ঢের দেখিয়েছিস্‌। থাম। ওদিকে বাপের পকেট মেরে তো ফাঁক করে দিচ্ছিস!

ফট্‌কে বলে, রবি, ভালো হচ্ছে না কিন্তু. তুমি শালা যেন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! মায়ের বাক্স থেকে টাকা সরিয়ে কল্পনার মা-ভাইকে সিনেমার টিকিট কেটে দিয়ে, একলা ঘরে কল্পনাকে নিয়ে ফুর্তি করিস না?

ফট্‌কে খবরদার! বলে রবি এবার নিজেই ফট্‌কের গলাটা টিপে ধরে। ফের যদি কোন মার কথা মুখে আনবি তো থাপ্পড় মেরে গাল ভেঙে দেবো!

এই রবি ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—লাগছে—

দেখ না, হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথা—তাদের ভেতরে বাপ-মাকে আনবে কেন?

ফট্‌কে বলে, আমায় যদি এইভাবে রাগিয়ে দাও, তাহলে আমি সকলের ভেতরের কথা ফাঁস করে দেবো বলছি। সব শালাকে আমি চিনি। 'ডুবে ডুবে জল খায়, শিবের বাবাও টের পায় না'।

রবি বলে, ফের মুখ খারাপ করছিস, চুপ্‌! সেদিন ধোলাই দিয়েছিলুম, ভুলে গেছিস বুঝি?

পট্‌লা, একটা করে বিড়ি সকলকে দিয়ে বলে, নে চুপ করে মুখে আগুন দে।

॥ ১৩ ॥

পাঁচটায় আপিসের ছুটি হয়। কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মিনিবাসে ওই বি. বা. দী. বাগ থেকে যাদবপুর পালের বাজারে আসতে যা টাকা খরচা তাতে এক লিটার হরিণঘাটার টোন্‌ মিল্ক কিনে ছেলেমেয়ে দু'টোকে খাওয়াতে পারলে বরং তাদের দেহে দুফোঁটা রক্ত বাড়ে। তাছাড়া সেখানেও তো লম্বা লাইন লেগে যায়—সাপের মত এঁকেবেঁকে এতদূর যায় যে তার ল্যাজ দেখা যায় না।

একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে 'হত্যে' না দিলে চান্স, পাওয়া শক্ত! অর্ডিনারী ট্রামেবাসে এসময় ওঠার কথা চিন্তা করতে বুকের মধ্যেটা ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করে ওঠে পরেশবাবুর। মাথার ওপর খাঁড়ার মত উদ্যত হয়ে আছে ক্ষেন্তি, অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত তার বিয়ের ব্যবস্থা কিছু করতে পারলেন না। হঠাৎ যদি এইরকম ঝুলন্ত অবস্থায় ট্রাম-বাস থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়, তাহলে সংসারের কি দুর্দশা হবে কথাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র পরেশবাবু চোখের সামনে সব অন্ধকার দেখেন। মনে হয় ভূমিকম্পে যেন সব কাঁপছে। দুলছে। এখুনি বুঝি ভেঙে পড়বে ওই জি. পি. ও-র মাথার

গম্বুজটা ও টেলিফোন ভবনের—দূরভাষিণীর ওই সাত-আট তলা বাড়ীটা, আর তার সঙ্গে আদি গীর্জার ওই ছুঁচোলো চূড়োটা।

সামনের ওই স্টিফেন্স হাউসটার দিকে তাকিয়ে চোখ বুজিয়ে নেন, মনে হয় ওই বিরাট ইমারতটা ভেঙে-চুরে ইট কাঠ সব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু লোহার কতগুলো বড় বড় স্তম্ভ ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা দুটো একবার খুলেই থমকে দাঁড়ান। তারপর সনাতন পন্থা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ বাপ-জেঠাদের মত হাঁটা শুরু করে দেন সোজা একেবারে বেলেঘাটা স্টেশনের দিকে। পথে কোনো বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটপাত থেকে সস্তায় কিছু আনাজ তরকারি 'সওদা' করে থলে ভর্তি করে রেলের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হন্ হন্ করে পা চালিয়ে বেলেঘাটার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ইলেকট্রিক ট্রেনের দরজার সামনে দিয়ে ছুটোছুটি করেন। সেখানেও ভিড়, ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। ট্রেন ছাড়ার সময়ের কোন গ্যারাণ্টি না থাকলেও তবু ট্রেনের মধ্যে তাস খেলে বা অন্যের খেলা দেখতে দেখতে সময়টা কেটে যায়। তারপর যাদবপুর স্টেশনে নেমেই আবার হাঁটা পথ। একেবারে সোজা পালবাজার।

এইভাবে নিত্য জীবনসংগ্রাম করে বিজয়ী সৈনিকের মত ঘরে ফিরে শান্ত ছেলে-মেয়ের মুখ দেখলেই যেন সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় পরেশবাবুর।

সেদিন ট্রেনটা একটু বেশী লেট করায় ফিরতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। পরেশ-বাবু আপিসের জামাকাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে লুঙ্গি পরে সবে পাখার নীচে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে 'আ' বলে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়েছেন, অমনি রাস্তা থেকে কে যেন ডাকলো, জ্যাঠামশাই, বাড়ী আছেন?

কে? বলে ভেতর থেকে হাঁক দিলেন পরেশবাবু বিরক্তিভরা কণ্ঠে।

আমরা জ্যাঠামশাই।

কে তোমরা? বলে উঠে জানলায় উঁকি মেরেই চমকে ওঠেন। দেখেন হাতে চাঁদার খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার সেই রকবাজ ওঁচা ছোঁড়ার দল। সকলের নাম জানেন না। চেনেন না কাউকে। কে কোন্ পাড়ায় থাকে তার খবরও রাখেন না। শুধু পটলা, রবি, ফটকে তিন-চারটে ছোঁড়া সব ব্যাপারে মস্তানী করে বলে ওদের মন থেকে মুছে ফেলার শত চেষ্টা করলেও ভুলতে দেয় না ওরা নিজেরাই। তাই চা-টা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে মনের সব বিদ্বেষ চেপে মোলায়েম কণ্ঠে সাড়া দিলেন, একটু দাঁড়াও বাবারা, যাচ্ছি এখনি।

সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পরেশবাবু বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, তোমরা যে সব এখন—।

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই পটলা বললে, জ্যাঠামশাই, এবার আমরা পাড়ায় সার্বজনীন কার্তিক পুজো করছি, তাই চাঁদা নিতে এসেছি আপনার কাছে।

এঁ্যা, কি বললে, সার্বজনীন কার্তিক পুজো ? এ তো বাপের জন্মে কখনো শুনিনি হে !

ফটকের মুখ দিয়ে ফট্ করে বেরিয়ে এলো, হাঁ জ্যাঠামশাই, কেউ কখনো যা করেনি আমরা প্রথমে সেটা করে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমাদের এ পল্লীর মধ্যে আমাদের পাড়াটাই সবচেয়ে সেরা।

রবির চেহারাটা জলদস্যুর মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুলের বোঝা, গালের অর্ধেক পর্যন্ত মোটা ঝুলপি, তেমনি গোঁফ দুদিকের ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঝুলে নীচের দুই ওষ্ঠপ্রান্ত গ্রাস করে ফেলেছে। বুক খোলা রঙীন গেঞ্জির ভেতর দিয়ে আগে চোখে পড়ে একটা কালো রঙের চেনের সঙ্গে গণ্ডারের একটা মূর্তির লকেট ঝুলছে ওর বুকভর্তি কালো লোমের মধ্যে।

ফটকের কথা শেষ হতে-না-হতেই সে বলে উঠলো, হাঁ, আমাদের পাড়ায় আমরা কোন পুজো বাদ দেবো না, দেখে নেবেন জ্যাঠামশাই।

পরেশবাবু বললেন, কিন্তু এ পুজোটা যে তোমরা করছো, পাড়ার যাঁরা প্রবীণ লোক তাঁদের কি মত নিয়েছো ?

হো হো করে এবার তারা একসঙ্গে হেসে উঠে বললে, প্রবীণ লোকদের মত নিতে গেলে, তাঁরা যতরকম ব্যাগড়া দিতে চেষ্টা করেন। আসলে গ্যাঁটের পয়সা তো খসবে এই ভয়ে !

রবি বললে, জ্যাঠামশাই, আপনি তো দেখছেন, আগে এ পাড়ায় কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। এক শেতলা পুজো ছাড়া আর কোন পুজো কি হতো ? এখন দেখুন আমরা দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে একে একে কিছু বাদ রাখিনি। বাদ পড়ে গিয়েছিল কার্তিক পুজো, এবার থেকে তাই এটা শুরু করেছি।

পরেশবাবু বললেন, কিন্তু কার্তিক পুজোটা তো বারোয়ারী করে হয় না বাবা।

পটলা বলে, কেন হয় না ? করলেই হবে। এই যে এ পাড়ায় আগে কোন পুজোই ছিল না, কিন্তু এখন তো সব হচ্ছে। তেমনি এখন থেকে এ পুজোটাও চালু হয়ে যাবে দেখবেন—"হোয়াট্ পালবাজার থিঙ্কস্ টু-ডে দি হোল্ অফ্ বেঙ্গল্ থিঙ্কস্ টু-মরো।"

হা-হা-হা-হা করে ছোকরার দল আবার হেসে উঠতে পরেশবাবু বললেন, এটা কেন বারোয়ারী করে হয় না, তার আসল কারণটা তোমরা বোধ হয় জানো না ? বলে একটু গলার স্বরটা নামিয়ে তিনি বললেন, তোমরা সব ছেলের বয়সী, তোমাদের কাছে বলতে লজ্জা করে, তবু শাস্ত্রে বলেছে 'প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষে পুত্রমিত্রম বদাচরেৎ'। এই শ্লোকটার মানে নিশ্চয়ই জানো তোমরা !

ফটকে ফট্ করে বলে ওঠে, জানি বলেই তো ষোল বছরে পা দেবার আগে থেকেই আমরা আপনাদের সামনে বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার রিয়ার্শেল দিতে শুরু করে দিই।

এই থাম ফট্‌কে! আগে জ্যাঠামশাই কি বলছে শোন। মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস্‌নি—বলে রবি একটা ধমক দিলে।

পরেশবাবু বললেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এই কার্তিক পুজোটা বাঁজা মেয়েরা মানে যাদের ছেলে হয় না তারাই পুত্র কামনায় করে, ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি। হ্যাঁ, আর করে ওই বেশ্যারা, কার্তিকের মত সব বাবু পাবার আশায়। তাই বলছিলাম কি আমাদের পাড়ায় তো ছেলেপুলের অভাব নেই, বরং উদ্বৃত্ত বলতে পারো, সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে জন্মনিয়ন্ত্রণে, আর অন্যটার জন্যে বিশেষ বিশেষ পাড়া আছে সেখানে খুব ঘটা করে কার্তিক পুজো হয় শুনেছি। এই বলে একটু থেমে বারকতক ঢোক গিলে পরেশবাবু বললেন, এইজন্যেই এ পুজোটা কেউ করে না—বিশেষ করে বারোয়ারী চাঁদা তুলে করার কোন অর্থ হয় না।

রবি বললে, ভুল জ্যাঠামশাই, তাদের সেই ভুলের জন্যই আজ আমাদের এইভাবে শাস্তি পেতে হচ্ছে।

শাস্তি! তার মানে? বড় বড় চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন পরেশবাবু।

রবি বলে, মানে আসলেই তো ভুল, গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। কার্তিককে কেবল আপনারা এতকাল ওই ভাবেই পুজো করে এসেছেন। আসল পুজোর স্থানে দিয়েছেন ফাঁকি, ভুলে গেছেন যে কার্তিক হলেন দেবসেন্যাপতি। তাঁর হাতে তীরধনুক। তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন তাদের, যারা তাঁকে পুজো করে ষোড়শোপচারে। আজ যে আমাদের পাড়ায় এতসব চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ, খুনোখুনি দিনদুপুরে চোখের সামনে হচ্ছে, অথচ কেউ তা রুখতে পারছে না, পুলিস-বাহিনী বন্দুক নিয়ে লজ্জায় ফিরে যাচ্ছে, এইসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এই কার্তিক পুজো ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কার্তিক দেবসেনাপতি, শৌর্য বীর্য ও যৌবনের প্রতীক, তাই অনেক চিন্তা করে আমরা দেখেছি এ পুজো যুবকদেরই পুজো। যৌবনের দেবতাকে কি করে তুষ্ট করতে হয় আমরা তা জানি। এই যৌবনশক্তিকে আজ জাগিয়ে তুলতে হবে—এই দেবাসেনাপতিকে ষোড়শোপচারে পুজো আরাধনা করে। তাই চাঁদার খাতা নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের ধনসম্পত্তি, জীবন, মানইজ্জত সব রক্ষা পায় যাতে সেই জন্যে এই পুজো। এতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। সবই আপনাদের কল্যাণের জন্যে।

পট্‌লা বললে, না, স্বার্থ নেই বললে ভুল হবে। আমরা এতজন ইয়ংম্যান থাকতে আমাদের পাড়ায় যে এইভাবে খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ হামেশাই হচ্ছে তার জন্য ক্ষয়ক্ষতি যত আপনাদের তার চেয়ে অনেক বেশী কলঙ্ক যে আমাদের, ভেবে দেখেছেন কি তা জ্যাঠামশাই?

পরেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা জানি। তোমাদেরই তো দেখি সবাই

দুর্নাম দেয়।

কিছু জানেন না। এ পাড়ার দুর্নাম, কলঙ্ক সবই এখন ইয়ংম্যানদের ওপর এসে পড়ছে। সকলের অভিযোগ, আমাদের পাড়ায় এতগুলো যুবক থাকতেও এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না কেন?

রবি বলে ওঠে, সত্যিকারের যিনি শৌর্যবীর্যের দেবতা, যুবশক্তির প্রতীক তাঁকে আমরা অবহেলা করেছি, আলাদা করে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, শেতলার মত পুজো করিনি তাই যত কলঙ্ক যত কোপ আজ এসে পড়েছে আমাদের মত যুবকদের ওপর। এ সেই দেবসেনাপতিরই অভিশাপ। তাই আমাদের পাড়াকেও সবদিক থেকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্যে আমরা এই সার্বজনীন পুজোর আয়োজন করেছি।

ফটকে এবার একটা একান্ন টাকার রসিদ পরেশবাবুর হাতে দিয়ে বললে, আপনি এখনি অফিস থেকে ফিরেছেন, তাই এখন বিরক্ত করবো না। আপনি বিশ্রাম করুন, কাল সকালে এসে আমি টাকাটা নিয়ে যাব।

পরেশবাবু টাকার অঙ্কটা দেখে শিউরে উঠলেন, এ্যাঁ! কার্তিক পুজোর চাঁদা একান্ন টাকা। বলো কি হে? যেখানে দুর্গাপুজোয় দিয়েছি পঁচিশ, লক্ষ্মীপুজোয় দশ, কালীপুজোয় দশ, সেখানে কার্তিক পুজোয় একান্ন টাকা?

পটলা বলল, ওসব পুজোয় কম দিলে চলে কিন্তু এটাই তো এখন আসল পুজো! দুর্গাপুজোয় পঁচিশ দিলে, কার্তিক পুজোয় অন্তত চার ডবল দেওয়া উচিত। ওসব বাজে দেবদেবীর পুজো করে কি ফল পেয়েছেন—চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি, নারী-ধর্ষণ কিছু কমেছে কোথাও? বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই এসব রুখতে হলে সবচেয়ে ভালো করে এই দেবসেনাপতিকে খুশী করতে হবে জ্যাঠামশাই। এই আসল দেবতাকে আমরা এতদিন শুধু কাঁচকলা দেখিয়ে এসেছি। সেই জন্যে তাঁর অভিশাপেই দিন দিন এত অশান্তি বাড়ছে।

রবি এগিয়ে এসে বললে, দেখবেন এবার থেকে জ্যাঠামশাই আমাদের পাড়ায় কোন চোর, ছ্যাঁচোড়, বদমাইশ ঢুকতে পারবে না। এই তো আসল পুজো।

ফটকে বললে, আমরা সকলে মিলে মিটিং করে তবে এই চাঁদা ঠিক করেছি। যার যেমন অবস্থা সেই বুঝে। জানি এই এক মাস ধরে নানা পুজোর হিড়িকে অনেক টাকা সকলের খরচ হয়ে গেছে তাই একান্ন টাকা ধরেছি আপনার, নইলে আপনার অন্য সব বন্ধু-বান্ধবদের গড়ে একশো এক টাকার রসিদ কেটেছি। ভানুবাবু, মণীশবাবু, গজুকাকা, ছোট্টুদা তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

পরেশবাবু বললেন, না না, জিজ্ঞেস করতে যাব কেন, তোমাদের কি অবিশ্বাস করি বাবা, তোমরা পাড়ার ছেলে, যদিও সকলকে চিনি না। তবে বলছিলুম কি জানো, কার্তিক পুজো তো সামান্য ব্যাপার। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা বড় জোর লাগে। রাতদুপুরে পুজো হয়, তাতে তোমাদের এত টাকা কেন লাগবে?

পটলা বলে, জ্যাঠামশাই, আপনার তো বয়েস হয়েছে, আপনাকে আর বেশী

কি বলবো। তবে এটা তো জানেন আপনাকে নেমন্তন্ন করে যদি কেউ শাক-ভাত খাওয়ায়, আবার আর একজন পোলাও, মাছ, মাংস, চপ, কাটলেট পেট ভরে খাইয়ে খুশী করে তাহলে আপনার মনটা কার দিকে বেশী টানবে বলুন? যেমন দক্ষিণা তেমনি পুজো। মানেন তো কথাটা?

পরেশবাবু বলেন, বুঝেছি বাবা, আর বেশী বলতে হবে না।

রবি বলে, দেবসেনাপতি, যিনি দেবতাদের সব সময় বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তাঁকে আমরা মর্তে আহ্বান করে আনছি, আমাদের স্বার্থে। কাজেই তাঁকে তুষ্ট করতে হলে, কিভাবে পুজো করা উচিত বুঝতেই পারেন। আমরা এমন ধুমধাম লাগিয়ে দেবো যে দেবসেনাপতি যাতে স্বর্গে ফিরে গিয়েও কোনদিন আমাদের ভুলতে না পারেন। দেখবেন পুজোর দিন কি ঘটা করি!

বলতে বলতে তারা বিদায় নিলে পরেশবাবু সেই রসিদটা মুঠো করে চেপে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বললেন, ক্ষেন্তি, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যা তো মা।

এই তো গরম চা খেয়েছো বাবা, ঠাণ্ডা জল তার ওপর এখনি খেলে যে সর্দি লেগে যাবে।

তা জানি। কিন্তু গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে, শিগ্‌গীর একটু জল দে মা। এই বলে জলের গ্লাস হাতে নিয়েই ঢকঢক করে এক নিঃশেষে সবটা খেয়ে ফেললেন।

গৃহিণী ভেতরে রান্নাঘরে ছিলেন। কাপড়ে ভিজে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন, হাঁগো, ক্ষেন্তি বলছিল পাড়ার ওই বকাটে ছোঁড়াগুলো এসেছিলো নাকি তোমার কাছে কার্তিক পুজোর চাঁদা চাইতে! এবার থেকে সার্বজনীন কার্তিক পুজো করবে ওই বকুলতলার মাঠে!

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললেন, হাঁ, এই দ্যাখো বিল কেটে দিয়ে গেল, কাল সকালে টাকা নিতে আসবে।

বিলটা হাতে নিয়ে যেন জ্বলে উঠলেন, এ্যাঁ, একান্ন টাকা চাঁদা কার্তিক পুজোর জন্যে! বাপের জন্মে কেউ কখনো শুনেছে যে কার্তিক পুজো বারোয়ারী করা হয়? ছিঃ ছিঃ! এখানে মানুষ বাস করে? দিনে দিনে যেন বেড়ে চলেছে ওদের অত্যাচার!

পরেশবাবু বললেন, তাই ভাবছি কার্তিক পুজোর পরে হয়তো ব্যাটারা আবার এসে বলবে এবার গণেশ পুজোর চাঁদা দিন। গণেশই আসল সিদ্ধিদাতা। মাড়োয়ারীরা এই গণেশ পুজো করেই সব বড়লোক! আমাদের পাড়ায় এত বেকার ছেলে, এত অভাব ঘরে ঘরে, গণেশ পুজো-করলেই সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে! বেকার বলতে আর পাড়ায় কেউ থাকবে না!

রাগে ফেটে পড়েন গৃহিণী, কবে থেকে তোমায় বলছি, এখানে আর মানসম্ভ্রম নিয়ে বাঁচা যাবে না। চলো বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে, কলকাতার দিকে চলে যাই। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে তার সুদে বাড়ী ভাড়া করে থাকবো। কোন একটু ভাল পাড়া দেখে।

বলি ভাল পাড়া কোথায়—সর্বত্র এই। অফিসে এই নিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। সকলেই পাড়ার মস্তানদের জ্বালায় জ্বলে মরছে।

গৃহিণীর রাগ এতে আরো বেড়ে যায়। বলেন ছেলে-ছোকরাদের যতই দোষ দিই না কেন, আসলে তোমরাই সবচেয়ে অপরাধী। ওরা যখন যা চাঁদা চায় তোমরা তাই দিয়ে ওদের লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছো। তোমরা জানো ওরা এইসব টাকার কতটুকু দিয়ে পুজো করে, আর কতটা নিজেদের আমোদ-ফূর্তিতে ব্যয় করে। তোমরা যদি একজোট হয়ে বন্ধ করে দাও এই টাকা দেওয়া, তাহলে ছোঁড়াগুলো এইভাবে উচ্ছন্নের পথে যেতে পারে না।

পরেশবাবু বলেন, আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি গোপনে গোপনে কিন্তু কেউ এতে রাজী নন। সকলের ভয়, যদি ছোঁড়ারা জানতে পারে তাঁর নাম। কেউ ওদের ঘাটাতে চায় না।

তাহলে মরো এইখানে পচে। ওই জানোয়ারগুলোকে মনে হয় রাস্তায় বেঁধে ল্যাংটো করে আগাগোড়াজলবিচ্যুটি মারি। বলে রাগে গর গর করতে করতে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন।

কার্তিক পুজো কেটে গেছে। তারপর একদিন। ফট্‌কে লাফাতে লাফাতে উড়েঠাকুরের চায়ের দোকানে এসে হাজির হবার আগেই পট্‌লা, রবি, কল্যাণ প্রভৃতি দলের প্রায় সকলেই সামনের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা জমিয়ে তুলেছিল। একজন অর্ধেক বিড়ি খেয়ে বাকী অর্ধাংশ আর একজনকে দিচ্ছিল। যে-ই রবির মুখ থেকে বিড়ির আধখানা নিয়ে পট্‌লা মুখে দিতে যাবে, খপ্‌ করে পিছন থেকে সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে ফট্‌কে একসঙ্গে গোটাচারেক টান জোরসে মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, গুরু, আজ একটা জব্‌বর খবর আছে!

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, কি রে কি খবর—বেশ জম্পেস্‌ ও রগরগেতো?

ফট্‌কে বলে, আগে একটা বিড়ি ছাড়ো গুরু, নইলে ওই আধখানায় কি নেশা লাগে!

রবি বলে, আগে বল শলা—তখন একসঙ্গে ডবল নেশা দেবো।

আচ্ছা একটা 'এড্‌ভ্যান্স' দে আগে। বলে রবির দিকে হাত বাড়ালো। তারপর বিড়িটা মুখে গুঁজে, দোকানের সামনে বাঁশের খুঁটিতে নারকেল দড়িতে যে আগুন জ্বলছিল, তার কাছে গিয়ে ধরিয়ে বললে, মাইরি, দারুণ খবর। সামনের শনিবার সকলে রেডি থাকবি। দাসপাড়ার গলিটার মুখে।

ফট্‌কের পাছায় একটা লাথি মেরে পটলা বলে, ছাড় না আগে পেট থেকে কথা!

আরে চৌধুরীদের বাড়ী বিয়ে লেগেছে। শনিবার—

রবি বলে, কার বিয়ে রে ওদের বাড়ী? মেয়ে না ছেলে?

আরে সেই যে মোটা কলসীর মতো মেয়েটা—

পট্‌লা বলে ওঠে, মেয়েটা না বলে বরং মেয়ের পিসীটা বল্‌! ওর যে

বয়সের গাছপালা নেই রে। আমার চেয়েও চার বছরের বড়। মায়ের মুখে শুনেছি।

ফটকে বলে, একে মোটা তায় কালো কুচকুচে রং। কোন্ শলা যে ওর গলায় মালা দেবে, জানি না।

রবি বলে, ওর বাবা তো দু'নম্বর কারবার করে বড়লোক সবাই জানে। টাকা ছাড়লে আবার বিয়ে করার লোকের অভাব।

ফটকে বলে, মাইরি। শুনছি নাকি এক উকিলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।

রবি বলে উঠলো, রতনে রতন চেনে। উকিল কি সাধে বিয়ে করছে—কত টাকায় ঘা দিচ্ছে খবর নিয়ে দেখগে যা।

গুলি মারো গুরু। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি। আমরা চাই আমাদের পাওনাটা—ব্যস্।

শনিবার ঠিক সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে যে গলিটা দাসপাড়ায় ঢুকেছে সেখানে ঘুরঘুর করতে থাকে। তারপর যেই ফুল দিয়ে সাজানো বরের গাড়ীটা গলির ভেতর ঢুকতে যাবে, এমন সময় ওরা এসে পথ আটকালো।

রবি এগিয়ে গিয়ে বললে, আমরা পাড়ার ছেলে, আমাদের ক্লাবের দক্ষিণাটা না পেলে গাড়ী ছাড়বো না।

বরকর্তা গাড়ী থেকে নেমে বলেন, বাবা, আগে বিয়েটা হতে দাও, তারপর কাল সকালে তোমরা এসো, তোমাদের ক্লাবের চাঁদা নিশ্চয়ই দেবো।

ওটি মাপ করুন। কালকের কারবারে আমরা নেই। যা দেবার এখনি দিয়ে বর নিয়ে চলে যান।

এদিকে লগ্নের সময় আর বেশী নেই। অগত্যা বরকর্তা পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করে রবির হাতে দিয়ে বলেন, যাও বাবারা। এবার আমাদের যেতে দাও।

রবি টাকাগুলো ভদ্রলোকের হাতে ফেরত দিয়ে বলে, আমরা কি ভিখিরী যে ভিক্ষে দিচ্ছেন এই পঞ্চাশটা টাকা ?

বরকর্তা মিনতি করে বলেন, বাবা, আরো আমাদের অনেক কিছু দিতে হবে, জানো তো !

সে তো দেবেন-ই। কত দোহন করে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা কি হিসেব করে দেখেছেন। গহনা জিনিসপত্রে প্রায় সত্তর-আশি হাজার টাকার কম নয়। সেখানে অন্তত আড়াইশো টাকা না পেলে আমাদের মান থাকবে না। তাছাড়া আপনারা এতবড় নামকরা উকিল হয়ে ওই পঞ্চাশটা টাকা হাতে করে দিলেন কি করে মশাই, এর জন্যে আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

বিয়ে তো এই একবারই করতে এসেছেন আমাদের পাড়ায়—আর তো আসবেন না।

অগত্যা দ্দশো টাকায় রফা হয়। রবি ফট্দের দল তখন তাদের হাত তুলে নমস্কার করে সরে পড়ে।

এদিকে পরের দিন বিয়ে-থা চুকে গেলে, ঠিক বরকনে বিদায়ের আগে ওরা কন্যাকর্তার কাছে গিয়ে বলে, প্রায় লাখখানেক টাকা খরচা করে মেয়ের বিয়ে দিলেন, আর আমরা পাড়ার ছেলে, ক্লাবের জন্যে পাবো না ?

· ঝামেলা এড়াবার জন্যে কন্যাকর্তা ওদের আড়ালে ডেকে হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বলেন, তোমরা তো পাড়ার ছেলে। যখন তখন প্দজোর চাঁদা দিই, ফাংশানের টিকিট নিই তোমাদের কাছ থেকে। মেয়ের বিয়ের জন্যে বরপক্ষর কাছ থেকে আগেই টাকা নিয়েছো শ্দনল্দম, তবে আবার কেন আমার কাছে চাইছো ?

ফট্কে বলে ওঠে, বরপক্ষ যখন আমাদের পাড়া থেকে হাজার হাজার টাকা নিচ্ছেন, তখন আমাদের অবশ্যই দেবেন। আর আপনি যখন এত টাকা পরকে অনায়াসে বার করে দিলেন, তখন পাড়ার জন্যে কিছ্দ দেওয়া কি আপনার উচিত নয় ? ভগবান যখন আপনাকে এত দিয়েছেন তখন আমাদের বঞ্চিত করছেন কেন ? এত বড় একটা শ্দভকাজ করলেন, সবাই ধন্যধন্য করছে আপনার !

এই বলে একটু থেমে ফট্কে বলে, অন্তত আরো একশো দিন, বেশী কথা না বাড়িয়ে, কন্যাকর্তা আরো একশো দিয়ে তাদের বিদেয় করেন !

ক্লাব না ছাই! একটা আড্ডাখানা! কল্যাণদের বৈঠকখানায় বসে যত বেকারের দল তাস পাশা খেলে আর বিড়ি ফোঁকে। একটা ক্লাবের নাম করলে টাকা সহজেই পাওয়া যায় বলে রবি ফট্কের দল অনেক মাথা ঘামিয়ে 'জনকল্যাণ সংঘ' নাম দিয়ে ঘরের ভেতরে দেওয়ালে একটা মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে কালি দিয়ে লিখে রেখেছে।

তেমনি পাড়ায় কেউ মরলে, যাদের লোকবলের অভাব, তারা হয়ত ওদের সংবাদ দেবার কথা চিন্তা করছে কিন্তু তার আগেই কোমরে গামছা বেঁধে পট্লা রবির দল হাজির হয়। তারপর খাট, ফুলের মালা, দড়ি প্রভৃতি যাবতীয় কিনে এনে পরমোৎসাহে মড়া কাঁধে দাহ করতে চলে যায় কেওড়াতলার শ্মশানে।

শীত গ্রীষ্ম নেই, দিন রাত নেই, ওরা জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছে। অবশ্য এই উৎসাহের পিছনে থাকে বে-হিসেবী পাওনা ! মড়া ঘাড় থেকে নামিয়েই তারা ক্লান্তি দ্দর করার জন্যে তৎক্ষণাৎ চা খেতে যায়। বলা বাহ্দল্য, শ্দধ্দ চা নয়, তার সঙ্গে মোটা রকমের টা-এর ব্যবস্থাও থাকে। শোকার্ত মৃতের আত্মীয়-স্বজন তাড়াতাড়ি তাদের হাতে মোটা টাকা গংঁজে দেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে টাকার হিসেব রবি পট্লার কাছ থেকে কেউ কখনো চায় না। এই ফালতু টাকা দিয়ে ওরা পরে ইচ্ছামত রেস্তোরাঁয় স্ফ্দর্তি করে কিংবা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। এর পর থাকে একটা বড় রকমের ভোজ, যা বাধ্যতাম্দলক— অর্থাৎ শ্মশানবন্ধ্দ ভোজন।

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে ওরা যেমন সাদরে নিমন্ত্রিত হয়, তেমনি বিয়ে-থার ব্যাপারে কখনো কখনো বিনা নিমন্ত্রণে ওরা দশ-পনেরো জন খাবার টেবিলে বসে খেয়ে চলে যায়। শেষে কর্মকর্তাদের খাদ্যে টান পড়ে যায়। বাড়ীর লোকেরা সেই রাত্রে ছুটোছুটি করে মিষ্টি, মাছ, ঘি, ময়দা প্রভৃতি কিনতে ছোটে বাজারে, নইলে আত্মীয়দের কাছে মান থাকে না।

অথচ মজা এই, এর জন্যে পটলা রবির দলকে মুখে কেউ কোন কথা বলে না। বরং মুখে আপ্যায়ন করে। তবে ইদানীং অনেকে আগে থেকে রবি পটলাদের বলে, তোমাদের খাবার পাঠিয়ে দেবো, তোমাদের আসবার দরকার নেই। যাতে না পরে ছুটোছুটি করতে হয় এই ভয়ে।

তাতে আরো খুশি হয়ে ওঠে ওরা। বলে, পাঠাতে হবে না। আমরা এসে নিয়ে যাবো।

॥ ১৪ ॥

জনার্দনবাবু নাতিকে নিয়ে গড়িয়াহাট মার্কেটে যাচ্ছিলেন, তাকে একটা খেলার বল কিনে দেবার জন্য। কিন্তু ট্রাম লাইন পেরিয়ে ওপারে খেলনার দোকানে যাবার আগেই এক বিরাট মিছিল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান। লাল শালুর ওপরে লেখা 'আমাদের দাবী মানতে হবে'—আরো কত রকমের স্লোগান্।

দাদু, এরা এতো চেঁচাচ্ছে কেন? কি হয়েছে এদের?

কিছু হয়নি।

তবে কেন ওরা চেঁচাচ্ছে? বলো না দাদু?

এ এক রকমের খেলা। দেখছিস না, কত লাল লাল ফ্ল্যাগ হাতে!

দাদু, আমিও খেলবো—চলো না ওখানে।

ওরা তোমায় খেলতে নেবে না। তুমি যে ছোট ছেলে। দেখছো না, তোমার মত কেউ নেই।

এই বলে নাতিকে মুখে যত ভোলান, মনে মনে তত ওই ঝাণ্ডাওলাদের মুণ্ডপাত করেন। তাঁর স্কুলে একসময় পড়তো এমন দু'এক ছাত্রকেও তিনি দেখতে পেলেন ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেখে মনে মনে গর্জে ওঠেন, ব্যাটারা স্কুল-কলেজগুলোর বারোটা বাজিয়েছে। এবার কলকারখানাগুলোতে লালবাতি জ্বালার জন্যে মরছে—নিজের পায়ে নিজেরা যে কুড়ুল মারতে যাচ্ছে এটুকু বুদ্ধি যদি থাকতো! এদলে রবি ফটকেরাও ভীড়ে গেছে। এক মাস কারখানা বন্ধ। ওরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে চেঁচালে প্রত্যেক দিন দু'টাকা রোজ ও চার কাপ চা পায়। তাছাড়া কারখানা চালু হলে, যদি চাকরি একটা পেয়ে যায় সেই আশায় ওই দলের নেতাদের পায়ে তেল দেয়।

॥ ১৫ ॥

সুজাতার ক্লাস কোন্ কোন্ দিন কখন শেষ হয় রবি তা জানে। সুজাতাই তাকে বলে দিয়েছে।

মুরলীধর কলেজের বি. এ. ফাইন্যাল ক্লাসের ছাত্রী সে। বাপের অবস্থা ভাল নয়। তাই বি. এ. পাশ করলেই তার বিয়ে দেবেন বলে ভেতরে ভেতরে পাত্রের সন্ধান করেন। অবস্থা খারাপ, কিছু দিতে-থুতে পারবেন না—অথচ কোন ভদ্র শিক্ষিত ছেলে ছাড়া অন্যের হাতে মেয়েকে সমর্পণ করবেন না এমনি তাঁর দৃঢ় সংকল্প।

এদিকে সুজাতা যে কলেজের ছুটির পর রবির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় পর্দার আড়ালে বসে চা খায়, কোন দিন বা লেকের ধারে নির্জনে বসে থাকে দু'জনে মুখোমুখি—এ খবর ওর বাপ মা কেউ জানতো না।

সুজাতা শুধু তাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতো, কি হলো, চাকরি কিছু পেলে না এখনো?

আরে গুলি মারো চাকরিতে! আমি 'ব্রোকারি' করে যা উপায় করি তোমার গ্র্যাজুয়েট ক্লার্করা চাকরি করে তা কল্পনা করতে পারে না।

আচ্ছা তুমি কিসের দালালী করো বল তো?

আরে তার কি কিছু ঠিক আছে! যখন যা হাতে আসে। কখনো জুট, কখনো আয়রন্, কখনো কোল্—যখন যাতে দাঁও মারতে পারি!

মিথ্যে করে নিজের বেকারত্বকে এইভাবে ঢাকবার জন্যে মুখে রবি লম্বা লম্বা কথা বলে চমক লাগায় সুজাতাকে।

সুজাতা বলে, কিন্তু এ সবের তো কোন স্থায়িত্ব নেই; আপিসের চাকরির মত বাঁধা মাইনে তো পাও না কিছু।

আরে গুলি মারো বাঁধা মাইনেতে। 'মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার'—আমার কাছে সোজা কথা! ওসব পরের গোলামী করা আমার দ্বারা পোষাবে না। জানো আমি কত বড় বংশের ছেলে! আমাদের দোরে হাতী বাঁধা থাকতো একদিন। পুকুর, বাগান-বাগিচা, গোলাভর্তি ধান। চাকর-বাকর, লোকলস্কর কত যে ছিল আমাদের, সেকথা তোমরা কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে না—তাই বলিও না কাউকে। নেহাত তুমি জিজ্ঞেস করলে তাই বললুম। পরের গোলামী আমি করবো! জানো কত লোক আমাদের কাছে চাকরি করতো।

সুজাতা বলে, দেখো তুমি কিছু মনে করো না, তোমার সঙ্গে যে আমি মেলা-মেশা করি, মা তা জানতে পেরেছেন। তাই আমায় সেদিন মা সাবধান করে দিয়ে বললেন, যার সঙ্গে মেলামেশা করবি, আগে ভাল করে তার বংশপরিচয় জেনে নিবি। কোথায় বাড়ী, কোথায় থাকে, কি চাকরি করে, পাড়ায় কেমন সুনাম, সব

জেনেশুনে তবে পরের ছেলের সঙ্গে মিশবি। কত মেয়ে এমনি করে নিজের সর্বনাশ নিজে করছে—একদিন ফাঁসিয়ে দিয়ে ছেলেটা কোথায় সরে পড়েছে আর তাকে ধরতে পারেনি।

রবি বলে, আমাকে কি তোমার সেইরকম কিছু মনে হয়? সত্যি করে বলো?

মা জিজ্ঞেস করছিলেন, তোমার বাড়ীঘর আছে কিনা, কোথায় তুমি থাকো, আমি তো কিছুই জানি না—তাই বলছি।

রবি চট্ করে কল্যাণের বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে দেয় তাকে। ওর বাবা খুব বড় চাকরি করেন দিল্লীতে। এখানে বালিগঞ্জ প্লেসে সুন্দর বাড়ী করেছেন। সেখানেই কল্যাণের বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রায়ই ওরা আড্ডা মারে।

চুপিচুপি একদিন সেই বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখতে গিয়ে রবিকে সেখানে দেখে সুজাতা ভাবে রবি মিথ্যা বলেনি। বাড়ীটা সত্যি খুব সুন্দর।

সুজাতার মনে যাতে ওর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মায় সেই জন্যে মাঝে মাঝে কোন বড় রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে অনেক টাকার বিল দিতো। আবার কখনো বা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে সুজাতাকে সিনেমা দেখাতো।

ও যে সত্যি অনেক উপার্জন করে এই ধারণাটা সুজাতার মনে যখন এইভাবে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায় তখন সুজাতা বি. এ. পরীক্ষায় পাস করে।

যেদিন রবিকে হাসিমুখে পাস করার খবরটা দিলে, রবির মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সুজাতা বলে, তোমার যত আনন্দ হচ্ছে আমার কিন্তু তত হচ্ছে না। সেকেণ্ড ডিভিসন্-এ পাস করেছি বলে বাবা-মার খুব মন খারাপ!

গুলি মারো, ডিভিসন্ নিয়ে কি হবে! তুমি তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হয়েছ, সেটা কম কৃতিত্ব নয়। ক'টা ছেলে পারে তা? আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলবো!

সত্যি বলছো? খুব আনন্দ হচ্ছে?

কেন, আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছো না?

পারছি। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে মা-বাবার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। কেমন যেন গম্ভীর। মা দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারছো যখনি শুনেছি, তখনি জানি এবার লেখাপড়ার বারোটা বাজবে। যা ভেবেছিলুম তাই হলো। নইলে হায়ার সেকেণ্ডারীতে যে মেয়ে ফার্স্ট ডিভিসন্ পায় সে বি. এ.-তে এত খারাপ রেজাল্ট করে কি করে?

সুজাতা ও রবি লেকের ধারে একটা গাছের তলায় বসে ঝালমুড়ি খাচ্ছিল।

রবি হাতের ঠোঙাটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে বললে, আরে মা তোমার লেখাপড়ার কি বোঝেন? এই বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবার লেখাপড়া কত দূর?

ম্যাট্রিক পাস করে রেল আপিসে চাকরিতে ঢোকেন। তিনি গুড্স্ ক্লার্ক।

ওঃ, তাহলে বাদ দাও ওঁদের কথা। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ একেবারেই করো না। বি. এ. পাস করতে কতখানি বিদ্যাবুদ্ধির দরকার তাঁরা কি আমার মতো বুঝবেন? অর্থাৎ রবি যেন নিজে গ্র্যাজুয়েট এইটে ওকে বোঝাতে চায়। সত্যি সুজাতা, আমার কিন্তু এত আনন্দ হচ্ছে যে এখুনি তোমায় নিয়ে কোন বড় হোটেলে গিয়ে 'সেলিব্রেট' করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখুনি আমায় একটু জরুরী কাজে যেতে হবে। তাই আসছে শনিবার তিনটের সময় তুমি পার্ক স্ট্রীটের 'ওয়ালডর্ফ' হোটেলে যেয়ো, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।

সুজাতা নাম শুনেছিল পার্ক স্ট্রীটের ওই হোটেলটার। বড়লোকরা ওখানে খেতে যায়। তাই সত্যি সত্যি যে রবির খুব আনন্দ হয়েছে তার পাসের এই খবরে, মনে করতে গর্ব অনুভব করে। বাস্তবিক রবি তাকে কত ভালবাসে, এটাই তার প্রমাণ। অথচ ওর নিজের বাপ-মা একদিনও এর জন্যে মুখে একটু আনন্দ প্রকাশ করেননি। ভাবতে সুজাতার চোখে জল ভরে আসে। সেদিন ছিল সোমবার। শনিবার আসতে এখনো অনেক দেরি। ওর যেন চোখে ঘুম আসে না। কি শাড়ী পরে যাবে এবং মা যাতে না জানতে পারেন, তাই পার্কসার্কাসে এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছে বলে বেরিয়ে আসবে, মনে মনে স্থির করে রাখে। সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার চোখে ঘুম এলো না। রবির কথাই ঘুরেফিরে মনে আসে কেবল। সত্যি সত্যি সে ওকে ভালবাসে!

কিন্তু পরের দিন রাসবিহারী এভিনিউর ট্রাম-রাস্তা ধরে ঝাণ্ডা কাঁধে "আমাদের দাবী মানতে হবে" বলে চীৎকার করতে করতে দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে দেখে চমকে ওঠে সুজাতা। এ কি! ভুল দেখছে না তো! না, ও রবি-ই তো! তবে কি রবি ওই কারখানার শ্রমিক? ওইখানে কাজ করে? কই, একদিনও তো সেকথা বলেনি। সে কি তার কাছে গোপন করতে চায়? পাছে তা জানতে পারলে সুজাতা দূরে সরে যায়। তাকে বিয়ে করার চিন্তা না করে। তাই বোধ হয় এতদিন জানতে দেয়নি। মুখে বড় বড় কথা বলেছে, কত বড় বড় কাজ করে, কত বেশী রোজগার করে—সেই কথাটাই বারবার তাকে শুনিয়েছে। সুজাতা কারখানার শ্রমিকদের পছন্দ করে না, সেটা রবি জানতো, তাই বোধ হয় আসল পরিচয়টা ওর কাছে লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

এই গোপনতার জন্যে কেমন যেন সন্দেহ জাগে সুজাতার মনে। ওর এক বন্ধুর দাদা সেই কারখানায় কাজ করতো, মনে পড়ে গেল। কালীঘাটে তাদের বাড়ী। সুজাতা তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে রবির নামটা একটা কাগজে লিখে দিয়ে এলো। বললে, ভাই তোর দাদার কারখানায় এই ভদ্রলোক কাজ করে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে বলিস। খুব জরুরী। আমি পরশু আসবো জানতে।

বন্ধু হেসে ওর গায়ে একটা চিমটি কেটে বলে, বুঝেছি, বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে! সত্যি করে বল?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। তাই সব কিছু যেন জেনে আসেন তোর দাদা। তাঁকে বলিস ভাই।

পরশুদিন যেতে সুজাতাকে ওর বন্ধু বললে, কে তোকে বলেছে, দাদাদের কারখানায় কাজ করে?

সুজাতা বলে, কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখলুম তাকে ঝাণ্ডা-কাঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—"আমাদের দাবী মানতে হবে" বলে।

হ্যাঁ, দাদা কিন্তু বলেছে ওর সঙ্গে যেন তোর বন্ধুর বিয়ে না হয়।

কেন?

বন্ধু বলে, সে শুনলে হয়ত তুই দুঃখ পাবি। দরকার নেই। মোট কথা ওখানে বিয়ে করিসনি। ছেলেটা সুবিধের নয়।

কেন সুবিধের নয়? কি হয়েছে বল্। গোপন করিসনি। দাদার মুখে কি শুনেছিস?

দাদাকে বলেছিলুম, এর সঙ্গে আমার এক বন্ধুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, কাজেই তুমি সব কিছু খোঁজ নিয়ে আসবে ভাল করে। দাদার কিন্তু 'রিপোর্ট' খুব খারাপ। ওরা নাকি বেকার রকবাজের দল—যখন কোথাও কোন কারখানায় ধর্মঘট হয়, ওদের ওই ভাবে চেঁচানোর জন্যে চার টাকা রোজ দিয়ে ডাকা হয়। বিশেষ করে ওই ছেলেটি নাকি ওদের দলের মস্তান। ওর বাড়ীর ঠিকানাও দাদা নিয়ে এসেছে। দাদাদের সঙ্গে কাজ করে একজন ওই পাড়ায় থাকে। যখনই ওদের কারখানায় ধর্মঘট হয়, সে-ই ওদের খবর দেয়।

নিমেষে সুজাতার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে যায়।

বন্ধু বলে, কি রে, রাগ করলি আমার ওপর?

না ভাই। তুই যা উপকার করলি, কখনো ভুলবো না।

বন্ধু বলে, তবু তুই একবার তোর বাড়ীর কাউকে খোঁজ নিতে বলিস—সত্যি কি মিথ্যে বুঝতে পারবি।

সেদিন মার কাছে কিছু গোপন না করে সুজাতা রবির সম্বন্ধে যা শুনেছে সব বললে।

মা বলেন, আমি তোর বাবাকেই নাম-ঠিকানাটা দিচ্ছি। নিজে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

সুজাতা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মায়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে, বাবাকে যেন বলো না আমার সঙ্গে আলাপ ছিল। জানো তো বাবা কি রকম রাগী।

জানি তোকে আর শেখাতে হবে না। এই ঠিকানাটা দিয়ে বলবো, একটা পাত্রের সন্ধান পেয়েছি—তুমি একটু খোঁজখবর নাও তো, কেমন ছেলে?

শনিবার সকাল থেকে সুজাতা ভাবতে থাকে তিনটের সময় 'ওয়ালড্রফ্' হোটেলে যাবে কিনা। এরপর রবির সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে হবে ভাবতে যেন ঘেন্না হয়।

তবু সে গেল। রবিকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করবে আগে, সেদিন কারখানার ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিলের সঙ্গে চেঁচাচ্ছিল কেন? কি বলে আগে শুনবে, তারপর যা শুনেছে—সত্যি কি মিথ্যে, জিজ্ঞেস করবে ওকে।

কিন্তু রবির চেহারা দেখে এবং যা শুনেছে ওর সম্বন্ধে, তারপর আর যেন সাহস হলো না কিছু বলতে। শুধু তার সঙ্গে বসে হোটেলে যখন খাচ্ছিল, রবি বললে, তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? আজ একটা বিশেষ দিন! আনন্দের দিন তোমার ও আমার। কি হয়েছে বলবে না?

সুজাতা মিথ্যে করে বলে, মা আমাকে কিছুতেই বাড়ী থেকে আসতে দেবেন না। আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

ভেরি গুড্! এই তো চাই। আমিও স্থির করেছি আমার বাপ-মাকে লুকিয়ে রেজেস্ট্রি করে শিগ্‌গির তোমায় বিয়ে করবো চুপি চুপি। এখন কাউকে জানতে দেবো না। তোমার মা-বাবাও জানতে পারবেন না। আমার বাবা-মাও নয়। আমি একটা ভাল ফ্ল্যাটের চেষ্টা করছি। যেদিন পেয়ে যাবো, সেইদিন তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবো। কি বলো, চুপ করে আছো কেন? আজকের এই বিশেষ দিনে তোমার মনে আনন্দ হচ্ছে না?

সুজাতা বললে, না।

কেন?

আমি ওসব লুকোচুরির মধ্যে নেই। যখন তুমি ফ্ল্যাট পাবে, তখন বিয়ে হবে মা বাবাকে জানিয়ে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো।

কেমন যেন মুষড়ে যায় রবি। তবু মুখে হাসি টেনে বলে, এ খুবই ভাল কথা—তবু তুমি একটু চিন্তা করে দেখো আমার কথাটা।

চিন্তা করতে আর হলো না। পরের দিন সুজাতার বাবা রবির সম্বন্ধে যা খবর আনলেন হুবহু ওর বন্ধুর দাদার সঙ্গে মিলে যায়।

সুজাতার কাকা কানপুরে চাকরি করতেন, ওর মা সেখানে ওকে পাঠিয়ে দিলেন। ওসব ছোকরাদের মতিগতি ভাল নয়! কত রকমের খুন-খারাপের কাহিনী শোনা যায়!

সত্যি বলতে কি, সুজাতারও মনে রবি সম্বন্ধে এমনি একটা আতঙ্ক ছিল। তাই সে আর দ্বিরুক্তি না করে কাকার কাছে চলে গেল। এবং সেখানেই কিছুদিন পরে একটি কলেজের প্রফেসারের সঙ্গে তার কাকা বিয়ের ঠিক করে ফেলেন।

॥ ১৬ ॥

বাস স্টপেজের কাছে উড়ে ঠাকুরের পান-বিড়ির দোকানে যখন পান খেয়ে নারকেল-দড়ির আগুনে বিড়ি ধরাচ্ছিল ওই পট্‌লা, রবে, ফট্‌কে, নিতাই প্রভৃতির দল, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর্মাক্ত-কলেবরে এসে হাজির হলেন পরেশবাবু। এই যে

বাবা পট্‌লা, তোমরা এখানে রয়েছো ! তোমাদেরই আমি খুঁজছিলুম। একজন বললে তোমাদের প্রহ্লাদ কেবিনে দেখেছে একটু আগে। সেখানে গিয়ে শুনলুম তোমরা নাকি গার্লস স্কুলের দিকে চলে গিয়েছো। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি। যাক, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের।

রবি বললে, কি ব্যাপার বলুন তো জ্যাঠামশাই ! আপনার মত লোক আমাদের খুঁজছেন এ যে বিশ্বাস করা যায় না !

বড় বিপদে পড়েছি বাবা। তোমরা ছাড়া আমায় সাহায্য করার মত আর কে আছে পাড়ায় !

পট্‌লা বলে, বড্ড আনন্দ হচ্ছে জ্যাঠামশাই আপনার মুখ থেকে একথা শুনে। মাইরি বলছি !

ফট্‌কে বলে ওঠে, থাম্, মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিসনি। আগে বলতে দে ওঁকে বিপদটা কি, তারপর আনন্দ করিস যত খুশী।

হ্যাঁ বাবা, বিপদ বলে বিপদ ! বড় সাংঘাতিক বিপদ, অথচ এসব কথা যাকে তাকে বলা যায় না। তাতে আমার কেবল মাথা হেঁট হবে না, তোমাদেরও হবে। তোমরা পাড়ার ছেলে। তোমাদের চেয়ে আপন কে আছে !

রবি বলে, এত বড় বিপদ যখন, আগে খবর দেননি কেন ?

পরেশবাবু গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, আগে কি ছাই জানতুম ! ভেবে-ছিলুম যেমন যায় বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী, এক-আধবেলা থেকে খেয়ে দেয়ে রাতে ফিরে আসে কিংবা সে-রাতটা তাদের পীড়াপীড়িতে থেকে পরদিন সকালেই বাড়ীতে ফেরে—কিন্তু একদিন দুদিন করতে করতে তিনটে রাত কেটে গেল এখনো মেয়ে বাড়ী ফিরলো না ! কি করি বাবা ? আমি একা, আমার আর কে আছে ? তোমরা যদি একটু খোঁজখবর না করো—বলতে বলতে একেবারে কেঁদে ফেললেন।

আহা-হা, কাঁদছেন কেন ? মিছিমিছি জ্যাঠামশাই—

পরেশবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, মিছিমিছি নয় বাবা, সব জায়গায় খোঁজ করেছি, হাসপাতালগুলোতে নিজে গিয়েছি, যদি পথেঘাটে কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে থাকে ! তারপর লালবাজারে গিয়ে মিসিং স্কোয়াডে সব লিখিয়ে দিয়ে এসেছি—প্রায় সব থানাগুলো মোটামুটি দেখেছি ট্যাক্সি করে ঘুরে ঘুরে, কিন্তু কেউ কোন সন্ধান দিতে পারেনি। কোথায় যাই কি করি এখন, বলো বাবা তোমরা।

রবি বলে, আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে না। আমরা রইছি কি জন্যে ?

পট্‌লা বললে, কিছু ভাববেন না। আপনার মেয়ে যেরকম স্মার্ট, কেউ তার কিছু করতে পারবে না।

পরেশবাবু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেন, আমার তো সেই বিশ্বাস ছিল। যখন যেখানে খুশী যায় আসে, কখনো বারণ করিনি, জানি ভাবিনি কোনদিন ওর জন্যে বাবা। আজ তিনদিন ওর মা মুখে জল দেয়নি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে

গিয়েছে। সে-ই পাঠালে তোমাদের কাছে। বললে জ্যাঠামশাই বলে তোমায় তারা কত ভালবাসে, সবাই তোমার ছেলের মত—ওদের কাছে বলতে কোন লজ্জা নেই। তারপর একটু থেমে গলার স্বরটা আরো একটু নামিয়ে বললেন, লেকের জলের কথা আমার মনে ছিল না। তোমাদের জ্যাঠাইমা বলছেন সে সাঁতার জানে না, যদি জলে ডুবে গিয়ে থাকে—তোমরা কি একবার খুঁজে দেখবে জলটায়?

রবি ফিক্ করে হেসে বললে, নিজে জলে ডোববার মেয়ে আপনার নয়—বরং অন্যকে ডুবিয়ে মারবে। আমরা তো ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি। আপনার চেয়ে বেশী চিনি তাকে।

নিশ্চয়। তা তো চিনবেই বাবা। তোমরাই তো তাব আপনজন। সেই জন্যেই তো তোমাদের কাছে ছুটে এলুম বাবা। আমি তো সারাদিন অফিসে থাকি, আমার চেয়ে তোমরা তার অনেক বেশী খোঁজখবর রাখো।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই। আমাদের পাড়ার মেয়ে, আমাদের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিন। যাবে কোথায়?

তাই তো ভাবছি, গেল কোথায় বাবা?

রবি বলে, ওর মত স্মার্ট মর্ডান মেয়ের যাবার জায়গার অভাব কি কলকাতা শহরে? আপনি দেখেছেন অনেক জায়গায়, কিন্তু আসল জায়গাগুলো খোঁজ করেননি!

তোমরা তাহলে তাড়াতাড়ি সে জায়গাগুলোতে একটু খোঁজ নাও বাবা। বলে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে গুঁজে দিলেন পট্লার হাতে,—তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যেন মনে বল ফিরে পাচ্ছি···

পট্লা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, কিন্তু আমরা যে একেবারে বল পাচ্ছি না জ্যাঠামশাই—এই পঞ্চাশ টাকায় কি হবে?

আচ্ছা এই নাও, আরো পঞ্চাশ। এবার কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, মেয়েটা যে প্রাণে বেঁচে আছে, মরেনি—এই খবরটা আমায় আগে এনে দাও বাবারা।

বলে পট্লার হাতটা দু'হাতে যেই জড়িয়ে ধরলেন অমনি সে বলে উঠলো, তার আগে আমাদের প্রাণে বাঁচান জ্যাঠামশাই, ও একশোতে কিছু হবে না, আরো একশো আগে ছাড়ুন। তারপর খবর আনার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুশো চাই—তখন যেন না বলবেন না, আগেই বলে রাখছি কিন্তু···

এই পট্লা, থাম্। রবি বলে, জ্যাঠামশাইকে তুই কতটুকু চিনিস্ ব্যাটা! দুদিনের যোগী, ছিলি তো বেলেঘাটার খালধারে, পাঁচ-ছ'বছর হলো এখানে এসেছিস। আর আমরা যে ছেলেবেলা থেকে এই পাড়ায় মানুষ। জ্যাঠামশাই যখন বলেছেন দেবেন তখন মরদ কী বাত হাতীকে লাথ! হ্যাঁ, দিয়ে দিন তো আর একশো টাকা—অবশ্য পট্লা যা বলেছে, সত্যি। এখনি চারখানা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চারজনে চারদিকে ছুটবো। কলকাতা শহরটাতো ছোট নয়, জানেন! সবই তো ট্যাক্সি-ভাড়াতেই চলে যাবে। অবশ্য আমাদের পাড়ার মেয়ে, আমাদেরও

একটা প্রেসটিজ আছে। যেমন করে হোক খ‍ুঁজে আনতেই হবে।

অগত্যা আরো একশো টাকা ভেতরে ফতুয়ার পকেট থেকে মানিব্যাগ খ‍ুলে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, দেখো বাবারা, একথা যেন পাঁচ কান করো না—ওর বিয়ের সম্বন্ধ এক জায়গায় প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছে।

রবি, পটলা, ফটকে একসঙ্গে বলে উঠলো, পাগল হয়েছেন, আমাদের পাড়ার মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তো আমাদের তো ম‍ুখে কালি পড়বে!

হ্যাঁ বাবা, তোমাদের একেবারে ছেলের মতন ভালবাসি, তাই আর কাউকে কিছ‍ু না বলে ছ‍ুটে এল‍ুম তোমাদের কাছে।

ফটকে বলে ওঠে, যত তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয় ততই ভালো—ল‍ুচি সন্দেশ খাওয়া যাবে পেটভরে। আমাদের জনকল্যাণ ক্লাবের সবাইকে কিন্তু বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে হবে।

থাম্ ব্যাটা ফটকে। আগে যার বিয়ে তার খোঁজ কর্।

পটলা বলে, যান আপনি—চলে যান বাড়ীতে জ্যাঠামশাই। কিছ‍ু চিন্তা করবেন না, আমরা আর এক মিনিট সময় নষ্ট করবো না।

পরেশবাব‍ু চলে গেলে ওরা চারজনে একটা ট্যাক্সিতে চেপে একেবারে পার্ক স্ট্রীটে এসে নামলো। তারপর চারজনে আলাদা ভাবে এক-একটা হোটেলে গিয়ে ঢ‍ুকলো চা খেতে। প্রথমবার চারজনেই ব্যর্থ হলো। আবার অপর চারটে হোটেলে গিয়ে একই ভাবে চা খেতে বসে যায়। এই সময় রবি স্কাইলার্ক রেস্তোরাঁয় কফির পেয়ালায় চুম‍ুক দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে হাসির শব্দে। হ্যাঁ, একেবারে সেই ক্ষেন্তির কণ্ঠস্বর। বহ‍ু পরিচিত। রেস্তোরাঁর ভেতরের অস্পষ্ট আলোতে কার‍ুর ম‍ুখ চেনা যায় না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ল‍ুকোবে কেমন করে!

তাই তাড়াতাড়ি বিলটা চুকিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে আগেই পটলা ও ফটকেরা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। রবি বলে, ধরেছি, কিন্তু জালে মাছ পড়লেই তাকে ডাঙায় তোলা যায় না। জাল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়, মনে রাখিস।

তুই কিন্তু দ‍ুশো টাকা আগে হাতাবি, তারপর এখানে আনবি মনে রাখিস। রবি লাফাতে লাফাতে তাদের কাছে এসে দাঁড়াতেই পটলা বললে, কি রে ব্যাটা, এত স্ফ‍ূর্তি যে!

হ্যাঁ, একেবারে যাকে বলে কট্ রেড-হ্যাণ্ডেড্—হাতে হাতে ধরেছি! কিন্তু আর এক ম‍ুহ‍ূর্ত দেরি নয়। পটলা, তুই ট্যাক্সি নিয়ে ছ‍ুটে যা—জ্যাঠামশাইকে বল, পেয়েছি। এবং সঙ্গে করে তাঁকে নিয়ে চলে আয়। এক ম‍ুহ‍ূর্ত দেরি করিসনি। ইতিমধ্যে যদি কেটে পড়ে এখান থেকে, তাহলে, আমাদের সব ক্রেডিট্ ফিউজ হয়ে যাবে। আমরা তিনজনে এখানে কড়া পাহারায় রইলাম। আড়ালে ল‍ুকিয়ে থাকবো।

পটলা বললে, খ‍ুব হ‍ুঁশিয়ার শালা।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন পরেশবাবু। ট্যাক্সি-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পটলাকে বলেন, কৈ, আমার মেয়ে কৈ—দেখতে পাচ্ছি না তো? তাঁর গলায় কান্নার সুর। পট্‌লা দূর থেকে তার তিনজন বন্ধুকে দেখিয়ে বললে, যাতে পালাতে না পারে ওরা তিনজন পাহারা দিচ্ছে। আপনি ওই দরজাটার কাছে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন—বেরুলেই তাকে চেপে ধরবেন। আমাদের কোন নামগন্ধ করবেন না। বলবেন পুলিসের কাছে খবর পেয়ে এসেছেন, কেমন? আপনাকে দেখে যদি পালিয়ে যায় আমাদের কিন্তু কোন দোষ নেই!

না,—বলে দুশো টাকা ওদের হাতে গুনে দিয়ে পরেশবাবু স্কাইলার্ক রেস্তোরাঁর দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই ক্ষৌন্তির কাঁধে হাত রেখে একটি যুবক পাইপ মুখে দিয়ে হোটেলের দরজা থেকে রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করলে পরেশবাবু ছুটে গিয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন, মা ক্ষৌন্তি, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

খিঁচিয়ে ওঠে ক্ষৌন্তি, কেন, তোমরা কি ভেবেছিলে মরে গেছি?

হ্যাঁ। তিনদিন তোর কোন খোঁজখবর নেই। থানা-পুলিস, হাসপাতাল সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কেউ তোর সন্ধান দিতে পারেনি। তাই তোর মা কেঁদে কেঁদে তিনদিন মুখে জল দেয়নি। এই শহরের বুকে নিত্য কত খুন-জখম হচ্ছে, ভাবনা কি হয় না মা-বাপের?

চুপ করো। ধমক দেয় ক্ষৌন্তি, আমি কি কচি খুকি! কতদিন বারণ করেছি, আমার সম্বন্ধে তোমরা একেবারে ভাববে না। কিন্তু তোমরা এত আন্‌কালচারড্ যে লোকের কাছে পরিচয় দিতে ঘেন্না করে! আমার খোঁজে এখানে আসতে তোমাকে কে বলেছিল? যত সব রাবিশ!

অল্প দূরে সেই সুদর্শন যুবকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিল। ক্ষৌন্তি বাবার কাছ থেকে সেখানে যেতে যুবকটি মাতালের জড়িত স্বরে বললে, মঞ্জু (ক্ষৌন্তির ভাল নাম), কে ওই লোকটা? নন্‌সেন্স্! ভদ্দরলোকের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে জানে না? আচ্ছা বায় বায়। বলে হাত নেড়ে সামনে যে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল তাতে উঠে বসলো।

গাড়ীটা চলে যেতে ক্ষৌন্তি তার বাবাকে এসে বলে, জানো ও কে? কত বড় ঘরের ছেলে? কাঁটাপুকুরের জমিদার গোবিন্দলাল তালুকদারের ছেলে অজয় তালুকদার। কাল ভোরের প্লেনে বিলেতে যাচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। আমার বন্ধুর দাদা। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল সেদিন ওদের সঙ্গে, তাই ওদের বাড়ীতে আমায় জোর করে নিয়ে গেল। অজয়দা চলে যাচ্ছে, কতদিন আর দেখা হবে না!

বাড়ীতে ফিরে যেতে মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বেশ তো গিয়েছিলি, একটা খবর কি দেওয়া যেত না? তাহলে তোর বাপের প্রাণটা ছুটোছুটি করে

কাটতো না! একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল।

কেন খরচ করলে? আমি কি কচি খুকি? ছেলেবেলা থেকে আধুনিক করার এত সাধ! কো-এড্ স্কুল-কলেজে পড়িয়েছো, কাটাকুটি জামাকাপড় পরিয়েছো! শুধু বাইরেটা মর্ডান করেছো কিন্তু তোমাদের মনটা এখনো পড়ে আছে সেই ঠাকুমা-দিদিমার আমলে! এত আন্‌কালচারর্ড যে তোমরা জানতুম না!

॥ ১৭ ॥

মলীর বিয়ে হয়েছিল দিল্লীতে। এক বছরের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে সে কানাডায় চলে যায়। তার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার, সেখানে ভাল চাকরি করে যেমন প্রচুর উপার্জন করে, মলীও তেমনি কি একটা চাকরি করে অনেক টাকা রোজগার করে। স্বামী-স্ত্রীতে বেশ মনের সুখে আছে।

মাঝে মাঝে ওরা পনেরো-কুড়ি দিনের ছুটিতে ইণ্ডিয়াতে আসে। কিছুদিন শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে থেকে তারপর মলী আসে কলকাতায়। মার কাছে কিছুদিন থেকে বেশ কিছু 'মার্কেটিং' কলকাতা থেকে করে নিয়ে যায় কানাডায়। বিশেষ করে ফ্যাশানেবল্ তাঁতের শাড়ী ও সুতীর জামা-কাপড় কয়েকটা কিনবে বলে সেদিন গিয়েছিল ছোট বোনকে সঙ্গে করে গড়িয়াহাট্ মার্কেটে। বোধ হয় ছ'বছর পরে আবার গড়িয়াহাটায় মার্কেট করতে এলো! কি ভাল লাগছিল তার সুন্দর দোকানগুলো দেখে! ওমা, ভাল ভাল সব জামাকাপড়ের দোকান হয়েছে এদিকে! আগে তো বাটার এই জুতোর দোকানের পর তেমন কোন ভাল কাপড়-জামার দোকান ছিল না?

ছোট বোন উচ্ছ্বাস করে বলে, এখানে কি দেখছো, একেবারে ওই গোলপার্ক পর্যন্ত সারি সারি কত নতুন নতুন দোকান হয়েছে, দেখবে চলো!

বলে দিদিকে নিয়ে সেই দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে, হঠাৎ মলী চমকে ওঠে শিক্ষিত বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের তেলেভাজার দোকান এক জায়গায় লেখা দেখে! দু'পা এগিয়ে যেতেই দু'তিনজন প্যাণ্ট-বুশসার্ট পরা যুবক বলে ওঠে, এই যে দিদি আসুন—কি চাই, চপ্ কাটলেট্? আসুন, চলে যাবেন না! আমরা কয়েকজন বেকার ইঞ্জিনীয়ার এই দোকানটা করেছি বেকার বসে না থেকে। আপনারা যদি হেল্প্ না করেন, তাহলে আমরা যাই কোথায়?

মলী ভুলে গেছে অনেককাল তেলেভাজার স্বাদ। ওঃ, আগে এই গড়িয়াহাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে কত ফুচ্‌কা, চানাচুর, আইসক্রীম খেয়েছে!

সেসব দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বলে, আচ্ছা দিন দু'টো চপ আর দু'টো কাট্‌লেট!

দু' জায়গায় দিই?

হাঁ। বলতে একটা মলীর হাতে আর একটা তার বোনের হাতে দিলে।

কত দাম? বলে মলী কাঁধের ব্যাগটা খুলে টাকা বার করতে গেলে যুবকটি বললে, পাঁচ টাকা।

মলীর বোন বললে, সে কি, এই টুকুটুকু চপ্-কাটলেটের এত দাম? না না দিদি, নিসনি!

যুবকটি বললে, দু'টোই মাংসের। চপ্‌টা এক টাকা আর কাট্‌লেট দেড় টাকা। বেশী নয় তো!

কি বলছেন, বেশী নয়? আমাদের রেস্টুরেণ্টে যে এর অর্ধেক দাম! না চাই না, দিদি, ফেরত দে।

নরম সুরে যুবকটি বলে, দোকানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করবেন না দিদি। আমরা তো নিজে হাতে তৈরী করতে জানি না, অন্যকে দিয়ে করাতে হয়। তাদের মজুরী দিয়ে আর কতটুকু লাভ থাকে!

মলী বোনকে বলে, নিয়ে নে।

এই বলে ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে যুবকটির হাতে দিতে গিয়ে বললে, আপনারা সব ইঞ্জিনীয়ার হয়ে, কোন ইঞ্জিনীয়ারিং গুড্‌স্ বিক্রী না করে হঠাৎ একেবারে চপ্-কাট্‌লেট্-এর দোকান করলেন কেন?

দিদি, এইটেই লোক বেশী কিনে খায়, তাই। পেট চালাতে হবে তো কোন রকমে! আচ্ছা নমস্কার, আবার আসবেন দিদি—বেকারদের হেল্‌প্ আপনারা না করলে কে করবে?

খেতে খেতে ওরা দুই বোনে এগিয়ে যায়। মলী বলে, হ্যাঁ রে, এরা সত্যি সত্যি ইঞ্জিনীয়ার—না ওই বলে মানুষের সহানুভূতি জাগিয়ে, সেণ্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে বেচে দু'টো পয়সা কামিয়ে নিতে চায়?

না দিদি, এখন আমাদের এখানে বহু ইঞ্জিনীয়ার এইরকম বেকার খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি।

মলী বলে, বলিস্ কি রে! এ যে ভাবতে পারা যায় না। এত টাকা বাপ-মার খরচ করে, এত লেখাপড়া শিখে এই পরিণতি! তুই যাই বলিস্, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

মলীর বোন বলে, দিদি, তুই এসেছিস 'ডলার'-এর রাজত্ব থেকে, তার ওপর দুজনেই চাকরি করিস—তোরা বুঝতে পারবি না এখানে বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে কিভাবে বেড়ে চলেছে! এই বলে কাটলেটে একটা কামড় দিয়ে বলে, বড় মামা কি বলে জানিস্, ওরা তো লেখাপড়া শেখেনি—টুকে পাস করেছে ছোরা দেখিয়ে, স্ত্রী বিধবা হবে বলে পরীক্ষকদের চিঠি লিখে ভয় দেখিয়ে পাস করেছে। এদের উচিত শাস্তিই হয়েছে।

ওদের জন্যে মলীর বুক সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। আহা, এই ছেলেগুলোকে যদি কানাডায় নিয়ে যাওয়া যেতো!

আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডি. সি. এম-এর কাপড়ের দোকানে ঢুকতে যাবে, দেখে একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে যাচ্ছে অমিয়। এই অমি? অমি? বলে চেঁচিয়ে ওঠে মলী তাকে দেখে। ও যখন ডাক্তারী পড়তে ঢোকে, তখন এই লেকের ধারে দিনের পর দিন কত আড্ডা মেরেছিল ওর সঙ্গে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমিয়। তারপর মলীর কাছে এগিয়ে এসে বলে, আরে মলীদি, তুমি! তাই তো বলি, এ নাম ধরে কে আমায় ডাকে!

হঁ্যা, তুই বুঝি তাই হন্‌হন্‌ করে চলে যাচ্ছিলিস্‌?

মাইরি মলীদি, তোমায় চিনতে পারিনি! কী সুন্দর তোমার চেহারা হয়েছে, কি বলবো! তারপর কবে এলে কানাডা থেকে শুনি?

দিল্লীতে এসেছি পনেরো দিন আগে, এখানে মায়ের কাছে এসেছি শনিবার, শুক্রবারের ফ্লাইটে দিল্লী ফিরে যাবো। সেখান থেকে রবিবার সন্ধ্যার ফ্লাইটে কানাডা। তুই তো ভুলেই গেছিস্‌! আমি সেখান থেকে ভাবি, এতদিনে তুই ডাক্তারী পাস করে কলকাতায় প্র্যাকটিস্‌ জমিয়েছিস্‌। গাড়ী কিনেছিস। সত্যি, তোকে এভাবে হাঁটতে দেখবো ভাবিনি!

অমিয় বলে, গাড়ী যদি থাকতো, তাহলে কি তোমার সঙ্গে এইভাবে দেখা হতো?

সত্যি সত্যি, কোথায় প্র্যাকটিস্‌ করছিস্‌ এখন!

কোথাও নয়। এই তো দেখছো হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছি।

কোথায় যাচ্ছ?

ওষুধের দোকানে। ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করতে।

কেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সেটা আর শুনতে চেয়ো না—থাক!

না না, সত্যি বল্‌ না!

এই ঝোলানো ব্যাগটা দেখে বুঝতে পারছো না?

না ভাই, সত্যি পারছি না। প্র্যাকটিস্‌ করছিস তো!

মুচকি হেসে অমিয় বলে, হঁ্যা করছি, তবে ক্যানভাসিং-এর প্র্যাকটিস্‌!

তার মানে?

তার মানে আর কি মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ্‌। একটা বড় ওষুধ-কোম্পানীর ওষুধ নিয়ে ক্যানভাস করি ডাক্তারদের দোরে দোরে।

সে কি! চমকে ওঠে মলী, তার চেয়ে প্র্যাকটিস করলি না কেন?

অমিয় বলে, বাবা, এই কলকাতার শহরে প্র্যাকটিস্‌ জমানো কি সোজা কথা! এ কি তোমার কানাডা পেয়েছো? কত ডাক্তার যে ঘরের ভাড়া দিতে পারে না, তার খবর কে রাখে!

কিন্তু আমাদের গলিতে নতুন পাস করা এক ডাক্তার এসে বসেছে—কি তার

প্র্যাকটিস্‌। দিনেরাতে খাবার সময় নেই। মা বলেন, আমাদের পুরনো হরিহর ডাক্তারের আর পসার হয় না। এখন নাকি তিনি গুরু, ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন।

সবাইয়ের ভাগ্য তো সমান নয়, কি করবো বলো! থাক ওকথা। তারপর তোমার সব খবর কি বলো? ছেলেমেয়ে ক'টি?

ধ্যেৎ অসভ্য! একটাও নয়। বলে একটু মুচকি হেসে, তারপর অমিয়কে বলে, বিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস?

নিশ্চয় না। কারণ নিজেই যেখানে খেতে পাই না, সেখানে আর একজনকে খাওয়াবো কি?

এবার হেসে ফেলে মলী। মাইরি অমিয়, তোর কথা শুনে হাসি পাচ্ছে! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরুতে তর সয় না—মেয়ের বাপেরা এসে ছেঁকে ধরে ডাক্তারদের, চিরদিন তো এই দেখে এসেছি।

অমিয় বলে, চিরদিনের সঙ্গে আজকের দিনের যে অনেক ফারাক হয়ে গেছে! তা তুমি ডলারের রাজত্বে বাস করে বুঝবে না আমাদের সে দুঃখ! চুপ করে রইলে যে?

সত্যি, আমি তোর হাতে ক্যানভাসিংয়ের ব্যাগ দেখে অবাক হচ্ছি, মুখে যেন আর কথা আসছে না। এই একটু আগে দেখে এলুম, বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের তেলেভাজার দোকান! সত্যি হলো কি দেশটার—ভাবতে গেলে চোখে জল এসে পড়ে···

আচ্ছা চলি এখন, মলীদি। বলেই দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ওই অবস্থায় মনটা যখন ভারাক্রান্ত, একজন ভদ্রলোক ওর সামনে এসে বললে, ধূপ—ধূপ চাই দিদিমণি—খাঁটি চন্দন ধূপ! দেব একটা দিদিমণি?

না, চাই না। বলে মলী মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই ধূপওয়ালা বলে ওঠে, একটা অন্তত নিয়ে গরীবকে হেলপ্‌ করুন! আমি বেকার আজ তিন বছর, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি কষ্টে যে দিন কাটাচ্ছি কি বলবো!

বেকার কেন? দিব্যি জোয়ান মানুষ!

কি করবো, যে কারখানায় কাজ করতুম লক্‌ আউট্‌ হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে না আপনারা করিয়েছেন! যে দেশে এত দারিদ্র্য, এত বেকার সমস্যা—সেখানে স্ট্রাইক্‌ আর স্ট্রাইক্‌, আপনারা ভাবেন কি করে! এইভাবে ভিক্ষে করার চেয়েও সে কি সম্মানের ছিল না? না হয় কিছু কম পেতেন?

আচ্ছা দিন দুটো ধূপ। বলে মলী দুটো টাকা তার হাতে ব্যাগ থেকে বার করে দিয়ে বলে, আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, এটুকু বোঝেন না কেন, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে খাবেন কি? কে খাওয়াবে? আমি বিদেশে থাকি, সেখানের কাগজে আমাদের দেশের শ্রমিকরা কি করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে—বড় বড় ছবি দিয়ে সেকথা লেখে!

ধুপওয়ালা বলেন, দেখুন কিছু মনে করবেন না—সে দেশের শ্রমিকরা যে টাকা পায়, আমরা এদেশে সে তুলনায় কতটুকু পাই!

মলী বলে, আমার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার, তাই কেউ আমার চেয়ে বেশী এ খবর জানে না। আপনি যেমন বলছেন, তারা কত বেশী মজুরী পায়—ঠিকই, কিন্তু তারা সে তুলনায় কত বেশী পরিশ্রম করে, তা এখানের শ্রমিকরা কল্পনাও করতে পারে না। আমার বিশ্বাস আপনারা যদি সেই পরিমাণ কাজ করতেন, তাহলে আপনাদের মালিকরাও হাসিমুখে দিতে পারতো আরো। আমার নিজের খুড়শ্বশুরের একটা কারখানা ছিল এখানে, শ্রমিকদের তিন মাসের বোনাস দিয়েও খুশি করতে পারেন নি। আরো আরো চায়। শেষে মালিককে জব্দ করার এক নতুন পন্থা বার করলে—"গো স্লো"। ব্যাস, তখন এখানকার কারখানা বন্ধ করে দিয়ে গুজরাটের দিকে গিয়ে নতুন করে কারখানা করেন। সেখানকার শ্রমিকরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কাজ করছে। তাদের তিনমাসের বোনাস্ দিয়ে কারখানা এত চালু হয়ে গেছে যে, বিদেশে প্রচুর মাল রপ্তানি করে এবং বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানি হয় সেখান থেকে।

সেখানকার মানুষরা বেশী পায় শুনেছেন, কিন্তু সেই সব ঠাণ্ডা দেশে এক-জোড়া জুতোর দাম যে পাঁচশো টাকা! একটা প্যাণ্ট বা জামা কিনতে যে হাজার টাকা বেরিয়ে যায়—সে খবর তো রাখেন না! তার ওপর আছে খাদ্য-খাবার। সেসব জিনিসের দাম শুনলে চমকে উঠবেন আপনারা। একটা শ্রমিকের উপার্জনের সঙ্গে তার খরচাটা যে কত তা মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, আপনারা এখানে তাদের তুলনায় খুব কম পান না!

এই বলে একটু থেমে মলী বলে, আপনারা পরের কথায় যখন নেচে ওঠেন, ভুলে যান নিজেদের সংসারের কথা কি করে? অথচ যারা আপনাদের এইসব মন্ত্রণা দেন, তাদের ঘরে গিয়ে দেখে আসুন তারা কিভাবে বাস করছে! আমার তাই দুঃখ হয় আপনাদের জন্যে, যে দেশ সবে দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই দেশের অভাব-দারিদ্র্য দূর করার জন্যে যারা বড় বড় কলকারখানা তৈরী করে হাজার হাজার লোকের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছিলেন, তাদের সেই প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়ে কতটুকু লাভ হচ্ছে আপনাদের! বিদেশে এই দেশের তৈরী মাল যখন উচ্চ মর্যাদা লাভ করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছিল, তখন মালিকের পেট ভরাচ্ছেন মনে করে নিজেরা উপোস করে মরছেন। একবারও ভেবে দেখলেন না, মালিকের পেট আগে ভরলে তবে তো আপনাদের দেবে! নিজে উপবাসী থেকে কে অপরকে দেয়!

একটু থেমে মলী বলে, আপনাকে আমি জ্ঞান দিতে আসিনি। আমি যখন বিদেশে বসে আমার দেশের লোকের এই মুর্খতার কথা ভাবি তখন বড় কষ্ট হয়। মনে হয় ছুটে এসে এখানকার শ্রমিকদের সব বুঝিয়ে বলি, কত সুখে-স্বচ্ছন্দে সেদেশের শ্রমিকরা বাস করছে। সেখানে মালিক শ্রমিকে

মিলেমিশে কাজ করে, আর আপনারা এখানে কি করছেন? কোথায় এই শিশুরাষ্ট্র, বলতে গেলে যার আয়ু মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর, তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে তার অকালমৃত্যু ডেকে আনছেন। আপনি নিজে শ্রমিক ছিলেন একদিন, আর এখন কেমন আছেন নিজে ভুক্তভোগী—তুলনা করলে বুঝতে পারবেন। তাই আপনার কাছে মনের দুঃখে এত কথা বললুম বলে মনে কিছু করবেন না। আপনাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য চোখে দেখে বুকের ভেতরটা যে কেমন করে তা মুখে বলে বোঝাতে পারবো না।

মলীর ছোট বোন এবার তার হাতটা টেনে বলে, দিদি চল্, বড্ড দেরি হয়ে গেল। এর কাছে এত বকবক করে সময় নষ্ট করছিস কেন? এরা কি তোর কথা শুনবে? ওরা ভিক্ষে করবে সেও ভাল—চলে চল্!

বোনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে গড়িয়াহাট চৌমাথার কাছে যেমন এসেছে মলী, উঃ বলে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর গলায় হাত দিয়েই দেখে হারটা নেই! একটা প্যাণ্ট বুশসার্ট পরা ছোকরা ছুটতে ছুটতে তার পাশ দিয়ে ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেল।

চোর! চোর! আমার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে ওই যে পালাচ্ছে! বলে চেঁচিয়ে উঠে ওরা দুই বোনে একসঙ্গে, ওই যে পালাচ্ছে—ঐ দিকে গেল—পুলিস, পুলিস পাকড়াও!

পুলিসটা সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কাছে আসতে মলী বলে উঠলো, তোমার সামনে দিয়ে পালালো, আর তুমি ধরতে পারলে না? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো?

পুলিস বলে, আমি তো দেখিনি লোকটাকে!

কেন, চোখ বুজিয়ে ছিলে নাকি?

আমার ডিউটি করছিলুম। চোর ধরা তো আমার কাজ নয়।

ততক্ষণে ভিড় ভিড়। চারিদিক থেকে ওদের দুই বোনকে নানা প্রশ্ন—কোন্ দিকে পালালো? কেমন দেখতে? ছোকরা না বুড়ো লোক? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওরই মধ্যে একজন বলে উঠলেন, যান থানায় গিয়ে এখুনি একটা ডাইরি করে দিয়ে আসুন। যদি ধরা পড়ে আপনার জিনিসটা পেয়ে যাবেন।

হেসে ওঠে অনেকে।

রোজ এমনি ছিন্তাই কত হচ্ছে, ক'টা ধরা পড়েছে এ পর্যন্ত শুনেছেন! শুধু ওঁর যাতায়াতের পরিশ্রমটাই সার হবে।

একজন প্রশ্ন করে, কত ভরির ছিল?

মলী বলে, সাড়ে তিন ভরির।

এ্যাঁ! আজকাল কেউ রাস্তায় এতখানি সোনা গলায় দিয়ে বেরোয়? আপনি কি জানেন না?

মলী বলে, আমি কানাডায় থাকি, সবে দু'দিন হলো এসেছি।

বাড়ীর লোকেরা কেউ নিষেধ করেনি?

একজন বলে ওঠে রসিকতা করে, আমেরিকার পয়সা—ওরকম দশটা হার গেলেও ওদের গায়ে লাগে না, বাদ দাও। চলো, চলো। বরং গরীব-দুঃখীরা দু'দিন খেয়ে বাঁচবে। যাদের অনেক আছে, তাদের কাছে চাইলে তো দেবে না—বেশ হয়েছে !

এইরকম নানা মন্তব্য কানে শুনতে শুনতে ওরা তখন দুই বোন বাড়ী ফিরে যায়।

॥ ১৮ ॥

পরদিন সকালে খবরের কাগজ দেখে মলী চমকে ওঠে। মা, ছোট বোন, ভাই সকলকে ডেকে দেখায়, ওমা এই দেখো—কাল আমার হারটা ছিনতাই করে যে চোরটা পালাচ্ছিল সে নাকি দাগী। পাড়ার ছেলেরা তার পিছু ধাওয়া করে অবশেষে তাকে ধরে ফেলে। কিন্তু যে ছেলেটি তাকে ধরেছিল, চোরটি তার বুকে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করায়, তাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা নাকি তার সংকটজনক। ছেলেটির নাম রবি চৌধুরী।

খবর পেয়ে তখনি রবির মা কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলেন। রবি তখন অজ্ঞান হয়ে আছে। ডাক্তারবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় নেই, খুব জোর বেঁচে গিয়েছে। ছোরাটা আর একটু ভেতরে ঢুকে গেলে জীবন রক্ষা হতো না।

দু'দিন পরে একটু যেন সুস্থ বোধ হয় রবিকে।

তখন ওর মা ছেলের মাথার হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তুই কেন এই কাজ করতে গেলি বাবা ? জানিস তো ওদের কাছে অস্ত্র থাকে। যদি আরো কিছু থাকতো !

জড়ানো স্বরে রবি বলে, তাই বলে আমাদের পাড়ার বদনাম করে চলে যাবে আর চুপ করে তাই সহ্য করবো ? সে আমার দ্বারা হবে না মা।

তোর কি একলার পাড়া রে, আর কি কোন লোক নেই ? তোর কি সবতাতে মাথাব্যথা ! আর একটু হলে কি সর্বনাশটা হতো বল দেখি ? বলে চোখের জল মুছতে থাকেন।

আঃ, ফের তুমি ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছো ! চুপ করো, কি হতো তা ভেবে কি হবে ? বলি কেউ যদি না মাথা ঘামায়, তাহলে পাড়ায় যার যা ইচ্ছে তাই করবে আর তাই সহ্য করতে হবে ? সে প্রাণ থাকতে আমি পারবো না—তুমি যাই বলো !

তুই তো পাড়া পাড়া করে মরিস, কিন্তু পাড়ার কেউ তো তোকে ভাল বলে না, সেটাই আমার দুঃখ।

বয়ে গেল কে কি বললো, না বললো ! আমি থোড়াই কেয়ার করি ! তুমি শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করো না—ব্যস্, তাহলেই আমি খুশি।

বেশ তাই হবে। বলে তিনি চোখের জল মুছে নিলেন।

নার্স রুগীকে ওষুধ খাওয়াতে এসে চুপি চুপি তাঁকে বাইরে ডেকে বললে, একদম কথা বলবেন না ওর সঙ্গে। যাতে উত্তেজনা আসে মনে এমন কোন কিছু বলবেন না। খুব দুর্বল। ডাক্তার নিষেধ করেছেন কারুর সঙ্গে কথা কইতে। শুধু আপনি মা বলেই······

আচ্ছা, আমি আর একটা কথাও বলবো না। যতক্ষণ না ঘণ্টা পড়ে, আমি শুধু এখানে বসে থাকবো। বলতে বলতে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

পরের দিন দুপুর থেকে হঠাৎ রুগীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং সেই রাত্রেই রবির মৃত্যু হয়। সকাল হতেই হাসপাতালে পাড়ার ছোকরারা দল বেঁধে এসে ফুল দিয়ে খাট সাজিয়ে রবির মৃতদেহটাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে দক্ষিণ কলকাতা বালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে সন্ধ্যানাগাদ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে।

পরের শনিবার অপরাহ্নে রবির পরমবন্ধু ফটকে পটলা, কল্যাণ প্রভৃতির উদ্যোগে এক মহতী শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় স্কুল-প্রাঙ্গণে স্থানীয় জনসাধারণ ও বহু মান্যগণ্যর উপস্থিতিতে। শোকসভার সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত জনদরদী নেতা ও সমাজসেবী শ্রীমিহির বিশ্বাস।

সকলেই রবির গুণগান করে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার পর শেষে মাননীয় সভাপতি মশাই মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, বাংলার আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে গেল। শৌর্য, বীর্য ও সাহসিকতায় শ্রীমান রবির মত ছেলে খুব কম দেখা যায়। সে ছিল কেবল এই পল্লীর গৌরব নয়—সারা বাংলার গৌরব। সামান্য একটি হারের জন্য সে প্রাণ বিসর্জন দেয়নি—সেই হার যে গলা থেকে ছিনতাই হয়েছিল, সেই নারীজাতির ইজ্জত রক্ষার জন্য সে এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে ভয় পায়নি। সারা বাংলার ঘরে ঘরে যেদিন যুবকরা এই রবির মত আদর্শ গ্রহণ করবে মনেপ্রাণে, সেইদিন বাঙালী জাতির মানসম্ভ্রম ইজ্জত আবার ফিরে আসবে। রবিকে যেন আমরা না ভুলি। তার স্মৃতি যেন আমাদের ছাত্রদের জীবনে আদর্শ রূপে চিরস্থায়ী হয়। আর যে জননী রবির মত এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাঁরও জীবন ধন্য—তিনি রত্নগর্ভা। আদর্শ মাতারূপে বাঙালীর ঘরে ঘরে তিনি চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি তাঁকে আজ এই সভার সকলের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বলে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলে করতালিধ্বনিতে সভাস্থল কম্পিত হয়ে উঠলো। তারপর বিদায় সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হলো।

জটিলতা

পটলার যখন সাত বছর বয়স তখন আর কোথাও চাকরীর যোগাড় করিতে না পারিয়া অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়া শেষে এক স্যাকরার দোকানে ঢুকিল। খাওয়া-পরা আর এক পয়সা জলপানি, কাজ শিখিলে ভবিষ্যতে উন্নতির সুবর্ণময় সম্ভাবনা!

নীলমণি দত্তের লেন হইতে সরু যে গলিটী বাহির হইয়াছে, তাহা ধরিয়া বরাবর সোজা গিয়া, ডান হাতি বাঁকিয়া, বাম দিকের গলি ছাড়িয়া, উত্তরমুখে যাইয়া, পথটী যেখানে সহসা পূব দিকে শেষ হইয়াছে—সামনে একটী গ্যাসের আলো, তাহার পাশে ময়লা ফেলার দুর্গন্ধময় টব, ভন্‌ভন্‌ করিয়া মাছি উড়িতেছে; রক্তমাখা ন্যাকড়া, তুলা, মাছের আঁশ কাঁটা, আমের খোলা ও আঁটী ছড়ান, আধখানা ছেঁড়া কাপড় টবের গা হইতে ঝুলিয়া মাটীতে কাদায় লুটাইতেছে; একটা পুরাণ ভাঙ্গা বাড়ীর উপর হইতে ট্যাঙ্কের জল অনবরত পড়িয়া পড়িয়া সমস্ত গলিটী থৈ থৈ করিতেছে—ঠিক তাহারি সামনে একটা খোলার ঘরে এই স্যাকরার দোকান।

পটলা ঘর ঝাঁট দেয়, হাপর টানে, উনুনে কাঠ-কয়লা দেয়, বড় রেড়ীর তেলের পিদিমে তেল ঢালে, তুলা দিয়া মোটা সল্‌তে পাকায়, বাবুর জন্য তামাক সাজে ও বাবুর মেয়েকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন কুলে তার কেহ নাই। তাই সেই দোকান ঘরেই রাত্রে শুইয়া থাকে।

এইভাবে তাহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

পৃথিবীর নানা স্থানে ইতিমধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। পটলার বাবুদের খোলার ঘর ছিল ক্রমে একতলা হইয়া এখন দোতলায় দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু পটলার উন্নতি বলিতে হইয়াছে মাত্র এক পয়সার জলপানি ও আর একখানা কাপড়—বৎসরে দুইখানা কাপড় ছিল তাহার স্থলে তিনখানা এবং রোজ একপয়সা জলপানির পরিবর্ত্তে দুই পয়সা। যদিও সে এখন সোনা গালাইতে পারে, অলঙ্কার তৈরী করিতে পারে তবু ইহাতেই সে খুশি; অন্য কোন দাবী বা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন তাহার নিজের ত ছিল নাই-ই উপরন্তু তাহার নিকট চাহিবার মতও বুঝি এ সংসারে আর কেহ আপনজন জীবিত ছিল না। মনিবের সংসারকে নিজের মনে করিয়া পরম শান্তিতে তাই তাহার দিন কাটিতেছিল।

পল্লীগ্রামের ছেলে—কালো বলিষ্ঠ চেহারা, কোন কাজ বলিলে 'না' বলিতে জানে না। দিনরাত ভূতের মত খাটে, মনিবের মুখের কথা তাহার কাছে বেদ-বাক্য!

দোকানের মালিক শ্রীরাধাকান্ত কর্ম্মকার, ঢাকার একজন নামকরা কারিগর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের ওস্তাদ। বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া ঘাটের কুলে গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে কিন্তু এখনো চোখে চশমা না লাগাইয়া কাজ করিতে পারে।

সত্যাশ্রয়ী ও অমায়িক প্রকৃতির জন্য সে খরিদ্দারদের ভারী প্রিয়। তাই এই প্রতিযোগিতার বাজারেও লোকে তাহাকে ডাকিয়া কাজ দেয়।

ছেলেকে পাঠাইয়া রাধাকান্ত কাজ লইয়া আসে, নিজে আজকাল আর বড় বাহিরে যায় না। এমন ছিল না, বরাবর সে নিজেই খরিদ্দার বাড়ীতে যাইত, কিন্তু এখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রকান্ত তাহাকে কোথাও যাইতে দেয় না। তাহার বিশ্বাস, তাহার বাবা লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্ত সেকেলে ধরণের—আধুনিক শিক্ষিত সমাজে একেবারে অচল।

রুদ্রকান্ত একটু রাশভারী প্রকৃতির লোক, দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারী তাহাকে ভয় করিয়া চলে। কঠিন তাহার শাসন। কারো কাজে এতটুকু ত্রুটি বা অবহেলা সে সহ্য করিতে পারে না—গালাগালি দিয়া, মাহিনা কাটিয়া, কটু কথা কহিয়া তাহাদের শাস্তি দেয়। বয়স অল্প হইলেও দোকানের হিসাব নিকাশ হইতে শুরু করিয়া প্রতিটী কাজ তাহার নখদর্পণে—সে বাজার হইতে সোনা কেনে, খরিদ্দারের বাড়ী হইতে ঘুরিয়া কাজ লইয়া আসে, আবার কারিগরদের বুঝাইয়া দেয় প্রতিটী কাজ।

রাধাকান্ত পুত্রের কাজের উপর কোন কথা বলে না, সে যাহা করে তাহাই মানিয়া লয়। কোন বিশেষ কাজ, বেশী মজুরী পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তবে নিজে হাতে করে, নচেৎ বাড়ীর মধ্যেই বেশী সময় কাটায়।

পুজার সময় কাজ আসে খুব বেশী। রাত জাগিয়া, আলাদা করিগর লাগাইয়া বাপ ব্যাটায় সারাদিন খাটিয়াও সব শেষ করিয়া উঠিতে পারে না।

তখন রুদ্রকান্ত বাহিরে অনবরত ছুটোছুটি করে, আর তাহার বাবা ভিতরের কাজ কর্ম্ম দেখাশুনা করে। আহার নিদ্রা তাহারা ভুলিয়া যায়—শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ।

তিন দিন ধরিয়া দিনরাত নিজে হাতে কাজ করিয়া রাধাকান্ত একটী হার তৈয়ারী করিল। বড় লোকের বাড়ীর অর্ডার, জড়োয়া গহনা, বহু মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত। এখানের মুক্তা ওখানে বসাইয়া, ওখানের চুণি এখানে সরাইয়া, নিজের মনমত করিয়া রাধাকান্ত সেই হারটী সাজাইল।

আজকালকার বাবুদের অল্প সোনার কাজে, নিজের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখাইবার সে সুযোগ পায়না। কেহ তিন আনার সোনায় ছ'গাছা চুড়ির অর্ডার দেয়, ভিতরে তামা শুধু উপরে সোনার স্বল্পচাকচিক্য; কেহ বা দেড় ভরিতে গলার হার তৈরী করায়। শিক্ষিত সমাজের এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ ঠিক তার রুচিতে মেলেনা তাই এই ভারী অলংকারটী হাতে পাইয়া সে পছন্দমত করিয়া গড়িল এবং বহুদিন পরে নিজের কারিগরির পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদও বোধ করিল।

এই হারটী লইয়া রুদ্রকান্তই খরিদ্দারকে দিতে যাইবে, যেমন সব ক্ষেত্রে হয়, এবারও তেমনি স্থির ছিল। কিন্তু কাজেই অত্যন্ত চাপ পড়ায় রুদ্রকান্ত সেদিন যাইতে পারিল না তাহার বাবাকে সেখানে পাঠাইল।

অনেকটা পথ, তাই রাধাকান্তর একলা যাইতে কেমন মনে হইল, সঙ্গে পটলাকে লইল।

শরতকাল—প্রভাতের সোণালী আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। কত গলি ছাড়িয়া, কত ট্রাম লাইন পার হইয়া, তাহারা দু'জনে আসিয়া শেষে হাজির হইল একটী বিরাট বাড়ীর দরজায়। কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া গেল এবং তাহারা যাইয়া ভিতরে বসিল।

প্রকান্ড ঘর, দেওয়ালে বড় বড় 'অয়েল পেণ্টিং' টাঙান, মার্ব্বেলের মেঝের উপর সবুজ কাপড়ে ঢাকা কত শোফা কাউচ্ পাতা, দরজায় দরজায় নীল রংয়ের পর্দ্দা ঝুলিতেছে, মাথার উপর প্রকান্ড কাঁচের ঝাড় মৃদু হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। পটলা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, সমস্ত জিনিষই তাহার কাছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল, ইতিপূর্ব্বে সে কখনো এ রকম আধুনিক কায়দায় সাজান বড় লোকের বাড়ীতে ঢোকে নাই।

গিন্নীমা আসিয়া রাধাকান্তর নিকট হইতে হারটী লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন এবং এ পাথরটা এখানে না দিয়া ওখানে দিলে ভাল হইত. টিপকলটা এরকম না করিয়া ওরকম করিলে আলগা ভাবে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত এবং এখানকার সোনাটা এত ম্লান দেখাইতেছে কেন ইত্যাদি নানা প্রকার বাজে প্রশ্ন তুলিয়া গৃহিনীপণার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাধাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া এবং কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহারি কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তিনি অতি মিহি সুরে ডাকিলেন, ওরে ডালু তোর হার এসেছে, দেখবি আয়।

ডালু ওরফে ডালিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। নীল পর্দ্দাকে পিছনে রাখিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল। পটলার মনে হইল যেন নীলসরোবরে অকস্মাৎ একটী পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের পরিপূর্ণ রূপ তাহার দেহের কানায় কানায় উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। তাহার সদ্য বিকশিত ডালিয়া ফুলের মত মাতাল করা চাহনি, পিঠের উপর এলান ভিজা চুলের রাশ, অপ্রশস্ত ললাটে ছোট একটী সিন্দুরের টিপ, ফুলের পাপড়ির মত দুইখানি রক্তিম ওষ্ঠ, রাজহংসীর মত উন্নত অথচ শুভ্র ও নিটোল গ্রীবা,—তাহার নীচে হালফ্যাসানের সেমিজ, বুক ও পিঠের অর্দ্ধেকেরও বেশী উন্মুক্ত।

তাহার বুঝি লজ্জা নাই কিংবা লজ্জা করিবার মত পাত্র তাহার কাছে ইহারা নহে! ইহারাও যে মানুষ, ইহাদের দেহেও যে রক্তমাংস আছে তাহা চিন্তা করিতে বোধকরি ডালিয়ার মত ধনী নারীর রুচিতে বাধে—তাই অসঙ্কোচে তাহাদের সামনে সে বুকের আঁচল সরাইয়া গলার হার পড়তে লাগিল।

পটলা তরুণ যুবক—নারীর এত রূপ, এত যৌবন এর আগে সে কখনো দেখে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার মুখ চোখ দিয়া একটা আগুণের শিখা ছুটিতে লাগিল। সে যেন সকল ইন্দ্রিয় দিয়া শুষিয়া লইতে লাগিল ডালিয়ার দেহের সমস্ত রূপরাশি!

রাধাকান্তের যদিও বয়স হইয়াছে ষাটের কাছাকাছি এবং কেশের প্রায় অর্দ্ধেক সাদা হইয়া গিয়াছে তথাপি তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। সে ডালিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল তাহাদের পরিবারের যে যেখানে আছে সকলেরই কথা—কেহ ত এমন সুন্দর নহে! সবাই কুৎসিত, সবাই কালো, জঘন্য কালো, মুখে চোখে তাহাদের কোন শ্রী, কোন সম্পদ নাই; তাছাড়া যৌবনের এমন সমারোহ, এমন সুমধুর প্রকাশও সে ত আর কখনো কাহারো দেহে দেখে নাই। সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িল তাহার স্ত্রীর কথা; তারপর বাড়ীর অন্যান্য বৌ-ঝিদের কথা! ঘৃণায় বিরক্তিতে তাহাদের প্রতি তাহার মন যেন মুহূর্ত্তে কলুষিত হইয়া উঠিল। সে আবার চোখ তুলিয়া ডালিয়ার দিকে চাহিল।

নিটোল রক্তাভ বক্ষের সমস্ত নগ্ন অংশটুকু জুড়িয়া সেই হারটী ঝলমল করিতেছিল। কে বেশী সুন্দর? অসংখ্য হীরামুক্তা খচিত হারটী না ডালিয়ার সুন্দর মুখ? রাধাকান্ত ঠিক করিতে পারিতেছিল না তাই সেই দিকে চাহিয়া কেবলই তাহার মনে হইতেছিল এ হার তাহার গলায় ছাড়া যেন অন্য কোথায়ও মানায় না; হারের জীবন ধন্য, আর ধন্য তাহার মত শিল্পী! বাস্তবিক সেইক্ষণে রাধাকান্তের মনে হইল তাহার জীবনও এতদিনে সার্থক হইল।

এমন সময় হাত দু'টী উঁচু করিয়া পিছনের দিকে তুলিয়া ডালিয়া আসিয়া দাঁড়াইল রাধাকান্তের সামনে এবং ঈষৎ অভিযোগের সুরে বলিল, দেখুন ত কর্ম্মকার মশায়, টিপকলটা কি রকম শক্ত, কিছুতেই দেওয়া যাচ্ছে না।

রাধাকান্তর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল; সে চেয়ারে বসিয়াছিল, মন্ত্রাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। এবং ডালিয়ার হাত হইতে হারের প্রান্তটুকু লইয়া আঁটিতে লাগিল। খোলা পিঠের মসৃণ ত্বকের উপর দিয়া যে সরু রোমশোভিত লাইনটী ঘাড় হইতে নামিয়া সোজা সেমিজের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া পটলা হাঁ করিয়া কি যেন গিলিতেছিল। মনিবের পাশে গিয়া সেও দাঁড়াইয়াছিল নিঃশব্দে।

ডালিয়া হাসিয়া বলিল, হয়েছে? আপনি নিজে তৈরী করেছেন তবুও ফিট্ করতে এত সময় লাগছে কেন?

একটু অপ্রস্তুত হইয়া, সে বলিল, না হয়ে গেছে, নতুন কিনা একটু 'টাইট' হচ্ছে, সেইজন্য। এই বলিয়া রাধাকান্ত আবার নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

হাসিতে হাসিতে চঞ্চল চরণে তখন ডালিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পটলা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সেই অপসৃয়মান মূর্ত্তির দিকে। তাহার

মনে হইতে লাগিল তখনো সে হাসির মৃদু গুঞ্জরণ যেন ঘরের কোণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

নিজের ঘরে গিয়া, বিরাট আয়নার সামনে ডালিয়া দাঁড়াইল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিতে লাগিল সেই হারটী গলায় কেমন মানাইয়াছে।

কয়েক মিনিট পরে আবার সে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, না স্যাকরা মশায়, এ লাল পাথর দেওয়া ফুলটা এখানে ভাল দেখাচ্ছে না, এটাকে এখান থেকে তুলে দেবেন, আর আরো ভাল পালিশ ক'রে কাল নিয়ে আসবেন—নিন্, এখন খুলুন। এই বলিয়া তাহার দিকে আবার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাধাকান্ত আবার উঠিয়া হারটী তাহার গলা হইতে খুলিয়া লইল।

তারপর যথারীতি নমস্কার সারিয়া দু'জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিল।

দুইজনেই নিস্তব্ধ! কাহারো মুখে কোন কথা নাই। পট্‌লা আগে আগে চলিয়াছে আর তাহার পশ্চাতে রাধাকান্ত। একজন তরুণ যুবক—প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। আর একজন প্রায় বৃদ্ধ—সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মপ্রাণ।

কিছুদূর যাইয়া সহসা রাধাকান্ত পটলাকে ডাকিল।

পটলা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া, দাঁড়াইল। রাধাকান্ত বাক্সটী তাহার হাতে দিয়া বলিল, তুই ততক্ষণ এগিয়ে যা, আমি আর একজন খরিদ্দারের বাড়ী হ'য়ে যাচ্ছি—খুব সাবধানে কিন্তু বাক্সটা রাখিস?

যে আজ্ঞে, বলিয়া পট্‌লা মনিবের এই সুবুদ্ধির জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই বাক্সটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল এবং জামার বোতাম লাগাইয়া দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন যেন আনন্দের তুফান বহিতেছিল।

কিছুদূর যাইয়া একটী নির্জন পার্কের মধ্যে পটলা ঢুকিল। তাহার ইচ্ছা, একবার সেই হারটী হাতে করিয়া স্পর্শ করিবে। একটী গাছের ছায়ায় বসিয়া সযত্নে সে বাক্সটী বাহির করিল কিন্তু বাক্সটী খুলিতেই সে চমকিয়া উঠিল। একি! হার কোথায় গেল! আশে পাশে, ঘাসের মধ্যে, বেঞ্চের উপরে, জামার ভিতরে, কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে তন্ন তন্ন করিয়া সে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু হায় সে আর তার কোন সন্ধানই পাইল না। তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া গেল। কি করিবে? কোথায় যাইলে খুঁজিয়া পাইবে? কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না। শুধু বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া সে সেখানে বসিয়া রহিল।

এদিকে রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিল তখনো পটলা আসে নাই। ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল তবুও পটলার কোন খোঁজ নাই। সকলেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া রুদ্রকান্ত, সে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল, শালা পালিয়েছে। তারপর আর একমুহূর্ত্তও দেরী না করিয়া পুলিশে খবর দিল।

বৈকাল নাগাত পুলিশের হাতে পটলা ধরা পড়িল। তখনো তাহার কাছে সেই বাক্সটী রহিয়াছে। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখিল।

তিনদিন পরে কোর্টে তাহার বিচার হইল। রাধাকান্ত সাক্ষী দিল এবং এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে সে দণ্ডিত হইল।

পটলা কিন্তু কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া সেই শাস্তি মাথায় পাতিয়া লইল।

শুধু তাহার হাত দু'টী শৃঙ্খলাবন্ধ করিবার সময় সে প্রার্থনা করিল সেই বাক্সটী। তাহারা বাক্সটী তাহাকে ফিরাইয়া দিল। পটলা বুকের মধ্যে সেটীকে রাখিয়া জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে পুলিশের সঙ্গে যাইয়া কাল রঙের গাড়ীতে উঠিল।

শূন্য বাক্সটীর মধ্যে কি আছে এবং তাহা লইয়া পটলার কি হইবে কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। তাই তাহার প্রার্থনা শুনিয়া সবাই হাসিল। হাসিলেন না বোধকরি একজন যিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াও মানুষের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন! যাঁহার বাঁশির সুরে গাছে ফুল ফোটে, পুরুষের দেহে আসে যৌবন!

ইহার দুই বৎসর পরে, একদিন হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া রাধাকান্ত ইহলোক ত্যাগ করিল। রুদ্রকান্ত তখন বাবার একমাত্র সিন্দুকের চাবী লইয়া নিজের চাবীর সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিল।

শ্রাদ্ধ শান্তির পর আরো কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একদিন মধ্যাহ্নে চুপি চুপি যাইয়া রুদ্রকান্ত বাবার সিন্দুকটী খুলিল। কতকগুলি অতি পুরাতন পঞ্জিকা ও সাবেকী আমলের খাতাপত্র এবং তাহার নীচে একটী পুঁটুলি করা খানকয়েক গিনি পাইল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে খাতাপত্রগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল এবং শেষ পর্যন্ত কেন যে তাহার বাবা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাবীটি হাতে দিত না, তাহারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

সে সিন্দুকটী পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং একে একে সমস্ত আবর্জনা বাহির করিয়া, যখন নীচে পাতা লাল শালুর কাপড়টীকে টানিয়া তুলিল, তখন তাহার ভিতর হইতে একগাছি সোনার হার মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

রুদ্রকান্ত তাড়াতাড়ি সেই হারটী তুলিয়া লইয়া দেখিল, সেটী নতুন তখনো পালিশ চক্ চক্ করিতেছে এবং জড়োয়ার দীপ্তি কোথাও এতটুকু ম্লান হয় নাই। দুই গাছি দীর্ঘ ও 'কুঞ্চিত কেশ তখনো আটকাইয়া ছিল একটী পাথরের বুকে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে দেখিতে লাগিল এবং মনে করিতে চেষ্টা করিল, সেই হারটী কার এবং কোথা হইতে সেখানে আসিল!

অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল এ সেই হার, যাহার জন্য পটলা জেলে গিয়াছে এবং তাহাকে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে, কেমন

করিয়া ইহা তাহার সত্যাশ্রয়ী পিতার সিন্দুকের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না এবং চিরকাল অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা রহিয়া গেল।

সহধর্ম্মিণী

মাথার নীচে কতকগুলি বালিশ, আশেপাশে কতকগুলি বালিশ—খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে সুপ্রভা। চোখে ক্ষীণ দৃষ্টি, মুখে পাণ্ডুর রেখা—শুষ্ক কঙ্কালসার দেহ কম্বলে ঢাকা।

খাটের কাছে একটা ছোট টেবিল; তাহাতে ছোট বড় নানারকমের ঔষধের শিশি, কাঁচের গ্লাস, ভাঙ্গা ও গোটা কয়েকটা বেদানা, কমলালেবু এবং আরো কতকগুলি ফল।

পশ্চিমের জানালা খোলা। তাহা দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু একটানা বন ও মধ্যে মধ্যে তাল, নারিকেল, দেবদারুর মাথা প্রাণশক্তিহীন অথর্ব্বের মত নিৰ্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

শীতের অপরাহ্ণ—ধূসর ও নিষ্প্রভ। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; সমস্ত প্রকৃতি যেন তাহারি শোকে মুহ্যমান। আকাশের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃতের শেষ হাসির মত তখনও লাগিয়া রহিয়াছে ঈষৎ রঙের রেখা।

সুপ্রভা চুপ করিয়া তাকাইয়া আছে সেই দিকে।

নির্জন ঘর। রোগ শয্যার সে একাকিনী। দ্বিতীয় কোন জীবিত ব্যক্তি নাই সেখানে। শুধু পুরাতন বালিঝরা দেওয়ালে অতি পুরাতন কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি নীরব নির্বাক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

বাঁ হাতে বুকের একটা দিক চাপিয়া ধরিয়া সে খক্‌খক্‌ করিয়া মাঝে মাঝে কাশিতেছিল। কাশির সঙ্গে উঠিতেছে রক্ত, থু করিয়া খানিকটা ফেলিতেছে পিকদানীতে, খানিকটা বা কশ বাহিয়া বালিশে গড়াইয়া পড়িতেছে। মারাত্মক ব্যাধি! ভয়ে কেউ তাহাকে ছোঁয় না, ঘরে ঢোকে না। তাই নিজেই ক্ষীণহস্তে কাপড়ের আঁচল দিয়া কখনও মুখটা মোছে কখন-বা বিরক্তিবশতঃ মুছিতে আলস্যবোধ করে।

—মা! বাহিরে কে ডাকিল।

সুপ্রভা সচকিত হইয়া উঠিল এবং ব্যাকুলভাবে দরজার পানে চাহিয়া রহিল।

কেউ আসিল না দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল, বিন্দি, ও বিন্দি!

বিন্দী হইল এ বাড়ীর পুরাতন ঝি। সে-ই কেবলমাত্র দেখাশুনা করে সুপ্রভাকে। দরজার বাহির হইতে উত্তর দিল, কেন মা?

সুপ্রভা বলিল, খোকাকে একবার দোরের কাছে নিয়ে আয় ত একটু দেখি—কতদিন তাকে দেখিনি।

ঝি বলিল, ও অনুরোধ ক'রো না মা—বাবু আমায় কঠিন দিব্যি দিয়েছেন—এ ঘরে কারুর আসবার হুকুম নেই।

—তোর পায়ে পড়ি বিন্দি, একবার তাকে নিয়ে আয়, কোলের ছেলে কতদিন দেখিনি।

—কি করব মা, এক ছেলে নিয়ে ঘর করি—বাবু আমায় যে ছেলের দিব্যি দিয়েছেন!

ইহার উপর সুপ্রভা আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। সে নিজে ছয়টি সন্তানের জননী, কাজেই যাহার এক পুত্র, কেমন করিয়া তাহার অকল্যাণ করিবে! অথচ এই ঝি-ই পূর্বে কতবার বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া ছেলেমেয়েদের তাহার কাছে লইয়া আসিয়াছে। তাই নিদারুণ অভিমানে তাহার কণ্ঠটা কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল কাশির বেগ সামলাইতে গিয়া আরো এক ঝলক রক্ত উঠিয়া পড়িল।

সুপ্রভা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—নিজের ছেলে, নিজের স্বামী তাহাদের উপরও আর আমার কোন অধিকার নাই—চোখের দেখা, তাও নিষিদ্ধ। হায়রে সংসার, হায়রে অদৃষ্ট! চোখের দৃষ্টিতেও কি আমার বিষ আছে? আমি কি ডাইনী?

স্বামীর প্রতি তাহার রাগ হইল। কি নিষ্ঠুর, কি হৃদয়হীন সে। নিজে আজকাল আর ঘরে আসে না, ডাকিয়া পাঠাইলে যদিও আসে ত দূরে দাঁড়াইয়া দুই একটা কথার উত্তর দিয়া কাজের অছিলায় তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। অথচ এই স্বামীই তাহাকে একদিন কত ভালবাসিত! কত দিন বলিয়াছে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তাহার মুখের কথা ছিল, তখন তাহার কাছে বেদবাক্য! তাহার এতটুকু সুখের জন্য, তাহার ছোট্ট কোন একটা বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, কত অর্থ সে ব্যয় করিয়াছে, কত বিপদ মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। তবে সে সব কি তাহার অভিনয়? কৈ এখন ত একবারও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে না, কেমন আছো, কি কষ্ট হ'চ্ছে তোমার?

বিবাহের দিন হইতে অসুখ হইবার পূর্বরাত্র পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। দশবৎসর ধরিয়া কত প্রেমগুঞ্জন, কত প্রেমলীলা! একদিনের জন্য বাপের বাড়ী যাইবে শুনিলে যাহার চোখে জল আসিত, সামান্য মাথা ধরিলে যে অফিস কামাই করিয়া সারাদিন তাহার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিত, সে-স্বামী আজ কোথায়? তাহার মনের এ কি পরিবর্তন! না হয় তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই, তাই বলিয়া কি একবারও ঘরে আসিয়া দু'দণ্ড বসিবার ইচ্ছা তাহার হয় না। যদি ভগবান না করুন, আজ তাহার স্বামীরই এই অসুখ হইত, তাহা হইলে সে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, না তাহাকে ফেলিয়া দূরে সরিয়া যাইত? সুপ্রভার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে সে তাহার শীর্ণ দেহটাকে লইয়া পাশ ফিরিল।

স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিয়া তাহার অন্তর জ্বালা করিতে লাগিল! এই পুরুষ! এই তাহার প্রেম!

যতদিন তাহার দেহে ছিল রূপ যৌবন ততদিন ভালবাসিয়াছিল তাহাকে। আর এখন সব ফুরাইয়াছে, স্বাস্থ্য ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাই দেখা নাই তাহার। স্বামীর সেই ভালবাসাকে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল লোলুপ যথেচ্ছাচার। তাহাকে ভুলাইয়া তাহার দেহ লইয়া, মন লইয়া সে ছেলেখেলা করিয়াছে।

স্বামীর প্রতি ঘৃণায় তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। কে তাহার যক্ষ্মার জন্য, এই অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী? কাহার জন্য সে এই অল্পবয়সে বহুপুত্রের জননী?

অভিমানে সুপ্রভার দুই চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল কেমন করিয়া সে স্বামীর সেবা করিয়াছে! অল্প আয় বলিয়া ঝি রাখিতে দেয় নাই, রাঁধুনি রাখিতে দেয় নাই—নিজে জীবন পাত করিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করিয়াছে, একলা। কোনদিন ভাল খাবার আসিলে নিজে না—খাইয়া, খাওয়াইয়াছে স্বামী ও পুত্র কন্যাদের। কোনদিন ভাল কাপড়, ভাল গহনা পরিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হয় নাই! রান্নাঘরের সেই আলো-বাতাসহীন অন্ধকার কক্ষে কাঠাইয়া দিয়াছে বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ দশ বৎসর। কেন সে এমনি করিয়া জীবনপাত করিয়াছে, কাহার জন্য? তখন ত বলিলেই পারিত পারিব না, তাহা হইলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি তাহাকে মরণের পথে আসিতে হইত না—স্বামীর এই অবহেলা, এই অনাদর সহ্য করিতে হইত না!

আজ বিন্দীর মুখ হইতে ওই একটি কথা শুনিয়া তাহার জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনা এক সঙ্গে যেন মনের দুয়ারে ভীড় করিয়া আসিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া শ্রাবনের ধারার মত জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় সুপ্রভা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। বাহিরে তখন বিধবা ননদের ভাঙ্গা কাঁশির মত গলা ঝাজিয়া উঠিয়াছে। বলি, হ্যাঁ লা বিন্দি তুই কি মনে করেছিস—অস্পদ্দা যে দিন দিন তোর বেড়ে যাচ্ছে দেখছি।—আসুক আজ নগেন ঘরে, ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব, তিরিশ দিন টিক্ টিক করছি যে ছেলেদের নিয়ে ওঘরে যাস্‌নি—একজন মরতে বসেছে বলে কি সবাইকে তার সঙ্গে যেতে হবে? তা আমি না হয় দাসীবাঁদী, কিন্তু নগেনের কথাটাও কি গেরাহ্যি হয় না—মনিব বলে মনে কি একটুও ভয় ডর নেই? কুকুরকে 'লাই' দিলে মাথায় ওঠে!

বিন্দী ছোটলোকের মেয়ে দাসীবৃত্তি তার পেশা, খাতির করিয়া কথা বলিতে কোনদিন শেখে নাই—জানে ও না। তাই তাহার উপর আরও একপদ্দা গলা চড়াইয়া কহিল, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি পিসিমা? যত বুড়ো হ'চ্ছ তত যেন তোমার ভীমরতি হচ্ছে—বলি কোন চোখে দেখলে যে খোকাকে নিয়ে ও

ঘরে ঢুকেছিলুম ?

তখনি গলার সুর ঈষৎ কমাইয়া পিসিমা বলিলেন, আর বৌ ছুঁড়ির কি আক্কেল মা—দেখছে নিজে মরতে বসেছি তখন ছেলেপুলেগুলোর জন্যেত একটু সাবধান হয়। আচ্ছা আগে আসুক নগেন আপিস থেকে, তারপর হবে অখুন সব

ছেলেদের প্রতি মৃত্যুর এই ইঙ্গিতে সুপ্রভার বুক কাঁপিয়া উঠিল এবং ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে তখনি সে প্রণাম করিল বার বার।

কিছুক্ষণ পরে সুপ্রভা ভিতর হইতে স্বামীর গলা পাইল। সে চীৎকার করিয়া তিরস্কার করিতেছিল বিন্দীকে।

ইহা শুনিয়া সুপ্রভা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, আজ তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে জানিতে পারিয়াছে তাই স্বামীর এত অবহেলা, এত অনাদর তাহাকে! অথচ একদিন সে ছিল এই সংসারের গৃহিণী, তাহারই হুকুমে সবাই উঠিত বসিত। আর আজ সে কোথায়? সবাইয়ের আপদ-বালাই—যত শীঘ্র মরে ততই ভাল!

এমন সময় বিন্দী আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং প্রদীপটা জ্বালাইয়া দিল। সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার আজ হুঁস ছিল না। টেবিলের উপরের একটা শিশি হইতে গেলাসে ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে সে আপনমনে গজ গজ করিতে লাগিল।—একচোখো মাগী, তুই কি বুঝবি স্বামী-পুত্তুরের মর্ম্ম? তিন তিনটে ছেলেকে খেয়ে, স্বামীকে খেয়ে, আবার এসেছেন ভাইয়ের সংসারের আগুন লাগাতে। ওরি ত নজর লেগে আজ তোমার এই দশা বৌদি!

সুপ্রভা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, ছিঃ বিন্দী, ওকথা বলতে নেই—ওঁরা যে গুরুজন ওঁদের গালাগাল আশীর্ব্বাদ। ওদের ওপর কথা কইলে যে পাপ হয়।

দেখ বৌদি, তুমি বিন্দীকে পাপ পুণ্যি শেখাতে এসো না—ওরকম ননদ আমি ঢের ঢের দেখেছি। মাগীর কথা শুনেছ? বলে কিনা আবার ভায়ের বে' দেব। মানুষটা এখনো জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে এর মধ্যে ও কথাটা মুখে আনতে একবার বাধল না। কাল ঘাটে বসে বসে চাটুয্যে গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলুম তোমায় বলব না পাছে তুমি মনে কষ্ট পাও। কিন্তু এখন দেখছি আর চুপ করে থাকা উচিত নয়, তোমার ননদটি যে কি রত্ন, তা তোমায় জানিয়ে দেওয়া উচিত।

কথাটা শুনিবামাত্র সুপ্রভার সমস্ত দেহে যেন এক সঙ্গে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দে দে বিন্দী শিগগির দে ওষুধটা!

যাহাকে প্রতিদিন কত জোর দবরদস্তি করিয়া ওষুধ খাওয়াইতে হয় তাহাকে আজ নিজে এইভাবে চাহিয়া ঔষধ খাইতে দেখিয়া বিন্দী অবাক হইয়া গেল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া ঔষধ খাইয়া ফেলিয়া সুপ্রভা বলিল, বিন্দী তোর বাবুকে ডেকে দিতে পারিস্ ?

বিন্দীর কণ্ঠের ঝাঁজ বোধকরি তখনো মরে নাই। তাই থিয়েটারী ঢঙে বলিয়া উঠিল—আ আমার পোড়া কপাল ! বাবু যেন তোমার জন্য এখনও ঘরে বসে আছে। ওগো তাস—তাস খেলতে গেছে সেই হারান্ চাটুর্য্যের বাড়ী। বাড়ীতে নাকি ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়ে যায়, তাই সেই মুড়িপোড়া বামুনের ধিঙ্গী মেয়েটার কাছে যায় মন ভাল করতে। এই বলিয়া সে খর্ খর্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

কথাটা সম্ভব,—কি অসম্ভব, একবারও সুপ্রভা ভাবিয়া দেখিল না। সে জানিত বুড়ো হারান্ চাটুর্য্যের তৃতীয় পক্ষের একটা মেয়ে আছে—বহু চেষ্টা করিয়া, ধরাধরি করিয়াও এ পর্যন্ত কেহ তাহার বিবাহ দিতে পারে নাই ! আরও জানিত, তাস খেলিয়া কোনদিন রাত বারোটার আগে তাহার স্বামী বাড়ীতে ফেরে না।

খপ্ করিয়া সুপ্রভার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, নগেন্দ্রের পাশে এক নববধূর মূর্তি—তাহাদের হাসি ঠাট্টা, প্রেম-গুঞ্জন—নূতন আনন্দ—নূতন সংসার !

তাহার অন্তর জ্বালা করিতে লাগিল--সারা দেহ ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে পাশ ফিরিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই, বিন্দী কখন চলিয়া গিয়াছে। শুধু টিপ্ টিপ্ করিয়া একটি প্রদীপ ঘরের কোণে জ্বলিতেছে, আর বাতাসে তাহার ক্ষীণ শিখাটি নিভিয়া নিভিয়াও জ্বলিয়া উঠিতেছে।

শয্যায় যেন তাহার কাঁটা ফুটিতে লাগিল। সুপ্রভা একবার এ পাশ ফিরিয়া শুইল, আবার ও-পাশ ফিরিয়া শুইল—ঘুরিয়া ফিরিয়া কত রকম করিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই একফোঁটা ঘুম তাহার চোখে আসিল না। কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মাঝে পাক খাইয়া মরিতে লাগিল।

একবার সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল ; কিন্তু আবার শুইয়া পড়িল ! আবার কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুইহাত জোড় করিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল, হে ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দাও, আমায় রোগমুক্ত ক'রে দাও—আমি একবার দেখে নেবো আমার স্বামীকে ; একবার প্রতিশোধ নেবো তার এই হতশ্রদ্ধার ! রাগে তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

পরমুহূর্তেই আবার তাহার চোখ দিয়া প্রবল ধারায় জল পড়িতে লাগিল এবং হতাশায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার মনে কে যেন বলিল সুপ্রভা আর বাঁচিবে না, তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে—এ রোগে মৃত্যু সুনিশ্চিত ! সে আবার শয্যা গ্রহণ করিল।

শুইয়া শুইয়া সুপ্রভা ভাবিতে লাগিল, তাই বুঝি নগেন্দ্র আবার নূতন আশ্রয়, নূতন সঙ্গিনীর খোঁজে ব্যস্ত ? না—না তা হবে না, কিছুতেই আমি তাকে আবার বিয়ে করতে দেব না—বাধা দেব যেমন ক'রে হোক্। এই কথা বলিতে বলিতে সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

রাত তখন প্রায় বারোটা। পল্লীর কোলাহল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। বাহিরে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার নিস্তব্ধতার বুকে যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বিছানা হইতে সুপ্রভা ধীরে ধীরে নীচে নামিল, তারপর ঘরের দেওয়াল ধরিয়া—খানিকটা-বা দাঁড়াইয়া, খানিকটা-বা বসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বারান্দা পার হইয়া, একদম শেষ প্রান্তে গেলে, তাহার স্বামীর ঘর। সুপ্রভা ক্রমাগত সেইদিকে চলিতে লাগিল। চোখে তার কুপিতা ফণিনীর হিংস্র দৃষ্টি, গতিতে ভয়াল প্রতিহিংসার ছায়া !

বাড়ীর সকলে নিদ্রামগ্ন। নগেন্দ্র তখনও ফিরিয়া আসে নাই—তাহার ঘরের দরজা ভেজান। সুপ্রভা দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

ঘরের মেঝেয় একধারে একখানা আসন পাতা, তাহার সামনে থালায় নগেন্দ্রের খাবার ঢাকা ও একগ্লাস জল ; এবং তাহারই পাশে লম্বা একটা পিলসুজে টিপ্ টিপ্ করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরের আর একধারে বিছানায় একটা মশারি ফেলা। চারিদিকে চাহিয়া সুপ্রভা শিহরিয়া উঠিল ! সেই ঘর—সেই বিছানা ! তাহার মনে পড়িয়া গেল—ফুলশয্যার কথা। সঙ্গে সসে তাহার হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, চোখের মামনে সব যেন ঝাপ্সা হইয়া আসিল ! ঘরের মধ্যে সে তখন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু বারবার তাহার নজরে পড়িতে লাগিল—সেই একগ্লাস জল !

হঠাৎ তার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল বিষধর সর্পের মত। সে নিঃশব্দে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া দেখিল। তারপর আর কালবিলম্ব না করিয়া নীচু হইয়া সেই গ্লাসের জলে মুখ ডুবাইল।

কিন্তু জলে মুখ ডুবাইয়াই তাহার বুক ঢিব ঢিব করিয়া উঠিল। নাক দিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। সে যেন খুনী,—এইমাত্র কাহাকে খুন করিয়া ফেলিল এইভাবে তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ঠক্ ঠক্ করিয়া সুপ্রভার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—চোখে ঘুম আসিল না কিছুতেই। চারিদিক হইতে তাহার কানে যেন আসিতে লাগিল সেই মৃত্যুর কলকল্লোল।

এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই সুপ্রভার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

নগেন্দ্র আসিয়া ঘরে জামা খুলিয়া নিজে প্রতিদিনের অভ্যাসমত একাকী ভাতের ঢাকনা খুলিয়া খাইতে বসিল।

সুপ্রভা তখনও বিছানায় ছটফট করিতেছিল পাগলের মত। হঠাৎ সে বিছানা নামিয়া কম্পিতপদে আবার স্বামীর ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। পা আর চলে না—সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, তবুও কোন রকমে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সে ঘরের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল।

নগেন্দ্র পিছন ফিরিয়া খাইতেছিল, তাই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। আহার শেষ করিয়া সবে সে জলের গ্লাসটি মুখে তুলিতে যাইতেছে—এমন সময় সে চমকাইয়া উঠিল। পিছন দিক হইতে ক্ষুধিতা সিংহীর মত সুপ্রভা লাফাইয়া পড়িল তাহার হাতের উপর। জলের গ্লাসটি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল তাহার হাত হইতে, এবং ভাতের থালায়, ঘরের মেঝেয় জল থৈ থৈ করিতে লাগিল। সুপ্রভার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে শুধু দুইটি কথা বাহির হইল, ওতে বিষ আছে, খেয়োনা। সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে সেখানে অচেতন হইয়া পড়িল।

সুপ্রভার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া নগেন্দ্র বিস্মিত হইয়া গেল। এবং তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, প্রভা, প্রভা!

সুপ্রভার সংজ্ঞাহীন দেহ তখন মাটীতে লুটাইতেছে, কোন উত্তর আসিল না তাহার নিকট হইতে।

নগেন্দ্র চেঁচাইয়া বাড়ীর লোকজন সব জড় করিল এবং মাথায় জল দিয়া, হাওয়া করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। তারপর ধরাধরি করিয়া প্রভাকে লইয়া গিয়া সকলে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

পিসিমা তখন গজ গজ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, মাগীর ন্যাকামি, রাত্রিতে আবার ঢঙ করতে যাওয়া হয়েছিল স্বামীর ঘরে!

পরদিন সকালে যথারীতি বিন্দী আবার সুপ্রভাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা বৌদি কাল তোমার কি হয়েছিল—কেন তুমি বাবুর ঘরে গিয়েছিলে?

সুপ্রভার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, একবার কি ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

একথার উপর আর বিন্দী কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রভা হঠাৎ তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল এবং সে কাছে আসিতে চুপি চুপি বলিল, একবার বাবুকে আমার কাছে ডেকে দিবি?

বিন্দী গালে একটা আঙ্গুল লাগাইয়া বলিল, ওমা, তুমি বুঝি যাননা কাল রাত্তির থেকে বাবুর যে বড় ব্যামো হয়েছে গো!

—ব্যামো! কি ব্যামো বিন্দী? সুপ্রভা শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল।

—ভারী জ্বর, তার ওপর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে।

—রক্ত, এ্যাঁ! বলিয়া এমন অদ্ভুতভাবে সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল যে ভয়ে বিন্দীর মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা পাখা লইয়া আসিয়া তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল! তারপর তার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, কেন এমন করছ বৌদি—কি হয়েছে?

সুপ্রভা কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু হাত দিয়া তাহার বুকটা দেখাইয়া দিল!

প্রথম প্রেম

দাক্ষিণাত্যের মাত্র কয়েকটি প্রদেশ তখন মুঘলদের অধিকারভুক্ত হ'য়েছে, সম্রাট সাজাহান আওরঙ্গজেবকে পাঠালেন তার শাসনকর্ত্তা করে। তিনি ছিলেন যেমন দুর্দ্ধর্ষ বীর তেমনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ। বাল্যকাল থেকেই রাজ্য জয়ের চিন্তায় তাঁর বক্ষ স্ফীত হ'য়ে উঠতো—কল্পনায় তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের সুখস্বপ্ন দেখতেন। যত বাধা বিঘ্ন আসুক যত বিপদসঙ্কুল ও দুর্গম হোক না কেন পথ—আওরঙ্গজেব একবারও তার সম্মুখীন হ'তে পশ্চাদ্‌পদ হ'তেন না। তাই পিতার আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করলেন দক্ষিণাপথের উদ্দেশে।

মীর খলিল তখন বুরহানপুরের সুবেদার। তিনি হ'লেন আওরঙ্গজেবের এক মেশোমশায়। যাবার পথে আওরঙ্গজেব একবার মাসীর সঙ্গে দেখা করবেন স্থির করলেন।

উপর্য্যুপরি কয়েক দিন পথশ্রমের পর সবাই ছুটী পেলে একদিন বিশ্রাম লাভ করবার জন্য। তাঁবুর পর তাঁবু পড়লো সারি সারি। হাতী ঘোড়া, উট, পদাতিক সৈন্য সামন্তে ভরে গেল—কানন, প্রান্তর, পাহাড়ের পাদদেশ।

পায়ে মখমলের নাগরা, মাথায় হীরা-মুক্তা-খচিত শিরস্ত্রাণ, সর্ব্বাঙ্গে শুভ্র রেশম ও মসলিনের পরিচ্ছদ—যুবক আওরঙ্গজেব চললেন একাকী মাসীর সঙ্গে দেখা করতে, জয়নাবাদে—বুরহানপুর থেকে তিন মাইল দূরে।

তাপ্তী নদীর তীরে, কুঞ্জকানন পরিবেষ্টিত, শ্বেত মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রাসাদ তখন সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ জলে আপনার রূপ দেখে আপনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়েছিল; তারি পিছনে দর্পণে প্রতিফলিত ছবির ন্যায় বৃক্ষের কালো ছায়া ও পশ্চিম আকাশের রক্তিম পটভূমি!

আওরঙ্গজেব যেন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে গেলেন। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে ঢুকে আঁকা বাঁকা পথ ধরে ধীর স্থির পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হ'তে লাগলেন। অপরাহ্ণের নিস্তেজ আলোকছটার শান্ত সংযত-শ্রী তখন আকাশে, বাতাসে, চারিপাশে।

সহসা যেন তাঁর চোখের সামনে একটা নক্ষত্র খসে পড়ল আকাশ থেকে। আওরঙ্গজেবের বুকের রক্ত দুলে উঠলো, নেচে উঠলো।

তিনি চমকে উঠে দেখলেন, তাঁরি অদূরে দাঁড়িয়ে একটী তরুণী—চোখে তার চঞ্চলা হরিণীর দৃষ্টি, বিদ্যুতের জ্যোতি সর্ব্বাঙ্গে। ফলভারানত একটী আম গাছের ডাল এক হাতে টেনে ধরে, তার নাগালের বাইরে যে আমটী তাকে পাড়বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার নীল ওড়না মাথা থেকে খসে পড়ে লুটোচ্ছে মাটীতে, দেহের প্রতি কোমলরেখা আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে সূক্ষ্ম দেহাবরণ ভেদ করে।

বার বার চেষ্টা ক'রেও সে একটী আমকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না।

আওরঙ্গজেব বিস্মিত অপলক দৃষ্টিতে সেই আশ্চর্য্য রূপের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়া রইলেন। তারপর পা টিপে টিপে তার পিছনে গিয়ে নিজে হাত বাড়িয়ে সেই ফলটী পেড়ে তার হাতে দিলেন।

মেয়েটী সচকিত হ'য়ে চেয়ে দেখলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাস্‌ছে এক সুদর্শন যুবক। হয় ত বা তাঁর বেশভূষা দেখে তাঁর পদবীও সে অনুমান করতে পেরেছিল, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলে না। বরং তার ধনুকের মত ভ্রূ দু'টি বিরক্তিতে কুঞ্চিত করে বার কয়েক তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমটী ছুঁড়ে মারল তাঁরই গায়ে!

আওরঙ্গজেব স্তম্ভিত! সম্রাট সাজাহানের এই বিশ্বজয়ী পুত্রের সামনে আর কেউ এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করলে কি হ'ত কে জানে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি অন্য কিছু না ক'রে শুধু সেই বালিকার ওড়নার একটা প্রান্ত চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন —ফলটা ফেলে দিলে যে?

মেয়েটী অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গী করে বললে—আপনি কেন পেড়ে দিলেন? আমি নিজেই পাড়তে পারতুম! আমি চাইনে আপনার দেওয়া ফল!

মেয়েটীর কণ্ঠস্বর এতই মধুর যে তার মৃদু তিরস্কারের সুরও আওরঙ্গজেবকে মুগ্ধ ক'রে দিলে, তবু তিনি জোর ক'রে নিজের গলার আওয়াজে উষ্মা টেনে এনে বললেন—জান আমি কে? আমি আওরঙ্গজেব!

এইবার কিশোরীর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। বোধকরি সে নিজে একটু বিব্রতও বোধ করলে কিন্তু একবার অপাঙ্গে আওরঙ্গজেবের দিকে চেয়েই এক ঝটকায় ওড়নাটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিলে, তারপর সেটা গায়ে জড়াতে জড়াতেই ছুটে পালিয়ে গেল সেই প্রাসাদের মধ্যে।

আওরঙ্গজেবের মনে হ'ল যেন তাঁর চোখের সামনে কিছুক্ষণ ধরে সাতটী রঙ্গের এক অপরূপ খেলা হ'য়ে গেল। সে রঙ্গের হুরী আর নেই, কিন্তু সেই রঙের মায়া এখনও তাঁর চোখে লেগে আছে। সে নীলপরীর মধুকণ্ঠের মূর্চ্ছনা এখনও যেন সেই পুষ্পিত উদ্যানের শাখায় প্রশাখায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রূপের নেশায় টল্‌তে টল্‌তে তিনি প্রাসাদের মধ্যে ফিরে এলেন।

সম্রাট সাজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ইতিপূর্ব্বে বহু সুন্দরী রমণীর সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করতে পারেনি।

শরতের লঘুমেঘের মত তাঁর হৃদয়াকাশে তারা এসেছে আবার ভেসে চলে গেছে। কিন্তু এই মেয়েটীর রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তাঁর মনে হ'লো যেন সহস্র কবির কল্পনা একসঙ্গে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তার দেহের প্রতি অঙ্গে—রেখায় রেখায়। যুগযুগান্তর ধরে পুরুষ যার বিরহে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে—সেই কল্পলতাকে কে যেন স্বপ্নলোক থেকে ছিনিয়ে এনেছে মর্তধামে। আওরঙ্গজেব যুবক—তাঁর দেহের শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

নানা কুশল প্রশ্নের পর আওরঙ্গজেব মাসীকে জিজ্ঞাসা করলে—এইমাত্র যে মেয়েটীকে দেখলুম বাগানে, সে কে?

অল্প একটু বর্ণনা শুনেই মাসী বললেন—ওটী আমার স্বামীর ক্রীতাদাসীর কন্যা, নাম হীরাবাই।

আওরঙ্গজেব বললেন, ওই মেয়েটীকে আমার চাই। আমি ওর রূপে মুগ্ধ হ'য়েছি।

মাসীর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানতেন আওরঙ্গজেবের হাত থেকে কারো নিস্তার পাবার জো নেই। অথচ তাঁর স্বামী মীর খলিলও লোক ভাল নন। আওরঙ্গজেবকে তিনি খুব প্রীতির চোখে দেখেন না। তাই তিনি আওরঙ্গজেবকে নিষেধ করলেন সেই মেয়েটীর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করতে।

আওরঙ্গজেব মাসীকে আর কিছু না বলেই শিবিরে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল সেই মেয়েটীর কাছে। তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর অভাব নেই, ক্রীতদাসীরও নয়। কিন্তু হীরাবাইকে দেখবার পর তাঁর মনে হলো যেত তাদের কোন মূল্যই নেই, তাদের অন্তরের প্রাণশক্তি সম্রাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, কতকগুলি কাঠের পুতুল সেজেগুজে তাঁর মন ভোলাবার বৃথা চেষ্টা করে মাত্র। যে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন, যে বিজয়গর্বের স্বপ্ন তাঁকে পরবর্তী জীবনে পিতার কাছ থেকে 'বিশ্ববিজয়ী' উপাধি এনে দিয়েছিল, সে স্বপ্নও আজ তাঁর কাছে অর্থহীন বলে মনে হলো। সামান্য একটী ক্রীতদাসীর মেয়ের অভাবে আজ সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁর কাছে বিবর্ণ বিশুষ্ক বলে বোধ হতে লাগল।

অবশেষে স্থির থাক্‌তে না পেরে তিনি মন্ত্রী শায়েস্তা খাঁকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন।

শায়েস্তা খাঁ পরামর্শ দিলেন কোন জরুরী কাজের অছিলায় মীর খলিলকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে হীরাবাইকে ধরে নিয়ে এসে নিজের অন্তঃপুরে বন্দী করতে।

এই কথা শুনে আওরঙ্গজেব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং শায়েস্তা খাঁর উপদেশ মত কার্য্য অবিলম্বে করলেন।

মীর খলিল ফিরে এসে সব শুনলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে

শত্রুতা করতে তাঁর সাহস হ'লো না। তাই ছাই চাপা আগুনের মত ক্রোধে ভিতরে ভিতরে তিনি পুড়ে মরতে লাগলেন।

এদিকে হীরাবাইয়ের অন্তর জয় করবার জন্য—তার ভালবাসা পাবার জন্য আওরঙ্গজেব পাগল হ'য়ে উঠলেন। রমণীকে ভালবাসার ইচ্ছা এই তাঁর প্রথম। তিনি কখনো নারীর কাছে নতজানু হ'য়ে প্রেম ভিক্ষা চান নি। কিন্তু হীরাবাইকে দেখে কি জানি কেন তাঁর ভালবাসার ইচ্ছা এমন প্রবল হয়ে উঠলো। অথচ হীরাবাই যেন পাষাণ প্রতিমা! কত রমণী আওরঙ্গজেবের মুখের একটু প্রসন্ন হাসির জন্য সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই কিশোরী ক্রীতদাসীর মন যেন অন্য উপাদানে প্রস্তুত, সে কিছুতেই সম্রাট-পুত্রের কাছে ধরা দিতে চাইল না।

উদ্যানের শ্রেষ্ঠ ফল যায় হীরাবাইয়ের কাছে। মণিকার সিন্দুকের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যত্ন অলঙ্কার তার কাছেই পেঁ ৗছে দিয়ে যায়। একটী নারী-হৃদয় জয় করবার জন্য সমস্ত উপকরণ আওরঙ্গজেব একে একে উজাড় করে দেন, তবু সেই হৃদয় লাভ করা তাঁর কাছে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে!

অন্যান্য অন্তপুরিকারা এই এক ফোঁটা মেয়ের সাহস দেখে অবাক্ হয়ে যায়। আওরঙ্গজেবও এক এক সময় রেগে বলেন—জান, আমি ইচ্ছে করলে এখনি তোমায় জীবন্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারি।

হীরাবাই স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয়—জানি, আমার দেহ আপনার বাহুবলের ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য জনাব। কিন্তু মনকে ত বাহুবল দিয়ে জয় করা যায় না। ওটা ভিক্ষা দেবার জিনিষ।

আওরঙ্গজেব নিষ্ফল কামনার অসহ্য দাহে অবসন্ন হ'য়ে পড়েন।

অবশেষে একদিন তিনি করজোড়ে বললেন – হীরা আমি তোমায় সত্যিসত্যি ভালবাসি—তুমি কি কিছুতেই আমার একথা বিশ্বাস করবে না?

হীরাবাই বললে—ইতিপূর্ব্বে আরো কত হতভাগিনীকে ঠিক এই কথা বলে ভুলিয়েছেন সম্রাট?

—ইতিপূর্ব্বে? না না, একজনকেও নয়। বিশ্বাস করো হীরা, আর কাউকে আমি কখনো ভালবাসিনি—সবাই আমার পদতলে নিজেদের রূপযৌবন বিলিয়ে দিয়ে তাদের জীবন ধন্য করেছে!

—মনে রাখবেন যারা আপনার কামানলে এইভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে, তাদের রূপ দিয়ে, যৌবন দিয়ে—আমি তাদের দলের নই।

—তা জানি। তাই আওরজজেব আজ ভিক্ষুকের মত তোমার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে—জীবনে কোন দিন আমি যা করিনি আজ তাই করছি, শুধু তোমার জন্য। হীরা বিশ্বাস করো আমি তোমায় ভালবাসি আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে। তোমার মনে ঠাঁই না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হীরাবাই বললে—রাজারাজড়ার প্রেম শুধু মুখে—মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, তাঁরা তেমনি এক রমণীর সর্ব্বনাশ ক'রে আর এক রমণীর প্রতি আসক্ত হন। তাঁরা বিশ্বাসঘাতক! বিশেষতঃ আপনার মত কঠিন হৃদয়, বীরের কাছে রমণীর কোমল অন্তরের কোন মূল্য নেই।

হাতের মুঠোর মধ্যে হীরাবাইয়ের একটী হাত টেনে নিয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে আওরঙ্গজেব কলে উঠলেন—হীরা, কঠিন পর্ব্বতের বুকে কি নির্ঝরিণীর স্থান হয় না? মরুভূমি কি কোনদিন মেঘের স্বপ্ন দেখে না? আমার মুখের দিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখো, আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না। আমি তোমায় ভালবাসি—সত্যি বলছি তোমার জন্য আমি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি—রাজ্য, অর্থ, সিংহাসনের আশা, আমায় যা বলবে—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত?

হীরাবাই আওরঙ্গজেবের মুখে তাড়াতাড়ি একটা হাত চাপা দিয়ে বললে—থাক্ থাক্ অত বড় কথাটা বলে ফেলে আর নিজেকে সত্যভ্রষ্ট করবেন না!

আওরঙ্গজেব বললেন—বিশ্বাস না হয়, তুমি আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার?

হীরাবাই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ছোট্ট একটুখানি হাসি চেপে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তার শয়ন কক্ষে গিয়ে ঢুকলো—তারপর একটী সোনার পাত্র ক'রে মদ এনে আওরঙ্গজেবের মুখের কাছে ধরে বললে—পান করুন সম্রাট!

কী সর্ব্বনাশ! এ যে সুরা!

নিমেষে আওরঙ্গজেবের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। যে সুরাকে তিনি বাল্যজীবন থেকে ঘৃণা করে এসেছেন, যা শুধু কোরান কিংবা ধর্ম্মের নিষেধাজ্ঞার জন্য নয়,—মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে বলেই যার ওপর তাঁর আন্তরিক ঘৃণা, সেই সুরা পান করতে হবে?

হীরাবাই তাঁর বিহ্বল দৃষ্টির দিকে মুহূর্ত্তকয়েক চেয়ে থেকে বললে—এ আমি জানতাম শাহাজাদা!

তারপর মদের পাত্রটী সরিয়ে রেখে বললে—নিজের প্রেমের মূল্য এইবার ত নিজেই বুঝতে পারলেন?

আওরঙ্গজেব ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—কিন্তু এ যে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে ত্যাগ করেছি হীরাবাই! কেমন করে এ জিনিস স্পর্শ করব আবার? আর, আর এ যে পবিত্র কোরানের নিষেধ!

নিষ্ঠুর বিজয়গর্ব্বের চাপা বিদ্রূপ কণ্ঠে টেনে এনে হীরাবাই বললে—আমি ত আপনাকে খাবার জন্য সাধাসাধি করছি না। দরকার কি আপনার এতে? ও আমি এখনই ফেলে দিচ্ছি—

সেই মুহূর্তে সহসা কি কারণে যেন হীরাবাইয়ের ওড়না একবার খসে পড়ে গেল। পরক্ষণেই সে তা সামলে নিয়ে গায়ে টেনে দিল বটে, কিন্তু সেই একটি মুহূর্তের জন্য যেন সহস্র বাতির রোশনাই তার অনাবৃত কোমল হাত দু'টী ও

কাঁধের ওপর ঝিলিক্ দিয়ে উঠ্ল। সেই রূপ, ও সেই অসাধারণ লাবণ্যর দিকে চেয়ে বুঝি আওরঙ্গজেবের আত্মবিস্মৃতি ঘটলো। তিনি তৎক্ষণাৎ হীরাবাইয়ের হাতদুটী চেপে ধ'রে বললেন—হীরাবাই, আমার অবস্থা কল্পনা করে আমায় দয়া কর। তুমি যা কিছু চাও নিশ্চয় দেব—শুধু এই আদেশটী ফিরিয়ে নাও।

কুন্দদন্তে লাল পদ্মের পাপ্ড়ীর মত জিহ্বাটী ঈষৎ কেটে হীরাবাই বললে—কী বলছেন জনাব, আদেশ করব আমি, আপনাকে! না, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার হয় নি। স্মরণ করে দেখুন, পরীক্ষা করার কথা আপনিই বলেছিলেন।

তখন সম্রাট-পুত্রের মাথায় আগুন জ্বল্ছে, হীরাবাইয়ের রূপবহ্নিতে তাঁকে ঝাঁপ দিতেই হবে। বুকের মধ্যে তাঁর তারুণ্যের তরল রক্ত তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তিনি আরও মুহূর্ত্ত কয়েক সেই স্বপ্নালোকবাসিনী তরুণীটীর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর নিজেই উঠে গিয়ে সেই রক্ত-মদিরা-রূপিণী সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশের পাত্রটী মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

হীরাবাইয়ের চোখ দু'টী সহসা হীরার মতই জ্বলে উঠ্লো। জয়ের গর্ব্ব, প্রেমের গর্ব্ব তার এতক্ষণে সার্থক হ'ল কি তবে!

যে সত্যাশ্রয়ী পুরুষ জগতে কখনও মদ স্পর্শ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরই ওষ্ঠের একান্ত নিকটে তখন এগিয়ে গেছে সেই পাত্র। আওরঙ্গজেব একবার চোখ বুজলেন, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সহস্র বিদ্যুৎ শিখার মত জ্বলে উঠল এক কিশোরীর মূর্ত্তি! তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না প্রাণপণ শক্তিতে সেই সুরার পাত্র মুখের আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু সে-পাত্র তাঁর ওষ্ঠ স্পর্শ করবার আগেই হীরাবাই বিদ্যুদ্বেগে তাঁর হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেই পাত্রটী কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আওরঙ্গজেব বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, হীরাবাই নতজানু হ'য়ে তাঁকে অভিবাদন করছে। তার চোখে বিদ্রূপের সে অসহ্য জ্বালা আর নেই, কালো ভ্রমরের মত চক্ষুদুটী তখন প্রেমে স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

আওরঙ্গজেব বললেন—ওকি হীরাবাই?

হীরাবাই নতমুখে বললে—আমায় পরাজয় হয়েছে শাহ্জাদা!

আওরঙ্গজেব সেই তন্বী দেহলতাটীকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে বললেন—ধরা দিলে তা হ'লে এবার?

প্রথম প্রণয়ের আবেশে তখন হীরাবাইয়ের চোখদুটী বুজে এসেছে। সে তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে চুপি চুপি বললে—আমি আপনারই ক্রীতদাসী!*

* মাসির-উল্-উমারা অনুসারে এই মিলনের অল্প কয়েকদিন পরেই হীরাবাঈ মারা যায়। আওরঙ্গজেব প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, আওরঙ্গজেবের জীবনে ইহাই নাকি একমাত্র প্রণয়কাহিনী।

ভালো জামা কাপড় প'রে কোথায় বেরুন হচ্ছে শুনি ? কমলা জিগ্যেস করলে তার স্বামীকে। কণ্ঠে তার তীব্র ঝাঁজ !

অরুণ একটু থতমত হয়ে বললে, না এমনি একটু বেরচ্ছি—সমস্ত দিন ত বাড়ী বসে আছি—ছুটির দিনে যেন ভাল লাগে না, কিছুতেই বেলা কাটতে চায় না।

তাই নাকি ! আপিসের সাহেবকে তবে বললে পারো—রবিবার খুলে রাখতে। এই বলে এমনভাবে কমলা অরুণের দিকে তাকাল যে তার বুকের মধ্যেটা ঢিপঢিপ ক'রে উঠলো।

কথাটা নিছক রহস্য নয়, তার মধ্যে তীব্র বক্রোক্তি রয়েছে—এটা বোধ হয় সে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর থেকেই বুঝতে পেরেছিল। তাই একটা ঢোক গিলে এবং বার দুই কাশবার চেষ্টা ক'রে অরুণ বললে, তুমি ত এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত কাজ নিয়ে, আমি চুপচাপ বসে কি করি বলো ?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কমলা বললে, থাক ওকথা ব'লে আর আমাকে ভোলাতে হবে না, কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা আমি জানি।

স্ত্রীর অনুমান কতটা সত্য জানি না, তবে সেকথা শুনে মুহূর্তে অরুণের মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো এবং সেই প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বিছানার একপ্রান্তে বসে পড়ে' বললে, চা করেছো নাকি ?

করেছি—বলে রান্নাঘর থেকে কমলা এক পেয়ালা চা ও খান চারেক লুচি একটা রেকাবীতে ক'রে এনে তার সামনে ধরলে।

অরুণ তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে বললে—কমল তোমার চা-ও এখানে নিয়ে এসো, একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক্ !

থাক, এত সোহাগ আমার সহ্য হবে না—এই কথা বলতে বলতে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণের মুখে চা যেন তেতো হয়ে উঠলো। নিঃশব্দে সমস্তটা গলাধঃকরণ করবার পর সে চুপ করে বসে রইল। একবার ভাবলে জামা কাপড় খুলে রেখে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো—না, তা হ'লে হয়ত কমলা মনে করবে যে তার অনুমানটাই সত্যি, তার ভয়েই সে গেল না। তার পৌরুষে বাধল। তখন সে উঠে দাঁড়াল এবং আয়নার সামনে গিয়ে আর একবার চুলটা ঠিক করে নিতে লাগল।

ইত্যবসরে অরুণ কি করছে দেখবার জন্য একটা কাজের অছিলায় কমলা ব্যস্ত-ভাবে ঘরে এসে ঢুকলো। তার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে অরুণ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। তারপর ধীরে ধীরে কমলার সামনে গিয়ে বললে, চলো কমল, আজ আমরা একটু 'লেকে' বেড়িয়ে আসি। তার কণ্ঠস্বরে যেন অপরাধীর মত ভয় ও সংকোচ জড়ানো।

গম্ভীরভাবে কমলা শুধু বললে, না। তারপর চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়ালে অমনি অরুণ তার পথ আগলিয়ে বললে, না মানে?

না মানে—না—আবার কি?

তার মানে যাবে না আমার সঙ্গে, এই ত?

হ্যাঁ তাই। এই বলে কমলা আবার যাবার জন্যে উদ্যত হ'লো।

কেন যাবে না, জিগ্যেস করতে পারি কি? অরুণের কণ্ঠে যেন দৃঢ়তা ফিরে এলো।

কমলা বললে, তুমি জিগ্যেস করতে পারো, কিন্তু আমি বলতে পারি না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ সে কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

অরুণ বললে, ভালো লাগুক বা না লাগুক, তবু তোমায় বলতে হবে। সত্য অপ্রিয় হলেও আমি শুনতে চাই।

কমলা তখন বললে, আমায় সঙ্গে নিয়ে 'লেকে' বেড়াতে গেলে লোকে তোমায় কি বলবে!

হেঁয়ালী ছাড়ো কমল—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী কি বেড়াতে যেতে পারে না?

কণ্ঠে বিদ্রূপ ঢেলে কমলা বললে, না পারে না—সে যুগ এখন কেটে গেছে।

অরুণ বললে, আরো স্পষ্ট ক'রে বলো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে—বর্তমান যুগে 'লেকে' বেড়াতে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিলে লোকে নিন্দে করে। পরস্ত্রীকে পাশে নিয়ে যেতে হয় অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার বেড়াতে যাওয়া উচিত—এই বলে কমলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি কমলার পেছনে পেছনে বারান্দা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তার একটা হাত ধরে অরুণ তাকে ঘরে টেনে নিয়ে এলো; তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, আজ আমি এর একটা মীমাংসা করতে চাই। বহুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, তুমি আমায় ইন্দ্রাণীর কথা বলে খোঁচা দাও। যদি আমি আজ তোমায় স্পষ্ট ক'রে বলি যে আমি ইন্দ্রাণীকে ভালোবাসি, তাহ'লে তুমি আমার কি করতে পারো?

কঠিনদৃষ্টিতে একবার স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে বললে, যে দেশের মেয়েদের পেটের ভাত নির্ভর করে তাদের স্বামীর অনুগ্রহের ওপর, তারা আবার কি করতে পারে! তবে শুধু এইটুকু আমি বলতে চাই যে তোমার মত একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে জেনেশুনে আমায় বিয়ে করা উচিত হয় নি। পথ ছাড়ো। এই বলে সদর্পে কমলা দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ একথার ওপর আর কিছু বলতে পারলে না। স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর কেবলমাত্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং সোজা ইন্দ্রাণীদের বাড়ীর পথ ধরলে।

ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ী ভবানীপুর, দু'বছর পরে সে এখানে এসেছে। তার স্বামী পশ্চিমের কোন দেশে পোষ্ট অফিসে চাকরী করেন; আগে বছরে অন্তত একবার ক'রে তারা কলকাতায় বেড়াতে আসতো; কিন্তু এবার যে দু'বছর দেরী হ'লো তার কারণ ইন্দ্রাণী নিজে। গত বছর যে সময় তার স্বামী ছুটী পেয়েছিল তখন ইন্দ্রাণী আঁতুড় ঘরে। ছ' বছর পরে এই প্রথম সে সন্তানের মুখ দেখলে। ছেলে হবার আগে পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রাণী অরুণকে চিঠি লিখতো, কিন্তু ছেলে হবার পর থেকে আর সে তার কোন চিঠি পায়নি। তাই ইন্দ্রাণী এখানে এসেছে খবর পেয়ে অরুণ তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল! অরুণ নিজেই ইন্দ্রাণীর আগমন-সংবাদ কমলাকে দিয়েছিল কয়েকদিন আগে! তাছাড়া কমলা জানতো যে অরুণের সঙ্গে ছেলেবেলায় ইন্দ্রাণীর খুব ভাব ছিল, এমন কি বিয়ে পর্যন্ত হবার কথা হয়েছিল। অবশ্য এসব অরুণই একদিন তাকে গল্প করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে তাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ইতিপূর্বে কোন দিন কোন কলহের সৃষ্টি হয় নি। তবে আজ যে হঠাৎ কেন এমনটা হ'লো তা বোধকরি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

কিছুক্ষণ পরে অরুণ গিয়ে ইন্দ্রাণীদের বাড়ী হাজির হলো এবং বাইরে থেকে কড়া নাড়তেই চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বার করে' মুখটা বার কয়েক মুছে নিয়ে অরুণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

ইন্দ্রাণীর বাবা তাকে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওরে ইন্দু তোর অরুণদা এসেছে।

তারা দুজনেই আশা করেছিল যে ওই কথা শুনে ইন্দ্রাণী এখনি ছুটতে ছুটতে আসবে। কিন্তু মিনিট পনেরো ধরে ইন্দ্রাণীর বাবার সঙ্গে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত নানাপ্রকার রোগ ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করবার পরও যখন ইন্দ্রাণী সেখানে এলো না তখন তার পিতাই অরুণকে বললেন, যাও না তুমি, সে ওপরের ঘরে আছে।

অরুণ যেন এই কথাটির জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, তাই বলামাত্র সে সেখানে থেকে উঠে একেবারে সোজা ইন্দ্রাণীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ইন্দ্রাণী তখন ছেলেকে জামা পরাচ্ছিল। আঁচলের প্রান্তটা বুকে টেনে দিতে দিতে বললে, এসো অরুণদা, কেমন আছো?

কেমন আছি তুমি ত আর খবর নাও না, এক বছরের ওপর হ'য়ে গেল, আমায় দু'লাইন চিঠি লেখবার কথাও তোমার মনে হয়নি।

কি করি বলো, সংসার নিয়ে এবং স্বামীপুত্তুরের ফরমাস খাটতে খাটতে এক

মুহূর্তও সময় পাই না। এতটুকু ছেলে হ'লে কি হয়—বাপ কি বিক্রম!

তার মানে তোমার এই ছেলেটাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, এই বলতে চাও তো? এই বলে অরুণ নিজেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ইন্দ্রাণীর কিন্তু সে হাসি পছন্দ হ'লো না, সে কঠিন হয়ে রইল।

তারপর আরো কিছুক্ষণ তারা খুচ্‌রো আলাপ করলে। কিন্তু এ সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে অরুণ লক্ষ্য করলে ইন্দ্রাণী ও তার মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান—সে যেন সর্ব্বদা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। তার কণ্ঠে আর সে আকুতি নেই, অরুণদাকে বলবার জন্য নির্ঝরিণীর মত বাক্যস্রোত আর বেরিয়ে আসছে না ওষ্ঠ ভেদ করে। অথচ এর আগের বারেও যখন সে শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছিল তখনো কত কথা হয়েছে! সে সব মনে করতে গিয়ে অরুণের কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে উঠলো; সে বার দুই ঢোক গিলে ইন্দ্রাণীকে প্রশ্ন করলে, সরোজ কোথায়? সরোজ তার স্বামীর নাম।

ইন্দ্রাণী বললে, ফিটন ডাকতে গেছে—'লেকে' বেড়াতে যাবে বলে'। ও আবার মোটর দু'চোক্ষে দেখতে পারে না—বলে বেড়াতে যাচ্ছি, সেখানে ত আর আপিসের 'হাজ্‌রে' দিতে হবে না! স্বামীর কথা বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

অরুণ তাই লক্ষ্য ক'রে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, অথচ পাছে সেকথা ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে সেইজন্য মুখে হাসি টেনে এনে বলে উঠলো, বেশ তা' চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, আমিও বেরিয়েছি লেকে যাবো ব'লে।

ইন্দ্রাণীর মুখ যেন নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে চট ক'রে বলে ফেললে, কিন্তু আমাদের গাড়ীতে ত জায়গা হবে না।

অরুণ আবার ঈষৎ হেসে বললে, এখানেও তোমার এই ছেলেটি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি?

অরুণ প্রথমে মনে করেছিল হয়ত ইন্দ্রাণী তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে; কিন্তু যখন সে আবার গম্ভীরভাবে বললে তাদের নীচের তলায় ভাড়াটে বৌ ও তার ছেলে যাবে, তাদের পূর্ব্বেই কথা দেওয়া হ'য়েছে তখন অরুণ আর অপেক্ষা না ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

একাকী লেকের পথে চলতে চলতে তার মনে হ'তে লাগল কতকথা। কতদিন সেইপথ দিয়ে ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

রবিবার, লেকে ভীড়ে ভীড়।

অরুণ খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল—তার মধ্যে গিয়ে আরো ভীড় বাড়াবে কি ফিরে যাবে ভাবছে—এমন সময় তার দৃষ্টি পড়লো একটা চলন্ত ফিটনগাড়ীর ভিতর। ইন্দ্রাণীর কোলে ছেলে, সে তার স্বামীর গা ঘেঁসে বসে আছে একটা 'সিটে'—তাদের উভয়ের মুখ হাস্যোজ্জ্বল; কিন্তু আর একটী সিট একেবারে খালি তাতে অন্য কোন লোক নেই।

সপাং ক'রে কে যেন অরুণের পিঠের ওপর সজোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিলে! অরুণের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ঘাসের ওপর বসে পড়লো। ইন্দ্রাণী যে তার সঙ্গে আজ প্রতারণা করেছে, সেই কথাটাই বারবার তখন তার মনকে পীড়া দিতে লাগল। কিন্তু তাকে এড়াবার জন্যে ইন্দ্রাণীর এই রকম কৌশল অবলম্বন করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে সে তা ভেবে পেলে না।

ইন্দ্রাণী ত ভাল করেই জানে যে তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন রকম আবিলতা নেই। আর জানত বলেই বিয়ের পরও সে অরুণকে অসঙ্কোচে বরাবর চিঠিপত্র লিখে এসেছে, তার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পেরেছে। তবে কি সে-বিশ্বাস এখন তার ওপর থেকে সে হারিয়েছে? এতদিন পরে এই অবিশ্বাসই বা তার মনে কেন জাগলো? তবে কি এটা তার স্বামী পছন্দ করে না? কিন্তু সে-কথাত ইন্দ্রাণী স্পষ্ট করেই তাকে বলতে পারতো! অরুণের সুশিক্ষিত মন এইভাবে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল নানা যুক্তির মধ্যে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু অরুণ যতই এইসব নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করে ততই যেন ইন্দ্রাণীর অবহেলা এই সমস্তর মধ্যে তার চোখে বড় ক'রে দেখা দেয়।

অরুণ আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর সহসা তার মনে পড়লো স্ত্রী কমলার কথা। নিমেষে যেন সমস্ত পৃথিবী তার চোখের সামনে নেচে উঠলো। সে আর সেখানে বসে থাকতে পারলে না। সামনে একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাতে উঠে বসলো এবং তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে গেল।

সন্ধ্যা তখনো হয়নি। কমলা সবে গা ধুয়ে এসে তার বৈকালিক প্রসাধন করছিল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূদুটীর মধ্যে সিঁদুরের টিপ পরছিল। এমন সময় তার পিছনে আয়নার মধ্যে অরুণের মূর্তি ফুটে উঠলো। তার দিকে না চেয়েই মাথায় কাপড়টা টেনে দিতে দিতে কমলা বললে, কি হ'লো, ইন্দ্রাণী বুঝি তাড়িয়ে দিলে?

তার কণ্ঠের এই শ্লেষ যেন অরুণ শুনতেই পেলে না। তার দু'টী চক্ষু তখন কমলার সদ্যস্নাত মুখের ওপর নিবদ্ধ। অপলকনেত্রে সেইদিকে তাকিয়ে সে কি ভাবছিল! অরুণের চোখের সামনে অকস্মাৎ ভেসে উঠলো ইন্দ্রাণীর মুখ, এবং এই প্রথম তার মনে হ'লো যেন ইন্দ্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী রূপ কমলার!

কমলা পিছন ফিরে আবার বললে, কি দেখছো, আমার চেয়ে ইন্দ্রাণীকে দেখতে ভাল কিনা?

এই কথাগুলো শুনবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার সম্বিৎ ফিরে এলো। সে থতমত খেয়ে বললে, কমলা চলো এখন আমরা 'লেকে' বেড়িয়ে আসি।

কমলা বক্রস্বরে বললে, তা'হলে ইন্দ্রাণী যদি রাগ করে?

করুক্, আমি ত তাই চাই। হঠাৎ এই কথাগুলো বলে ফেলেই অরুণ আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না তার জন্যে নয়, কিন্তু আমার কি একদিনও সাধ হয় না যে তোমায় নিয়ে বেড়াই!

কমলা এবার উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলে, না।

অরুণ মিনতিপূর্ণস্বরে তখন তার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, কমলা আমায় ক্ষমা করো, শুধু আজকে আমার এ অনুরোধটা রাখো! আমি আর কোনদিন তোমায় বলবো না। কমলা, লক্ষ্মীটি একবার শুধু বলো হ্যাঁ যাবো?

কমলা এরকম ক'রে আর কখনো তার স্বামীকে অনুরোধ করতে শোনেনি, তাই তার মুখ থেকে এই কথাগুলি শুনে সে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো।

অরুণ নিজে তখন আলমারী খুলে তার পছন্দমত সাড়ী বার করে দিলে কমলাকে পরবার জন্য।

স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ভালবাসায় কমলা মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বিবাহিত জীবনে সে এই প্রথম স্বামীর কাছ থেকে সত্যিকারের আদর পেলে!

অরুণ একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে।

কমলা সেজেগুজে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলো।

'লেকে' পেঁাছে অরুণ ড্রাইভারকে খুব ধীরে ধীরে মোটর চালাতে বললে। গাড়ী মন্থরগতিতে লেক পাক দিতে লাগল।

একবার, দুবার, তিনবার।

অরুণ উদ্গ্রীব হয়ে চারিপাশে চায়। তার ইচ্ছা অন্ততঃ একবার ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হোক। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা বোধহয় অন্যরূপ, তাই বারবার ঘোরা সত্বেও অরুণ তার দেখা পেলে না।

এদিকে কমলা অত্যন্ত অধৈর্য্য হ'য়ে উঠলো। একই স্থানে বার বার ঘুরতে তার ভালো লাগে না। সে বলে, রাত হয়ে গেল, বাড়ী ফিরে চলো।

অরুণ বলে, আর একবার।

এমন সময় ইন্দ্রাণীদের গাড়ীটা হঠাৎ অরুণের চোখে পড়লো।

ইন্দ্রাণী তখন তার স্বামীর সঙ্গে গল্পে এমন উন্মত্ত যে তাকে সে দেখতেই পেলে না।

কিন্তু একটু পরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে অরুণের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই কমলা দেখতে পেলে ইন্দ্রাণীকে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের হাতটা তার কোলের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে সে বললে, বাড়ী চলো।

অরুণ মিনতি ক'রে বললে, আর একবার লক্ষ্মীটি!

না, আর একবারও নয়! দৃঢ়কণ্ঠে কমলা বললে।

মিনতির সুরে তখন অরুণ বললে, লক্ষ্মীটি, আমার অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে হবে, নৈলে—

তোমার কোন কথা আমি বুঝতে চাই না—এই ড্রাইভার বাড়ী চলো। কমলা দৃঢ়স্বরে হুকুম দিলে।

এর ওপর তখন অরুণের আর কোন কথা বলার সাহস হলো না। সে চুপ করে বসে রইল।

গাড়ী ফিরলো বাড়ীর দিকে।

পথে কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বললে না। দু'জনেই যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

কি সে চিন্তা তা তারাই জানে!

ছবি

গঙ্গায় শেষ ডুব দিয়ে হেমাঙ্গিনী পূবদিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল। তারপর গলায় আঁচল জড়িয়ে, চোখ বুজে, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে, মিনিট দশেক ধ'রে অনুচ্চারিত কণ্ঠে কোন দেবতাকে উদ্দেশ করে কি ব'ললে তা সেই জানে। তখন পূব-আকাশ সবে লাল হ'য়েছে, নির্লজ্জ কয়েকটা কাক খাদ্যান্বেষণে ব্যর্থ হয়ে, কা-কা রবে তাদের অভিযোগ জানাচ্ছিল আর স্বাস্থ্যকামী কয়েকজন ব্যক্তি ছড়ি হাতে করে পায়চারি ক'রছিল গঙ্গার ধারে ধারে।

চোখ খুলতেই হেমাঙ্গিনী দেখলে একজন লোলুপ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হেমাঙ্গিনীর চোখের সঙ্গে তার চোখের মিলন হ'তেই অপ্রস্তুত হয়ে সেই লোকটি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

স্বল্প-গভীর আদিগঙ্গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, বুক-পিঠের অনাবৃত অংশ ভিজে কাপড় টেনে দিতে দিতে হেমাঙ্গিনী ঘাটের ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর নিত্য-প্রথা অনুযায়ী কমণ্ডলু হাতে, ভিজে কাপড়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে অলিগলির মধ্যে দিয়ে আপনার বাসার দিকে চললো।

পরদিন আবার ঠিক সেই সময়ে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল সেই লোকটির। এবার আগের দিনের মত প্রথম দৃষ্টিতে সে অপ্রস্তুত হ'ল না—সে যেন হাঁ করে কি গিলছিল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দৃষ্টিতেও যখন নড়ল না তখন কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হেমাঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এমনভাবে তার দিকে তাকালে, যে সে ঘাড় হেঁট ক'রে দ্রুতপদে পালাতে পথ পেলেনা।

আবার তার পরদিন হেমাঙ্গিনী দেখলে সেই একই ব্যক্তি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে আছে! এবার প্রথম চাউনিতেই তাদের চার চক্ষুর মিলন হ'ল, এবং হঠাৎ যেন তার কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছে এইভাবে লোকটি একেবারে ভাল ছেলের মত সুড় সুড় ক'রে চলে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু স্নান শেষ ক'রে রাস্তায় উঠতেই আবার সেই লোকটির সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর

দৃষ্টি বিনিময় হলো, এবার কিন্তু তাকে দেখে সে কিছু বললে না শুধু একটু মুচকি হাসলে।

হেমাঙ্গিনী বেশ্যা, দেহ ভাড়া দেওয়া তার ব্যবসা। কিন্তু বে-হিসেবী ব্যবসায়ীর মত দুদিনে পুঁজি শেষ ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয় নি!

সুন্দরী হয়ত সে নয়, চোখ-ধাঁধাঁন ঝলমলে রূপও তার নেই। তবু রূপাতীত এমন এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্য তার দেহকে ঘিরে রেখেছিল যে তাকে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না, বারবার দেখতে ইচ্ছা করে।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গিনী দেখলে লোকটা তখনো তার দিকে তেমনি চেয়ে আছে। সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, ঘাড়টি বেঁকিয়ে একবার তার মুখের দিকে আড় চোখে চেয়ে ব'ল্লে 'কোথাকার বেহায়া পুরুষ গা! বলি মেয়েমানুষ কি জন্মে দেখে নি, না ঘরে মা বোন্ নেই—দু'চোখ দিয়ে যেন গিল্‌ছে।'

এই কথাগুলো যেন অসীমকে চাবুক মারল, ঘৃণায় তখন তার সারা দেহ রি রি ক'রে উঠল। তার ইচ্ছা করতে লাগল সেখান থেকে ছুটে কোথাও পালায়, কিন্তু পাছে তা অশোভন হয় এই ভয়ে ছোটার চেয়েও দ্রুততর গতিতে সে একেবারে হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল।

অসীম কলকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তান; বংশগৌরবে ও পদমর্য্যাদায় সমাজের শীর্ষস্থানে তার আসন। তার ওপর সে নিজে একজন নাম করা আর্টিষ্ট বাংলা দেশের। তার দীর্ঘ ঋজু দেহ, বর্ণ গৌর, কুঞ্চিত কেশ। তার স্বপ্নালস আঁখিতে কল্পনার রঙ! তার সূক্ষ্ম রুচিতে, তার ভাবপ্রবণতায়, তার সৌন্দর্য্যানুভূতিতে তাই হেমাঙ্গিনীর কথাগুলো একটা বেদনার ঘা মেরে গেল।

সে শিল্পী, সে রূপস্রষ্টা, সৌন্দর্য্যের উপাসক সে। যুগ যুগ ধ'রে যে-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে শিল্পীরা ছোটে দুর্গম অরণ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশিখরে যাকে ধরবার জন্য আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে তারা কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে, অসীম যেন সেই সৌন্দর্য্যকে দেখতে পেয়েছিল, হেমাঙ্গিনীর দেহের রেখায় রেখায়, তার চলার মৃদুছন্দে, তার পরিপূর্ণ অচঞ্চল চোখের চাহনিতে। সকল ভদ্রতা, সকল রুচি তাই হার মেনেছিল শিল্পীর এই অনুপ্রেরণার কাছে!

হেমাঙ্গিনী খোলার ঘরে বাস করে. নিতান্তই অশিক্ষিতা সে। শিল্পী কি এবং তার প্রাণের কথাই বা কি, তা সে কেমন ক'রে জানবে? তাই ভদ্রলোকের পোষাকে এমন ছোট লোকের মত হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে সে খুবই চ'টে গিয়েছিল।

অসীম অপমানিত হ'য়ে চ'লে গেল। তার পরের দিন সকালে সে আর এল না, জোর ক'রে তার মনকে বেঁধে রাখলে। কিন্তু যত বেলা বাড়তে লাগল তত তার মনও চঞ্চল হ'য়ে উঠল! সে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রেও কিছুতেই কিছু ক'রতে পারলে না। শেষে বেলা দুটো লাগাত বেরিয়ে প'ড়ল বাড়ী থেকে।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর ! মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেন আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ক'রছে। পিচের রাস্তা গলে ফুট্‌ছে টগ্‌বগ্‌ করে। তবু সে হাঁটতে হাঁটতে চললো ! কালীঘাটের পুল পেরিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধ'রে গলির মধ্যে দিয়ে অসীম যেতে লাগল সেই একই পথে। সে দেখেছিল ওই দিকটায় রোজ হেমাঙ্গিনী যায়।

হঠাৎ কতকগুলো খোলার ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। এক জায়গায় নারীতে নারীতে তুমুল কলহ বেধেছে। রাস্তায়, খোলার ঘরের দরজায়, জানালায়, পাশের বাড়ীর ছাদে, মেয়ে পুরুষ গিস্‌ গিস্‌ ক'রছে। তীব্র কণ্ঠে, অশ্লীল ভাষায় এক পক্ষ আর এক পক্ষকে এমন ভাবে সম্ভাষণ ক'রছে যে, ভদ্রলোকদের কানে আঙ্গুল দিতে হয়। অসীম ফিরবে মনে ক'রছে, এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত কণ্ঠস্বর ভেদ ক'রে কর্কশস্বরে একজন আর একজনকে এমন বাক্য প্রয়োগ ক'রলে যে, মেয়েরা পর্য্যন্ত খোলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। অসীমের দৃষ্টি চকিতে তার ওপর গিয়ে পড়িল। সে শিউরে উঠে দেখলে, এ সেই হেমাঙ্গিনী !

তার মন মুষড়ে গেল। ঘৃণায় সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ ক'রে বাসায় ফিরে এল। হেমাঙ্গিনী যে এত নীচ তা সে ভাবতে পারেনি। ওর প্রতি তার মন সেদিন আরো বিষাক্ত হ'য়ে উঠল।

একদিন, দুদিন, তিনদিন ক'রে এক সপ্তাহ কেটে গেল। অসীম যত হেম্যাঙ্গিনীকে ভোলবার চেষ্টা ক'রে কিন্তু পারে না। যে সৌন্দর্য্য একদিন তার মন ভুলিয়েছিল, তার স্মৃতি বারবার তাকে এমন বিহ্বল ক'রে তোলে যে তাকে দেখবার জন্যে আবার সে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

শেষে একদিন রাত্রে চুপি চুপি অসীম বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়'ল।

রঙীন কাপড় প'রে মুখে চোখে রঙ দিয়ে খোলার ঘরের দরজায় আধ-আলো, আধ-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কত নারী। তাদের এই নিষ্ঠুর পেশার কথা ভেবে অসীমের মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় !

যেতে যেতে সহসা সে থেমে গেল এক জায়গায় এসে। দেখলে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেমাঙ্গিনী। অদ্ভুত তার বেশভূষা ! রাত্রের অস্পষ্ট আলোতে সে যেন কোন মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছে। চোখের ইসারায় সে তাকে ডাকলে। অসীমও আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ল।

সেই স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে ঢুকে অসীম চেয়ে দেখলে, কোথাও দাঁড়াবার বা বসবার মত এতটুকু স্থান নেই। শুধু একটি বিছানা, আর পাশাপাশি দুটি বালিশ। আবার তার মনটা যেন মুসড়ে গেল ! সে আর একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখলে সেই ঘরের মধ্যে শুধু হেমাঙ্গিনী ও সে।

হেমাঙ্গিনী তখন দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তাকে বিছানায় উঠে ব'সতে ব'ললে। তার মুখ থেকে প্রথম এই রকম সম্ভাষণ শুনে অসীমের গাটা যেন ছমছম ক'রে উঠল, সে মনে মনে ধিক্কার দিলে তার এই কুৎসিত প্রবৃত্তিকে ! তারপর পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বার ক'রে বিছানার ওপর ফেলে

দিয়ে সে দরজার খিলটা খুললে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

তখনি পিছন দিক থেকে তার একটা হাত ধ'রে ফেলে হেমাঙ্গিনী ব'ললে, আমি ভিখিরী নই যে তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমায় ভিক্ষা দিয়ে চলে যাবে আর আমি তা মাথায় ক'রে নোবো। আমাদেরও আত্মসম্মান আছে, তা না হ'লে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াতুম—এ পথে আসতুম না।

তার কণ্ঠস্বরের এই দৃঢ়তা ও তার সঙ্গে এই আত্মসম্মানবোধ, অসীমের খুব ভাল লাগল। তবুও একটু ইতস্তত হ'য়ে অসীম ব'ললে, কেন? এ তো তোমাদের প্রাপ্য, তবে আপত্তি ক'রছ কেন?

হেমাঙ্গিনীর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তীক্ষ্ম কটাক্ষ হেনে ব'ললে, ওগো সাধুপুরুষ, ছিনালী রাখো। এত রাত্রে চুপি চুপি খোলার ঘরে এসেছ, আর কার সঙ্গে কি ব্যবহার ক'রতে হয় ভুলে গেলে চ'লবে কেন? বলি, বয়েস তো ঢের হ'য়েছে, এ পথে কতদিন হ'ল!

লজ্জায় অসীমের ঘাড় হেঁট হ'য়ে গেল। এ পথে সে আর কখনো আসে নি। শিল্পী সে, রূপ নিয়ে তার কারবার, সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখাই তার বিলাস। তাই এই রূঢ়-ভাষণ শুনে তার মনটা একেবারে দমে গেল। তবু একবার তার ইচ্ছা হলো তাকে বলে—আমি তোমায় দেখতে এসেছি, তুমি অতি সুন্দর! আর আমি কিছু চাই না, শুধু তোমায় দেখবো!

কিন্তু সে-কথা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না, তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই কি হ'ল কে জানে—সমস্ত সংকোচ, সমস্ত লজ্জা কেটে গিয়ে আবার শিল্পী-ভাব জাগ্রত হ'লো তার প্রাণে। অসীম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমাঙ্গিনী ব'ললে, জানি, আমি সুন্দরী নই, চোখঝলসান রূপ আমার নেই—তাই তোমার ঘৃণা হ'ল আমায় দেখে, আর সেই ঘৃণাকে আরো বেশী ক'রে তুমি জানালে এই টাকা দিয়ে।

অসীম এইবার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, তার হাতটা দু'হাতে চেপে ধ'রে আবেগ-থরথর-কণ্ঠে ব'ললে, তুমি জানোনা তোমার কি সৌন্দর্য্য আছে! তোমার রূপের দাম দিতে পারি এমন অর্থ আমার নেই। এই ব'লে, আরো একখানা নোট সে তার হাতে গুঁজে দিলে।

মুহূর্তের জন্য হেমাঙ্গিনীর চোখ দু'টো জ্বলে উঠল, তারপর অভিমানের সুর কণ্ঠে এনে ব'ললে, না আমি পরের দান গ্রহণ ক'রব না, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

অসীম ব'ললে, সুন্দরী, তুমি রাগ ক'র না, এ টাকা আমি ত তোমায় দান করছি না!

তবে কি ভালবেসে দিচ্ছ?

অসীম বললে, এ তার চেয়েও বেশী। এ তোমার প্রাপ্য—চুরি ক'রে তোমার রূপ অনেক দিন ধ'রে দেখেছি, এ তারই জরিমানা।

তুমি তাহ'লে চোর? এই ব'লে হেমাঙ্গিনী একটু মুচকি হাসলে। এতক্ষণে সে অসীমকে চিনতে পারলে যে এই সেই ব্যক্তি! ও সেকথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। রাস্তায় বেরুলে এরকম ঘটনা তাদের জীবনে অনবরতই ঘটে, কাজেই কত লোককে মনে রাখা সম্ভব!

হ্যাঁ, চোর এখন ধরা প'ড়েছে, তাই তোমায় চুরি করা জিনিষের দাম নিতে ব'লছি। এইবার অসীম যেন মনে বেশ বল পেলে।

হেমাঙ্গিনী ব'ললে, চোর ধ'রে তার কাছ থেকে কেবল জিনিষের দাম নিয়ে কেউ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য তাকে উপযুক্ত শাস্তিও ভোগ করতে হয়।

শাস্তি?

হ্যাঁ, শাস্তি প্রত্যেক চোরকেই পেতে হয়—এ বুদ্ধি বোধহয় তোমার আছে।

অসীম ব'ললে, আমি শাস্তি পেলে যদি তুমি খুশী হও ত আমি প্রস্তুত।

হেমাঙ্গিনী হাসতে হাসতে ব'ললে, বেশ তাহ'লে আজ সারা রাত তুমি এই ঘরে বন্দী, এই তোমার শাস্তি।

না না, আমি কিছুতেই পারব না, এ শাস্তি তুমি তুলে নাও আমার ওপর থেকে। এই বলে অসীম ব্যাকুলকণ্ঠে তাকে মিনতি করলে।

তা হ'লে তোমার এদান-ও আমি নিতে পারব না—আমার আত্মসম্মানে বাধবে।

অসীম ব'ললে, আর কি কোন উপায় নেই?

কঠিনভাবে সে শুধু ব'ললে, না।

অনেক ভেবে শেষে অসীম ব'ললে, আমি ছবি আঁকি এবং সেই ছবি বিক্রি ক'রে অনেক টাকা পাই। যদি এ টাকা নিতে তোমার একান্ত আপত্তি থাকে ত এক কাজ ক'রতে পার—আমি যখন ছবি আঁকব তুমি গিয়ে আমার সামনে ব'সে থেকো কিছুক্ষণ ক'রে।

কথাটা হেমাঙ্গিনীর মন্দ লাগল না তবু সে বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, আমার ছবি!

হ্যাঁ তুমি অতি সুন্দর! যাবে এখন আমার সঙ্গে?

সে তখনি রাজী হ'ল, এবং টাকাগুলি বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে তার সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়ল।

টালিগঞ্জের গঙ্গা যেখানে সরু হ'তে হ'তে হঠাৎ চওড়া হ'য়ে গেছে, তারই বাঁ-ধারে ঝাউগাছ-ঘেরা ছোট্ট একটি বাগান-বাড়ী। দোতলায় প্রকাণ্ড একখানা কাঁচ-ঘেরা ঘরে নানা রঙের নানা ছবি সাজান—কোনটা সম্পূর্ণ কোনটা বা অসম্পূর্ণ। সেই ঘরে বড় একটা আলোর সামনে হেমাঙ্গিনী গিয়ে দাঁড়াল, আর অসীম তাকে দেখে ছবি আঁকতে লাগল।

একদিন দুদিন ক'রে প্রায় দু'মাস কেটে গেল। রোজ হেমাঙ্গিনী এসে এমনি ক'রে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আর যাবার সময় টাকা আঁচলে বেঁধে নিয়ে চলে

যায়। অসীম যেমন ক'রে দাঁড়াতে বলে, যেভাবে চাইতে বলে, সে ঠিক তেমনি ভাবে সব ক'রে যায় বিনা আপত্তিতে।

দু'মাস পরে যখন ছবি সম্পূর্ণ হ'ল তখন অসীম দেখলে, হেমাঙ্গিনীকে না দেখে সে আর থাকতে পারবে না। কখন গোপনে সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। তাই হেমাঙ্গিনীর কাছে সে প্রস্তাব করলে তার এই ঘৃণিত জীবন ত্যাগ করে তার সঙ্গে বাস করবার জন্যে। হেমাঙ্গিনী তাতে রাজী হলো। আনন্দে অসীমের সৃষ্টির উৎস যেন খুলে গেল। অসীম তাকে সামনে রেখে মডেল করে ছবি আঁকলে—ছোট বড় অসংখ্য। তাদের প্রত্যেকটীই উচ্চ মূল্যে বিক্রী হতে লাগল এবং সুনামও সঙ্গে সঙ্গে অসীমের বাড়তে লাগল।

এমনি করে যখন বছর পাঁচেক গেল কেটে হেমাঙ্গিনী তখনো সুখে বাস করতে লাগল অসীমের কাছে। এই সময় অসীম এক নতুন ছবি আঁকতে সুরু করলে। বিরাট ছবি, শিল্পীর তুলির টানে দেখতে দেখতে জীবন্ত হ'য়ে উঠল। শ্রীরাধিকার বেশে হেমাঙ্গিনী অভিমানভরে দাঁড়িয়ে আছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তার পায়ে ধ'রে মান-ভঞ্জন ক'রছে। হেমাঙ্গিনী বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেল নিজের ছবি দেখে। সে ভাবলে, সত্যি কি সে এত সুন্দর! প্রথমটা তার কেমন লজ্জা হ'ল, অথচ তার চেহারার সঙ্গে ছবির হুবহু মিল দেখে সে রীতিমত গৌরব অনুভব করলে।

বহু টাকায় সে ছবিখানি বিক্রি হ'লো একজিবিসনে। কোন এক মাড়ওয়ারী কিনে নিয়ে গেল।

এইভাবে হেমাঙ্গিনীর দিন যখন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটছে তখন হঠাৎ একদিন তার এ-জীবনের ব্যতিক্রম ঘটলো কাশীতে বেড়াতে গিয়ে। অসীমের সঙ্গে গিয়ে সেখানে সে এক বড় হোটেলে উঠেছিল। এবং রোজ তারা দুজনে বেড়িয়ে বেড়াত একসঙ্গে। কিন্তু একদিন কি হলো, একলা হেমাঙ্গিনী বেরিয়ে পড়লো উৎসব দেখবার জন্য গঙ্গার ধারে এক মঠে।

প্রাঙ্গণে লাল সামিয়ানা টাঙ্গান, তারই নীচে তুলসীমঞ্চের ওপর বিরাট একখানা ছবি রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজান। আর গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণরা ছবিটীকে ঘিরে কীর্তন গাইছেন। তারপর শাঁখ-ঘণ্টা ধূপধুনার সঙ্গে পট্টবস্ত্র-পরিহিত পুরোহিত সেই ছবিটীর আরতি সুরু ক'রলেন। গলায় আঁচল দিয়ে, হাত জোড় ক'রে হেমাঙ্গিনী সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আরতি শেষ হ'তে, শাখ-ঘণ্টা থামল, সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রলে সেই পুষ্পবিভূষিত ছবিকে। হেমাঙ্গিনীও করলে, কিন্তু প্রণাম শেষ ক'রে ঠাকুরের দিকে চোখ তুলে চাইতেই সে চম্‌কে উঠল! এ যে তারই ছবি—সেই মানভঞ্জন! তার সর্ব্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল তার মন। তবে কি এত ব্রাহ্মণ, এত সন্ন্যাসী তাকেই প্রণাম ক'রলে? তারা কি চিনতে পারলে না তাকে! সে কি তবে—! না, না, অতি পাপী সে! এ কথা তার মনে হ'লে যে দেবতা কলুষিত হবেন! উচ্চারণ ক'রলে যে তার জিব খ'সে

যাবে। তার মত পাপী, তার মত ঘৃণিতা কলঙ্কিনীর পক্ষে এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ !

একবার তার মনে হ'ল যত ব্রাহ্মণ যত সন্ন্যাসী সেখানে আছে, ছুটে গিয়ে তাঁদের সকলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়, কিন্তু তা সে পারলে না। এক অব্যক্ত বেদনায় হেমাঙ্গিনীর মন তখন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। সে কারো সঙ্গে কোন কথা না ব'লে চুপ করে সেই ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, অনেকক্ষণ। তারপর কি মনে ক'রে একে একে তার দেহ থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে সেই ছবির পায়ের তলায় রেখে চলে গেল—কোথায় তা কেউ জানতে পারলে না।

এদিকে অসীম পুলিশে খবর দিলে, বহু অর্থব্যয় ক'রে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করলে কিন্তু কোথাও হেমাঙ্গিনীর কোন সন্ধান পেলে না।

এমনি ক'রে সুদীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল। এই শব্দঝঙ্কারময়ী পৃথিবীর অনন্ত কোলাহলের মধ্যে কত লোক এল, কত লোক গেল, কোথায় কত পরিবর্ত্তন হ'ল, কেউ তা জানতে পারলে না।

ইতিমধ্যে শুধু অসীমের শিল্পীখ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং সকলের তা জানতে বাকী রইল না। তখন একদিন এক মাতৃমূর্ত্তির ছবি আঁক্‌বার নিমন্ত্রণ পেয়ে অসীম বৃন্দাবনের এক মঠে গিয়ে হাজির হ'ল।

বিরাট মঠ। বহু সন্ন্যাসী খোল করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন ক'রছেন, আর মাঝখানে ব'সে আছেন পদ্মাসনে সৌম্য ও ধ্যানরতা এক দেবীমূর্ত্তি—গলায় তাঁর ফুলের মালা ও সারা অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র।

অসীম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য অনুভব করতে লাগল।

কীর্ত্তন থাম্‌ল। মা, মা,—ব'লে সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে সেই দেবীর চরণধূলা নিলে।

অসীমও সকলের সঙ্গে নমস্কার ক'রলে।

কিন্তু সেই দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁর মুদিত চক্ষু উন্মীলিত করতেই অসীম অবাক হ'য়ে গেল—এ যে হেমাঙ্গিনী !

পাষাণ মূর্ত্তির মত অসীম চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইল—চোখের পলক প'ড়ল না, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। শুধু তার মনে হ'তে লাগল একি সত্যি ! এই কি সেই হেমাঙ্গিনী !

গ্রন্থপরিচয়

সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে বাঁকাস্রোত, মহানদী ও পদধ্বনি এই তিনটি উপন্যাস ও প্রথম গল্প-সংকলন জটিলতার পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

প্রথম গ্রন্থ বাঁকাস্রোত লেখকের প্রথম উপন্যাস। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের পরে মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও সমালোচক-সাংবাদিক সজনীকান্ত দাসকে উৎসর্গিত। প্রথম পেপার-ব্যাক সংস্করণ থেকে রচনাবলীর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মহানদী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। বাঁকাস্রোতের পটভূমি মূলত শহর ও শহরতলী, মহানদীর পটভূমি পল্লীগ্রাম। এই গ্রন্থ বিখ্যাত কবি ও সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায়কে উৎসর্গিত। এটিরও পাঠ গৃহীত হয়েছে প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ থেকে।

তৃতীয় গ্রন্থ 'পদধ্বনি'কে উপন্যাসিকা বলাই সঙ্গত। বর্তমান যুগে অবক্ষয়ের ফলে তরুণসমাজ যে নৈরাশ্য ও হিংসার শিকার হয়েছে, বস্তুত তারই পটভূমিতে 'পদধ্বনি'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত হয় ও সেখান থেকেই রচনাবলীর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

জটিলতা 'গল্পগ্রন্থ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে। এই গ্রন্থ প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল ও তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী দেবীকে উৎসর্গিত হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পাঁচটি গল্প—জটিলতা, সহধর্মিণী, প্রথম প্রেম, প্রতিঘাত ও ছবি রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥